মনোজ বসুর রচনাবলী

[চতুর্থ খণ্ড]

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট | কলিকাতা-৭০০০১২

সম্পাদক ঃ

দীপক চন্দ্র • মনীষী বসু • ময়ূখ বসু

ঃ চতুর্থ খণ্ডের সূচী ঃ

প্রকাশক ঃ ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

মুদ্রক ঃ শিশির কুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০-বি ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০০০৭

দাম ঃ কুড়ি টাকা

ভূমিকা

সোভিয়েতের দেশে দেশে (১৩৬৪, কার্তিক)।

গ্রন্থ সম্পর্কে লেখকের মনোভাব পূর্ব-খণ্ডে ব্যক্ত হয়েছে। ভ্রমণকাহিনীকে মনোজ বসু কোথাও বস্তুসর্বস্ব করেন নি। ছন্দগত রোমান্স রসে জারিত হয়ে তা অপূর্ব গল্পরূপ লাভ করেছে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত রাশিয়ার পুনর্গঠন এবং দ্রুত স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন লেখকের দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রভুত্বকামী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের শোষণে নিঃস্ব রিক্ত ভারত পুনর্গঠনের জন্য দেশের মানুষের মনে সে দেশের বিপুল কর্মচাঞ্চল্য চিত্রায়িত করে লেখক উন্মাদনার সৃষ্টি করেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় যথার্থ ই বলেছেন: "মনোজ বাবুর শক্তিশালী লেখনী সুবৃহৎ সোভিয়েত ইউনিয়নকে আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে···যাহা সম্পূর্ণ নূতন এবং যে সমাজ বেগবান, প্রাণময় ও সৃষ্টিধর্মী।"

জলজঙ্গল (১৩৫৮, কার্তিক)।

খাল-বিল, নদী-নালা, প্রান্তর-বনানী শোভিত প্রাকৃতিক পটভূমি আর তার সহজ সরল বেপরোয়া দুঃসাহসী সরল মানুষগুলির জীবনের বিচিত্রতা ও বিশালতা বাংলার নিজস্ব প্রাণছন্দে কবিভাবনার মন্ময় উত্তাপে বিগলিত পরিশ্রুত হয়ে এক সর্বাতিশায়ী সুরবলয়িত রোমান্টিক উপলব্ধির স্বাদ সৃষ্টি করেছে 'জলজঙ্গল' উপন্যাসে। 'জলজঙ্গল' ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয় 'দেশ'-এ (২৪শে চৈত্র ১৩৫৭—১২ই আশ্বিন ১৩৫৮)। গ্রন্থাকারে আত্ম-প্রকাশ করে কার্তিক ১৩৫৮-এ।

বাল্যে ও কৈশোরে দেখা দিগন্তলীন খাল-বিল, নদী-নালার প্রান্তবর্তী মানুষগুলোর অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্য, অর্ধআরণ্যক দুর্ধর্ষ বেপরোয়া জীবন-যাপন কঠোর জীবন-সংগ্রাম মনোজ বসুকে আকৃষ্ট করে। এ সম্পর্কে লেখকের উক্তি: "গ্রাম আমার সুন্দরবন অঞ্চল থেকে দূরবর্তী নয়···জনালয় থেকে বিচ্ছিন্ন,

বনবিবি ও বাঘের সওয়ার গাজি-কালুর রাজ্য রহস্যময় সুন্দরবন ছোট বেলা আমায় আকর্ষণ করত।···সমগ্র সুন্দরবন আমি ঘুরেছি।···সুন্দরবন নিয়ে দুটো উপন্যাস ও কতকগুলো গল্প লিখেছি আমি। কোন কোন অংশ একেবারে বনের ভিতর খালের উপর নৌকোয় বসে লেখা।"—সুন্দরবনের পটভূমিতে লেখক বঙ্গোপসাগরের অদূরবর্তী অচেনা-অজানা অরণ্যচারী মানুষদের অসংস্কৃত উদ্দাম প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা, দয়া-মায়া, অনুরাগ ও প্রতিহিংসার এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। দুর্গম বাদাঅঞ্চলের ভয়াল প্রাকৃতিক পরিবেশ গল্পটিকে মোহময় অদ্ভুত ও চমৎকার করেছে। চরিত্রগুলি আরণ্য প্রকৃতির পরিবেশের সঙ্গে একসুরে বাঁধা। এক কথায় মাটি জল আর মানুষ একাকার হয়ে গেছে এই উপন্যাসে। জল ও জঙ্গল জীবন্ত মানুষের পাশাপাশি চরিত্ররূপে ফুটে উঠেছে। বস্তুধর্ম রোমান্টিকতা ও রোমান্সের সমন্বয়ে "জলজঙ্গল" অনবদ্য ও অভিনব।

'জলজঙ্গল'-এর ইংরাজী অনুবাদ (The Forest Goddess—Asia Publishing House, 1965) দেশে ও বিদেশে বাংলা সাহিত্যের খ্যাতি ও গৌরব বৃদ্ধি করেছে। বিদেশী পত্রপত্রিকা The Foresr Goddess-এর প্রশংসায় মুখর। মনোজ বসুর অনন্যসাধারণ প্রতিভার মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে Envoy পত্রিকায় জনৈক ভাষ্যকার বলেন: "The jungle, which like a mistress withits inhabitants, love and hate at the same time, is the real hero and the real villain of the story." এই প্রসঙ্গে 'Readers Magazine'এর সমালোচনাও প্রণিধানযোগ্য: "These people have their own codes, jungle laws, and yet, a surprisingly sophisticated emotional life. Forest Goddess is their story, beautifully told and refreshingly free of the syrupy descriptions of folktales or factual data of travellogue-cum-novel."

চাঁদের ওপিঠ (১৯৬৬, ফেব্রুয়ারী)॥

'চাঁদের ওপিঠ'-উপন্যাসে শিল্পপতি নীরদবরণ সামাজিক বিচারে ও নীতি-ধর্মের দিক থেকে যাই হোক না কেন, গার্হস্থ্য-প্রেমিক মনোজ বসুর মমতাস্পর্শে তার সকল দোষত্রুটি অন্যায় অপরাধ ঢাকা পড়ে যায়। বাৎসল্যের অনাবিল প্রসন্নতা ও মুগ্ধতায় নীরদবরণের চরিত্র মহিমময়। কোন অবস্থাতেই পুত্র

ভাস্করের কাছে তাকে খর্ব করেন না লেখক। পুত্রস্নেহের নির্মল রূপকে তিনি একটি স্নিগ্ধ সহজ সহানুভূতির সঙ্গে রূপ দিয়েছেন।

জীবনরসের রূপকার মনোজ বসু মানুষের শুভচেতনায় বিশ্বাসী। মানুষ-সম্পর্কে অপরিসীম উদারতা তাঁর সাহিত্যে ক্রূর স্বভাবের কোন মানবচরিত্র আঁকেনি বললেই চলে। ক্ষুব্ধ গৌরদাসের ব্যক্তিত্বের বৈদ্যুতিক বিস্ফোরণের দীপ্ত আলোকচ্ছটায় নীরদবরণের শাঠ্য লাম্পট্য কাপট্যের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। এতে কিন্তু পিতার প্রতি পুত্রের শ্রদ্ধা-ভালবাসা বিপন্ন হয় না। এমন কি গৌরদাসের বিরোধিতার মধ্যেও নেই প্রতিহিংসার উত্তাপ। কারখানার জট-পাকানো পরিবেশে গৌরদাসের রহস্যময় ব্যবহার ভাস্করকে জীবনের অতলান্ত রহস্য-জিজ্ঞাসায় প্রশ্নচঞ্চল করে। কিন্তু মানসজগতের গূঢ় গহন পরিক্রমায় লেখকের উৎসাহ নেই। ভাস্করের মনে যে জটিলতার গ্রন্থি পড়েছে, তাকে যাতে পাঠক অনুসরণ করতে পারে সেজন্য তিনি কিছু সংকেত সৃষ্টি করেছেন এইমাত্র। ভাস্করের গৌরদাস হত্যার পরিকল্পনা যেন সেই সাংকেতিক ভাষায় লেখা হয়েছে। মানুষের কোন বিপথগামিতা মনোজ বসুর কল্পনায় আসে না। জীবনের সুস্থ সমাজসম্মতরূপই তাঁর আরাধ্য। লেখকের মানসিক মমত্ববোধ গ্রামকে আশ্রয় করে তাই জীবনের পূর্ণতা অন্বেষণ করে। গ্রামের মধ্যে জীবনকে ফুটিয়ে তোলায় লেখকের অনায়াস-দক্ষতা মনের গভীরে একটি স্নিগ্ধ শ্যাম লাবণ্য-রেখা এঁকে দেয়। ভাস্করের জীবনে তারই এক অত্যাশ্চর্য রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। তার নবজন্ম হয়েছে। মানুষের পরিপূর্ণতা পল্লী ও প্রকৃতির সাহচর্যে সম্ভব, 'চাঁদের ওপিঠ' উপন্যাসে লেখক সেই উপলব্ধির বাণীরূপ দিয়েছেন।

৬, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এভিনিউ
কলিকাতা-৩০

—দীপক চন্দ্র

সোবিয়েতের দেশে দেশে

(দ্বিতীয় খণ্ড)

ভ্রমণ-কাহিনী

সোবিয়েতের

দেশে দেশে

(ভ্রমণ কাহিনী)

[দ্বিতীয় খণ্ড]

॥ পনের ॥

দুশানবে-(তখনকার নাম স্টালিনাবাদ) এরোড্রোমে যাত্রীরা সব প্লেনের অপেক্ষায় আছে। দাড়িওয়ালা গ্রাম্য চাষী—হাতে মোটা লাঠি। আবার এদের চেয়েও দীন পোশাকের লোক দেখছি। হরদম তবু আকাশে চলাচল। তুরসুন বিদায়-বক্তৃতা করলেন। কবি লোক—ভাষা আবেগময়। বন্ধুরা, তোমাদের মহৎ দেশের সুন্দর মানুষদের জন্ম ভালবাসা নিয়ে যাও। প্লেনে চললে তোমরা মস্কোয়—মস্কো ছাড়িয়ে আরও কত কত দূরে! প্লেনের পাখায় লেখা, ঐ দেখ, শান্তি। শান্তিময় দেশের উপর পাখা বিস্তার করে উড়ে যাবে প্লেন, পাখার নিচে মানুষের শান্ত ঘরগৃহস্থালি। সারা জগতের সমস্ত মানুষের শান্তির উপর আমাদের স্থিরলক্ষ্য হোক···

শহর ছাড়িয়ে এলাম। জনালয় কমে আসছে। নদী—বাঁধে-বন্দী স্রোত। দিগ্‌ব্যাপ্ত ফসলের ক্ষেত মাঝে মাঝে। তারপরে বালুভূমি। উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি—অনেক উঁচু। ভারি মজা—মনে হচ্ছে, পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে উঠছি যেন। পাহাড়ের উপর জায়গায় জায়গায় বিস্তর গাছপালা। নির্জলা ভূমিতে বিশেষ ধরনের জঙ্গল বানায়—সেই সব গাছই হয়তো এই পাহাড়ে।

পাহাড় ছাড়িয়ে আরও কত দেশ পেরিয়ে বড় নদী নজরে এলো। শিরদরিয়া। তারই কিনারা ধরে প্লেন উড়ছে। শহর দেখা যায় ঐ। আর কি—তাসখন্দে এসে পড়েছি আবার। নতুন প্লেন এসে এইখান থেকে আমাদের মস্কোয় নিয়ে যাবে। আজকের দিন এখানে স্থিতি। সে-ই হোটেলে নাকি ? এক এক তলায় একটা কল ও এক পায়খানা। সে কথা মনে পড়ে আতঙ্ক লাগে। এয়ারপোর্টে সবগুলিই প্রায় চেনা মুখ, অভ্যর্থনার জন্ম এঁরাই এসেছিলেন আগের বারে। আর এসেছে অতি-সুন্দর সেই দোভাষী তরুণী। হাসিয়ানা, হাসিয়ানা—নামটা সবাই ভেবে নিচ্ছি। হাসতে হাসতে সে সংশোধন করে দেয়, ঐ দেখুন, আবার ভুল করেন—আসল নাম হাসিয়াৎ। আর বংশটা হল দোস্ত মহম্মদ—অতএব দোস্ত মহম্মদ হাসিয়াৎ নাম দাঁড়াল পুরোপুরি।

কাল রাত্রে তেজা সিং গোলমালে পড়েছিলেন। সে গল্প শোনেননি বুঝি। ছুটোছুটিতে চোখে অন্ধকার দেখছি, ফাঁক কখন যে দু-দণ্ড জমিয়ে গল্পগুজব করব ? সেই যে দলনেতা তেজা সিং, বুড়া মানুষ—শরীরটা তেমন ভাল

যাচ্ছে না—সারাদিন ধরে অনেক রকম আত্মনিগ্রহের সঙ্কল্প করেন, কিন্তু খানা-টেবিলে বস্তুগুলোর সামনে আর হুঁশ থাকে না। ডিনারে বসে বিস্তর প্রমাণ কয়েকটা আমিষ-কাটলেট সেবনের পর জানা গেল নিরামিষ কাটলেটও উত্তম হয়েছে। তখন তার উপরে নিরামিষ কাটলেটও চাপান দিয়ে দিলেন। ফলে রাত দেড়টায় দম বন্ধ হবার জোগাড়। জ্ঞান মজুমদার ডাক্তারমশায়ের ডাক পড়েছে। কনকনে শীতে হি-হি করতে করতে মজুমদার মশায় রোগি দেখতে ছুটলেন। ব্যাপার গুরুতর বটে! উদরের ভার-মোচনের জন্য বার বার বাইরে বেরুনোর তাগিদ—কিন্তু বিপদ হয়েছে, ভোরবেলায় রওনা হবার তাড়ায় এখন থেকেই লোকে ধর্না দিয়ে আছে। বারম্বার দরজা ছেড়ে দিতে চায় না—নেতার খাতিরেও নয়। তেজা সিং অতএব বেডপ্যান চাইলেন—উল্টো বুঝে ওরা ঐ নিশিরাত্রে তুর তুর করে চা বানিয়ে আনল। ইত্যাদি, ইত্যাদি। এরোড্রোমে গিয়েও তাঁর রাগ পড়েনি—খোঁজ নিচ্ছিলেন, এখান থেকে কাবুলে সোজা পাড়ি দেবার উপায় আছে কিনা। বেড়ানোয় বিতৃষ্ণা ধরে গেছে, দেশে ফিরতে পারলে বেঁচে যান। ভয়েরও ব্যাপার—আমরা সেইদিক দিয়ে ভাবছি। তাসখন্দে গিয়ে আবার যদি রাতের কাণ্ড শুরু করে দেন, এজমালি একটি শৌচখানা নিয়ে বিষম মুশকিল হবে। সেবারে পনের জন আমরা দিশা করতে পারি নি। এবারে যাচ্ছি তো পঁচিশ।

ছায়া-মোড়া পথ। সেবারে খানিকটা ঘোরাফেরা করে গেছি, চারিদিক চেনা লাগছে। গাড়ি চলল—কিন্তু সেই হোটেলের দিকে বোধহয় নয়। রেলরাস্তার তলা দিয়ে যাচ্ছি, এ তল্লাটে এসেছি বলে মনে হয় না। তাই বটে! শহর ছাড়িয়ে বাইরে এলাম। রাস্তা আর পিচ-দেওয়া নয়—পাকা বটে কিন্তু উঁচু-নিচু। অনেক—অনেক দূর, এরোড্রোম থেকে মাইল পাঁচশেক হবে। গাড়ি তার পরে বাঁক নিল ধুলো-ভরা এক গ্রামপথে। বাংলা দেশেরই এক গ্রাম যেন। দিগ্‌ব্যাপ্ত মাঠ—কোথাও ফসল ফলেছে, ফসল কেটে নিয়েছে কোথাও। কুটির এদিকে-ওদিকে—হাঁস-মুরগি ঘুরছে, গরু-ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। রাস্তার ধারের নয়ানজুলি দিয়ে জলধারা বয়ে যাচ্ছে কলকল বেগে। এক বাংলো-বাড়িতে নিয়ে তুলল। গোলাপ-বাগানে উঠান ভরে আছে। চারিদিকে গাছপালার সমরোহ।

গোটা তিনেক বাড়ি কম্পাউণ্ডের ভিতরে। আমাদের পরের প্লেনে কাণ্টার-বেরির ডীন এসে পৌঁচেছেন। ছোট বাড়িটায় তাঁদের তুলল। বড় দোতলা বাড়িতে আমরা। দামি দামি আসবাবপত্রে পরিপাটি সাজানো-গোছানো। কোন নবাব-আমিরের বাগানবাড়ি যেন। উঠানে পা দিতে না দিতে বড় টেবিলে

ডিনার সাজিয়ে ফেলেছে। উপরের ঘর নিচ্ছি না আমরা। সিঁড়ি ভেঙে মালপত্র নিজ হাতে তুলতে হবে, কুলি নেই। তা ছাড়া রাত্রি দুটোয় এখান থেকে রওনা, সমস্ত আবার নামিয়ে আনো সেই সময়। নিচের ঘরে থাকলে ঝামেলা কম হবে। ঘর উপরের হোক নিচের হোক, ফেলনা কোনটাই নয়। আর নেতা এবং ডেপুটি-নেতাকে যে দুটো ঘর দিল, কোনো লাটসাহেব তা পান না। অন্তত পক্ষে পশ্চিম-বাংলার ঋষি-লাট হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় তো ভাবতেই পারতেন না ঐ রকম সাজসজ্জা। ঘরের লাগোয়া বসবার ঘর, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে চোখের মণি দুটো ছিটকে বেরিয়ে আসে। খবর নিয়ে জানলাম, এটা হল কর্মিকসৌধ, এই কিছুদিন আগে বানিয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের চিঠি নিয়ে কর্মিকরা দিন কয়েক থাকে এসে এখানে, ফূর্তিফার্তি করে।

ক্লান্তিতে লেপ মুড়ি দিয়েছি। ধড়মড় করে উঠে দেখি, বেলা পড়ে এসেছে। কোন দিকে কেউ নেই—কী মুশকিল, বাড়িতে আমি একলা একটি প্রাণী মনে হচ্ছে। না, একেবারে একা নই—বেরিয়ে এসে রাও সাহেবকে পেলাম। মাদ্রাজের এডভোকেট—কানে খাটো বলে সব সময়ে যন্ত্র কানে দিয়ে বেড়ান। গেঁয়ো রাস্তায় বেরুলাম তাঁকে নিয়ে। পথ ছেড়ে মাঠে নেমেছি; মাঠের প্রান্তে চাষীদের ঘরবাড়ি—কোণাকুণি পাড়ি দিচ্ছি সেইমুখো। এক বাড়ির সামনে এলাম। কৌতূহলে পাড়াসুদ্ধ উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। এক মাঝবয়সি গিন্নি কোথায় ছিলেন—তাড়াতাড়ি এগিয়ে অভ্যর্থনা করেন।

উজবেকি ভাষা এবং এ-তল্লাটের যাবতীয় ভাষার নিকট-সম্পর্ক ফারসির সঙ্গে। ফারসিতেও বিষম দিগ্‌গজ আমি, তবু কিন্তু দু-পাঁচটা কথা দিব্যি বুঝতে পারি। এবং কথা না বুঝলেও দু-চোখে যে আন্তরিক সমাদর ফুটে উঠেছে, সেটা বুঝতে আটকায় না। ছিমছাম ঘরবাড়ি, মেজেয় গালিচা পাতা। কয়েকটা বাচ্চা খেলা করছে। ধুলো-মাখা পোশাকে ড্যাবডেবে চোখ মেলে তারা এগিয়ে এলো। কাছে ডাকছি হাতের ইসারায়। হাত বাড়িয়ে দিল একটি, দিয়েই আবার সরিয়ে নেয় লজ্জায়। বড়টি গটমট করে বীরোচিত ভাবে এসে দাঁড়ায়। দেখাদেখি ছোটটিও তখন এগোয়। হাত ধরে একটুকু হাত মলে দিলাম দুজনের, গালে আঙুল ছুঁইয়ে আদর করলাম। গিন্নি ওদিকে চায়ের জোগাড় করতে চান, ঠারেঠোরে বলছেন। না-না করে ঘাড় নেড়ে আমরা সরে পড়লাম। এদিক-ওদিক আরও খানিকটা চক্কোর মেরে বাড়ি ফিরে আসি।

এক বা দু-জন কেন হব, আরও তো আছেন বাড়িতে। হীরেন মুখুজ্জে ঘর থেকে বেরুলেন। বিষম বিরক্ত। গিয়েছে ওরা সকলে কনজারভেটরিতে। অর্থাৎ সঙ্গীতের কলেজে। তিনি এক চেয়ারে বসে আর এক চেয়ারে পা তুলে

ক্লান্তিতে একটু চোখ বুজেছিলেন, তন্দ্রাও একটু এসেছিল বোধহয়। কিন্তু যাবার সময় একবার ডেকে যাবে না, এ কেমন কথা ?

গ্রোকোভকে পেয়ে গেলাম—আমাদেরই এক দোভাষি, মস্কো থেকে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। শোন হে, আমরাও যেতে চাই কনজারভেটরিতে, গাড়ির জোগাড় দেখ। তেজা সিং নেমে আসছেন। সিঁড়ি থেকে বলছেন, এখন কোথায় যাবে গো ? ওরা পাঁচটায় ফিরবে, আমায় বলে গেছে। যেতে যেতেই তো পাঁচটা বাজবে। মিছে কষ্টভোগ। তা হোক, আমরা মরীয়া। গাড়ি দু-তিনটা ঝিমিয়ে রয়েছে উঠানে—কষ্ট করে চড়ে বসা। এই কষ্টে নারাজ হলে বিদেশে আসা কেন ? ঘরে বসে থেকেই বা কোন চতুর্বর্গ লাভ হবে ? রাওমশায়ের খোঁজ নেওয়া হল। দাবায় বসে গেছেন তিনি টুপি-দাড়িওয়ালা প্রবীণ এক উজবেকির সঙ্গে। দাবাখেলায় কথা লাগে না। একে কানে কম শোনেন তায় চালের ভাবনায় একেবারে বদ্ধকালা হয়ে গেছেন, কানের যন্ত্রে আপাতত কাজ হবে না। রাওমশায়কে নড়ানো গেল না।

বাড়ির অদূরে, যেখান থেকে কাঁচারাস্তা শুরু, মোড়ের উপর দুটো পুলিশ। কি হে গ্রোকোভ-ভায়া, পুলিশ পাহারায় রেখেছ কেন আমাদের ? পাড়াগাঁ জায়গা—কেউ যদি কোন বদ্ মতলবে বাড়ির মধ্যে ঢোকে, সেজন্য এই বিশেষ বন্দোবস্ত। শহর হলে এ সব লাগত না। কনজারভেটরির সামনে লোকজন ঘিরে দাঁড়াল। উঁহু, আলাপ-পরিচয় পরে—গান-কনসার্ট শুনেগে আগে, হয়তো বা সারা হয়ে গেল এতক্ষণে।

কনজারভেটরির প্রতিষ্ঠা খুব বেশিদিন নয়। উজবেকিস্তানের গাঁয়ে গাঁয়ে লোকসঙ্গীত, কিন্তু রাগসঙ্গীত নিয়ে বেশি কিছু শোনা যায় না। এঁদের কাজ, লোকসঙ্গীতের গবেষণা, বৈজ্ঞানিক স্বরলিপি-রচনা এবং লোক-সঙ্গীতের ভিত্তিভূমির উপর রাগসঙ্গীতের স্থাপনা। একটি মেয়ে গান শোনাল—গানের মধ্যে অনেক বার 'আল্লাহ্' কথা পেলাম। পুরানো গান—ঈশ্বরের ভজন। গাইল নতুন গবেষণার উন্নত তানকর্তবে। ঈশ্বর নিয়ে যদিচ তেমন মাথাব্যথা নেই, পুরানো কোন-কিছু বাতিল করা চলবে না। টাক-মাথা শক্তসমর্থ এক ভদ্রলোক এখনকার ডিরেক্টর—তাঁরই বিশেষ অধ্যবসায় এ সমস্ত ব্যাপারে, নিজের মাথার নানা রকম উদ্ভাবনা।

এক বড় হলে নিয়ে ঢোকালেন। ছবিতে ছবিতে এলাহি ব্যাপার—ঘর-বারাণ্ডার দেয়ালে বড় ফাঁক নেই। নামজাদা গীতকার সুরস্রষ্টা এঁরা সব। প্লাটফরমের উপর পঁয়ত্রিশ জন তৈরি হয়ে আছেন, কনসার্ট শোনাবেন। মেয়ে আছেন, পুরুষ আছেন—হাতে রকমারি বাঁশি ও তারযন্ত্র ; একজনের কাছে

জলতরঙ্গের সরঞ্জাম। বাজনার স্বরলিপি সকলের চোখের সামনে। সাবেকি লোকযন্ত্র—একটু-আধটু সংস্কার করে নতুন কায়দায় বানানো হয়েছে। ডিরেক্টর একটা একটা করে পরিচয় দিচ্ছেন, যন্ত্রীরা উঁচু করে তুলে দেখাচ্ছেন হাতের যন্ত্র। আমি লোকটি নিতান্ত আনাড়ি—তবু শানাই নাগারা দিলরুবা এই নামগুলো না জানার কথা নয়। বাঁশের বাঁশি আছে, আবার বিলাতি ঘোর-প্যাচের বাঁশিও আছে কয়েকটা। অনেকগুলো সুর শোনাল—অতি প্রাচীন সুর একটা, নাম হল কাসগারচা। বলে, বাংলা সুর শুনবেন নাকি? সুর একটু এগোলেই বোঝা গেল, অতুলপ্রসাদের 'ঝমুঝুমু ঝুপুর পায়…'। ভারতের রেডিও ধরে তাই থেকে তুলে নিয়েছেন। আমাদের রেডিও ওঁরা খুব শোনেন, বিস্তর ভাল ভাল সুর পাওয়া যায় নাকি। রবিশঙ্করের একটা বাজনা নিয়ে নিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শেকহাণ্ড সেরে চটাপট হাততালির মধ্যে বিষম দেমাকে আমরা তারপর রাস্তায় নেমে পড়লাম।

হাতে সময় আছে, কি করা যায়? দোকানে হামলা দেওয়া যাক না একটু। জিনিসপত্র দেখি, দর শুনি। বিশেষত একটি মেয়ে আছেন, দেহের রং মেরামতে সর্বদা ব্যস্ত—তাঁর বটুয়ার রসদ ফুরিয়েছে। এদেশের মেয়েরা কি মাখে-টাখে, খোঁজখবর নিয়ে দেখবেন তিনি। গাড়ির সারি চলল স্টোরের দিকে। সমস্ত সরকারি দোকান, জিনিসপত্র সরকারের ফ্যাক্টরিতে বানানো। রাস্তাঘাটে অতএব কোন বিজ্ঞাপন দেখবেন না। সরকারের জিনিস পেয়ে যাবেন কোন না কোন স্টোরে। মাঝারি, ভালো, আরো-ভালো—সবরকমের আছে। দরও বাঁধা। প্রতিযোগিতা নেই, রংদার বিজ্ঞাপনে খদ্দের ভুলোবার চেষ্টাও নেই সেইজন্য।

আরে মশায়, জিনিস দেখব কি—আমাদেরই দেখবার জন্য মানুষ পাগল। সিংজির পাগড়ি, দাড়ি এবং ফারের ধার-বুনানি বিচিত্র ওভারকোট। মেয়েদের রকমারি শাড়ি। আমি তবু ধুতি-চাদর পরিনি, চীনে যেমনটা পরে বেড়াতাম —তবে তো রক্ষে ছিল না আর! তিনটে দল হয়ে পড়লাম—ভিড়টা তিনভাগ হোক। একত্র থাকলে স্টোরের কাজকর্ম অচল হবে।

জিনিসপত্র দু-চারটে কেনাকাটা হল। বেশি কে কিনবে, দর শুনে ছিটকে পড়তে হয়। ট্রাভেলারস-চেকে অনেকেই অনেক টাকা বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম, ফিরিয়ে আনতে হল প্রায় পুরোপুরি টাকা। এদেশের রোজগারের টাকায় ওদেশের মাল কেনা যায় না। এত ভিড়ের হেতুটা ক্রমশ মালুম হচ্ছে। সেই আর একদিনের মতন ব্যাপার—এই তাশখন্দেই'। 'কিচলু' কথাটা কানে গেল। ডক্টর কিচলু মাঝে মাঝে সোবিয়েতে আসেন, তাঁর নাম ওদেশে খুব চালু শান্তি-আন্দোলন সম্পর্কে। মীরা বলল, তোমাকেই কিচলু ঠাউরেছে—সেইটে বলাবলি

করছে। জনতা ইংরেজি জানে না, ঘাড় নেড়ে হাবেভাবে বোঝাতে চাই, কিচলু মস্কোয় রয়েছেন—আমি বাজে লোক, ইণ্ডিস্কি পিশাতিয়েল। ভারতের এক লেখক আমি। তাতে রেহাই নেই—দাল দলে এগিয়ে এসে হাত বাড়াচ্ছে শেকহাণ্ডের জন্য—নানান বয়সি—পাকাচুলের প্রবীণ থেকে ইস্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ে। মোটরে উঠছি, রাস্তাতেও লোকারণ্য। সে এমন যে দৌড়তে দৌড়তে ট্রাফিক-পুলিশ এসে পড়ল। সিনেমার দল এসে এমন কাণ্ড করে গেছেন যে আমাদের সামান্য মানুষের পথ চলা দায়। কমবয়সি মেয়ে বিমলা বাঙ্গালোর থেকে এসেছেন, পোশাকের বাহার খুব—ভিড়টা তাঁকে ঘিরে জমজমাট। সিনেমা-স্টার বলে ধরে নিয়েচে। এবং আশেপাশের এই অধমেরা কমিক অথবা দূত-সৈনিকের পার্ট করি, এমনি কিছু ভেবে থাকবে।

বাসায় ফিরে দেখছি অন্ধকার—তারই মধ্যে দাবা খেলে চলেছেন রাও-মশায়েরা। বৃত্তান্ত কি? ইলেকট্রিক বিগড়েছে। ওদিকে খানা সাজানো হয়ে গেছে, রাত দুপুরে বেরুনো—সকাল সকাল খেয়ে নিতে হবে। আলোর সুরাহা হয় না কিছুতে। শেষটা করল কি—গোটা দুই মোটরগাড়ি নিয়ে এসে ডায়নামো থেকে তার টেনে ঘরের ভিতর একটা আলো জ্বালিয়ে দিল। কেরোসিনের আলোও এসে পড়ল কয়েকটা। বিদ্যুৎ ঠিক হয়ে গেল এমনি সময়, বাড়িময় আলো। উল্লাসে সকলে হৈ-হৈ করে ওঠে।

টেবিলের সামনে বসে দিনের বৃত্তান্ত একটু নোট করে নেওয়ার তালে আছি। হেনকালে আলেকজেণ্ড্রোভ এসে হাজির। সঙ্গে হীরেন মুখুজ্জে মশায়। হীরেন মুখুজ্জে বললেন, তাসখন্দ-রেডিও কিছু বলতে বলছে আমাদের। চলে আসুন। এক্ষুনি।

সে কি—না ভেবে-চিন্তে? তা ছাড়া ইংরেজিতে বলা, একটু লিখে-টিখে না নিলে সাহস পাইনে।

ওদের দোষ নেই। ডেলিগেশন-সেক্রেটারিকে বলেছিল ওরা বিকালে, সে কিছু করেনি। যাই হোক, বলতেই তো হবে কিছু।

খাওয়ার পরে সবাই ড্রইংরুমে গিয়ে বসেছেন। ডকুমেন্টারি ছবি দেখানো হবে, তার তোড়জোড় হচ্ছে। দু-জনে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বাঙালি যে চারজন আছি, সকলেই। আর আছেন অধ্যাপক প্রকাশ গুপ্ত ও অধ্যাপক শকসেনা। রেডিও-র স্টুডিও অবধি যেতে হল না। ছোট বাড়িটায় আলেক-জেণ্ড্রোভের ঘরে যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছে। ঐখানে বসিয়ে রেকর্ড করে নিল; পরে একদিন শোনাবে। আমি সাংস্কৃতিক-বিনিময় নিয়ে বললাম কিছু, ভারতের

সাহিত্যিক হিসাবে ওদের দরকার ছিলাম। মন্দ হয়নি বোধহয় বলাটা, সকলে তো তারিফ করলেন।

বক্তৃতা সেরে শুয়ে পড়েছি। ঘুম হচ্ছে না, বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছি। হেঁড়া-হেঁড়া নানান স্বপ্ন। রাত দেড়টায় শ্রীরেন সেন ঢুকে পড়লেন ও-ঘর থেকে। আর কি, উঠে পড়ুন এবারে। তিনি তৈরি। সুবিধা হয়েছে—তাড়াহুড়োর মধ্যে কামানোর ক্ষুর ইত্যাদি তুশানবে-তে ফেলে এসেছেন। অতএব ঐ ঝকমারির দায় থেকে বেঁচে গিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ সমাধা হয়েছে।

সবাই উঠে পড়ল। প্রকাণ্ড বাক্সটা গলদঘর্ম হয়ে বাইরের বারাণ্ডায় এনে ফেলি। ঐ রাত্রে একটু চায়েরও জোগাড় হয়েছে। ভয়ানক শীত, পশমি কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা, বাইরে এসে তবু ঠকঠক করে কাঁপছি। কর্তাদের দু-এক জন এসেছেন বিদায় দিতে। আর দেখি, হাসিখুশি মেয়েটা উঠে পড়ে এর ঘরে তার ঘরে তদ্বির-তদারক করে বেড়াচ্ছে। খানদানি ঘরের রূপসী যুবতী মেয়ে—রাত্রিবেলা বাড়ি যায় নি, বিদেশীদের খিদমতে গ্রামের মধ্যে পড়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বাড়ির লোক এতে কিছু বলবে না? ঘনপক্ষ চোখ দুটি তুলে সে অবাক হয়ে তাকাল: কি বলবে? এটা যে কোন আলোচনার বিষয়, এ যুগের মেয়েরা ভাবতে পারে না। অথচ এই তাসখন্দের ব্যাপারই তো—ছেলে হারাবার ভয়ে মা বোরখা খুলে পথে ছুটেছেন, সেই দোষে পাথর ছুঁড়ে তাঁকে মেরে ফেলল।

উজবেকিস্তানের গ্রাম পেরিয়ে শহরের কিনারা ধরে মোটরের কাফেলা চলল। চারিদিক নিশুতি, আকাশে তারা জ্বলছে আর রাস্তার ধারে আলো। হঠাৎ—কলকাতার শহরে নয়, ভারতের ভিতরেও নয়—আরও দূরে পাকিস্তানে (এখন, বাংলাদেশ) আমার চিরকালের গ্রামে মন উড়ে চলে গেল, যেখানে ঘুমুচ্ছে চিরকালের প্রতিবেশীরা। সে আকাশে ঠিক এমনিতরো তারকা? তা কি করে হবে—অনেক ফারাক সেই জায়গা ও এখানকার সময়ে। সন্ধ্যাতারা সেখানে হয়তো উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে বাঁশবনের আড়ালে।

ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে। প্লেনে উঠে পড়ে বাঁচা গেল। আর ঝামেলা নেই, সারারাত চলবে, রোদটোদ উঠলে কোনখানে নামিয়ে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে নেবে। শীতও নেই এখন, চলবার সময় প্লেনের ভিতরটা গরম করে রাখে। কম্বল টেনে চোখ বুঁজে পড়া গেল। প্লেন ঘরবাড়ি হয়ে উঠেছে আমাদের। সেদিন হিসাব হচ্ছিল—যা প্রোগ্রাম আছে, পুরোপুরি সমাধা হয়ে গেলে হাজার পঁচিশেক মাইল অর্থাৎ পৃথিবীটা একবার বেড় দেওয়া হয়ে যাবে।

॥ ষোল ॥

সেই প্লেন—কাবুল থেকে যেটায় হিন্দুকুশ পার হয়েছিলাম। অক্সিজেনের নল রয়েছে, যদিচ অক্সিজেনের গরজ নেই এই মেঠো অঞ্চলে। হোস্টেসও সেই মেয়ে—সেহ কিছু তারিকি এবং দাঁতগুলোও। শুয়ে পড়লাম চেয়ারটা নিচু করে কম্বল টেনে গায়ের উপর চাপিয়ে। পাইলট যথারীতি গোড়ায় একটু বক্তৃতা ছেড়েছে : রাতের মধ্যে কোন ঝামেলা নেই—প্রাতরাশ কোন এক শহরের কিনারে ; বেলা হবে সেই শহরে নামতে। শ্রীমতী হোস্টেস চা-কফি স্যাণ্ড-উইচের জোগান দিয়ে যেতে পারবেন তো—হোকগে বেলা, কী আর করা যাবে! দিব্যি লাগছে, আরামে ঘুম এসে গেল। মিষ্টি স্বপ্ন দেখছি। চারিদিকে শুধু অনন্ত অবাধ প্রীতি—মানুষের সকল দুঃখ-অশান্তি বিলীন হয়ে গেছে। কী ভাল যে লাগে!

স্বপ্ন ভেঙে ভেঙে জেগে উঠছি। সবাই ঘুমে অচেতন। আলো নিবিয়ে দিয়েছে—হোস্টেসের ডান পাশে শুধু একটা কমজোরি আলো জোনাকির মতন। বই পড়ছে একমনে—ঘুমন্ত ভদ্রলোকের একটি মাত্র পাহারাদার ঐ মেয়েটি। আর জেগে আছে পাইলট ও অফিসারেরা। ককপিটের মধ্যে তারা, দেখতে পাচ্ছিনে। মেশিন চালিয়ে দিয়ে তারা ঢুলছে কিম্বা কি করছে, কেবা জানে!

তার পরে এক সময় আর কিছু জানিনে। অনেক নিচে মাটির দেশে কত পাহাড় মাথা তুলে উঁকি দিচ্ছে, কত শহর দীপ উঁচু করে দেখছে, কত নদী ছুটছে পাল্লা দিয়ে তরঙ্গে তরঙ্গে—কিছু জানি নে একেবারে। অনেকক্ষণ কেটেছে, আবার একটু যেন সাড় হল। স্বপ্ন দেখছি, বয়সে ছোট হয়ে গিয়ে এবারে নাগরদোলায় দুলছি। নীলপূজার মেলায় হরিহরের তীরে বাঁশতলা সাফসাফাই করে নাগরদোলা বসিয়েছে, মোক্ষম পাক খাচ্ছি নাগরদোলায় চড়ে যেন। ঘুম ভেঙে চোখ মেললাম। সত্যি তো, কী বিষম দোলানি! হু-হু করে প্লেন নামছে। জানলা দিয়ে দেখবার চেষ্টা করি। কুয়াশায় আকাশ-ভুবন মুছে গেছে। বেলাবেলা হলে তো নামবার কথা। ঘড়ি দেখলাম, পৌনে চারটা। তবে? যা ভেবেছিলাম, হয়তো বা তাই—ঘুমের ঘোরে পাইলট এটা টিপতে ওটা টিপে বসেছে। কী করা যায়, ডেকে তুলব নাকি সকলকে? ও মশায়রা, আরামসে নাসাগর্জন করছেন, প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত এদিকে। পাকা আমের মতো প্লেন

ছুঁয়ে পড়ে যাচ্ছে। পরমায়ু মিনিটখানেক যত জোর—তারপর হাড়ে-মাসে সবসুদ্ধ তালগোল হয়ে আছি।

চেঁচাবার ইচ্ছে—কিন্তু ঘুম জড়িয়ে আছে, গলা খোলে না। ঘস্‌স্‌ করে আওয়াজ হেনকালে, ভূমির গায়ে প্লেন লাগবার সময় যেমনটি হয়। প্লেন অতএব পড়ে যায় নি, ধীর-সুস্থে নামিয়ে এনেছে। জানলা দিয়ে প্রাণপণে নজর হানি। যতদূর ঠাহর হয়, দিক্‌হীন তেপান্তরের মাঠ। সারবন্দি আলো দেখা যায় মাঠের প্রান্তে। এ কোথায় নিয়ে এলো, কথা ছিল না এমন তো! থমথমে রাত্রিবেলা প্লেন দৌড়তে দৌড়তে আলোর সারির ভিতর এসে পড়ল। দৌড়চ্ছে —আর দেখলাম, যে আলো পার হয়েছি সেগুলো নিবছে সঙ্গে সঙ্গে, সামনের দিকে নতুন আলোর সারি জলে উঠছে।

থামল প্লেন। থেমে দাঁড়িয়ে গর্জাচ্ছে। দরজা খুলে দিল: নেমে পড়ুন। মালপত্র যেমন আছে থাক, মানুষগুলি নেমে যান শুধু।

লণ্ঠন ধরে এয়ার-অফিসার কয়েকজন। হ্যারিকেন নয়, ঐ জাতীয় অন্য ধরনের কেরোসিনের বাতি। প্লেন থামতে চক্ষের পলকে মাঠের সমস্ত আলো নিবিয়ে দিল, অনেক দূরে শুধু কয়েকটা টিমটিমে আলো। সিঁড়ি দিয়ে নেমে দাঁড়াতে সর্বশরীরে কাঁপুনি ধরে গেল। কী শীত, কী শীত! কনকনে হাওয়া বইছে। প্যাচপেচে কাদা, বরফ গলে জল জমে আছে এখানে-ওখানে। তারই মধ্যে জুতো ডুবিয়ে চলেছি। মোজা ভিজে গেছে। শীত ঐ ভিজে মোজা দিয়ে পা বেয়ে পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে কনকনিয়ে ব্রহ্মতালু অবধি গিয়ে পৌঁছুচ্ছে। যাচ্ছি কোথায় গো, কেনই বা নিয়ে যাচ্ছে?

পৌঁছান গেল অবশেষে আলোর ধারে। এয়ার-অফিস। বৃত্তান্ত জানা যাচ্ছে এবার। কাজাকিস্তানে স্তেপ-অঞ্চলের মধ্যে নেমে পড়েছি, জায়গাটার নাম কুশালি। এ জায়গা ম্যাপে খুঁজে পাওয়া দুর্ঘট। এয়ারফিল্ডও তেমনি—ডিপ্‌ ব্যাণ্ড পোড়ো মাঠের মধ্যে গোটা চার-পাঁচ বাড়ি বানিয়ে রেখেছে। এক নহবা ঐ যে আলোর সারি দেখলেন—ডিজেলে চালিত বিদ্যুৎ-বানানোর কল আছে। প্লেন আসছে খবর হলে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে পথ দেখায়; নেমে পড়লে নিবিয়ে দেয় তাড়াতাড়ি। এখনকার এ আলোগুলো কেরোসিনের। হিসাবি গৃহস্থের মতো, তিলেকের অপব্যয় ধাতে সয় না। লড়াইয়ের সময়টা হাসপাতাল বানিয়েছিল এখানে, প্লেন ওঠানামার ব্যবস্থা করেছিল রোগী চালানো গোছের। হাসপাতাল চালু নেই—এয়ারফিল্ড রেখেছে দায়ে-বেদায়ে যদি কাজে আসে। যেমন এই আজকে। ঘোরতর কুয়াশা—তার মধ্যে উড়তে সাহস করল না। বিষম সাবধানি এরা—বিপদের ভয় থাকলে প্লেন ছুঁয়ে

নামিয়ে ফেলবে (জরুরি অবস্থায় অবশ্য আলাদা কথা)। দেখছে, দেখুন আকাশক্ষেত্রে প্লেনের মহা-মহোৎসব—কিন্তু দুর্ঘটনা প্রায় নেই। কুয়াশা দেখে ওরা শ-দেড়েক মাইল উল্টো এসে বিচার-বিবেচনা করে এইখানে এনে নামাল।

রাত তিনটের রওনা হয়েছি। পাকা তিন ঘন্টা চলে এসে এয়ার-অফিসের ঘড়িতে দেখছি চারটা। অঙ্কটা বুঝলেন তো—তিন আর তিনে চার। অতএব ঘন্টা আড়াই রাত এখনো বাকি। নেমে যখন পড়া গেছে, প্রাতরাশ এখানে। রওনা হতে অতএব সেই আটটা।

ছোট্ট অফিস-ঘর। বেশ গরম করে রেখেছে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আপাতত ষোলজন আমরা হাজির এই ঘরটুকুর ভিতর। ঘেঁসাঘেঁসি দাঁড়াবার ঠাঁই হয়েছে। কী মতলব, ওরে বাবা! দাঁড়িয়েই থাকতে হবে নাকি চার-চার ঘন্টা?

মীরা বলল, ঘুমিয়ে থাকতে হবে। স্প্রীংয়ের খাট ও গদি-তোশকের উপরে লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে। নয়তো এত জায়গা থাকতে এইখানে এসে পড়লাম কেন?

বলো কি হে! তেপান্তরের মাঠে এতগুলো খাট-বিছানা জুটিয়েছে?

আমাদের এই ক'জনের শুধু নয়—পিছনের প্লেনে যাঁরা আসছেন, তাঁদের জন্যেও।

চায়ের পিপাসা পেয়ে গেল কোন এক বাবুর। চাইলেই যখন এসে যায়, পিপাসায় দোষ কি? কিন্তু এই রাত্রে এ-সময়টা সুবিধা হল না। এমনি তো প্লেনের চলাচল নেই—খানাপিনার ব্যবস্থা সকালের আগে হয়ে উঠবে না। দাঁতে দাঁত চেপে রাতটুকু কোন গতিকে পিপাসা সামলে থাকুন, উপায় কি তা ছাড়া?

পিছনের প্লেন এসে পড়ল। মাঠে নেমে আবার চলেছি শোওয়ার বাড়ির দিকে। আগে-পিছে লণ্ঠন ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই বাড়ি—যেখানটা মিলিটারি-হাসপাতাল ছিল। রোগি নেই, কিন্তু খাটবিছানাগুলো আছে। খান যাটেক—অর্থাৎ প্রতিজনে আমরা এক খাটে মাথা এক খাটে পা রাখলেও কতকগুলো বাড়তি থেকে যাবে।

স্প্রীংয়ের খাট, ধবধবে তোশক-বালিশ, পরিচ্ছন্ন মোলায়েম কম্বল—জুতো-জামা খোলার সবুর সয় না, গড়িয়ে পড়ে আরামের চক্ষু বুজেছি। ঘরটা চার জনের—বিদেশ-বিভুঁয়ে মাঠের মধ্যে একা এক ঘরে থাকা ঠিক নয়। আলোটা চোখে লাগছে; হাত বাড়িয়ে আলোর জোর কমিয়ে নিবু-নিবু করে দিলাম।

ঘুমও এঁটে আসছে। হেন কালে দরজায় টোকা। আস্তে, খুব আস্তে। চোখ মেলেছি, কিন্তু সাড়া দিই না। ভেজানো দরজা একটুখানি খুলে গেল।

করিডরের আলোর একফালি এসে পড়েছে। সেই আলোর উপরে লঘু পা ফেলে এক তরুণী সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল। এদিক-ওদিক তাকায়, আমার মুখের উপর গভীর দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে। শীতের মধ্যেও গা ঘেমে উঠছে। তারপর আমাকে ছেড়ে আর একজনের দিকে তাকাচ্ছে ঐ রকম। সেখানে সাড়া মিলল না তো সরে গেল পরের জনের দিকে। সর্বনাশ, রাত্রিশেষে পুরুষমানুষদের ঘরে কি মতলবে ঢুকেছে ফুটফুটে মেয়েটা?

আন্দাজ করুন তো কেন? ক্ষণপরে প্রোকোভ ঢুকে পড়ে আলো বাড়িয়ে দিল। আঙুল দিয়ে দেখায় প্রিন্সিপ্যাল দোশুর খাটের দিকে। তখন মালুম হল। যা ভেবেছিলাম, সে-সব কিছু নয়—মেয়েটা হল ডাক্তার। প্রিন্সিপ্যালের গলায় বিচি উঠেছে, ঠাণ্ডা লেগে টনসিলে ব্যথা হয়েছে। কিছু গানটান নি সন্ধ্যা থেকে। রওনা হবার মুখে ওরা টের পেয়েছে। তখন সময় ছিল না। বাগে পেয়ে এবারে ডাক্তার নিয়ে হাজির। রাতটুকুও পোহাতে দিল না।

কত রকমে দেখল প্রিন্সিপ্যালের গলা—দেখেশুনে চলে যায়। বাঁচা গেল রে বাবা! তাই কি অত সহজে ছাড়বে? অষুধ ও যন্ত্রপাতি নিয়ে পুনশ্চ এসেছে। স্টেপটোমাইসিন ও পেনিসিলিন জাতীয় কি কি খেতে দিল, ফুঁকতে দিল। ডিস্পেনসারি এই বাড়িতেই—সাধ মিটিয়ে ডাক্তারি করার বাধা নেই। জোরালো আলোয় ঘুম ভেঙে গিয়ে উসখুস করছিল সকলে। ভালমানুষ প্রিন্সিপ্যালের লজ্জার অবধি নেই! বারম্বার বলছেন, আপনাদের কষ্ট হচ্ছে—কিন্তু আমার কোন হাত নেই। সামান্য একটু ব্যাপার—তা এরা মহা-মহোৎসব জমিয়ে তুলল, আমি তার কি করব?

তাই দেখা গেল, রোগি না থাক, মাঠের মধ্যে ডাক্তার-নার্সেরা আছে কিন্তু। এরোড্রোমের নিয়ম এটা। যে তল্লাটে যখন নামুন, অফিসে ঢোকবার মুখে দেখতে পাবেন একটা-দুটো মেয়ে সতৃষ্ণ চোখে দেখছে আপনার দিকে। আপনার রূপমাধুরী দেখছে না—আঘাত আছে কি না অঙ্গে, নিশ্বাস ঘন হচ্ছে কি না, বমিটমি করে কাহিল হয়েছেন কিনা—এই সমস্ত দেখছে ঠাহর করে। তা আমরাও স্বদেশের তেলে-জলে পুষ্ট এক-একখানা ইস্পাতের শরীর নিয়ে গেছি। মেয়েগুলো নিশ্বাস ফেলে নিষ্কর্মা হয়ে আবার নিজ নিজ টেবিলে বসে পড়ে।

অথ্যাত অজ্ঞাত জুশালির মাঠের রোদ কাচের জানলা দিয়ে আমার বিছানায় পড়েছে, তখন ঘুম ভাঙল। আর দেরি নয়, রওনা এবারে। মুখ-ধোওয়ার জল পাওয়া গেল বটে, কিন্তু অন্যান্য ব্যাপার? একজনে সন্ধান দিলেন—পিছন দিকে মাঠের মধ্যে কয়েকটা বালখিল্য ঘর দেখা যাচ্ছে, বাকি প্রাতঃকৃত্যের ব্যবস্থা ঐদিকে হওয়া সম্ভব। তাই বটে! কিন্তু নজর করা গেল, ঘরের সঙ্কীর্ণতায়

স্থানীয় লোকের মন ওঠে না—পিছনের বিমুক্ত মাঠের উপর নানা পরিচয়-চিহ্ন। দিনের আলোয় ভাল করে দেখছি—এদিকে তেপান্তর মরুভূমি, ওদিকটায় ফসল ফলাতে শুরু করেছে। মরু-বিজয় করতে করতে এগুচ্ছে—তারই অগ্রকেতন যত্ন-লালিত ক্যাকটাস ও রকমারি কাঁটাগাছ।

গরম কোকো ও উৎকৃষ্ট বিস্কুটের ব্যবস্থা করেছে। শীতার্ত সকালে আহা-মরি লাগল। প্লেন কেমন সহজে ওঠায় নামায় এরা. এয়ারফিল্ডে এক হাত পরিমাণ কংক্রিটও নেই। মরুপ্রায় ভূমির খানিকটা বালি সাফসাফাই করে নিয়েছে। ওরই উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে দিব্যি উপরে উঠে গেলাম। যাচ্ছি আস্কবিনস্কে—বড় বিমানঘাঁটি, দুপুরের লাঞ্চ সেখানে।

আরল-হ্রদের পূর্বতীর দিয়ে যাচ্ছি। অনেকক্ষণ ধরে চলল। আস্কবিনস্ক আর একবার দেখেছেন আপনারা। আজকে দেখি, আলাদা চেহারা। জল জমে চতুর্দিকে পায়ের পাতা ডুবে যাওয়ার মতন কাদা হয়েছে। ভুঁয়ে নেমে কাদাজল ছিটকাতে ছিটকাতে প্লেন চলল। গরুর গাড়ির চেয়ে প্লেনের যে বেশি আভিজাত্য, এমন মনে হল না। সেদিন এখানে এসেছিলাম, তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আজ প্রসন্ন রোদ। ওভারকোট প্লেনে রেখে নেমে পড়েছি। ঘরে যাব কি— নানান গাছে ভরা উঠানে ঘুরে ঘুরে রোদ পোহাচ্ছি সকলে। রেলস্টেশন কাছাকাছি কোথাও, ইঞ্জিনের আওয়াজ আসে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে পুনশ্চ রওনা হবার মুখে শোনা গেল, আমাদের প্লেন আগে এসেছে বটে কিন্তু ছাড়বে পিছনে। কি বৃত্তান্ত? না, দোওেকে নিয়ে পড়েছে আবার—নামবার সঙ্গে সঙ্গে এরোড্রোমের হাসপাতালে নিয়ে পুরেছে; বিছানায় শুইয়ে আলো ফেলে নানান কায়দায় পরীক্ষা করছে। পেনিসিলিন ফোঁড়াফুঁড়ি করছে মনের সুখে। ওঁরই জন্যে আটকা পড়ে গেলাম আমরা। দোওেমশায়ের লজ্জার অবধি নেই। কাতর হয়ে বলছেন, কী রকমারি বলুন তো! এটুকু ব্যাপারে আমাদের দেশে ডাক্তাররা তাকিয়েই দেখত না। এত যত্ন অসহ্য লাগে।

প্লেন উড়ল আবার মস্কোমুখো। মধ্য-এশিয়ার ঘোরাঘুরি এত দিনে সারা। বলল, পাঁচ ঘণ্টা লাগবে আবহাওয়া যদি ভাল থাকে। মস্কোর পথ সেদিন কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল; আজ রোদে হাসছে। বিস্তীর্ণ জলধারার উপর এসে হোস্টেস দেখিয়ে দেয়—ভলগা, ভলগা! দূরে দূরে হলেও আহাজ বেশ বুঝতে পারছি। তারপরে যত এগোই, আকাশ অন্ধকার হয়ে আসে। পুরোপুরি কুয়াশার মধ্যে এবার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধোঁয়ায় নিশ্চিহ্ন, তার মধ্যে বাতাসে

ভাসছি ক'টি প্রাণী আমরা। প্লেন বড্ড দুলছে। আবার এ পুঁথির বেশির ভাগ লেখা প্লেনে বসে বসে। তখন কাজকর্ম থাকে না, ছুটোছুটি নেই, অচ্ছিন্ন অবসরে ছড়ানো মনকে গুটিয়ে নিয়ে আসা যায়। কিন্তু নাগরদোলার মতো এমন দুলতে লাগলে লেখা যাবে কেমন করে? এই হু-হু করে নিচে নামছে, আবার সাঁ করে উঠে যাচ্ছে উপরে—খেলাচ্ছে মানুষগুলো নিয়ে। দিক্‌চিহ্নহীন কুয়াশার উত্তাল সমুদ্রে অসহায় মনে হচ্ছে আজ নিজেদের।

॥ সতের ॥

হোটেল মেট্রোপোলের সেই আগের কামরাই দখল করেছি। আজ সকালে তলস্তয়-মিউজিয়াম। সেখান থেকে তারপর তলস্তয়ের বাড়ি। শীত কমে গেছে হঠাৎ, আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে উঠেছে। এঁরা অবাক হয়ে গেছেন—কী আশ্চর্য, অন্য বছর বরফ পড়ে এ সময়। মজাক করে বলি, এবার পড়বে না—ভালবাসার উষ্ণতা নিয়ে এসেছি আমরা ভারত থেকে। তোমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর তখন বরফ পড়বে।

যেখানে আছি, শহরের কেন্দ্রদেশ এটা। বড় বড় বাড়ি, প্রশস্ত রাস্তা, বিশাল স্কোয়ার। কিন্তু আগে টের পাইনি, খুব কাছাকাছি পুরানো শহরও আছে এই সব বড়-রাস্তা পিছন করে। সেই পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। একটা ছোট্ট পুরানো ধাঁচের বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। ঘরগুলো ছোট ছোট। প্রতি ঘরের ছাত ভিতর থেকে কতকটা গম্বুজের মতো। তাতে বিচিত্র কারুকর্ম। ১৮৭০ অব্দের বাড়ি।

ঢুকেই সকলের আগে ব্রোঞ্জে-গড়া তলস্তয়ের আধা-মূর্তি। মূর্তি আদবেই বলা চলে না, খানিকটা আদল। কতকগুলো রেখা ছড়িয়ে রয়েছে এবড়ো-খেবড়ো একতাল ধাতুর উপর। গত বছর উৎসবের সময় এই বস্তু বসানো হয়েছে—অ্যানিসিমভ চীনে আমাদের যে উৎসবের নিমন্ত্রণের আশ্বাস দিয়েছিলেন। পৃথিবীর সর্ব ভাষায় তলস্তয়ের বইয়ের অনুবাদ হয়েছে, একটা ঘরে সেই সমস্ত সাজানো। সংগ্রহে বাংলা বই একখানা মাত্র—আনা কারেনিনা। কিন্তু আমারই জানা তো বিস্তর অনুবাদ—কুড়ির কাছাকাছি হবে। আধা-বয়সি মেয়েটা ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন—তিনি বললেন, আর কেউ তো পাঠান নি কোন বই, পাঠালে আমরা সংগ্রহে যত্ন করে রেখে দেব। ভরসা দিয়ে এলাম, দেশে ফিরে বলব পাঠিয়ে দেবার জন্য (এবং যথারীতি ভুলে গেলাম পরক্ষণে)।

বিপ্লবের পরে নতুন আমলে এই মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা। লেনিন বলেছিলেন, তলস্তয় হলেন রুশ-বিপ্লবের মুকুর। তলস্তয় সম্বন্ধে লেনিনের হাতে-লেখা মূল পাণ্ডুলিপি কিছু কিছু রয়েছে কাচের কেসে। তলস্তয় সম্পর্কে লেনিনের বইয়ের সংগ্রহও আছে।

এক ঘরে তলস্তয়ের ঠাকুরদাদা ও দাদামশায়ের এবং তাঁর পৈতৃক বাড়ির ছবি। সেই পৈতৃক বাড়ির চিহ্ন নেই, বিক্রি করেছিলেন সেবাস্টোপোল গল্পের বই প্রকাশের প্রয়োজনে। তলস্তয়ের বাপ সেনাদলে ঢুকে নেপোলিয়নের আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তলস্তয়ের মা'র ছবি পাওয়া যায় না—কুমারী বয়সের একটা সিলোট-ছবি মাত্র জোগাড় হয়েছে। কতকগুলো পুরানো কৌটা—তাতে তাঁর পূর্বপুরুষদের ছবি। কাজান-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন, তখনকার ছবি। এক অজ্ঞাত সহপাঠি সেই সময়ে তাঁর ছবি এঁকেছিল, সেটা জোগাড় করে রেখেছে। ছোট বয়সে একখানা কুদে-তলোয়ার ইস্কুলের পারিতোষিক পেয়েছিলেন সেটা রয়েছে। ছাত্র অবস্থায়ও লিখতেন, নিজের হাতের সেই সব পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপির উপরে ছবি আঁকতেন, সেই সব ছবি। একটা ছোট পত্রিকায় সর্বপ্রথম গল্প বেরিয়েছিল—সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে দিয়েছে।

সিবাস্টোপোল-লড়াইয়ের পর সেন্টপিটার্সবার্গে গেলেন তিনি। সাহিত্য-কর্ম শুরু করলেন। নানান জায়গা থেকে অজস্র উৎসাহ আসছে। যে কাগজগুলোয় লেখা বেরুত, তাদের সম্পাদকবর্গের মিলিত ছবি। তলস্তয় দেশ ছেড়ে বেরুলেন, তার পাশপোর্ট।

ফিরে এসে চাষীদের ইস্কুল বসালেন—সেই ইস্কুলের ছবি। তাদের গণিত শেখাতেন কতকগুলো কাঠের ঘুঁটি লোহার তারে গেঁথে। এই চাষীদের নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। শিক্ষা নিয়েও বিস্তর লেখেন এই সময়। সমস্ত পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

ককেশাস অঞ্চলে গেলেন—সেখানকার ছবি। তাঁর স্ত্রী সোফিয়ার নয়নাভিরাম এক ছবি। 'ওয়ার এণ্ড পীস' যেখান থেকে লেখা হয়, সেই তল্লাটের ছবি। এ ঘরে আরও বিস্তর ছবি রয়েছে নামজাদা আর্টিস্টদের আঁকা। নেপোলিয়নের আক্রমণের সময়কার—মানুষ দলে দলে মস্কো ছেড়ে পালাচ্ছে, পথের উপরে তাদের বিপন্ন অবস্থা। উপন্যাসে অনেক সত্যি মানুষের নাম দেওয়া হয়েছিল—তাদেরও অনেক ছবি।

পাণ্ডুলিপি দেখতে মজা লাগে—কী কাটাকুটি রে বাবা। আমার কপি দেখে ছাপাখানার বন্ধুরা তো বেজার হন, তলস্তয়ের হলে কি করতেন বলুন দিকি

আপনারা? 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' উপন্যাসের রসদ নিজচোখে দেখে সংগ্রহ করবার মানসে একবার রণক্ষেত্রে চলে গিয়েছিলেন, তার ছবি। প্রুফে বিস্তর কাটকুট করতেন, কম্পোজ-করা পাতার পর পাতা বাতিল করে দিতেন—সেই সমস্ত কাটা-প্রুফের গাদা। মাসিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে 'রিসারেকশন' বেরিয়েছিল, সেই মাসিকের সংখ্যাগুলো। আশি বছর বয়সে এক আর্টিস্ট বন্ধুর আঁকা প্রতিকৃতি। তলস্তয়ের মৃত্যুশয্যা এবং মৃত্যুর পরের ছবি। মৃত্যুর পর মুখের যে ছাঁচ তুলে নিয়েছিল। যে সব বন্ধু হামেশাই যাতায়াত করতেন, তাঁদের সকলের ছবি। যেখানে মারা যান, সেই বাড়ির পুরো মডেল।

চারিদিকে কুয়াশা, আকাশে মেঘ। কনকনে হাওয়া দিয়েছে, পশমের মোটা জামা ও দেহচর্ম ভেদ করে হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি ধরে যায়। তা হোক—হাতে সময় কম, ক'টা দিন মস্কোয় থেকে লেনিনগ্রাড-মুখো বেরিয়ে পড়ছি। তাড়াতাড়ি যত-কিছু দেখে যাওয়া যায়।

তলস্তয় মিউজিয়াম থেকে তখনই ছুটলাম তলস্তয়ের বাড়ি। পল্লীবাস নয়, মস্কো শহরে যে বাড়িটায় থাকতেন। কী যত্নে রেখেছে—দেবমন্দিরও লোকে অমন করে রাখে না।

জুতোয় যে পথের ধুলো নিয়ে ঢুকবেন, সে হবে না। এদেশ হলে জুতো খুলতে বলত। ওখানে শীতের দেশ ও সাহেবি পোশাক বলে জুতো খোলা চলে না—কাপড়ের জুতো দিচ্ছে, আপনার জুতোর উপরে সেইটা পরে ফিতে এঁটে ঢুকুন। অর্থাৎ জুতোর ময়লা ঐ কাপড়ের জুতোর ভিতরেই থেকে যাচ্ছে।

এক বৃদ্ধা ঘুরে ঘুরে আমাদের দেখাচ্ছেন। আশি বছরের উপর বয়স—ধবধবে চুল, গায়ের রং পরনের কাপড়চোপড় সাদা ধবধবে। পুণ্য, পবিত্র। তাঁকে ধকল দিতে চাইনে—অন্য লোক যারা আছে, তারা আসুক। তিনি এই বয়সে এঘর-ওঘর উপর-নিচে করবেন কেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে? কিন্তু মানা শুনবেন না তিনি। তলস্তয়ের জীবন-কাল থেকে আছেন, কত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখা! বিদেশের মানুষগুলোকে দেখিয়ে বুঝিয়ে আনন্দ পাচ্ছেন।

ছোট ছেলে মারা গিয়েছিল, বাচ্চার সেই খেলনাগুলো অবধি সাজানো আছে। তলস্তয়ের দু-ফোঁটা চোখের জলও জমে আছে নাকি পারিপাটি রূপে এই খেলনা সাজানোর মধ্যে?

ভীষণ হাঁটতে পারতেন তলস্তয়। গ্রামের বাড়ি পায়ে হেঁটে চলে যেতেন এখান থেকে। বৃদ্ধা সেকালের সেই ছবিটা দিচ্ছেন—হাঁটবার সময় সামনের

দিকে ঝুঁকে তীরবেগে ছুটতেন তিনি। গোর্কি আসতেন এই বাড়িতে—এসে চুপচাপ কথা শুনতেন ঐ জায়গাটায় বসে।

বড় পুরানো বাড়ি, ১৮০৮ অব্দে তৈরি। ১৮৮২ অব্দে তলস্তয় এখানে এসে উঠলেন। বাড়িটা সেই সময় আগাগোড়া মেরামত হয়। দোতলার ঘরগুলো ছোট ছোট আর বড্ড নিচু—দেয়াল ভেঙে ঘর বড় করলেন, ছাত ভেঙে উঁচু করে তুললেন। খুব সরল সাধারণ জীবনযাপন করতেন তিনি—বড়ঘরের লোক তা বুঝবার জো ছিল না। সকালবেলা উঠে নিজ হাতে ঘরবাড়ি সাফ করতেন, সন্ধ্যাবেলা কাগজচোপড় গুছিয়ে রাখতেন। লেখাপড়া করতেন বেলা ন'টা থেকে বিকাল চারটা অবধি। সাতটা থেকে বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগীদের আনাগোনা চলত। লিখবার ঘরে নিচু চেয়ার, দু-পাশে বাতিদান, দোয়াত-কলম, যে জুতোজোড়া পরতেন ঘরের মধ্যে। এ সব তো ভালই—মুশকিল ছিল গিন্নিকে নিয়ে। বড়ঘরের ঘরণী তিনি, আদর্শবাদ ইত্যাদি বেশি আমল দিতে চাইতেন না। তাঁর ঘর দেখলাম—ঘর দেখেই কর্তা-গিন্নির মনের ফারাক বুঝতে পারা যায়। বড় দুই ছেলের ঘর দেখছি—কেরোসিনের আলো, খাট-চেয়ার, রকমারি খেলার সরঞ্জাম। শীত আর বসন্তকালটা তলস্তয় এই বাড়ি থাকতেন। ছেলেদের ছুটি হয়ে গেলে গাঁয়ে চলে যেতেন।

১৯০১ অব্দে ছেড়ে যান এই বাড়ি। তারপরে ১৯০৯ অব্দে মাত্র দুই রাত্রি থেকে গিয়েছিলেন। বলতেন, মস্কোয় লোকে যে কী করে থাকে বুঝতে পারিনে। সেই অশীতিপর বৃদ্ধা বলছেন আমাদের—তাঁর সঙ্গেও তলস্তয়ের কত কথাবার্তা! বলছেন, আর পুরানো স্মৃতিতে কোটরগত চোখ দুটো জলজল করে উঠছে।

বললেন, আপনারা কিছু লিখে দিয়ে যান—বিশেষ করে আপনি পিশাতিয়েল যখন, তলস্তয়ের স্বগোত্র। ভিজিট বুকে দেশবিদেশের অনেকে লিখে গেছেন। আমি বাংলায় লিখলাম। অনেক দূরের তীর্থযাত্রায় এসে বিনত শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছি—এমনি গোছের কিছু। পাশে ইংরেজি করে দিলাম বাইরের লোকে যাতে বোঝে।

ডিনারের পরে দেখি, 'আওয়ারা' পালা হচ্ছে হোটেলের টেলিভিশনে। আওয়ারা নিয়ে বিষম মাতামাতি—অন্য সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল করে এই পালা দেখানো হয়। অনেক লোকে তিন-চারবার দেখেছে (যেমন, আমাদের দোভাষিণী ইরা), তার পরেও আবার টেলিভিশনে দেখতে চায়। গুটি পাঁচেক বাচ্চা এসে জুটেছে—হোটেলেরই কোন কোন ঘরের তারা—টেলিভিশন দেখবে

কি, আমাদের মুখ দেখে দেখেই সাধ মেটে না যেন। বড়রাও তাকান অমনি—তাঁরা ঢেকেঢেকে শিষ্টাচারসম্মত পদ্ধতিতে। বাচ্চারা অত শত বোঝে না, ফ্যালফ্যাল করে সোজাসুজি তাকিয়ে সুন্দর মানুষ দেখে। আজ্ঞে হ্যাঁ, বললে বিশ্বাস করবেন না—আমরা অতিসুন্দর এখানকার চোখে। কন্দর্পকে রূপে ছাড়িয়ে যাই। দেহবর্ণ নিয়ে হেনস্থা নেই। বরঞ্চ কালোরই কদর। তার উপর ভারতীয় হওয়ায় সোনায় সোহাগা হয়েছে। ভারতীয়দের সাত খুন মাপ। বিনয়ের স্ত্রী জয়া দেবী বললেন, শাড়ি পরে বেড়ানোয় আমাদের বড় সুবিধা—ট্রামে-বাসে পথে-বাজারে সর্বত্র খাতির। পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থবাড়ির একটা চেহারা পেলাম জয়া দেবীর মুখে। জারিডসিন গাঁয়ে ওঁদের এক বন্ধু আছে—এক রবিবার গিয়েছিলেন সেখানে। বুড়ি মা, ছেলে, ছেলের বউ আর গোটা দুই বাচ্চা। ছেলে আর ছেলের বউ চাকরিবাকরি করে, বাচ্চা দুটো ঠাকুরমা'র জিম্মায়। বউ-ছেলে কম্যুনিস্ট—নতুন কালের ধরন-ধারণ তাদের। বুড়ি ওদিকে ছোট এক ঘরে আইকন রেখেছেন, পূজোআচ্চা করেন। বন্ধুটি প্রীতি ও প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলে, মা'র পূজোর ঘর—অনাচারী আমরা ওদিকে যাব না। যে-বস্তু এদেশের নব্যদের বাড়িতেও হামেশাই দেখে থাকেন—টেবিলে মুর্গি খেয়ে সেই কাপড়চোপড়ে মায়ের ঠাকুরঘরে যাইনে যেমন আমরা। তাই দেখি, সাধারণ মানুষের জীবন-ধারা মোটামুটি এক—শিক্ষা ও নতুন ব্যবস্থা পরিবর্তনটা কিছু ক্ষিপ্র করে, এই মাত্র। বহু লোকই ওদেশে রাজনীতির ধার ধারে না—কম্যুনিস্ট সকলকে হতে হবে, তার কোন মানে নেই।

॥ আঠার ॥

বাচ্চাদের এক ইস্কুল। ঠিক শহরে নয়—মস্কোর বাইরে শহরতলীতে। ১৯২৭ অব্দে প্রতিষ্ঠা। বাড়িটা আরও পুরানো—প্রাক-বিপ্লব আমলের। আগে শুধুই ছেলেরা পড়ত, কিছু কাল থেকে মেয়েদেরও নিচ্ছে। হাই-ইস্কুল, দশম শ্রেণী অবধি। ডিরেক্টর মশায় ভারিক্কি মানুষ—পাকা চুল, পাকা গোঁফ, বুকের উপর মেডেল ঝুলছে। পথ দেখিয়ে তিনি নিয়ে চললেন। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে লম্বা করিডর পার হয়ে যাচ্ছি। দেয়ালের মাথা জুড়ে শিক্ষা-নেতাদের ছবি।

শিক্ষক কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা হল। যৌথ-চেষ্টায় বিশ্বাসী তাঁরা—ছেলেপুলে মিলেমিশে কাজ করবে, সেই শিক্ষা সকলের আগে। ভাল ল্যাবরেটারি আছে; সিনেমা-ছবি দেখানোর যন্ত্র এবং শিক্ষা ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আরও নানা রকমের যন্ত্রপাতি। ড্রইং শেখানোর এন্তার ব্যবস্থা। গানের ক্লাসও আছে। প্রত্যেক বিভাগের আলাদা লাইব্রেরি। অথচ মনে রাখবেন, এমন কিছু নামজাদা প্রতিষ্ঠান নয়—শহরতলীর ছোটখাট এক ইস্কুল।

নতুন পদ্ধতিতে শ্রমের দিকটায় জোর দেওয়া হচ্ছে—প্রথম থেকে দশম শ্রেণী অবধি কারিগরি পাঠ দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা কাগজ, কাদা ও প্লাস্টিসিন দিয়ে নানা জিনিস বানায়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে কাঠের কাজ, তৃতীয় শ্রেণীতে ধাতুর কাজ। চতুর্থ শ্রেণীতে উঠে এই তিন শ্রেণীর যাবতীয় উপকরণ মিলিয়ে কাজ করবে। এমনি ধাপে ধাপে চলল। ট্রাক্টর রেল-ইঞ্জিন চালানো অবধি। দশম শ্রেণীতে ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে শেখায়। বিজ্ঞান ও কারিগরি সম্বন্ধে যা-কিছু ছেলেমেয়েরা বইয়ে পায়, সমস্ত হাতে-কলমে শেখানোর ব্যবস্থা আছে ইস্কুলে।

সেপ্টেম্বর থেকে মে অবধি শিক্ষার মরশুম। শীতের ছুটি ৩১ ডিসেম্বর থেকে ১৩ জানুয়ারি। বসন্তের ছুটি ২৫ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল। প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীতে পরীক্ষার কোন বালাই নেই, বাচ্চারা এমনি প্রমোশন পায়। পরীক্ষা—লেখায় আর মুখে। পাঠ্য-বই সর্বত্র এক রকম। বিভিন্ন ভাষায় পাঠ্য-বইয়ের অনুবাদ হয়—যে গণতন্ত্রে যেটা মাতৃভাষা, সেখানে সেই ভাষায় বই পড়ানো হয়। প্রোগ্রাম সর্বত্র এক, পরীক্ষা ঠিক একই সময়ে হয়। প্রত্যেক গণতন্ত্রে শিক্ষা-

দপ্তর আছে, শিক্ষা-কমিশন আছে, তাঁরা সেই গণতন্ত্রের শিক্ষা-নীতির নিয়ামক। প্রোমোশনের পর তিন মাস লম্বা ছুটি। ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কর্তারা ভারি সজাগ। প্রত্যেক ইস্কুলে আলাদা চিকিৎসা-কেন্দ্র, ডাক্তার, নার্স, শিশুদের জন্ত বিশেষ হাসপাতাল। স্বাস্থ্যের কারণে যে ছেলের বাইরে যাবার দরকার, এই ছুটির মধ্যে তার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়। ইস্কুল থেকেও দল বেঁধে পাঠানো হয় শিক্ষা-অভিযানে।

লেনিন বলেছিলেন, শিক্ষকরাই দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা পাবেন। বিস্তর আইন হয়েছে শিক্ষকদের সুখ-সুবিধার জন্ত। একটা আইন ১৯৪৮ অব্দের —দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের পর যখন পুনর্বাসনের হিড়িক পড়ে গেছে। এই আইনে ইঞ্জিনিয়ারের সমান মাইনে পাবেন শিক্ষকরা। প্রাইভেট ট্যুইশানি করবার আইনত বাধা নেই, যদিও ছাত্রদের কদাচিৎ তার প্রয়োজন ঘটে। পাঁচ বছর অন্তর শিক্ষা-দপ্তরে কাজের রিপোর্ট যায়, দশ বছর ভাল কাজ হলে শিক্ষক সরকারি মেডেল পান। ত্রিশ বছরে অর্ডার-অব-লেনিন। আমাদের এই ডিরেক্টর মশায়ের তেতাল্লিশ বছর কাজ হয়েছে, অর্ডার-অব-লেনিন পেয়েছেন তিনি, সগর্বে সেই নিদর্শন জামায় সেঁটে রেখেছেন। এছাড়া গুণ বুঝে গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট প্রতি বছরের উৎসবে শিক্ষকদের উপাধি দান করেন।

রবিবারে ছুটি। মে দিবস (১ মে) ও বিপ্লব-দিবসেও (৭ নভেম্বর) ইস্কুল বন্ধ থাকে। বড়দিনের ছুটি নেই। পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পিরিয়ড—নিচু তিন ক্লাসে চার পিরিয়ড করে হয় রোজ। চতুর্থ শ্রেণীর সপ্তাহে আরও দুটো পিরিয়ড বেশি। ছেলেমেয়ের একই রকম পাঠ্যসূচি। পরীক্ষা নেবার জন্ত ডিরেক্টর মশায়ের তত্ত্বাবধানে কমিশন বসানো হয়, শিক্ষকরা তার মধ্যে থাকেন।

প্রথম শ্রেণীর ঘরে ঢুকলাম। সাত বছরের ফুটফুটে বাচ্চারা ধবধবে পোশাক পরে লেখাপড়া করছে। বেঞ্চিতে বসেছে দু-জন করে। বই নেড়েচেড়ে দেখি—ছবিই কেবল, লেখা যৎসামান্ত। আমাদের একজন দেশ থেকে কিছু ছবি এনেছেন—ছেলেমেয়েদের দিয়ে দিলেন। তারাও পালটা ছবি দিল ভারতের অদেখা বাচ্চা-বন্ধুদের নাম করে।

ভূগোলের ঘর। ছবিতে ঠাসা—পাহাড়, অরণ্য, আমুদরিয়া নদী। বালুতে পাহাড় ক্ষয়ে গেছে—তার ছবি। বড় বড় ম্যাপ টাঙানো। নানা রকমের গাছ টবে। সামুদ্রিক গাছপালা। সমুদ্রের তলদেশ—ছেলেরা বানিয়ে রেখেছে। তিন রকমের ফিল্ম প্রোজেক্টার। বিশাল ব্ল্যাকবোর্ডের উপরে পর্দা গোটানো থাকে, ফিল্ম দেখানোর সময় মেলে দেয়। আমাদের দেখাবে একটু। কালো পর্দায় চক্ষের পলকে জানলাগুলো ঢেকে দিল, সাদা পর্দায় ব্ল্যাকবোর্ড। নানান

দেশের ছবি দেখছি। ভারতেরও। দুর্গম গিরিসঙ্কট, নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য, জলসেচের হরেক ব্যবস্থা।

জীবতত্ত্বের ঘর। কঙ্কাল; কতরকমের মডেল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মডেল। পোকামাকড়। কত বিচিত্র ধরনের পাতা। পাশেই জীবন্ত প্রাণীর ঘর। রকমারি পাখি, খরগোশ, মুরগি, রঙিন মাছ। সামান্য একটা ইস্কুলের জন্য কী বিপুল বিচিত্র আয়োজন!

এই একটা জায়গায় নয়, সারা সোবিয়েত দেশ জুড়ে এমনি ব্যাপার। শিক্ষার ব্যাপকতা দেখে তাজ্জব হতে হয়। পিছিয়ে-পড়া দেশগুলো সব ঘুরে আসছি—বছর কতক আগেও সেখানে শতকরা দেড়-জন দু-জনের মাত্র অক্ষর-পরিচয় ছিল। তা-ও সুর করে কোরানের সুরা পড়ত মাত্র। আর এখন যে তল্লাটেই গিয়েছি, নিরক্ষরতা একেবারেই নেই। শিক্ষার প্রথম পর্বে মাতৃ-ভাষা ছাড়া অন্য কিছু শিখতে হয় না। মাতৃভাষা যত দরিদ্রই হোক, রাষ্ট্রের কাছে তার সর্বোচ্চ সম্মান। মাতৃভাষাকে তুলে ধরবার জন্য প্রত্যেকটি গণতন্ত্র এবং সোবিয়েত রাষ্ট্র সকল চেষ্টা করছে। কয়েকটি ভাষার লিপি পর্যন্ত ছিল না, সেখানে লিপির ব্যবস্থা হয়েছে। ভাষা দুর্বল বলে বিলুপ্তি ঘটানোর চেষ্টা হয় নি।

শিক্ষা মানে কয়েকটা পাশ করা নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য, ওরা বোঝে, জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলা। আঁটোসাটো ক্লাসের ঘরে খানকয়েক বইয়ের মধ্যে নিমগ্ন থাকাই নয়। তিন স্তরের শিক্ষা। তিন বছর অবধি নার্সারি। তিন থেকে সাত কিণ্ডারগার্টেন। সাত থেকে সতের ইস্কুল। আজকে যার একটা দেখে এলাম।

লাখ লাখ ছেলেমেয়ে নার্সারিতে পড়ে। দুনিয়ার ছয় ভাগের এক ভাগ সোবিয়েত দেশ—এই বিশাল দেশের সকল অঞ্চলে নার্সারি ছড়ানো। নার্সারির মধ্যে শিশু-কোরক ফুল হয়ে ওঠে। মা কাজকর্মে যাচ্ছে, নার্সারিতে বাচ্চা রেখে যায়। নার্সারি তা হলে হল দ্বিতীয়-মা। এই দ্বিতীয়-মা দিনের বেলা কাজের সময়ের; আসল মা রাত্রে ঘুমানোর। দ্বিতীয়-মা দেখে, যাতে শরীর গড়ে ওঠে শিশুর, সে হাসিস্ফূর্তিতে থাকে। যা স্বভাবক্রমে শেখা যায়, তাই শুধু শেখায় নার্সারিতে। এখানেই শেষ নয়—নার্সারির কর্মীরা বাড়ি গিয়ে দেখে, বাচ্চা কেমন অবস্থায় থাকে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ দেয়, যথাযথ ব্যবস্থা করে আসে। এদেশের মা-জননীরা শিউরে উঠবেন—কনকনে হিম, বরফগুঁড়ি পড়ছে, তারই মধ্যে খোলা জায়গায় বাচ্চাদের রেখে দিয়েছে। একটু বড়রা—গোলাপফুলের মতো লাল—দেখতে পাবেন, মাটির উপর ঝাপটে বসে খেলাধুলোয় মেতে আছে।

রঙের খেলা নার্সারিতে। ঘরের দেয়ালে নানা রং; খেলনায় বিচিত্র রঙের বাহার। রং দেখতে দেখতে জীবনও রঙিন হয়ে ওঠে নাকি। যাকে আমরা বলি, পড়ানো—নার্সারি-কর্মীরা সে বস্তু করে না কখনো। কথা বলে তারা শিশুদের সঙ্গে—গল্প করে, হাসায়। দু-একটা শিশু গম্ভীর মনমরা ছিল, দু-পাঁচ দিনে তারা হাসিস্ফূর্তি ছুটোছুটিতে মেতে ওঠে। গ্রীষ্মের সময়টা নার্সারিগুলো গাঁয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়। জায়গা-বদলের ফলে বাচ্চারা স্বাস্থ্যে ভরে ওঠে।

তারপরে কিণ্ডারগার্টেন। সবাইকে এক ছাঁচে ফেলে শিক্ষাদান নয়। বয়স, মনের গঠন, স্বাভাবিক প্রবণতা—সকল দিকে লক্ষ্য রাখা হয় প্রতিটি শিশুর। মানুষ তারা, এক প্যাটার্নের পুতুল নয়, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে তাদের—এই হল শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ার কথা। পড়া হয়, এই স্তরে, দিনের মধ্যে কুড়ি থেকে চল্লিশ মিনিট। চল্লিশের বেশি কখনও নয়। গ্রীষ্মের সময় শিশুদের গ্রামে নিয়ে যায়। সেখানে মাটি গাছপালা পাখি ও জীবজন্তুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। প্রত্যেক নার্সারি ও কিণ্ডারগার্টেন-প্রতিষ্ঠানে অভিভাবকের কমিটি আছে—তাঁরা এসে দেখাশুনা করেন, উপদেশাদি দেন।

এর পরে ইস্কুল। ইস্কুলের নাম নেই, শুধু নম্বর দিয়ে পরিচয়। অর্থাৎ সবই এক ধাঁচের। আমি বেশি মাইনে দেব, আমার ছেলেপেলে ভাল শিক্ষা পাবে—এ রকম ব্যবস্থা হতে পারবে না। জায়গা হিসাব করে ইস্কুল—এই চৌহদ্দির ভিতরের সব ছেলেমেয়ে অমুক নম্বর ইস্কুলে পড়বে। অভিভাবকের পদ-প্রতিষ্ঠা যে রকমই হোক, শিশুদের মধ্যে কোন বাছবিচার নেই। চাকরানির ছেলে আর অধ্যাপিকার ছেলে এক সঙ্গে একই শিক্ষা পাচ্ছে। মাস্টারমশায়রা প্রতি বছর হিসাব নিয়ে দেখবেন, তাঁদের এলাকায় সাত বছরের উপর সব ছেলেমেয়ে ইস্কুলে আসছে কিনা। প্রতিটি শিশু ইস্কুলে আসবে—যদি না আসে, তার জন্য দায়ী হবেন শুধু অভিভাবক নয়, সেই এলাকার ইস্কুল-কর্তৃপক্ষও। সমস্ত সরকারি ইস্কুল, খরচপত্র সরকারের। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য অভিভাবকের এক পয়সা ব্যয় নেই। শিক্ষকেরা সকলেই ট্রেনিং-পাওয়া; তার জন্য বিরাট ব্যবস্থা, বিপুল অর্থব্যয়। ধরে নেওয়া হয়েছে—প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে সাধারণ মেধাসম্পন্ন। যাদের মেধা নেই, তাদের অসুস্থ বলে ধরা হয়। তাদের শিক্ষার জন্য পৃথক আয়োজন। কোন ছাত্র পিছিয়ে পড়লে তার দায়িত্ব ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের উপরও পড়বে। অভিভাবকও দায়ী হবেন, কেন তিনি শিশু-মনে শিক্ষার আগ্রহ সঞ্চার করতে পারেন নি।

বিভিন্ন গণতন্ত্রের জীবনরীতির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ফারাক। এই সমস্ত বিচার-বিবেচনা করে শিক্ষানীতি ঠিক করা হয়। বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিয়েও

সমগ্র সোবিয়েতে শিক্ষার কাঠামো এক—একই পদ্ধতির খানিকটা রকমফের। আঞ্চলিক ভাষায় পড়াশুনোর আরম্ভ—চতুর্থ শ্রেণীতে উঠে রুশ-ভাষাটা শিখতে হবে। তার পরের বছর বিদেশি ভাষা শিখতে হবে একটা—ইংরেজি, ফরাসি অথবা জর্মন। পঞ্চম শ্রেণী থেকে শুরু করে ছাত্রদের বছরে তিরিশ ঘণ্টা দিতে হবে বরফ-পরিষ্কার, পুরানো পাঠ্য-বই মেরামত, ইস্কুলের ইলেকট্রিক কাজকর্ম ইত্যাদি হাতের খাটনির ব্যাপারে। পয়সা বাঁচানোর জন্ত নয়, ছাত্র যাতে কোন কাজ হীন মনে না করে। ইস্কুলের মধ্যেই ছাত্র মানসিক শ্রমের সঙ্গে দৈহিক শ্রম করবে, নিজের কাজ যথাসম্ভব নিজে করবে—এই অভিপ্রায়। রোমাঞ্চকর অপরাধমূলক বই ছেলেমেয়েদের পড়তে দেওয়া হয় না, সাধারণ সিনেমা-হাউসে ঢুকতে দেওয়া হয় না। ছোটদের জন্ত বিস্তর সিনেমা-থিয়েটার আছে, দলে দলে তারা যায় সেখানে।

ইস্কুলের মধ্যেই বিভিন্ন বিশেষ শিক্ষণ-কেন্দ্র আছে, ছাত্রেরা তার কোন একটিতে যোগ দেয়। সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, কারিগরি, নাটক, সঙ্গীত, ললিত-কলা, খেলাধুলা, দেহচর্চা ইত্যাদি। এমনি ব্যবস্থার ফলে সতের বছর বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষা-সমাপ্তির সময় ছাত্র কোন এক বৃত্তি সম্পর্কে মন ঠিক করে ফেলেছে। এবং দশ বছরের চর্চার ফলে ঐ সম্পর্কে শিখেছেও অনেক কিছু।

। উনিশ ।

রাত্রে সার্কাস দেখতে গিয়েছি। সোবিয়েতের ভুবনখ্যাত সার্কাস। সার্কাসের ফাঁকে ফাঁকে ক্লাউনরা এসে দেশপ্রেম ও শান্তির কথা বলে যাচ্ছে। আমেরিকা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে খুব। নিজেদেরও ছাড়ে না। ক'টি ক্লাউন এলো একবার। একজনে বিস্তর রুবল জমিয়েছে—তাড়া তাড়া নোট বের করে বন্ধুদের দেখাচ্ছে। মোটর কিনবে। বন্ধুরা পিঠ চাপড়ে সাবাস দিল। খানিক পরে পুনশ্চ এই ক্লাউন-দলের আবির্ভাব। মোটর কেনবার মানুষটার গলায় নম্বর ঝোলানো—লাখের উপরে এক সংখ্যা। বন্ধুরা অভিনন্দন করছে, কিনে ফেলেছ তবে—এই বুঝি তোমার মোটরের নম্বর? উঁহু, এটা হল কিউয়ের নম্বর। অর্থাৎ এর আগে আরও লক্ষাধিক লোক মোটরের জন্ত নাম রেজেস্ট্রি করে বসে আছে। তাদের হয়ে গেলে তবে এই লোকের পালা। চাহিদা অনুযায়ী জিনিস সরবরাহ হচ্ছে না, তাই নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ।

পরদিন বিপ্লব-মিউজিয়ামে গেলাম। অপর নাম লেনিন-মিউজিয়াম—১৯৩২ অব্দে প্রতিষ্ঠা। লেনিন-জীবনের আশ্চর্য নিদর্শনগুলো অধ্যায়ে অধ্যায়ে সাজিয়ে দিয়েছে। ভলগাতীরের গাঁয়ে শিশুর জন্ম—সেই বাড়ির ছবি ও মডেল। বাবা মা পরিজনদের ছবি। বাড়িসুদ্ধ বিপ্লবী—বড়ভাইয়ের ফাঁসি হল জারের হত্যাচেষ্টার জন্য, তাঁর ছবি রয়েছে। ইস্কুলের পাঠ্য-বইগুলো; সোনার মেডেল পেলেন ভাল পড়াশুনোর জন্য। কাজান য়্যুনিভার্সিটিতে পড়বার সময় বিপ্লবচেষ্টা ও জেল। তারপরে নির্বাসন। ফেদোসিয়েভ প্রতিষ্ঠিত মার্কস-সোসাইটিতে যোগদান। পড়াশুনোয় বড় ভাল—টপাটপ পাশ করে যাচ্ছেন। পেট্রোগ্রাডে গুপ্ত মার্কস-সমিতির প্রতিষ্ঠা। সমিতিতে যে সব বই পড়া হত, তার পরিপূর্ণ সংগ্রহ। নিজে সেই সময় অনেক মার্কসীয় বইয়ের তর্জমা করেছিলেন, তা-ও রয়েছে। পিটার্স-বার্গে কম্যুনিস্ট-দল গড়লেন তিনি, কমিকদের ইউনিয়নগুলো সম্মিলিত করলেন। তখনকার সহকর্মীদের ছবি।

পিটার্সবার্গ জেলে ১১৩ নম্বরের কামরায় চোদ্দ মাস আটক রইলেন। এই কামরায় বসে তাঁর অনেক রচনা। দুধ দিয়ে লিখতেন আইনের বইয়ের লাইনের ফাঁকে ফাঁকে। আগুনে ধরে সেই লেখা পড়া হত। তারপরে তিন বছর সাইবেরিয়ায় এক কুড়েঘরে নির্বাসন। রেল-লাইন আড়াই-শ মাইল সেখান থেকে। সেখানেও বিস্তর লিখলেন। যে টেবিল-চেয়ারে বসে লেখাপড়া করতেন, সাদামাঠা তারী সেই আসবাবগুলো এনে রেখেছে।

প্রথম মার্কসীয় কাগজ বের করলেন—স্পার্ক। লেখায় লেখায় আগুন বেরুবে—সেজন্য এই নামকরণ। কাগজকে কেন্দ্র করে পার্টির কাজকর্ম চলল। লেনিনের বইও ছাপা হয়ে বেরুতে লাগল। বিপ্লবী লেনিনের নাম দেশবিদেশে ছড়িয়ে গেল।

পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের যাবতীয় কাগজপত্র ও পাণ্ডুলিপি। দাবাখেলার টেবিল—তার তলায় চোরাগোপ্তা খোপ বানিয়ে সেখানে এই কাগজপত্র রাখা হত। পুলিশ অনেকবার এসে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। লেনিন তো দাবাখেলায় মত্ত; সেই টেবিলের মধ্যে এমন বস্তু, বুঝবে তারা কেমন করে?

১৯০৫ অব্দ। বুভুক্ষু নরনারীর রক্তে জারের অঙ্গন একদিন রাঙা হয়ে গেল। সেই ভয়াবহ ছবি দেখুন মিউজিয়ামের দেয়ালে। বিপ্লব সারা দেশে ছড়িয়ে গেল। জারতন্ত্র উৎসন্নে যাক, জমিদারি ধ্বংস হোক—সর্বত্র এই বুলি। পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস হল এই বছরের এপ্রিলে। একটা বাড়ির মডেল বানিয়ে রেখেছে—নেতারা নিরীহ ভালমানুষ হয়ে সেখানে বসবাস করেন। বাড়ির নিচে ছাপা-খানার কাজকর্ম চলেছে। তারপরে পুলিশ ধরে ফেলল। ১৯০৬ অব্দে লেনিন যে বাক্স ব্যবহার করতেন, সেটা রয়েছে।

নানা জায়গায় সশস্ত্র অভ্যুত্থান। ব্যারিকেড দিয়ে পথ দিয়েছে, তার ছবি কয়েকটা। দলাদলি। মেনশেভিকরা বিশ্বাসঘাতকতা করল। আয়োজন ব্যর্থ। অনেককে ধরে ফেলল। দু-জন কর্মীর সঙ্গে লেনিন ফিনল্যাণ্ডে পালিয়ে গেলেন। একটুও দমেন নি তিনি। বললেন, বৃহত্তের প্রস্তুতি।

১৯১২ অব্দে লেনিন প্রাগে তৃতীয় কংগ্রেস ডাকলেন। বিদ্রোহ—লেনা নদীর তীরে কর্মিকদের উপর গুলি করা হচ্ছে, তার ছবি। প্রাভদা কাগজ বেরুল কর্মিকদের টাকায়। অনেক নির্যাতন হয়েছে কাগজের উপর, অনেকবার নাম পালটাতে হয়েছে। পোল্যাণ্ড থেকে লেনিন এই কাগজে লিখতেন। কর্মিকরা মহোৎসাহে প্রাভদা পড়ছে, তার ছবি।

প্রথম-মহাযুদ্ধ (১৯১৪) বাধল। লেনিন যুদ্ধের বিপক্ষে লিখতেন, বিপ্লবের স্বপক্ষে। লিখলেন, মরক্কো যদি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আর ভারত যদি ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ে, আমরা তাদের সমর্থন করব।

১৯১৭। কৃষক-কর্মিক এক হয়েছে। এপ্রিল মাসে লেনিন পেট্রোগ্রাড ফিরলেন। রিপোর্ট দিলেন (এপ্রিল-থিসিস)—স্বহস্তে লেখা তার কাপি। রেলস্টেশনে লেনিন বক্তৃতা করছেন (মে, ১৯১৭), সেই বিরাট ছবি। লেনিনের ওভারকোট, লাঠি; টিনের যে মগটা তিনি ব্যবহার করতেন। নানা রকম ছদ্মবেশ ধরতেন বহুরূপীর মতন, সেই সমস্ত ছবি। বিপ্লবে প্রধান নেতৃত্ব লেনিনের। বিপ্লবের পর শান্তি-ঘোষণা—লাঙল যার, জমি তার—জমাজমির ষোলআনা মালিক চাষী। যে কলমে ঘোষণা লিখলেন, সেটা সযত্নে রেখেছে।

একতলা সেরে এবারে মিউজিয়ামের দোতলায় উঠছি। সমাজতান্ত্রিক নবরাষ্ট্রকে চারদিক থেকে পিষে মারতে চায়। দেশরক্ষায় মহানেতা লেনিন। লেনিনকে হত্যার ষড়যন্ত্র। মস্কোর কর্মিকদের মধ্যে বক্তৃতা করছেন, একটা মেয়ে চার বার গুলি করল। দুটো বিঁধল তার মধ্যে। কোট ফুটো হয়ে ঢুকেছিল, সেই কোট রাখা আছে। সর্বপ্রান্ত থেকে উদ্বেগ জানিয়ে হাজার হাজার চিঠি আর টেলিগ্রাম আসছে। তিন সপ্তাহ পরে লেনিন বিছানা ছেড়ে উঠলেন। ডাক্তারের সার্টিফিকেট—ভাল হয়ে গেছেন তিনি।

ক্রেমলিনে লেনিনের পড়ার ঘরের ছবি। বই আর বই। দেয়াল-জোড়া ম্যাপ। দুটো টেলিফোন। বাতিদান ও বাতি—বিদ্যুতের সরবরাহ তখন অত্যন্ত কম। বাইরের লোক এসে বসবে গদি-আঁটা চেয়ারে, নিজের শক্ত বেতের চেয়ার। ধূমপান নিষেধ—লেনিন ধূমপান করতেন না। লেনিনের গায়ের শীতের কোট, পায়ের বুটজুতা, নানা পোষাক। অজস্র পাণ্ডুলিপি।

রোগশয্যায় লেনিন বিশ্রাম নিচ্ছেন, সেই ছবি।

অবশেষে আমাদের হলঘরে নিয়ে বসাল। ডকুমেণ্টারি-ছবি দেখাবে। মাত্র কুড়ি মিনিটের ছবি। ১৯১৮ থেকে ১৯২২ চার বছরে একটু-আধটু তুলে রেখেছিল। নানা অনুষ্ঠানে লেনিন এখানে ওখানে যাচ্ছেন। ১৯২২ অব্দে তাঁর সর্বশেষ বক্তৃতা। জীবন্ত লেনিনকে ছবিতে দেখলাম, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

সন্ধ্যায় আবার আজ বলশই-থিয়েটারে। নৃত্যনাট্য আজকে—ঘুমন্ত রূপসী (Sleeping Beauty)। রাজকন্যার জন্ম হল, রাজবাড়িতে আনন্দোৎসব। নানান ধরনের নাচগান। ডাইনি এলো—ডাইনির গাড়ি টেনে নিয়ে আসছে ভয়ঙ্কর রকমের মুখোস-পরা কয়েকটা আজব জানোয়ার। আর সঙ্গী হয়ে আসছে কালো কালো লেজওয়ালা এক দঙ্গল জীব। রাজকন্যা মারা যাবে ছুঁচ বিঁধে—ডাইনি খবরটা জানিয়ে উদ্দাম নৃত্য নাচতে নাচতে চলে গেল। রাজপুরী স্তম্ভিত। এলো দয়াবতী পরী। সে বলে, মৃত্যু নয়—ছুঁচ বিঁধে রাজকন্যা এক-শ বছর পড়ে পড়ে ঘুমুবে। আসবে তারপরে রাজপুত্র—চুম্বন দেবে কন্যার কপোলে। ঘুম ভেঙে পুরীসুদ্ধ জাগ্রত হবে। রাজা হুকুম দিলেন, রাজবাড়িতে ছুঁচ নিয়ে আসবে না কেউ কখনো।

নাট্যের এই হল প্রথম অঙ্ক। রূপকথা ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে। নৃত্যে আর আলোয় আলোয় গল্প বুনে যাচ্ছে। তিন চার-শ একত্র এসে নাচছে এক সময়। কী খেলা আলোর! ছিল মনোরম ফুল-বাগান, রংবেরঙের ফুল হাসছিল —ডাইনি আসার সঙ্গে সঙ্গে লাল মেঘে আকাশ ঢেকে গেল, চারিদিকে উৎকট বীভৎসতা। যেন দম বন্ধ হয়ে আসে এত বড় প্রেক্ষাগৃহের।

ভারতীয় দূতাবাসটা পয়লা নম্বরের, কাজকর্ম বিস্তর। অনেকটা জায়গার উপরে গোটা তিনেক বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। ভাড়ার অঙ্কটা সঠিক বলতে পারছি না—শুনেছিলাম সেই সময়, রীতিমত গুজনদার। কর্মচারীদের নিয়ম-মাফিক যা মাইনে দেওয়া হয়, রাশিয়ার ঐ বিষম মাগ্‌গি বাজারে তা ফুঁয়ে উড়ে যাবার কথা। ভারত সরকার সেজন্য কম দরে ওঁদের রুবল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। তা ছাড়া ভুবন চুঁড়ে বাজার করেন—যেখানে যেটি ভাল ও সস্তা। হয়ে-দরে পুষিয়ে যায়।

দূতাবাসে তিনজন বাঙালি। দাশগুপ্তের কথা শুনেছেন, তিনি দেশে চলে গেলেন তো সেই জায়গায় ধর এসেছেন এখন। আছেন রবি আহুড়ি—তিন বছর হয়ে গেল, পথ তাকাচ্ছেন কবে চলে যাওয়ার হুকুম আসে। আর একটি

তরুণ—সুধীন্দ্রনাথ বসু, বর্ধমান রায়না অঞ্চলে বাড়ি। একলা মানুষ—ওঁরই মতো ক-জনে মিলে বেশ করে আছেন। বিদেশে বঙ্গভাষায় আলাপনের মওকা পেয়েছি—তিন বাঙালির সঙ্গে বড্ড জমে গেছে। ভাদুড়ি-জায়াও ভারি খুশি। পুরুষরা কাজে-কর্মে থাকেন—মেয়েদের অসুবিধা, কথাবার্তার মানুষ পান না।

তা সুযোগ পেয়েছি, আমরাই বা ছেড়ে দেব কেন? ভাদুড়ি-জায়াকে ধরে বললাম, নেমন্তন্ন খাওয়াতে হবে আমাদের।

বেশ তো, বেশ তো—

ভাদুড়ি বিনয় করে বলেন, বড় বড় জায়গায় খাওয়াচ্ছে। আমাদের সামান্য ডাল-ভাত—

ধরে পড়লাম: ডাল-ভাতই কিন্তু খাওয়াতে হবে আমাদের। ভাত—এবং মুসুরির ডাল যদি যোগাড় করতে পারেন।

ভাত-ডালের নামে প্রাণ লালায়িত হয়ে উঠেছে। কত দিন ঐ বস্তু মুখে ওঠে নি! ভাদুড়ি-জায়া হেসে বললেন, তাই হবে, মুসুরির ডালই খাওয়াব। আর বেগুন-ভাজা সর্ষের তেলে।

এই গঙ্গাহীন দেশে মুসুরির ডাল এবং তদুপরি সর্ষের তেলের সংগ্রহ শুধুমাত্র এমব্যাসির লোকের পক্ষেই সম্ভব। ঐ যে বললাম, ভুবন-জোড়া বাজার—হল্যাণ্ড থেকে মাখন, অস্ট্রেলিয়া থেকে মাংস, ইন্দোনেশিয়া থেকে চাল। নিখিল ভুবন কাস্টমসের জালে ঘেরা—সেই জালের আওতার বাইরে এঁরা।

আজ রাত্রে লেনিনগ্রাড রওনা হব, তার আগে সাধের নিমন্ত্রণটা সেরে যাই। রবি ভাদুড়ি খবর দিয়ে গেছেন, দুপুরবেলা ব্যবস্থা হয়েছে। সকালের দিকটা তাই বেশি ঝমেলা রাখি নি। শহরের মলোটোভ অঞ্চলে বাইশ নম্বরের শিশু-সদনটা দেখা হবে, দেখেই দূতাবাসে চলে যাব।

লড়াইয়ে যেসব শিশুর বাপ-মা মরেছে, তাদেরই জন্য এমনি সব সদন গড়ে উঠল। পলের সঙ্গে সেই একদিন কথা হচ্ছিল—দেশে পুরুষের সংখ্যা অত্যন্ত কম, সব মেয়ের বিয়ে হবার কোন উপায় নেই, অতএব কুমারী মেয়ের উপর ট্যাক্স কেন? পল বলেছিল, এই ট্যাক্সে আমরা আপত্তি করি না; যুদ্ধের জন্য হাজার হাজার বাচ্চা অনাথ হয়ে গেল, ট্যাক্সের পুরো টাকাটা তাদের জন্য খরচ হয়। দেশসুদ্ধ মানুষের অপার মমতা ঐ শিশুদের সম্পর্কে। রেখেছেও তাদের রাজার হালে—মা-বাপ নেই, কোন সময় সে অভাব বুঝতে না পারে।

নীনা আগে আগে গিয়ে বোতাম টিপল। দরজা খুলে গেল। আগে খবর দেওয়া হয় নি, একসঙ্গে এতগুলো বিদেশিকে দেখে তারা হকচকিয়ে গেছে।

কর্ত্রী তরতর করে নেমে এলেন উপর থেকে। বাচ্চারা ছুটোছুটি করছিল, বড় বড় চোখ মেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেল।

১৯৪৩ অব্দে এই সদনের প্রতিষ্ঠা। তিরানব্বুইটা মেয়ে থাকে এখানে। সাত থেকে সতের বছর বয়স। শুধু মাত্র মেয়ে। ছেলে-মেয়ে এক প্রতিষ্ঠানে রাখতে যে মানা আছে, তা নয়। অনেক সদনেই আছে এমন। এখানে স্থানা-ভাবের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। পড়াশুনো বাইরের ইস্কুলে করতে যায়। সাতটায় সময় উঠে ব্যায়াম, প্রাতঃকৃত্য। সাড়ে-সাতটা থেকে আটটা প্রাতর্ভোজন দুই দলে ভাগ হয়ে। এক দল তার পরে ইস্কুলে চলে যায়, অন্য দল বেড়ায়। ন'টা থেকে এগারোটা অবধি ঘরের কাজ করে এই দ্বিতীয় দল। বেলা দুইটায় দ্বিতীয় দল ইস্কুলে যায়। প্রথম দল ইতিমধ্যে ফিরে এসে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে, পোশাক তৈয়ারি এবং নানা রকম হাতের কাজ করে। নাচগান ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান হয়। সপ্তাহে একবার করে সিনেমা দেখানো হয় এই বাড়িতে। বাইরের থিয়েটারে নিয়ে যায় মাসে একবার। মস্কো থেকে পঁচিশ মাইল দূরে অতি চমৎকার এদের পায়োনিয়র-ক্যাম্প। সেখানে যেতে হয় মাঝে মাঝে। আরও নানাস্থানে নিয়ে যায়—তলস্তয়ের গ্রামের বাড়ি, লেনিনগ্রাড—ইতিহাসের স্মৃতিমণ্ডিত নানান সব জায়গায়। এবারে ইউক্রেনে গিয়েছিল। ছ-জন আছেন খবরদারির জন্য। তা ছাড়া আছেন ডাক্তার নার্স ও পায়োনিয়র দলনেতা।

মা-বাপ না থাকলেই যে সদনে নিয়ে আসবে, এমন কথা নেই। পোষ্যপুত্র করে নিতে পারে কেউ, অথবা আত্মীয়স্বজন এসে ভার নিতে পারে। লড়াইয়ে যারা অনাথ হয়েছে, গোড়ায় শুধু তারাই স্থান পেত এমনি সব প্রতিষ্ঠানে। সেই সব ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে প্রায় সবাই বেরিয়ে গেছে। বাপ কিম্বা মা রোগাক্রান্ত, শিশুর লালন করতে পারে না—সেই সব শিশু নিয়ে আসে। আর আসে জারজ বলে যাদের দিকে আমরা নিচু চোখে তাকাই। বাপে-মায়ে বিয়ে হোক চাই না হোক, সন্তানমাত্রেই এদেশে যোলআনা আইন-সম্মত ও আদরণীয়।

বড় বড় সদন আছে—শ তিনেকের থাকবার মতো। কিন্তু এই রকম মাঝারি সদনই বেশি—শহরের কাছাকাছি যেখানে থাকে। অনেক ছেলেমেয়ে পড়াশুনোয় সুবিধা করতে পারে না, চোদ্দ বছর বয়স হতেই তাদের কারিগরি কাজকর্মে লাগিয়ে দেওয়া হয়। যেমন রেল-বিভাগের পরীক্ষায় পাশ করে সেই কাজে চলে গিয়েছে অনেকে। হাতের কাজেরও অনেক ব্যবস্থা। সেলাইয়ের কল বিস্তর দেখছি। অনেকে য়ুনিভার্সিটির পড়াশুনো করে আঠারো বছরে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার পর। যাবার সময় অর্থ-সাহায্যও পায়।

শোবার ঘরে ঢুকে দেখছি। পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণীর মেয়েরা থাকে এ ঘরে। আঠারটি খাট, ধবধবে বিছানা। পাট-ভাঙা তোয়ালে প্রতি জনের। খাসা খাসা শিশুমূর্ত এদিকে সেদিকে, দেখে মন প্রসন্ন হয়। জ্ঞানীগুণী-বিদ্বানের ছবি বাড়িময়। একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব জমানো গেল—ভ্যালেন্টাইন নাম। আর একটি মেয়ের নাম লিউবা—পায়োনিয়র দলের কেষ্টবিষ্টু একজন। রান্নাঘরে গ্যাসস্টোভ—হাসপাতালের মতন অ্যাপ্রন পরে ওদিকে চলাফেরা করতে হয়। খানাঘরে গোল-টেবিলের চারিধারে চারটে করে চেয়ার। পরিচ্ছন্ন কাপড় টেবিলের উপর। ষাট জন বসতে পারে একসঙ্গে। একটি মেয়ে, নাতেলা, ইংরেজি শেখে; গুড-মর্নিং বলে আহ্বান করল আমাদের। লিউবা তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা সুরু করে দিল—ভারতীয় শিশুদের ভালবাসা জানিও। যেন তারা চিঠিপত্র লেখে আমাদের। একবার এসে দেখে যায়···

ক্লারাকে কোলে তুলে দাঁড়িয়েছি। ক্লিক করে ক্যামেরায় ছবি তুলে নিল।

সদন থেকে সোজা এমব্যাসি। নিমন্ত্রণটা জুটিয়েছি আমি। গোড়ায় অনেকে দোষারোপ করলেন, বিদেশ-বিভুঁয়ে সুবিধা-অসুবিধা আছে—গায়ে পড়ে নিমন্ত্রণ চাওয়াটা ঠিক হয়নি। খাওয়াদাওয়ার পরে তাঁরা পরিতৃপ্তির উদ্গার তুলছেন এখন। বাঙালি গৃহস্থ-বাড়ির রান্না—অনেক দিন পরে সত্যিকার তৃপ্তি পাওয়া গেল। ডেলিগেটদের মধ্যে বাঙালি ক-জনেরই নিমন্ত্রণ—কিন্তু বাইরের একজনকে টেনেটুনে সঙ্গে আনা হল, প্রাদেশিকতার বদনাম না আসে। সে ভদ্রলোকের মুশকিল—অষুধ গেলার মতো করে খাচ্ছেন। গৃহকর্ত্রীও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হচ্ছেন গতিক দেখে।

আমাদেরই শুধু নয়, এমব্যাসিতে যাঁরা বাঙালি আছেন—পুরুষ মেয়ে ও বাচ্চা, সকলের নিমন্ত্রণ। মস্কো শহরে বাঙালি যজ্ঞিবাড়ির হুল্লোড়। দেদার বাংলা ভাষা—রেখেঢেকে সেরে সামলে গ্রামার বিবেচনা করে কথা বলবার দরকার হচ্ছে না। শ্রীমতী ভাদুড়ির তিন বছর হয়ে গেল এখানে। গৃহস্থ পাড়া-পড়শির সঙ্গে আলাপ-সালাপ হয়েছে কিছু কিছু। এক ভদ্রলোকের কাছে রুশভাষা শেখেন সপ্তাহে এক ঘণ্টা করে—মাসে মোট চারদিন। সেই বাবদে এক-শ রুবল করে দিতে হয়। দূতাবাসের আরো অনেকে তাঁর কাছে শেখে। সুধীন্দ্র বসুরা মেসে রান্নার জন্ত এক মেয়েলোক রেখেছেন। সকাল আটটায় আসে, একবেলা খাইয়ে দিয়ে এবং অন্য বেলার রান্না ঢাকা দিয়ে রেখে আড়াইটে নাগাদ চলে যায়। আপ-খোরাকি—এক আধবার চা খায় শুধু এখানে। পাঁচজন লোকের রান্না ও বাসন-মাজা—মাইনে হল আট-শ রুবল। বুঝুন। একদিন ওঁরা

দোকান থেকে দুধ এনে দেবার জন্য বলেছিলেন, ইউনিয়নে অমনি চিঠি চলে গেল। ইউনিয়ন হমকি দিয়ে ওঠে: ভেবেছ কি হে, কুল্যে আট-শ রুবল মাইনে—তাতে আবার দুধও এনে দেবে? রফা হল, আরও চার-শ রুবল দেবেন—ভদমূল্যে বাজার-করা দুধ-আনা ও কাপড়-কাচা এই তিনটে কাজ অতিরিক্ত করবে।

কালো রঙের কদর খুব। রাস্তায় বেরুলে কালো আমাদের ঈর্ষার চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে। শ্রীমতী ভাদুড়ি বিকালের দিকে হয়তো বা পার্কে গিয়ে বসলেন। রুশ-মেয়েরা আসে। শ্রীমতীর হাতখানা পরম আদরে টেনে নেয় তারা হাতের মধ্যে; বলাবলি করে, আহা, কী সুন্দর কালো রে! তবু তো শ্রীমতী কালো নন, রীতিমতো গৌরাঙ্গী। তাতেই এমনি—আর নিকষ-কালো পেলে উল্লাসে ওরা যে কী করত, ভেবে পাইনে।

বাচ্চা ছেলেপুলে বড্ড ভালবাসে ওখানকার মেয়েরা। আজব কিছু নয়, সব দেশেরই এক স্বভাব। ভাদুড়ির ছেলের নাম বুদ্ধদেব। অত হাঙ্গামায় নাম জিভে জড়িয়ে যাবে, শ্রীমতী তাই সোজা করে বলে দিয়েছেন খোকা। পার্কে ছেলে নিয়ে গেলে চারিদিকে 'কোকা' 'কোকা' করে অস্থির। নিজের বাচ্চার উপরেও রুশ-মায়ের অত্যধিক যত্ন। লেপের আচ্ছা-রকম প্যাকিং করে শুধুমাত্র নাক এবং একটু চোখ বের করে ছেলেপুলে হিমের মধ্যে নিয়ে বসে। এমনি করে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় পোক্ত করে তোলে বাচ্চাদের। শীতকালে ঘণ্টাখানেক অন্তত বেরুবেই পথে—এটা আবশ্যিক কর্ম, শখ নয়—মুক্তবায়ুর জন্য।

খাওয়াটা অতিশয় গুরুতর হল। নড়াচড়া মুশকিল। খুব একচোট গল্প-গুজবে সময়ক্ষেপ করে নিই। হোটেলে ফিরতে অপরাহ্ণ। শুধু একটু চা মুখে ঠেকিয়ে টহল দিতে বেরুব এবার। মেট্রনের কাছে ঘরের চাবি চাইতে গেছি—এই যে, এসেছ এতক্ষণে! দু-জনে তোমার কাছে এসেছে। সেই কখন থেকে বসে আছে।

তাজ্জব লাগে। নেতা কিম্বা উপনেতার ঝামেলায় নই, আমার কাছে আসতে যাবে কোন হতভাগা! কোথায় তারা? কি চায়?

একটা গোল-টেবিল ঘিরে আগন্তুকরা বসে। তার ভিতরে সেই দু-জন। বুঝতে পেরেছে, আসামি হাজির। উঠে দাঁড়াল। তরুণ ছেলে আর তরুণী মেয়ে। সুশ্রী উজ্জ্বল চেহারা। গুরুঠাকুর দেখলে বুড়ি বিধবারা যেমন হয়ে ওঠেন, মুখে-চোখে সেই প্রকার গদগদ ভাব।

ও-দেশের নতুন মানুষ পেলে যেমনধারা জিজ্ঞাসা করি : ইংরেজি বলবে তোমরা ?

মেয়েটি পরিষ্কার বাংলায় বলল, আপনার সহিত বঙ্গভাষায় বাক্যালাপ করিয়া প্রীতিলাভ করিতে চাহি।

বটে হে! তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতটুকুই বা প্রীতি হবে? সঙ্গীদের বলি, আপনারা বেরিয়ে পড়ুন। জাঁকিয়ে বসে প্রীতি-দানে লেগে যাই আমি। ফরমাস করলাম : চা-কফি কেক-বিস্কুট ফলটল ঘরে পাঠিয়ে দাও—দরাজ হাতে পাঠিও, তিন জনের মতো।

মেয়েটি আলেকসেয়েবা; ছেলেটি গ্রাতুক ডানিয়েলচুক। আমার খাতায় বাংলা হরপে নাম-সই আছে তাদের। মানুষের যত রকম পেশা হতে পারে, তত ইউনিয়ন সোবিয়েত দেশে। ইউনিয়নগুলো অসীম শক্তিশালী—রাজ্য চালায় আসলে এরাই। লেখকরাও ওখানে ইউনিয়ন গড়ে বসে আছেন—সোবিয়েত রাইটার্স ইউনিয়ন (Soviet Writer's Union)। কী বাড়ি মশায়, দু-দিন গিয়েছিলাম সেখানে। কাউন্ট রুস্তভ একদা থাকতেন ঐ বাড়িতেই, তলস্তয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীসে' যার উল্লেখ আছে। ঝকঝকে মোটর চড়ে লেখক মশায়রা তথায় আনাগোনা করেন। লনের পাশে গাড়ি রাখবার সুবিস্তীর্ণ জায়গা—অত জায়গা ভরে যায় এক এক সময়, গাড়ি তখন রাস্তায় রাখতে হয়। ইউনিয়নের বিস্তর কর্মচারী, নানান বিভাগ। বিদেশি দপ্তর আছে—সেই দপ্তরে বাংলা বিভাগের লোক এরা দুটি। কেমন করে জেনেছে, বাঙালি পিশাতিয়েল এসে জুটেছে একটি। খবরাখবর নিতে এসেছে।

ঘরের এক দিকে নিচু টেবিল ঘিরে আরাম করে বসেছি। আলেকসেয়েবা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে : এ তাবৎ বঙ্গভাষার বহু পুস্তক পাঠ করিয়াছি—অহো কি সৌভাগ্য, সেই ভাষার একজন লেখককে চর্মচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম।

বলতে বলতে—হাসি দেখেছে আমার—চুপ করে যায়। লজ্জায় মুখ নিচু করে।

হেসে তো চৌচির হবার কথা। কিন্তু ওদের দিকে চেয়ে প্রাণপণে সামলে নিই। শ্রদ্ধা জলজল করছে দু-জনের মুখে। বাংলা পড়াশুনো করে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর কী গভীর ভালবাসা!

বঙ্কিমচন্দ্রের কোন বই পড়েছ?

হাঁ, কপালকুণ্ডলা পড়িয়াছি।

কেমন লাগল?

অতীব চিত্তাকর্ষক।

শরৎ বাবুর কিছু?

বিরাজ বৌ—

কেমন?

অতীব চিত্তাকর্ষক।

আমার দুটো বই দিলাম দু-জনকে। আলেকসেয়েবা আর আসেনি, অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। মাতুক আসত; আমার ভাই হয়ে গিয়েছিল, আমি তার দাদা। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম: পড়েছ আমার বইটা?

সম্পূর্ণ পড়িয়াছি। অতীব চিত্তাকর্ষক।

চালাক ছেলে। মনে মনে হাসছি, ধরতে পেরেছে। বলে, সাধুভাষার পুস্তক পাঠ করিয়া আমাদের যাহা-কিছু শিক্ষা। বড়ই দুঃখের বিষয়, চলিত-ভাষায় আমরা কথা বলিতে পারি না।

বললাম, কলকাতায় চলো ভাই। আমার বাড়ি থাকবে, গেঞ্জি গায়ে বেড়াবে, গামছা পরে তেল মাখবে চানের আগে। ছ-মাসের মধ্যে চলিত-বাংলায় এমন লায়েক করে দেব যে আমরাই তখন তোমার কথা বুঝে উঠতে পারব না।

চলিত-বাংলায় না হোক—এই এক তাজ্জব, ঘণ্টার পর ঘণ্টা উৎকৃষ্ট সাধু-ভাষায় চালিয়ে যাচ্ছে, ভারী ভারী বিষয়ের আলোচনা করছে, বাধে না। সে পরিচয় আপনারাও অনেকে পেয়েছেন। মাতুক ভারতে এসেছিল, আগ্রায় নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে বাংলায় বক্তৃতা করেছিল।

প্রথম রাত্রেই তাই দেখছি। সাহিত্যের কথা শুনতে এসেছিল, কিন্তু আমাদের একজন নানা রাজনীতিক তর্ক জুড়ে দিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলল। ডিনারের সময় পার হয়ে যায়, একজন খেয়ে উদ্গার তুলতে তুলতে শব্দসাড়া করে ও-ঘরে ঢুকলেন। রাত্রি বারোটায় লেনিনগ্রাড রওনা হব আজকেই। তখন অনিচ্ছার সঙ্গে তারা উঠে পড়ল। দরজা অবধি গিয়ে ওভারকোট চড়াচ্ছে, তখনও সাহিত্য-প্রসঙ্গ। করিডরে অনেক-দূর সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, তখনও।

মস্কোয় ফিরিয়া আসিলে যেন সংবাদ পাই। আমরাই সংবাদ লইব। আপনি বিরক্ত হইবেন না তো?

সে কি কথা! এসো ভাই, নিশ্চয় আসবে আবার। কত জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল, কিন্তু তোমাদের এই দুটির মতো এমন স্বজন আজও এখানে পাইনি।

॥ কুড়ি ॥

ঘুম ভাঙল ট্রেনের মধ্যে। রাত দুপুরে উঠেছিলাম। কী অপরূপ কামরা, রাজা-মহারাজার ঘরের মতো। কার্পেট-বিছানো মেজে; ঝকমকে ঝাড়মণ্ডিত আলো। সারা দেয়ালেও কাজকর্ম। দু-কামরার জন্ত একটি গোসলখানা। সেটা এমনি কায়দার, এদিকটা খুললে ওদিক আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। শৌচাগার কামরার লাগোয়া নয়, একেবারে দূর প্রান্তে। এই এক অসুবিধা —চোদ্দ-পনের জনের এক শৌচাগার। শৌচ সম্পর্কে, দেখা যাচ্ছে, বিষম কঞ্জুষপনা এদের।

গাড়ি দুলকি চালে চলেছে। এই নিয়ম এখানে, মানুষ-বওয়া গাড়ি অত্যন্ত সামাল হয়ে চালায়। সকলের বাড়া ধন-দৌলত নাকি মানুষের জীবন। রাশিয়ার গ্রাম দেখতে দেখতে চলেছি জানলায় বসে। পৌনে ন'টা বাজে— এখনও রোদ ওঠে নি, ঊষাকালের মতন আকাশ। ধোঁয়া ভেসে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে, ছেঁড়া ছেঁড়া কুয়াশা। রাতে কিছু বরফ পড়ছিল, এখানে-ওখানে চিহ্ন আছে। দাবানলের পর গাছের গুঁড়ির যেমন কালো কালো অবশেষ থাকে, বনের সেই চেহারা। বরফ পড়ে পড়ে এই দশা হয়েছে। বনরাজ্যের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি—দু-ধারে সীমাহীন বার্চ-পাইনের বন। ক্ষেত-খামার মাঝে মাঝে। ফসল ঝেড়ে নিয়ে আঁটি স্তূপাকার করে রেখেছে, আমাদের গাঁয়ের উঠানে যেমন পোয়ালগাদা দেখতে পাই। জলা জায়গা—আমাদেরই বিল-বাঁওড়ের মতন। কাঁচা রাস্তা—গাড়ির চাকার দাগ পড়ে গেছে। দু-দশটা সবুজ গাছও এবার দেখতে পাচ্ছি—বরফ আর শীত আমলে না এনে হাসছে পাতা ঝিলমিল করে। জঙ্গল কেটে ফেলেছে অনেক জায়গায়, গাছের গোড়াগুলো শুধু আছে। চাষবাস করবে। খরস্রোতা নদী—নদী পার হয়ে গ্রাম এলো এবার। কাঠের বাড়ি, ছাত-দেয়াল সমস্ত কাঠের। কিন্তু লোকজন একটা দেখি না কোন দিকে। শীতে ঘুম ভাঙেনি এখনো গাঁয়ের। ঘর-কানাচের সব্জিক্ষেতে কয়েকটা সাদা মুরগি খুঁটে খুঁটে খেয়ে বেড়াচ্ছে শুধু। একটা মাঠে গরুর পাল। পুষ্ট চেহারা, সাদায়-কালোয় মেশানো রং। কিন্তু চরে বেড়াচ্ছে না, নড়াচড়া নেই, ঋষিতপস্বীর মতো একটা জায়গায় ধ্যাননিমগ্ন যেন। জীব না অতিকায় পুতুল, সন্দেহ হয়।

এর পরে পুরোপুরি সবুজ অঞ্চল। অজস্র পাইন ও ফার। আপেল-বাগিচাও অনেক। গ্রামের পর গ্রাম পার হচ্ছি। রাস্তাঘাট ভাল নয়, বরফ-গলা জল

জমে আছে এখানে ওখানে। প্যাচপেচে কাদা। এক-ঘোড়ায় টানা গাড়ি যাচ্ছে কাদা ছিটকাতে ছিটকাতে। দুটো একটা মানুষ দেখা যাচ্ছে এখন—মাথায় টুপি ও গায়ে ওভারকোট এঁটে কাদা বাঁচিয়ে সামাল হয়ে যাচ্ছে। বর্ষাকালে আমাদের পাড়াগাঁয়ের পথে অবিকল এমনিধারা দেখি। কচি ছেলের হাত ধরে বাপ ঐ কেমন কাদা পার হচ্ছে, দেখুন দেখুন।

কামরায় কামরায় রেডিও বাজছে। আমাদেরও আছে। বন্ধ করে রেখেছি, নইতো অসুবিধা হয় লেখার। কাচ-আঁটা কামরা -এ কাচ নামানো যায় না। ভিতরে গরম করে রেখেছে। কাচের খাঁচা থেকে বাইরের জগতে তাকিয়ে আছি, তার সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ নেই। মৃত্যুর পরে বায়ুভূত হয়ে ভুবন-ব্রহ্মাণ্ডের উপরে ভেসে চলছি যেন।

এবারে এক মস্তবড় গ্রাম। অগণ্য কাঠের বাড়ি। হাঁস-মুরগি চরছে। নিশপত্র বার্চগাছ এবং সবুজ পত্রময় ফার-পাইন। এই সব গাছপালা ও ঘরবাড়ি দেশের সঙ্গে একেবারে মেলে না। সারা পথে দেখে আসছি পতিত জমি বিস্তর। তাই এরা মানুষ চাচ্ছে, অগুন্তি মানুষ। মাঠের শেষে দূরে দূরে ফ্যাক্টরির চোঙা থেকে ধোঁয়া উঠছে। বড় কারখানা গ্রামপ্রান্তে—নীল কাচের বেড়ায় ঘেরা। লোক-চলাচল এবারে প্রচুর। আর দেরি নেই, পথ শেষ হয়ে এলো।

বড় স্টেশন। কিন্তু এমন নিচু জলা-জায়গা যে প্লাটফরম আগাগোড়া কাঠের পাটাতনের উপর করতে হয়েছে। কাঠেরও অপ্রতুল নেই। ক্ষেতের পর ক্ষেত—বড় বড় বাঁধাকপি ফলে আছে। জলবিদ্যুৎ-কারখানা অনতিদূরে। লেনিনগ্রাড।

জায়গাটা কি মশায় এখানে? ভুবনের প্রায় ঐ মাথায়; উত্তরমেরুর কাছাকাছি এগিয়ে এসেছি। নেভা নদী ফিনল্যাণ্ড-উপসাগরে পড়ল—মোহনার উপর খাল-বিল-জঙ্গলে ভরা ব-দ্বীপ, সেইখানটায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইন্দ্রপুরী বানিয়ে তুলল। পৃথিবীর এক সেরা শহর। নজরটা যদি ছড়িয়ে রাখেন আর কিঞ্চিৎ যদি কল্পনার দৌড় থাকে, শহরে ঢুকবার মুখে জায়গাটার আদি-অবস্থার আঁচ পেতে পারবেন।

নিয়ে তুলল একেবারে সকলের সেরা হোটেল আস্তোরিয়ায়। মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে কী যে চড়ে উঠল, কি আর বলি! এতই মহরম-মহরম আপনাদের সঙ্গে—কিন্তু দেখা করবার মনন নিয়ে যদি ঐ হোটেলের লাউঞ্জে গিয়ে বসতেন, সঙ্গে সঙ্গেই যে চিনে ফেলতাম এমন কথা হলফ করে বলতে পারিনে।

আস্তোরিয়া জানেন তো? ঘাড় নাড়লে শুনিনে, জানেন নিশ্চয়। লড়াইয়ের সময় জেনেছিলেন, শান্তির সময় এখন ভুলে বসে আছেন। লেনিনগ্রাড ঘিরে

ফেলে হিটলার ধরে নিলেন, নির্ঘাৎ এইবারে কেল্লা-কতে। হিসাবপত্র করে ফেললেন, কদ্দিন লাগবে শহর লেনিনগ্রাডের পদতলে আছড়ে পড়তে। সেই হিসাব অনুযায়ী আস্তোরিয়ার ম্যানেজারকে চিঠি পাঠালেন : বড়দিনের ফুর্তি-ফার্তি এবারে তোমার হোটেলে। অমুক দিন সদলবলে পৌঁছব। পাঁচশ লোকের মতো উত্তম খাদ্য ও মদ্যের জোগাড় রেখো। চিঠির নিচে সই খুদ হিটলার মশায়ের। কিন্তু হিসাবে গড়বড় হল। বড়দিন মাটি হয়ে গেল, তাঁরা এসে পৌঁছলেন না। ন'শ দিন সদলবলে শহর ঘিরে থেকে শেষটা পিছোতে লাগলেন। ঘরের ছেলে ঘরে—ঘরের একেবারে অন্দরদেশে। তিন-শ হাতবোমা মেরেছে একাই একটা মেয়ে, চোদ্দ-পনের বছর বয়স ছিল তখন, সেই মেয়ের সঙ্গে একদিন আলাপ হল ঐ হোটেলে। আর একটা ছেলে দেখলাম, পঞ্চাশ-ষাটটা বোমা মেরেছে। এমনি কত! সমস্ত ইতিহাসের কথা। আমার পাঠকেরা মহাপণ্ডিত—মায়ের কাছে কোন মাসীর গল্প শোনাতে যাব? সেই তখন আস্তোরিয়ার নাম পেয়েছিলেন খবরের কাগজে। তত্র আমরা গিয়ে আছি। বুঝুন। হিটলার পেরে উঠলেন না, আর আমরা গাড়ি থেকে নেমে মচমচ করে জুতো বাজিয়ে উঠে পড়লাম। সেই কথা বললাম হোটেলের ম্যানেজারকে : দেখলেন তো মশায়, হিটলারের চেয়ে অধিক শক্তি ধরি আমরা। বিপুল আয়োজন করেও শেষ অবধি তাঁর আসা ঘটে উঠল না, আর আমরা এই চলে এসেছি—কই, রুখতে পারলেন না তো!

ম্যানেজার ঘাড় নেড়ে মেনে নিলেন। বটেই তো! আপনারা হলেন শান্তির দূত, প্রীতি আর সৌহার্দ্য বয়ে নিয়ে এসেছেন—আপনাদের শক্তি কত! হাতিয়ারের জোরে হিটলার ঢুকতে চাচ্ছিল, সেই লোকের তুলনা আপনাদের সঙ্গে!

বাইরে কনকনে শীত, হাড়-কাঁপানো মেরু-বাতাস—ঘরের ভিতরটা বিদ্যুতের তাপে নাতিশীতোষ্ণ। কাচ এঁটে বাইরের জানলা পাকাপোক্ত রকমে বন্ধ করা, উত্তাপ বেরিয়ে যেতে না পারে। পর্দা রয়েছে—আলো বন্ধ করতে চান তো পর্দা টেনে কাচ ঢেকে দিয়ে বসুন। জানলা দিয়ে আরামে বাইরেটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। ঠিক সামনেই পার্ক—ভোরোভিস্কি স্কোয়ার—সম্রাট প্রথম-নিকোলাসের মূর্তি পার্কের ভিতর। ঘোড়া পিছনের দু-পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারই উপরে সম্রাট—মূর্তির এই বিশেষত্ব। শহরের বড় এক কেন্দ্রস্থল—তিন-চারটে বড়রাস্তা বেরিয়েছে পার্কের এদিক-ওদিক থেকে। ডাইনে বিখ্যাত আইজ্যাক ক্যাথিড্রাল—সেন্ট আইজ্যাকের নামে উৎসর্গ-করা। চূড়া সোনায় মোড়া—

শোনা গেল, বহু পরিমাণ সোনা লেগেছিল সোনালি প্রলেপ দিতে। ভিতরটায় দামি পাথর বসানো, অজস্র আশ্চর্য শিল্পকর্ম। জার আর অ'াদরেল ব্যক্তিবর্গ ওখানে ঈশ্বর-ভজনায় আসতেন। এখন আর ভজন হয় না গির্জায়। মিউজিয়াম বানানো হয়েছিল, কৌতূহলী মানুষ ঘুরে ঘুরে সেকালের ধর্মীয় চিত্রাবলী দেখত। চূড়ায় উঠে শহর দেখত, দূরের ফিনল্যাণ্ড-উপসাগর অবধি নজর চলে এখান থেকে। ১৮১৮ থেকে ১৮৫৮ চল্লিশ বছর ধরে বানানো। ইদানীং নজর পড়ল, ইমারত মাটির তলে বসে যাচ্ছে ক্রমশ। আর বসলে ফেটে চৌচির হবে। সেটা বন্ধ করবার জন্ম ইঞ্জিনিয়াররা উঠে পড়ে লেগেছেন। আষ্টেপৃষ্ঠে ভারা বেঁধেছে।

ক্যাথিড্রালের উল্টো দিকে আর একটা স্কোয়ার। ১৮২৫-এর ডিসেম্বরে বিদ্রোহ হয়েছিল প্রথম-নিকোলাসের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহ দমন করা হয়। সেই স্মৃতিতে জায়গাটার নাম দেওয়া হল ডিসেম্বি_স্ট স্কোয়ার। পিটার-দ্য-গ্রেটের বিশাল বলদৃপ্ত মূর্তি এই স্কোয়ারের প্রান্তে—শহরের অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু। বিপ্লবের আমলে ক্ষিপ্ত জনতা অনেক জারের মূর্তি গু'ড়ো গু'ড়ো করে দিয়েছে, কিন্তু পিটার-দ্য-গ্রেটের দিকে রোষদৃষ্টিতে তাকায় নি কেউ কোনদিন। দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের সময় মূর্তিটা সন্তর্পণে ঢেকে দিয়েছিল, বোমা তাক করতে না পারে ওর উপর। পাথর কাটা হয়েছে সমুদ্রের মতন তরঙ্গিত করে, এটা রাশিয়ার প্রতীক। সেই পাথরের উপর অশ্বারূঢ় পিটার। পায়ের নিচে দীর্ঘ এক সাপ পেঁচিয়ে আছে। শত্রুকুল বিমর্দিত, সাপ দিয়ে ইঙ্গিত করেছে।

আর একটু এগিয়ে তরঙ্গিণী নেভা। বিশাল নদী—শহরকে শতেক পাকে ঘুরছে। বাংলাদেশের খরস্রোতা নদীগুলোর সঙ্গে ভারি মিল। ফিনল্যাণ্ড-উপসাগরের মুখে দুর্গম জঙ্গল ও জলা-জায়গা ছিল সুইডেনের অধীন। প্রথম-পিটার জায়গাটা রাশিয়ার দখলে নিয়ে এসে শহরের পত্তন করলেন। সারা রাশিয়ার সর্ব অঞ্চল থেকে, এবং বাইরে থেকেও অগণিত স্থপতি এনে জোটানো হল। পাথরের অজস্র অট্টালিকা উঠল দেখতে দেখতে। শুধু এই সেন্টপিটার্স বার্গ ছাড়া রাশিয়ার কোনখানে কেউ পাথরের ইমারত বানাতে পারবে না, এই হুকুম দেওয়া হল। নেভা ফিন-উপসাগরে পড়েছে, সেই মোহনার উপর একশ'টা দ্বীপ নিয়ে শহর। কিন্তু দ্বীপ বলে আজকে চিনতে পারছেন না—তিনশ-ষাটটা পুলে এপারে-ওপারে এমনি ভাবে বেঁধে দিয়েছে। নেভা ছাড়াও আটাশটা খাল শহরের নানা দিকে। খাল এবং নেভার দুই তীরে জলের কোল ছুঁয়ে নিটোল পিচের রাস্তা; কোথাও বা জলের মধ্যেই নেমে গিয়েছে রাস্তার কিনারা। উল্টো দিকে সারবন্দি অট্টালিকা। আপনার মনে হবে, গোড়া

বাড়ানোর জন্তেই বুঝি রাস্তার পাশে মানান করে খাল কেটে জল নিয়ে এসেছে। একটা পুলের নাম হল চুম্বনের সাঁকো (Bridge of Kisses)। একটেরে নিরিবিলি জায়গা, আমাদের বাপ-ঠাকুরদা'র আমলের প্রণয়ীরাও ঐ পুলের উপর এবং আশেপাশে গাছপালার নিচে ঘোরাঘুরি করে গেছেন। অতি-বড় ভারিক্কি মানুষেরও এখানে এসে মন চনমনিয়ে ওঠে।

জারের শীতপ্রাসাদের উল্টো পারে নেভার কূলে অরোরা ক্রুজার নোঙর করা রয়েছে। জাহাজের কামানগুলো শীতের সন্ধ্যায় আগাগোড়া কাপড় মুড়ি দিয়ে একটু মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখছে আমাদের। নিশ্বাস নেবার মতো যৎসামান্ত হিসহিস আওয়াজ; অল্পসল্প পাতলা রকমের ধোঁয়াও উড়ছে একটা পাইপের মুখে। অত বড় প্রাণীটা আলস্তে বসে বসে চুরুট টানছে, এমনি এক ছবি মনে আসে। ব্যাপার সত্যি তাই। এখন কাজকর্ম নেই ক্রুজারের—অনেক খাটনি ও বিস্তর যশোলাভের পরে বুড়া বয়সে নদীকূলে বসে বসে অবসর ভোগ করে। একটা ইস্কুল অদূরে নেভার উপরেই—সেখানকার ছেলেরা মাঝে মাঝে এসে কলকজা টিপে দেখে, জাহাজি ব্যাপারের আন্দাজ দেবার জন্ত অল্পসল্প যন্ত্র চালানো হয়। বাচ্চাদের সঙ্গে মহামান্ত প্রবীণের যৎকিঞ্চিৎ কৌতুক করার মতো। ১৯০৩ অব্দে তৈরি—১৯০৪ অব্দের রুশ-জাপান যুদ্ধে খুব খেটেছিল এই ক্রুজার। ইজ্জত কিন্তু সেজন্তে নয়। ১৯১৭ অব্দে অরোরা ক্রুজার বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলে নেভা নদীর উপর থেকে জারের উইণ্টারপ্যালেসের দিকে সর্বপ্রথম গোলা ছুঁড়েছিল। সেদিনের বিপ্লবীদের দেশজোড়া যেমন খাতির, এই ক্রুজারেরও তেমনি।

একটা পার্ক—নাম বলল 'পার্ক অব মার্স' (Park of Mars)। অদূরে নানান রঙের গম্বুজওয়ালা বাড়ি। 'রক্তের উপর মন্দির' (Temple on Blood) বাড়িটার নাম। জার প্রথম-নিকোলাসকে হত্যা করেছিল, সেই হত্যাভূমির উপর বানানো। নেভার তীরবর্তী বহুবিস্তীর্ণ বাগান, বার্চ ও আপেলগাছ অজস্র। পাতা নেই অনেক গাছের, অনেকের পাতা লাল হয়ে গেছে। সেই বাগানের ভিতর ছবির মতন টালি-ছাওয়া ছোট্ট এক বাড়ি। বাড়ির পিছন দিকে নেভা থেকে বেরিয়ে-আসা খাল বয়ে যাচ্ছে। বাড়িটা হল পিটার-দ্য-গ্রেটের গ্রীষ্মপ্রাসাদ।

শহরের কয়েকটা পাড়ার উপর দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে এসে গাড়ি একটা গলির মাথায় মিনিট খানেক ধরে হাঁপাল। স্মোলনি-গৃহাবলী—ঐতিহাসিক জায়গা, বিপ্লবের প্রধান অফিস ছিল এখানে। ঐ বাড়ির একটা খোপে লেনিন তখন থাকতেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, পরে এক সময় ভাল করে দেখা যাবে। ওখান থেকে এসে নামলাম পায়োনিয়র কেন্দ্র-ভবনে।

ডিরেক্টর মানুষটি ভারি রসিক। কথায় কথায় হাসি-রহস্য। শিশু ও কিশোরদের মধ্যে থেকে থেকে নিজের বয়স ভুলে বসে আছেন। যুদ্ধের সময় লেনিনগ্রাড ন'শ দিন আটক ছিল—অর্থাৎ তিন বছরের কাছাকাছি। চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছিল—একটি মাছি-মশার সেঁধোবার জো ছিল না। প্লেনে করে শহরের রসদ আসত। সেই অতি-বড় দুর্যোগের ভিতরেও একদিনের তরে এখানকার কাজকর্ম বন্ধ থাকেনি। এটা হল মূল-কেন্দ্র—শুধু এই শহরেই কুড়িটা শাখা।

বাড়ি ঢুকবার মুখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি। উঠানে সারের গাদা। ছেলেমেয়েরা কোদালি দিয়ে সার কেটে কেটে নিয়ে যাচ্ছে। নতুন বাগান হবে কোন দিকে, গাছপালা আর্জাবে। ঘিরে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করল ছেলেমেয়েরা।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাইরের খেলাধূলা নেই। নিয়ে গেল দাবা-খেলার ঘরে। ছকের পাশে স্টপ-ওয়াচ। এক একটা চালে কত সময় নেয়, রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। ঘরে ঘরে এমনি নানান খেলা—বুদ্ধির খেলা, ধৈর্যের খেলা, কৌতুকের খেলা। চিনামাটির রঙিন অতিকায় ব্যাং। আর একটা ঘরে রকমারি গাছাপালা; ঘরের ছাতে মেঘ-ভরা আকাশ আঁকা। ছাতের দিকে তাকিয়ে হাঁটুন একটু—কি আশ্চর্য, আকাশে মেঘ ভেসে যাচ্ছে আপনি পরিষ্কার দেখবেন। কাচে তৈরি বড় একটা জারের মতো। এখন কিছুই দেখছেন না—ঘোরাতে লাগুন, ভিতরে দেখবেন পুতুল, খেলনা ইত্যাদি।

ফুটবল খেলা হচ্ছে পুতুলদের। সুপারির মতো ছোট্ট বল—নিচের দিক থেকে সরিয়ে ঘুরিয়ে মারতে হবে। ডিরেক্টর মশায়ের সঙ্গে আমরাও বসে গেলাম খেলতে। আর একটা খেলা—বিড়াল-পুতুলের লেজে দূর থেকে আংটি পরানো। এমনি অনেক খেলা।

নানা দেশ থেকে উপহার গেছে, একটা ঘরে সেই সমস্ত সাজানো। ভারত থেকে গেছে ছবির এলবাম ও নানা ধরনের পুতুল। বাচ্চাদের-আঁকা ছবি এক ঘরে। আর এক ঘরে লাইব্রেরি—বইয়ের লেনদেন চলে।

রাজপ্রসাদ ছিল এটা—জার-পরিবারের একজন থাকতেন। প্রতিটি ঘরের কারুকার্য দেখে অবাক হবেন। নৃত্যশালা। কবি পুশকিনের নামে তাবৎ রাশিয়া মেতে যায়—তিনি কবে নেচেছিলেন নাকি এই নাচের ঘরে। দেয়ালের ধার দিয়ে সেই আমলের চেয়ারগুলো সাজানো, সাদা কাপড়ের ওয়াড়-দেওয়া। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে, ঠিক কোন জায়গাটায় নেচেছিলেন পুশকিন, কোন চেয়ারে তিনি বসেছিলেন? চেয়ারটা সঠিক মালুম না হওয়ায় সবগুলো চেয়ারেই তারা একটু একটু বসে নেয়।

একটা ঘরে নানারকম পাথর ও ধাতু। ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেশের নানা অঞ্চলে অভিযানে বেরোয়—সেই সময়ে তারা এমনি সব বস্তু কুড়িয়ে নিয়ে আসে। ঘরময় বিপুল সংগ্রহ। কাচের আলমারিতে থরে থরে সাজিয়ে রেখেছে—মাটির নিচে পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাদের দেশের কী অপরিমিত সম্পদ!

রূপকথার ঘরগুলোয় চলুন এবার। বড় বড় ঘর—দেয়াল-ছাত ও আসবাব-পত্রে চোখ-ধাঁধানো ছবির মেলা। পুশকিনের লেখা একটা পরীকাহিনী আঁকা। রাশিয়ার গালার কাজের খুব নাম—এক গোটা অঞ্চল নিয়ে লাক্ষা-শিল্পীরা থাকে। সেখান থেকে তারা এসে লাক্ষা-চিত্রণে ঘর ভরে দিয়ে গেছে। এই নিয়েই বা শিশুদের কত জিজ্ঞাসা! কত ডিম লেগেছিল আঁকতে? ডিরেক্টর মশায়েরও তেমনি জবাব: বাইশ হাজার। পুশকিনের ঘরের পাশে গোর্কির ঘর। গোর্কির লেখা একটা রূপকথার পরিচিত্রণ সেখানে।

ছেলেরা নিজ হাতে ছোট্ট ক্রেন বানিয়েছে, বিদ্যুতে চলে। নাগরদোলা—প্লাগ লাগিয়ে দিতে পুতুলরা নাগরদোলায় খুব উঠানামা করতে লাগল। এ সমস্ত শিশুরাই মাথা থেকে বের করেছে। রেলপথ বানিয়েছে—দুর্গম পাহাড় দিয়ে পথ, টানেল, পুল—সুইচ টিপে দিতে গড়গড় করে ট্রেন চলল। একটা কুকুর—লাল জিভ একবার মেলছে, মুখের ভিতরে জিভ নিয়ে নিচ্ছে আবার।

গেলাম ওদের কারখানা-ঘরে—যে জায়গায় ওরা এমনি সব বস্তু বানায়। ছুতোরখানা। কাঠ কেটে রেঁদা ঘষে ঘষে ছোট্ট ছেলেমেয়েরা নানান জিনিস গড়ছে। হাতে-কলমে জিনিস গড়ে স্ফূর্তি কত তাদের! আরও ক্রেন তৈরি হচ্ছে, দেখলাম, লোহার টুকরা জুড়ে জুড়ে। বয়স কত হে তোমার? ন-বছর। ইঞ্জিনিয়ার হবে তুমি? উঁহু, নাবিক হব। তবে এসব বানাচ্ছ কেন? বাঃ রে, ক্রেন না হলে জাহাজের মালপত্র উঠানো-নামানো হবে কি করে? তাই বটে, আমারই ভুল। মালপত্রের জন্য আরও কয়েকটা ক্রেন আগে বানিয়ে তাকের উপর তুলে রেখে দিয়েছে।

গেলাম কনসার্টের ঘরে। ছেলে-মেয়ে মিলে দিব্যি বাজনার দল হয়েছে। পরিচালক একটা ছেলে—বছর ষোল বয়স। চট করে একখানা গৎ শুনিয়ে দিল।

কনসার্টের পর নাচের ঘরে। মেয়েরা নাচল, এক শিক্ষিকা পিয়ানো বাজালেন। পুতুলের ঘরে—প্রতিটি পুতুল এরা নিজ হাতে গড়ে। ফি বছর রূপকথার এক একটি পালা ভেবে তদনুযায়ী পুতুল বানায়। পুতুলের মানুষ শুধু নয়, কুকুর খরগোস সজারু ব্যাং। পুতুল-ঘরের মাতব্বর একটা ছেলে—দিব্যি সে বুড়োমানুষের ঢঙে বক্তৃতা করে তাদের কাজকর্ম কিছু কিছু বুঝিয়ে

দিল। পুতুল নাচিয়ে দেখাবে এবার—যান, পুতুলের থিয়েটারে গিয়ে বসে পড়ুন। সময় নেই, কিন্তু হাত এড়ানো গেল না। তাড়াতাড়ি যা-হোক একটু দাও দেখিয়ে। মেয়ে-পুরুষে পলকা-নৃত্য। কুকুর-বিড়ালে প্রথমটা ঝগড়া, তারপরে যুগল-নৃত্য। ইউক্রেনের একটি লোকনৃত্য। একটা হাসি-হল্লোড়ের নাচ।

যে ছেলেমেয়েরা পর্দার আড়ালে থেকে নাচাচ্ছিল, তারা বেরিয়ে এলো হাতে পুতুল নিয়ে। ভারতের ছেলেমেয়েদের ভালবাসা জানাল। শিক্ষকরাও প্রীতি জানালেন ভারতে যাঁরা শিশুশিক্ষার ভার নিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশে।

গান্ধিজীর মূর্তি-আঁকা তিনটে মেডেল এবং অশোকচক্র-আঁকা একটা মেডেল কেন্দ্রভবনে দেওয়া হল—ভারতের প্রীতির উপহার।

॥ একুশ ॥

আস্তোরিয়া হোটেলের এক একটা পুরো ঘর দখল করে প্রতি জনে বাদশাহি করছি। উঁহু, মাঝখানটা দেয়াল-ঘেরা না হলেও ঘর দুটো বলতে হবে। একটায় শোওয়া, অপরটা দামী আসবাবপত্রে সাজানো বৈঠকখানা। আট-দশটা বন্ধু নিয়ে আরামসে এই বৈঠকখানায় ওঠাবসা করতে পারেন। হায় রে কপাল, একলা আমাকেই একটা মিনিট স্থির হয়ে বসতে দেয় না, তার আবার বন্ধুবান্ধব সহ গুলতানি! খাটের উপর সওয়া হাত উঁচু গদি—সে এমন বস্তু, বপুখানি তদুপরি নিক্ষেপ মাত্রেই গদিতে বিলীন হয়ে যায়। দুপুরের ভোজন শেষে শীতের মধ্যে দু-দণ্ড যে সেখানে গড়াগড়ি করব, কিছুতে তা হতে দেবে না হতভাগারা। ঠাসা প্রোগ্রাম।

সেকেলে বদ্ অভ্যাস আমার—সকাল সকাল উঠি। পাঁচটায় উঠে পড়ে মুখ-হাত ধুয়ে জানলার পর্দা সরিয়েছি—আরে সর্বনাশ, লেনিনগ্রাডে রাত দুপুর যে এখন! শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। শেষটা আর পেরে উঠিনে, পৌনে-ছ'টায় উঠে মরীয়া হয়ে টেবিলে গিয়ে বসলাম। প্রাণের সাড়া নেই কোন দিকে কোথাও। ভিজে রাস্তা—বৃষ্টি হয়ে গেছে রাত্রে, অথবা কুয়াশা থেকে জল জমেছে। রাস্তায় সারবন্দি উজ্জ্বল আলো অবাক হয়ে তাকাচ্ছে: কোন নিশাচর হে, ছ'টায় সময় উঠে টেবিলে কাজ করে!

সাতটা হল, আটটা হল। রাত পোহাবার লক্ষণ নেই। ভয় ধরে যাচ্ছে এবার, বিধাতার রবি-যন্ত্রটা বিগড়ে গেল না কি? ন'টা বাজলে তখন দেখি, ভোরের আলো ফুটি-ফুটি করছে। লোক-চলাচল হচ্ছে দু-পাঁচটি; ট্রলি-বাস

ও মোটরবাস চলছে। পার্কের মাঝখান দিয়ে মানুষ আড়াআড়ি পথ ভাঙছে। কিন্তু জমে ওঠেনি এখনো। নিতান্ত যাদের কাজের গরজ, তারাই বেরিয়েছে, গোটা শহর জাগতে দেরি আছে। তবু এ পুরো শীতকাল নয়, সবে অক্টোবরের তেসরা।

গ্রীষ্মের সময় আবার ঠিক উল্টো। দিনমান কিছুতেই নড়তে চায় না। আলো-ভরা রাত দশটায় দলবলসহ টহল দিয়ে বেড়াবেন। 'সাদা রাত' ওরা নাম দিয়েছে।

হারমিটেজ—এলাহি ব্যাপার, রাশিয়ার সব চেয়ে বড় মিউজিয়াম। লণ্ডনের ব্রিটিশ-মিউজিয়াম ও প্যারির লুভরে—তাদের কাছাকাছি। নেভার কূলে বিশাল প্রাসাদাবলী—আগে বলত উইন্টারপ্যালেস, শীতপ্রাসাদ। আঠারো শতকের মাঝামাঝি তৈরি (১৭৫৪-১৭৬২)। এখনকার নাম হয়েছে প্যালেস অব আর্ট, শিল্পপ্রাসাদ। এই প্রাসাদের লাগোয়া আরও সব প্রাসাদ গড়ে উঠেছে পরবর্তী কালে। হারমিটেজ এইখানে। এক হল থেকে আর এক হলে যাচ্ছে—নেভা চোখের সামনে আসছে বারম্বার। আর এক পাশে খাল—নেভা থেকে বেরিয়ে আঁকাবাঁকা পথে শহরের মধ্যে হারিয়ে গেছে। খাসা জায়গা।

একতলা দোতলা তিনতলা জুড়ে হলের পরে হল, আর গ্যালারি। গুণতিতে তিন-শ। হলগুলো ছুঁয়ে নামিয়ে যদি পাশাপাশি বসানো যায়, হিসাব করে দেখা হয়েছে, লম্বায় আড়াই মাইল যাবে। সোনালি কাজকর্ম। থামগুলো পুরো এক এক পাথর কেটে তৈরি। নগ্ন নারী ও পুরুষ মূর্তি—সেকালের বনেদি ধাঁচের গৃহ-সজ্জা। ঘরে ঘরে শিল্পবস্তু ভরতি—মোটামুটি দুই মিলিয়ন গুণতিতে।

প্রথম-পিটারের স্বর্ণখচিত গাড়ি। অতিকায় আলো। রাজকীয় সমারোহের নানা ছবি। সম্রাটের বিশাল ছবি। ফরাসি, ইতালীয়, ডাচ ও স্প্যানিস ছবি। আঠারো শতকের রুশীয় সংস্কৃতির নানা নিদর্শন।

বিপুলায়তন এক একটা ঘর শেষ করে করিডরে এসে পড়বেন। অপরূপ সাজানো। নেভা ঝিকমিক করছে ঐ। বসে একটু বিশ্রাম নিন, ধকল তো কম নয়।

রকমারি ঘড়ি—নানা যুগের, নানা প্যাটার্নের। গাছের ডালে মণিমাণিক্যের ময়ূর—ময়ূর কেমন পেখম দোলায় ঐ দেখুন। মোজেয়িকে বানানো ছবি—ছোট-বড় বিস্তর।

দোতলায় বাগান। ছাতের উপর সাত ফুট মাটি ফেলে তার উপর রকমারি

মুক্ত ও ফল লাগিয়েছে, ফোয়ারায় জল ঝরছে। নেভা নদী দেখুন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই স্বপ্নময় পরিবেশে।

সবুজ পাথরের বৃহৎ সেকেলে পাত্র। এই পাথর উরল পর্বত থেকে নিয়ে এসেছে। তের-চোদ্দ শতকের ইতালীয় শিল্পকর্ম, আসবাবপত্র, অগ্নি-আধার, বাক্স, দরজা। ফ্লোরেন্সের কাজ। চিনামাটির হরেক মূর্তি। বাইবেলের নানা ঘটনার ছবি। ইতালীয় শিল্পীর আঁকা যীশুর অনেক ছবি, যীশুর মৃত্যুর পর শোকদৃশ্য। লিওনার্ডো দা-ভিঞ্চির মূল ছবি দু-খানা। ভ্যাটিকানের যাবতীয় ছবির নকল—কাপড়ে আঁকা। রামায়ণের ছবির নকল। সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয়-ক্যাথারিন এই সমস্ত আঁকিয়েছিলেন। রাফায়েলের মূল ছবি—যোসেফ মেরী ও ছেলে; ডলফিন ও ঘুমন্ত ছেলে। মাইকেল এঞ্জেলোর মূর্তি। টিশিয়ানের ছবি—জীবন্ত, যেন কথা বলছে…

ভাগ্যে ছবিগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল লড়াইয়ের সময়। নয়তো কিছুই থাকত না। গ্যালারির উপরটা কাচে ঢাকা, ছবির উপর যাতে ঠিক মতো আলো এসে পড়ে। বোমা পড়ে উপরের কাচ চুরমার হয়ে আগুন ধরে গিয়েছিল। আবার সব ঠিক হয়েছে, বুঝতেই পারবেন না এখন।

এথেন্সের শিল্পীদের গড়া মূর্তি ও ছবি। পাথর কুঁদে কী সব অপূর্ব মূর্তি বের করেছে! সতের শতকের ফ্রেমিশ শিল্প। ভ্যানডাইকের আঁকা ছবি, ভ্যান-ডাইকের নিজের ছবি। একটা ছবি—মুমূর্ষু বন্দী-বাপকে মেয়ে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। কী সুন্দর!

রেমব্রান্টের পুরো একটা ঘর। তাঁর স্ত্রীর ছবি। যীশুর দেহ ক্রশ থেকে ঝুলছে। ম্যাডোনা। শিশু-যীশু অঘোর ঘুম ঘুমাচ্ছে। বাইবেলের সেই ছবি—বেহিসাবি ছেলে ফিরে আসছে। রেনোয়ার আঁকা ছবি। একটা ছবি সামনে গিয়ে দেখলে একেবারে ঝাপসা—কুয়াসায় আচ্ছন্ন। বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে তাকালে কুয়াশার আড়াল থেকে সেতু দেখা দেবে। সকল দেশের ছবি আছে, কেবল রুশীয় ছবি নেই—সে আছে পৃথক মিউজিয়ামে। ছবির অন্ত নেই—যত নাম-করা জিনিস জড়ো করেছে। মূল-ছবি না মিলল তো চেষ্টাচরিত্র করে নকল নিয়ে এসেছে।

নাইটদের বর্ম। একটার ওজন পঞ্চাশ পাউণ্ড—এই বস্তু গায়ে চড়িয়ে লড়াই করত। চাষী ও নাগরিকরা বিভিন্ন যুগে যে সব অস্ত্র ব্যবহার করেছে, তার অনেকগুলো। কচ্ছপের খোলার টেবিল। রুপার রকমারি মদ্যপাত্র। সিল্কের উপর সোনার তারে বাঁধা ছবি। ভলতেয়ারের মূর্তি—অবিকল বাঙালি টুলো-পণ্ডিতের মতো।

ভারতের শিল্পকর্ম একটা ঘরে। নানা রকমের কাপড়। আঠার শতকের অস্ত্রশস্ত্রের সংগ্রহ। এক ব্রিটিশ-মিউজিয়াম ছাড়া এ সব অস্ত্র কোথাও নেই।

রূপার কারুকর্ম-করা কফিন এক সেনাপতির স্মৃতিতে; তিন হাজার পাউণ্ড রূপা লেগেছিল। আঠারো শতকের ছাপাখানা। দরবার-ঘর, প্রথম-পিটারের সিংহাসন। পুরানো পতাকা, সে আমলের সৈন্যদের পোশাক। অভ্যর্থনা-ঘর—এই ঘরে শুধুমাত্র জার বসবেন, আর কেউ বসতে পাবে না; ছাত আর মেজে অবিকল এক রঙের। পাথরের টুকরোয় এক ম্যাপ বানিয়েছে ১৯৩৭ অব্দে। নানা রঙের পঁয়তাল্লিশ হাজার টুকরো পাথর লেগেছিল এই কাজে।

মণিমাণিক্যের ঘর। তিন হাজার বছর আগেকার গয়না—ককেশাস অঞ্চলে কবর খুঁড়ে পাওয়া। সোনার বল্লাহরিণ ও ঘোড়া—একটা নদীর পাড় ভাঙছিল, সেইখানে সমস্ত পেয়েছে। সাইবেরিয়া অঞ্চলের প্রাচীন অনেক গয়না—ক্রিমিয়ায় পাওয়া গেছে। হীরা-বাঁধানো ছড়ি, আংটি।

রুশ জাতটা ধরেই থিয়েটার-পাগলা। শহর যত ছোট হোক, থিয়েটার দুটো-চারটে থাকবেই। যে জায়গায় যাচ্ছি, নিতান্ত সময়ের অকুলান না পড়লে থিয়েটার-হল এক-নজর দেখাবেই।

এই দেশেরই লেবেদিয়েভ (গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদিয়েভ) বাংলা থিয়েটার করলেন কলকাতায় গিয়ে। সে কি আজকের কথা—২৭ নভেম্বর, ১৭৯৫। তারিখটা সোনার অক্ষরে লিখে রেখে দিন। তার আগে বাংলা নাটকের অভিনয় হয় নি। অন্তত পক্ষে পুথিপত্রে কোন রকম তার নিশানা পাইনে।

লেবেদিয়েভ বিস্তর কষ্ট করে বাংলা শিখলেন। বাংলা ভাষার একটা ব্যাকরণই লিখে ফেললেন—বাংলা শিখতে তাঁর মতন এত কষ্ট আর কারো যেন করতে না হয়। লণ্ডন শহরে যে রুশ-রাষ্ট্রদূত ছিল, তার কাছে চিঠি লিখছেন: অনেক যত্নে আমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কিছু কিছু শিখেছি। আমার এই সাধনার ফল স্বদেশে প্রচার করতে চাই। হিংসুটে ইংরেজ কিছুতে তা হতে দেবে না। যেমন করে পার, আমায় দেশে ফিরবার বন্দোবস্ত করে দাও।

ইংরেজের রাজত্ব—রাশিয়ার সঙ্গে রাজনীতিক সামাজিক কোন রকম সম্পর্ক ভারতের নেই। তবু ভালবেসে শিখে নিলেন তিনি বাংলা ভাষা। নাটকের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের কাব্যের আবৃত্তি করতেন সুর-লয় যোগে। রুশভাষায় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের তর্জমা করলেন। ইউরোপীয় ভাষায় বাংলা বইয়ের সেই সর্বপ্রথম তর্জমা। বাংলা অভিধান ও কথোপকথনের বই, বীজগণিত এবং

বাংলা পত্রিকার কিছু কিছু তর্জমা হল। সংস্কৃত, বাংলা ও মিশ্র হিন্দির সুভাষিতাবলীর অনেক তিনি সংগ্রহ করলেন।

যে বাংলা নাটক অভিনয় হয়, সেটা ডিসগাইজ (Disguise) নামক ইংরেজি কমেডির তর্জমা। লেবেদিয়েভ নিজে তর্জমা করেন। দুই রাত্রি অভিনয় হল —চার-শ লোকের মতন জায়গা, সেখানে তিলধারণের ঠাঁই নেই। বাঙালি অভিনেতা দিয়ে অভিনয় হল। পালার মধ্যে একটিও ইংরেজি কথা থাকতে দেওয়া হয়নি।

এই দেখুন, থিয়েটারের কথায় কথায় কতদূর এসে পড়লাম। আজ বিকালে নিয়ে চলল কিন্তু থিয়েটার-হলে নয়, যাঁরা সব একদা থিয়েটার করতেন তাঁদের বাড়িতে।

জায়গার ইংরেজি নাম—হাউস ফর ভেটারন থিয়েট্রিক্যাল আর্টিস্টস। কড়া বাংলায় ব্যাখ্যা করলে দাঁড়াচ্ছে : অবসরপ্রাপ্ত নাট্যশিল্পীদের আশ্রয়সদন। নেভার পুল পার হলাম। তারপর খালের পর খাল পার হয়ে শহরতলী-মুখো যাচ্ছি। খালধারে বিস্তর কাঠের গোলা। কলকাতার নিমতলা অঞ্চলে যেমন দেখতে পান। কাঠ সাজিয়ে পাহাড় বানিয়েছে। খালের জলে গাছের গুঁড়ি ভাসছে বিস্তর—জল থেকে এখনো ডাঙায় তোলা হয় নি। অনেক দূরের জঙ্গল থেকে গাছ কেটে নদী-খালে ভাসিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে আসে।

বিস্তর অলিগলি ঘুরে পুনশ্চ এক খাল পেয়ে গেলাম। খালের পাশে পাশে চলেছি। সূর্য আজ সারা দিন মুখ দেখান নি, দিনভর টিপটিপে বৃষ্টি। হঠাৎ চেপে এলো বৃষ্টিটা—মুষলধারে ঢালছে। তারই মধ্যে সেই খাল-ধারে আমাদের গাড়িগুলো থেমে দাঁড়ালো। জন কয়েক বুড়োথুথ্‌ড়ে মানুষ—তার মধ্যে মহিলাও আছেন—অবিরল ধারার মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজছেন। গাড়ি থামতে অদূরের বাড়ি থেকে আরও বিস্তর বেরিয়ে এলেন। হাত ধরে ধরে পরম সমাদরে সকলকে নামাচ্ছেন—শ্বশুরবাড়ি নতুন-জামাইরা এসে পৌঁছল যেন।

দোতলার হল-ঘরে নিয়ে বসাল। ওখানকার যত বাসিন্দা, কারো আসতে আর বাকি নেই। সবাই বুড়োবুড়ি, পলিতকেশ সকলের। ঘর বোঝাই সোফা-চেয়ার—তবু কম পড়ে যাচ্ছে। আমরা ওঁরা দু-তরফে মিলে গুণতিতে অনেক। তা দেখলাম, বুড়ো হলে কি হবে—গায়ে দস্তুরমতো তাগত আছে, এঘর ওঘর ছুটোছুটি করে সবাই চেয়ার টেনে নিয়ে আসছেন। থুনথুনে এক বুড়ো আবলুস কাঠের যে গন্ধমাদন অবলীলাক্রমে মাথায় বয়ে নিয়ে এলেন—হলপ করে বলছি, মুখে বলিরেখা, কোটরের ভিতরের চোখ, শনের মতন চুল—সমস্ত ছদ্মবেশ

ওঁদের। থিয়েটারে পঁচিশ বছরের ছোঁড়া পঁচাশি বছরের বুড়ো সেজে আসেন, তারই বিপরীত।

জমিয়ে তো বসা গেল। শুনছি এখানকার ব্যাপার। থিয়েটারের তিন গোত্র—অপেরা, ব্যালে ও ড্রামা। তারই কোনো এক গোত্রের মানুষ হওয়া চাই, তবে এখানে ঠাঁই মিলবে। এবং হবেন বুড়োমানুষ—মেয়ে হলে নেহাত পক্ষে পঞ্চাশ, পুরুষ হলে পঞ্চান্ন। তার আগে ঢোকবার এক্তিয়ার নেই। আমাদের দেশে নাক সিঁটকান—ঐ লোকটা থিয়েটার করত এক সময়, আজকে তার অবস্থা দেখ। এ দেশে ঠিক উল্টো রেওয়াজ—তাদের এক রকম মাথায় তুলে নাচায়। আহা, আমাদের কত সন্ধ্যা আনন্দে ভরে দিয়েছ, কত রসের জোগানদার! আজকে বয়স হয়ে অশক্ত হয়ে পড়েছ বলেই কি ভুলে যাব তোমাদের? জাত ধরেই কৃতজ্ঞ, সরকার মোটা পেনসন দেয়। এ কিন্তু আজকের সাম্যবাদী রাশিয়া বলে নয়—অনেক আগে জারের আমল থেকেই। যে হাউসে এসেছি, এর প্রতিষ্ঠা ১৮৯৮ অব্দে। এই থেকে বুঝতে পারছেন।

আত্মীয়জন তেমন যদি না থাকে, নাট্যশিল্পীরা এখানে এসে ওঠেন। ছেলেপুলের ঝামেলা না থাকলে অনেক স্বামী চলে আসেন স্ত্রীকে কাউস্বরূপ সঙ্গে নিয়ে। স্ত্রীরাও তেমনি আবার এসে ওঠেন নিজ নিজ স্বামী-পুঁটলি সহ। বেড়ে মজায় রয়েছেন—সেকালের সেই থিয়েটারি জীবনের মতোই। পায়ের উপর পা চাপিয়ে দিবারাত্রি বিশ্রাম-সুখ নিচ্ছেন, এমত বিবেচনা করবেন না। কেউ কেউ আত্মজীবনী লিখছেন—এই মোটা হিজিবিজি খাতা দেখিয়ে দিলেন। ওর মধ্যে নানান খবর থিয়েটার-জগতের—বিস্তর গুহ্যকথা ও তত্ত্বকথা। চলতি থিয়েটারের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে কারো কারো—অভিনয় করেন না, নতুন আমলের অভিনেতাদের অভিনয় শেখান, বিবিধ উপদেশ ছাড়েন। প্রাপ্তি কিছুই নয়—বিনি-মাইনে আপ-খোরাকি।

হাউস চালানোর সমস্ত রকম দায় এঁদের। সরকার শুধুমাত্র টাকা দিয়ে খালাস। অশন আর বসন হলেই হবে না—এতে মানুষ বাঁচে না, বিশেষ এই সব শিল্পীমানুষ। বিরাট লাইব্রেরি আছে, চুপচাপ পড়াশুনো করো বসে বসে। আছে রকমারি বাদ্যযন্ত্র, সোরগোল করে যত খুশি বাজাও—অনেকখানি জায়গা নিয়ে কম্পাউণ্ড, পাড়ার লোকের তেড়ে এসে পড়বার শঙ্কা নেই। দেয়াল ছবিতে ছবিতে ঠাসা। মেঝের উপর এঁরা সব জমিয়ে বসেন—আর দেয়ালে এঁদের মাথার কাছে আগের অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং সুরকাররা, আজকে যাঁরা জীবন্ত নেই।

পুরানো প্রতিষ্ঠান—আগেই শুনিয়ে দিয়েছি। সৈবনা (Saibna) নামে

এক অভিনেত্রী সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে এই আশ্রয়-সদনের পত্তন করেন। বুড়ো হলে নটনটীর আর কদর থাকে না, কষ্টে পড়ে যায়। বুড়ো-থুখ্‌ড়েকে কে স্টেজের উপর দেখতে চায়? গলাও থাকে না তখন। তার জন্ত এক সমিতি গড়া হল—নটনটীর অধিকার-রক্ষা সমিতি। শিল্পীরা বুড়ো বয়সে যাতে নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে পারে, সেই হল সমিতির কাজ। এই কাজে জনসাধারণ দু-হাতে টাকা দিল। বিপ্লবের পরে আর কোন ঝামেলা রইল না, কাউকে এখন টাকা দিতে হয় না। স্টেট সমস্ত ভার বইছে। স্টেট বলতে পুলিশে-ঘেরা বিশেষ কয়েকটা অট্টালিকার জন কয়েক মানুষ ব্যক্তি নয়—স্টেট মানে জনসাধারণ। জনসাধারণ তাদের স্টেটের মারফতে এই সদন চালাচ্ছে। চালাচ্ছে রাজস্ব প্রণালীতে। লেনিনগ্রাডের এই হাউসে এখন এক-শ পঁচাত্তর জন আছেন, তন্মধ্যে এক-শ'র উপর মেয়ে। প্রায় প্রমীলা-রাজ্য বানিয়ে ফেলেছে। তবে লোলচর্মা শুভ্রদেহা প্রমীলারা—এইটে বড় চোখে লাগে।

থিয়েটার-শিল্পীর আশ্রয়-সদন এই একটি মাত্র নয়, মস্কোতেও আছে। আর থিয়েটারের মানুষ বলে নয়—বুড়োমানুষের আশ্রয়-সদন সোবিয়েত দেশময় ছড়ানো। কতক আছে পেশা হিসাবে আলাদা করা—এই একটায় যেমন এসেছি। আবার সাধারণ সদনও বিস্তর আছে—যে কোন বুড়োবুড়ি গিয়ে উঠতে পারেন। এতে কুলায় না—নতুন নতুন সদন দিনকে-দিন বাড়ানো হচ্ছে।

সেকালের নাম-করা ব্যালেরিনা নাম-করা গায়ক কত জনের সঙ্গে আলাপ হল। লাখ লাখ মানুষ একদা পাগল হত তাঁদের নামে। আজকে নির্জন অন্তহীন অবসর—পাদপ্রদীপের আলো জ্বলে না, নামই জানে না নতুন কালের যারা থিয়েটার যায়। টুংটাং পিয়ানো বাজিয়ে সেকালের এক-আধ কলি হঠাৎ গেয়ে ওঠেন কখনোসখনো—দেয়ালে ছাতে একটুকু রণিত হয়ে মিলিয়ে যায়।

এক ভদ্রলোক একেবারে নতুন এসেছেন। দস্তুরমতো সচ্ছল অবস্থা—এখানে আসবার মতন নয়। ছিলেনও এতদিন বাড়িতে। কিন্তু বিষম একঘেয়ে লাগছিল, টিকতে পারলেন না, সমস্ত ছেড়েছুড়ে দলের মাঝখানে চলে এসেছেন। বললেন, দিনরাত স্বপ্নের মধ্যে রয়েছি যেন মশায়। আমোদ-উৎসব রোজই কিছু না কিছু আছে। মরার কথা আর মনে আসে না। কিন্তু আমার মতো লোককে এখানে কায়েমি হয়ে থাকতে দেবে না, দু-দশ দিন পরে বিদায় করে দেবে। ঐ একটা ভাবনায় বড় মুসড়ে আছি, অন্ত কিছু মনে আসে না।

কত দূর থেকে গিয়েছি আমরা, কত কি দেখাবার আছে! তাই নিয়ে দুঃখ করছেন। বৃষ্টি আর দিন পেলো না, আজই চেপে পড়েছে। আপনাদের এর মধ্যে কেমন করে বের করি বলুন তো?

তবু ছাড়লেন না শেষ পর্যন্ত। ওই আদি-বাড়ির পাশে অনেকটা জায়গা নিয়ে নতুন বাড়ি। জল ছপছপ করে সেখানে পাকড়াও করে নিয়ে চললেন।

নতুন বাড়ি ঢুকে চোখে আর পলক পড়ে না। রাজ-অট্টালিকা। পার্ক লেক ফুলবাগান—যত রকমে সাজানো যায়, খুঁত রাখে নি। দেয়ালে দেয়ালে সোনালি কারুকর্ম। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে ভাস্করের পাকা হাতের নানা মূর্তি। এ-ব্লক ও-ব্লক ঘিরে টানা-বারাণ্ডা চলে গেছে। বারাণ্ডার লাগোয়া ঘর। উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখতে পাচ্ছি—ঘরে ঘরে রেডিও, খাটপালঙ্ক, ছবিতে ছবিতে ছয়লাপ। যারা পঙ্গু ও ব্যাধিগ্রস্ত, তাদের জন্ত আলাদা জায়গা এই নতুন বাড়িতে ; সকলের সঙ্গে একত্রে থাকতে দেয় না। নিচের তলায় ডাক্তারখানা হাসপাতাল। চিকিৎসা বাবদে এক পা বাইরে যেতে হয় না। এক বাড়ির ভিতরে সমস্ত।

চা-টা খেয়ে যাবেন কিন্তু আপনারা। উঁহু, ঘাড় নাড়লে ছাড়ছিনে। আপনাদের ভারতের কথা কত শুনেছি! ছবিও দেখেছি। গাছপালায় সবুজ শান্তস্নিগ্ধ এক আশ্চর্য রোমান্টিক দেশ। আমাদের কত পালার মধ্যে ভারতের নাম এসেছে কতবার। এক মহিলা বললেন, যৌবন বয়স থেকে আমার বড় সাধ রহস্যময় বিচিত্র ভারতবর্ষ দেখে আসব। সে তো হবে না আর জীবনে—আপনাদের কাছে বসে গল্পগুজব করে সেই সাধ মেটাই আজ খানিকটা। পালাতে দেব না কিছুতেই।

কি বলবেন আর এর পরে? এরই মধ্যে ঐ আদি-বাড়ির খানাঘরে টেবিল সাজানো হয়ে গেছে। রাক্ষুসে আয়োজন—দেখে আঁৎকে উঠতে হয়। ধরে ধরে নিয়ে বসিয়ে দিল। কতই তো নিমন্ত্রণ খেয়েছি, কিন্তু মৃত্যুর দরজায়-দাঁড়ানো রূপশিল্পীদের এই সমাদর অন্য কোথায় পাব? ভারতের সিনেমা-দল—যাঁদের দেখা আগে পেয়েছেন—এই লেনিনগ্রাডেও তাঁরা ইতিমধ্যে ঘুরে গেছেন। সেই গল্প উঠল। ভারতের ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল, এঁদের অনেকে দেখে এসেছেন গিয়ে। সৌরকরোজ্জ্বল ভারতের রূপ দেখে এলেন ছবির ভিতরে। ভারতের সুখসৌভাগ্য কামনা করে ভারতের বন্ধুত্ব স্মরণ করে পাত্রের পর পাত্র চলল। ও রসে বঞ্চিত আমরা ক'টি গোবিন্দদাস—ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি।

খাওয়া অন্তে হুল্লোড় লেগে গেল। এ বলে, এদিকে আসুন, ও বলে, ওদিকে চলুন। যে যার ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখাবে। চুরাশি বছরের এক বুড়া ক-জনকে নিয়ে বসিয়ে বাক্স খুলে অতিকায় এলবাম বের করলেন। কিশোর বয়স থেকে কত পালায় কত রকম অভিনয় করে এসেছেন, সেই সব ছবি। আর

এক বুড়ি—বয়স সত্তরের নিচে হবে না, গাল ও চোখের নিচে চামড়া ঝুলে পড়েছে—হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে ঘরে নিয়ে দেয়ালে-টাঙানো মহিমান্বিত এক সম্রাজ্ঞীর ছবি দেখাচ্ছেন আমায়। দেখ, চিনতে পারছ? আমি—আমিই সাজতাম চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। স্তম্ভিত হয়ে যাই। ঢলঢল পরিপূর্ণ-যৌবনা কোন অপরূপার আশ্চর্য ছবি। ছবির মুখোমুখি বীভৎসদর্শন এই বৃদ্ধা। শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর সামনাসামনি যেন তুলনা করে দেখানো। একবার ছবির দিকে আর একবার ঐ বুড়ির মুখে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছি।

রাত্রিবেলা ডিনার সেরে নৃত্যনাট্য দেখতে গিয়েছি। পালা হল—লাল-পপি। ব্যালে ও প্যান্টোমাইন একসঙ্গে—অর্থাৎ নাচ আর মূক-অভিনয়। দৃশ্যপটের ভারি জাঁকজমক—নাচ দেখবেন কি, সিন দেখেই থ বনে যাবেন। ঘুরন্ত-মঞ্চ নয়—কিন্তু আলো আর পর্দা খেলিয়ে আশ্চর্য গতিবেগ আনে, মায়ারহস্য ঘনিয়ে তোলে।

আমেরিকা থেকে মালের জাহাজ এসেছে চীনের বন্দরে। কুলিরা মাল নামাচ্ছে, বড় কষ্ট তাদের। নানান দায়-দরকারে বিস্তর লোক জাহাজঘাটায় আনাগোনা করছে। ঘাটের এক দিকে ফলের দোকান। রিক্সা চেপে মালিক দেখা দিল। রিক্সাওয়ালা বকশিস চাইল তো লাথি। অন্ধকার হল স্টেজ, জালের এক পর্দা পড়ল। আলো জ্বললে দেখি, খুব নাচ ও আমোদস্ফূর্তি। আর পিছনে জালের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, ক্লান্ত কুলিরা জাহাজের মাল নামাচ্ছে। ছুটোছুটি, বিষম ব্যস্ততা সেদিকে।

নায়িকা সব চেয়ে ভাল নাচে। মালিক নাচের ভিতরেই হাত ধরে টেনে নিয়ে তাকে পাশে বসাল। জাহাজঘাটে বিষম গণ্ডগোল হঠাৎ। নাচের মেয়ে ছুটল সেদিকে। অন্ধকার।

জালের পর্দা নেই এবার, স্পষ্টাস্পষ্টি জাহাজঘাট। কুলি-সর্দার রুখে দাঁড়িয়েছে (সর্দার হল মাও-সে-তুঙের প্রতীক)। সৈন্যদল ছুটে এলো, কিন্তু জনতার রোষের সামনে উদ্যত বন্দুক সরিয়ে নেয় তারা। নায়িকা চলে এসেছে এই কুলিদের মধ্যে। নেচে নেচে তাঁদের মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফুল দিল মেয়েটাকে—লাল রঙের পপিফুল। জাহাজের লোকেরাও নাচে এসে যোগ দেয়।

ক্লাসিক্যালের সঙ্গে আধুনিক নাচ মিলিয়ে দিয়েছে। পালা শেষ হলেও লোকে ছাড়বে না—উঠে দাঁড়িয়ে কেবলই হাততালি। পাগল হয়ে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে—পর্দা সরিয়ে শিল্পীদের বারম্বার বেরিয়ে আসতে হয়।

॥ বাইশ ॥

জালিয়ানওয়ালাবাগে এক সন্ধ্যায় মগ্ন হয়ে বসে ছিলাম। বুলেটের ক্ষত দেয়ালে দেয়ালে, গাছের গুঁড়িতে—সেগুলো যত্ন করে রেখেছে। আর সেই কুয়া—যার মধ্যে আতঙ্কিত শত শত মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবু বাঁচে নি।

জারের প্রাসাদ-অঙ্গনে ঘুরতে ঘুরতে জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা মনে এসে যায়। ১৯০৫-এর রক্তাক্ত-রবিবার। জারের কাছে দরখাস্ত নিয়ে এলো বিপুল জনতা। জারের দলেরই কেষ্টবিষ্টু একজন বুদ্ধি দিয়েছেন: সোজাসুজি চলে যাও, সুবিধে হবে। চলেছে তারা—হাতে আইকন, জারের ছবি। দয়ার প্রার্থী, অস্ত্রহীন, অসহায়—তাদের উপর রাইফেলের আগুন। জারতন্ত্রের সমাধি রচিত হল সেই রবিবার। একটা মেয়ে, কারেলিনা, চেঁচাচ্ছে—স্ত্রীরা-মায়েরা নিষেধ কোরো না তোমাদের স্বামী-ছেলেদের। জীবন দিক তারা মহৎ কাজে। কেঁদো না, গিয়েই থাকে যদি কারও জীবন। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, আছি—এই যে আছি আমরা। এক হাজারের বেশি মানুষ ঐ উঠানে পড়ে গেল। কত বাচ্চা, কত মেয়েলোক তার ভিতরে।

ঘুরতে ঘুরতে অনেক বেলা হয়ে গেল। হোক—বেলা না হলে য়্যুনিভার্সিটি খোলে না। গলির মোড়ে এক ভিখারি দেখলাম। এদিক-ওদিক তাকায়, আর ভিক্ষা চায়। ভিক্ষাবৃত্তি কিন্তু আইনে মানা, পুলিশে দেখলে ধরে নিয়ে যাবে। সোবিয়েত রাজ্যে মোটমাট দেড়জন ভিখারি চোখে পড়েছে আমার। এই একটি, আর মস্কোর রাস্তায় ময়লা ছেঁড়া-কাপড়ে হঠাৎ একজন সামনে এসে চক্ষের পলকে আবার উধাও হয়ে গেল। সেই লোকের সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ বললেন, ভিখারিই বটে, পুলিশের আঁচ পেয়ে ভেগে পড়ল। মতান্তরে, সেকেলে বুড়ো মানুষ—বিদেশিদের দেখে কৌতূহল ভরে একটুকু দেখে নিল। এমব্যাসিতে গল্পে গল্পে একদিন তুলেছিলাম কথাটা। তোমরা কি বলো?—হতে পারে ভিখারি। ভিখারি কেন, পকেটমারও আছে। মেয়েদের হাতের ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়—এমনও ধরা পড়েছে। আইন থাকলে কি হবে, আইন ফাঁকি দেবার মানুষ-ও থাকে। বয়স হয়ে গিয়ে পেনশন পাচ্ছে, আয় কম হয়ে গেছে—আর মদ খাওয়াটা বড্ড চালু এদেশে, হয়তো বা পেনশনের টাকা ফুঁকে দিয়ে অন্ধকার দেখছে। তখন আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না

লেনিনগ্রাড য়্যুনিভার্সিটি আমার বড় আপন মনে হল। বিশেষ করে প্রাচ্যবিদ্যা-অনুশীলনের যে বিভাগ আছে। কোথায় আমার বাংলাদেশ, আর কোথায় এই ফিনল্যাণ্ড-উপসাগরের উপান্তে প্রাচীন বিদ্যামন্দির! টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে, নেভার জোলো হাওয়া গা কেটে কেটে যেন হাড়ের ভিতর অবধি শীত বসিয়ে দিচ্ছে। কোন-কিছুতে কাতর নই। বড় বড় হল আর করিডরের ভিতর ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছি।

ভারতের আধুনিক ভাষার মধ্যে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, মারাঠি ও পাঞ্জাবি—পাঁচটা ভাষা পড়ানো হয়। প্রাচীন ভাষার মধ্যে পালি প্রাকৃত ও সংস্কৃত। ভারতের বাইরের চীন, আরব, তুর্ক, ইরান, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি স্থানের ভাষা।

ভারতীয় ভাষার মধ্যে, যতদূর খবর পাই, সকলের আগে এবং সব চেয়ে দরদের সঙ্গে শিখতে শুরু করে বাংলা। বাংলার সে প্রভাব নেই এখন, মিইয়ে আসছে—হিন্দি-উর্দুর উপরে জোর। হিন্দির শিরে রাষ্ট্রভাষার পাগড়ি—হবেই তো! এই য়্যুনিভার্সিটির ডক্টর বরন্নিকভ মহাভারত ও তুলসীদাসের রামায়ণের রুশীয় অনুবাদ করেছেন। আরও বিস্তর সাহিত্যকীর্তি আছে তাঁর। বৃদ্ধ অধ্যাপক গত হয়েছেন, ছেলে বরন্নিকভ ইদানীং উর্দু-হিন্দির অধ্যাপক।

প্রাচ্য ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা ভেরা নভিকভা—মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, আর দশটা রুশ-মেয়ের মতো সাজসজ্জায় একেবারে উদাসীন। বাংলা শেখানোর ভার তাঁর উপরে। বাংলা ছাড়া পাঞ্জাবির ভারও তাঁর উপর। এবং আরও কি কি—সঠিক মনে পড়ছে না। পাঁচ বছরের কোর্স—তারপরে ডিগ্রি দেওয়া হয়। ডিগ্রি নিয়ে কাজকর্মে চলে যায়—শত শত মিউজিয়াম আছে, তাদের প্রাচ্য বিভাগে; প্রাচ্যের নানা দূতাবাসে; বিভিন্ন লাইব্রেরিতে; একাডেমি অব সায়েন্সের কাজে। সরকারের প্রাচ্য-পুস্তক প্রকাশন বিভাগ আছে, তার জন্যেও বহু লোকের দরকার। পাশ-টাশ করে প্রাচ্য ব্যাপারের গবেষণা করে অনেকে; নানা সাময়িক পত্রে সেসব ছাপা হয়।

নভিকভা নিজে দশ বছর ধরে বাংলা শিখেছেন। শিক্ষক দাউদ আলি দত্ত, অথবা প্রমথনাথ দত্ত—যাঁর কথা আগে কিছু পেয়েছেন। কলকাতার এক দুঃসাহসিক ছেলে, ১৯০৫ অব্দে বেরিয়ে পড়েন—বিদেশি শক্তির সঙ্গে যোগসাজস করে যদি ইংরেজ তাড়ানো যায়। কত দেশে ঘুরলেন, তুর্কি-রেজিমেন্টে ঢুকলেন মুসলমানি নাম দাউদ আলি নিয়ে। ফ্রান্স ও ইউরোপের আরও নানা তল্লাট ঘুরে অবশেষে রাশিয়ায়। রাজনীতি ছেড়ে শেষটা মহত্তর কাজে নামলেন—বাংলা শেখানো, মস্কো য়্যুনিভার্সিটিতে বাংলার অধ্যাপক হলেন। রুশ মেয়ে

বিয়ে করলেন—তিনি হলেন বীণা দত্ত কিম্বা নুরজাহান দত্ত, স্বামীকে যেমন যেমন প্রমথ অথবা দাউদ আলি বলবেন। দাউদ আলি ১৯৫৩ অব্দে দেহ রেখেছেন। তাঁর শিষ্যা নভিকভা। গুরুর নামে শ্রদ্ধায় নভিকভার মুখ জলজল করে উঠল। পুরানো কথা বলতে লাগলেন। আমার পোয়া-বারো। বাংলার শিক্ষিকা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ওঁর জীবন-সাধনা—আর আমি হলাম বাংলার পিশাভিয়েল, তদুপরি গুরুর জাতভাই বাঙালি। দৈবাৎ তাঁর মুঠোর মধ্যে এক কোহিনুর ছিটকে এসে পড়েছে, এমনি গতিক। কি ভাবে সমাদর দেখাবেন, ভেবে পান না। আর যাঁরা এসেছেন, তাঁরা সবাই ছড়িয়ে গেলেন অন্য লোকের ভাঁবে ; নভিকভা আমায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, যত কথাবার্তা আমারই সঙ্গে। লেনিন এই য়্যুনিভার্সিটির ছাত্র, এইখানটায় বসে কাজ করতেন—এমনি সব স্মরণীয় জায়গা দেখে দেখে বেড়াচ্ছি।

আমার ছ-খানা বই নিয়ে এসেছি, সওকা বুঝে হাতে দিলাম। প্রাচ্য গ্রন্থাগারে থাকবে অন্যান্য বাংলা বইয়ের সঙ্গে। কতবার কত রকমে যে নাড়াচাড়া করলেন! এত বই—তবু বইয়ের কাঙাল এঁরা।

ইতিহাসের ছাত্র হীরেন মুখুজ্জে মশায়। কথা তুললেন, ভারতের ইতিহাস কি ভাবে পড়ানো হয় সোবিয়েতে, কি রকম ভাষ্য হয়েছে এ দেশে ভারত-ইতিহাসের? ইতিহাস নিয়ে বড্ড ঝোঁক পড়েছে ইদানীং—সম্প্রতি প্রাচ্য ইতিহাস ছাপা হয়ে গেছে। মুখে কি জবাব দেবেন, সেই বইয়ে সব পাওয়া যাবে।

অধ্যাপক ডক্টর কালিনিয়ভ এসে পড়লেন, ইতিহাসের আলোচনা আর এগুতে পারল না। সংস্কৃতে সম্ভাষণ করলেন আমাদের সকলকে, ঝরঝর করে সংস্কৃত বলে যাচ্ছেন। ভারতের মানুষ—অতএব দেবভাষা-বিশেষ ভাবে রপ্ত, এইটে ধরে নিয়েছেন অধ্যাপক। আমাদের ঘাম দেখা দিয়েছে, সংস্কৃতে জবাব দিতে হলে তো গেছি একেবারে! মাথায় অল্প টাক, সদাপ্রসন্ন রসিক সুপুরুষ—গোটা রামায়ণখানার তর্জমা করেছেন সংস্কৃত থেকে রুশভাষায়। এমন দিক্‌পাল পণ্ডিত—চালচলনে বুঝবার জো নেই। সাহেব হলে কি হবে, সংস্কৃত পড়ে পড়ে টুলো-পণ্ডিত বনে গেছেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভাবসাব হয়েছিল কেম্‌ব্রিজের এক ভাষাতাত্ত্বিক সমাবেশে। সুনীতিকুমারের কাছে কালিনিয়ভ শ্লোক লিখে দিয়েছিলেন—ভারত-সোবিয়েত-মৈত্রী এবং বিশ্বশান্তির নামে এক পান-প্রস্তাব :

মৈত্রায় ভারতবর্ষ-সোবিয়েৎ ভুম্যোরনক্ষায়।
পাত্রমুথাপয়াম্যহং শান্ত্যর্থং সর্বভুবনে॥

সুনীতিকুমার পাল্টা শ্লোক ছাড়লেন :

শ্রীকল্যাণ-বিবর্ধনং শ্রেয়সঃ সাধনং তথা।
যদৈব কাময়ে হৃহং রুবীয়াণাং শ্রবশ্চ বৈ॥

['কল্যাণ' কথাটার সাধারণ অর্থ তো আছেই ; আবার কালিনিয়ত কল্যাণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। 'শ্রবঃ' হল গৌরব ; এবং স্লাভজাতিও। 'স্লাভার' অর্থ হল গৌরবময় জাত।]

শ্লোক দুটো আমার কাছে ছিল। শোনালাম। কালিনিয়ভ বললেন, শ্লোকের উৎস শুকিয়ে যায়নি আমার। দাও খাতা, তোমায় একটা বানিয়ে দিচ্ছি। আমার খাতায় নিজের হাতে দেবনাগরি হরফে লিখে দিলেন নতুন শ্লোক :

মৈত্রং চেদমবিচ্ছেদ্যং প্রজানামাবয়োর্মহৎ।
জীবতু জনতাভূত্যৈ জয়তু শাশ্বতী সমাঃ॥

(কল্যানোভ, লেনিনগ্রাডে)

ভারতীয় ভাষায় লায়েক হওয়া চাট্টি কথা নয়। হিন্দি উর্দু ও বাংলা ভাষার ইতিহাস তো জানবেনই, ভারত সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানও চাই মোটামুটি। ভারতের ইতিহাস শিখতে হবে—প্রাচীনকাল থেকে এই হাল আমল। ব্যাকরণ শিখতে হবে। কোনটা যে শিখবেন না, তা জানিনে। আচার্য বরন্নিকভ এই লম্বা-চওড়া সিলেবাস্ বানিয়ে গেছেন।

নভিকভা বলে যাচ্ছেন : ফার্স্ট ইয়ারে হল বক্তৃতা শোনা ও দরকার মতো নোট নেওয়া। ভারতবর্ষ দেশটা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে যা-কিছু জ্ঞাতব্য সেই সম্বন্ধে, এবং ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে বক্তৃতা হয়। সেকেণ্ড ইয়ার থেকে বই। বই দু-রকমের। এক হল, ওরা নিজেরাই নানা লেখার সঙ্কলন বের করেছে, আর হল, সেই সেই ভাষার মূল-বই। হিন্দিতে প্রেমচন্দ সুদর্শন এঁদের মূল-বই পড়ানো হয় ; বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। উর্দু ছাত্রেরা কিষাণচন্দরের বইও পড়ে। (এসব বলছি উনিশ-শ চুয়ান্নর খবর। এর পরে কি রদবদল হয়েছে জানিনে।)

বললাম, বাংলা ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মোলাকাত করব। চল।

নভিকভা চুকচুক করেন : তাই তো, খবরবাদ না দিয়ে এসে পড়লে। ক্লাস তিনটেয়। একটুকু খবর পেলে তারা সব ছুটে আসত। তিনটে অবধি থাকা চলে না তো তোমাদের!

তা কেমন করে ? বাইরে দুর্যোগ—মেঘভরা আকাশ, টিপটিপে বৃষ্টি, ঝোড়ো বাতাসে ঢেউ দিয়েছে নেভার জলে। দুপুরের খানাপিনা হয় নি। তা হলেও

আমি থেকে যেতে রাজি। কিন্তু অন্য সবাই? বাংলা নিয়ে কী তাঁদের মাথা-ব্যথা বলুন।

য়্যুনিভার্সিটি জায়গা—হুড়ুম-দাড়াম অবিরত বক্তৃতার বোমা ফাটে। কিছু খেল না দেখিয়ে আমাদেরও ছাড়ান নেই। বেলা হয়ে গেছে যে! তা হোক তা হোক, সংক্ষেপে দু-চার কথায় সারবেন। বক্তৃতা শুনে শুনে এরা যেন ক্ষেপে রয়েছে। যে আসে তাকে ধরবে, লাগাও বক্তৃতা। এবং কান উঁচিয়ে টপাটপ বসে পড়বে।

অগত্যা আমরাও ঠাঁই নিলাম সামনাসামনি। প্রথম হীরেন মুখুজ্জে মশায়। এ মানুষ দাঁড়ালে বুকের ছাতি ফুলে ওঠে। বক্তৃতা নয়, ঝিকমিকিয়ে কথার তারা কাটে যেন।

—হাল আমলের ভারতীয় লেখক বলতে আপনারা মুলুকরাজ আনন্দ, ভবানী ভট্টাচার্য, আব্বাস—এমনি ক'জনকে জেনে বসে আছেন। যে হেতু লেখেন এঁরা ইংরেজিতে। কিন্তু আসল সৃষ্টিই তো মূল-ভাষায়। সেই যথার্থ আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ নেই। ভারত-সোবিয়েত সংস্কৃতির মধুবন্ধনে বাঁধা পড়বে প্রধানত সাহিত্যের মারফতে। অতএব আপনারা একটু-খানি তলিয়ে ভারতের সাহিত্য-মণিরত্নের সন্ধান নিন।

একটু ভিন্ন কথা বলে নিতে হয় যে! হীরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার গূঢ়তত্ত্ব বুঝবেন তা হলে। খেটেখুটে ওঁরা এক সঙ্কলন-বই বের করেছেন—ভারত ও পাকিস্তানের গল্প। তাতে ওঁরাই সব জমিয়ে আছেন—ঐ মুলুকরাজ ইত্যাদি। কারো কারো গল্প চারটে পাঁচটা। বাংলা ছোটগল্প আজকে ভুবনের যে-কোন সাহিত্যের সামনে বুক ঠুকে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু বাংলা গল্প একটিও নয়, বাঙালীর লেখা গল্প সাকুল্যে একটি মাত্র স্থান পেয়েছে। ভবানী ভট্টাচার্যের গল্প। সেই কথা আমিও তুলেছিলাম মস্কোর সোবিয়েত লেখক-সমিতিতে। ওঁরাও সায় দেন: কি করা যায় বলুন। আমরা তো চাই ভাল ভাল লেখা—সঙ্কলনটা যাতে যথাযথ হয়। কিন্তু খবর জানিনে, অনুবাদের মাধ্যমে হালের বাংলা লেখা আমাদের সামনে বিশেষ আসে না। (১৯৫৪ অব্দের এই অবস্থা। তার পরে অবস্থা কতটা পালটেছে জানিনে।)

ব্যাপার তাই। বাংলার লেখকরা আত্মতুষ্ট—বাইরে হৈ-চৈ করবার তাগত নেই। রুচিতেও বাধে হয়তো। নানান দেশ ঘুরে বুঝে এলাম রবীন্দ্রনাথের প্রভাব—নিজে তিনি জগৎময় ঘুরেছেন, বিদেশির অনুরাগ তার ফলে বেড়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরে কি হচ্ছে, কেউ বড় জানে না। (শরৎচন্দ্রকে না জানারই মতো)। বাংলা সাহিত্য নিজের ঘরে খিল এঁটে রইল, আজকের এই ছোট্ট দুনিয়ায় নড়েচড়ে বেড়ায় না।

হীরেন মুখুজ্জের পর আমাদের ভিতরকার উর্দুওয়ালা একজন উঠলেন। দোভাষি উঠে উর্দু থেকে রুশীয় তর্জমা করে দিল। তারপর হিন্দিতে বললেন একজন। তারও তর্জমা হল। এবারে পালা আমার। আমি লোকটা কম কিসে, স্বভাষা বাংলাতেই বলব। কিন্তু বাংলা দোভাষি নেই। অথচ ভারতীয় ভাষার মধ্যে ওদেশের মানুষ বাংলা শিখেছিল সকলের আগে, বাংলারই ছিল সকলের বড় খাতির। আজকের গতিক, অঞ্চল ঢুঁড়ে একটি বাংলা দোভাষি মেলে না। নভিকভা বললেন, আস্তে এবং খুব সহজ বাংলায় বলুন—দেখি আমি চেষ্টা করে।

সেই মনের ক্ষোভই আমি ব্যক্ত করছি: রবীন্দ্রনাথ অবধি মোটামুটি জানেন আপনারা। ১৯৩০ অব্দে তিনি এদেশে আসেন। আমরা, যারা সাহিত্য করি, তাঁরই মানস-সন্তান—এ যুগে তাঁর প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের সেই ঘুরে যাবার পর তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি' পড়েই কৌতূহল আরও উদগ্র হয়েছে আপনাদের সম্পর্কে; সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোলবার লোভ বেড়েছে। ব্রিটিশ-আমলে হয়ে ওঠে নি, স্বাধীন গণতন্ত্রী ভারত এবারে সুযোগ-সুবিধা করে দিচ্ছে। দুনিয়ার সঙ্গে আজ আমাদের শান্তি ও সৌভ্রাত্রের সম্পর্ক।

এই জেনে রাখুন, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা-সাহিত্য থেমে নেই। উজ্জ্বল ঐতিহ্যের অবমাননা হতে দিই নি আমরা। বলতে পারেন, কিঞ্চিৎ কূর্মবৃত্তি আমাদের—নিজের সাহিত্যবুদ্ধি ও সাহিত্যধর্মের মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতে ভালবাসি। খাটি সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করব। খান কয়েক বই দিয়ে যাচ্ছি, আরও পাঠাব। আমার স্বদেশের সাহিত্যিক বন্ধুরাও এগিয়ে আসবেন। ভোকস আমাদের দাওয়াত দিয়ে এনেছেন—ভরসা করি, সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনের ভার তাঁরাই নেবেন বিশেষ করে।

চটাপট হাততালি। ভিনদেশে এই এক সুবিধা—আগডম-বাগডম যা-ই বলি, হাততালিটা পাওয়া যায়। নভিকভা বই ক'খানা তুলে ধরেছেন। হাতে হাতে ঘুরছে। বাংলা জানেন না প্রায় কেউ, তবু উলটে-পালটে দেখেন। আমার লজ্জা লাগে সামান্য জিনিসে এমন হ্যাংলাপনা দেখে। নানান প্রশ্ন বইগুলো নিয়ে: বিষয়বস্তু কি? কভারের ছবির কোন অর্থ? নভিকভা বললেন, লিখে দিন—'লেনিনগ্রাড প্রাচ্য-গ্রন্থালয়কে উপহার দিলাম।' বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের হাতে লিখে-দেওয়া বই আছে। অনেক কাল পরে আবার এক বাংলা-লেখকের লিখে-দেওয়া বই গ্রন্থাগারে এলো।

লিখতে কিছু সময় লাগে, দলের অন্য সবাই ইত্যবসরে উঠে পড়েছেন। প্রাচ্য বিভাগে যাচ্ছি এবার। সে এক আলাদা বাড়ি। বিশাল করিডর পার

হয়ে যাচ্ছি। নভিকভা গাঁ ঘেঁসে মৃদুকণ্ঠে বাংলায় ইংরেজিতে আলাপ করতে করতে যাচ্ছেন। সত্যি, কতকালের পরমাত্মীয় আমরা যেন! এই প্রাচীন বিদ্যামন্দিরে কত কত মহামনীষী বৈজ্ঞানিক দেশনায়ক ছাত্রজীবনে পড়াশুনো করে গেছেন। দেয়ালের উপরে তাঁদের ছবি, দেয়ালে খোপ কেটে কেটে তাঁদের মূর্তি। আর, দেখুন, উচ্ছল আনন্দে কলহাস্যে একালের ছাত্রছাত্রী এঘরে-ওঘরে যাচ্ছে এই করিডরের ভিতর দিয়ে। একাল-সেকাল এক জায়গায় মিলেছি আমরা—মাথার উপরের ওঁরা নিঃশব্দ; নিচেকার এই জীবনচঞ্চল নতুন কালের ছেলেমেয়েদের উপর ওঁদের কৌতুক-প্রসন্ন আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে উপর থেকে। ঠিক সামনে মস্তবড় ছবি – পথ আটকে যায় আমাদের সেখানে। বুদ্ধি-প্রদীপ্ত এই কিশোর—মুখটা চেনা-চেনা লাগে। লেনিন। কিশোর বয়সে লেনিন এই য়ুনিভার্সিটিতে পড়ে এখান থেকে ডিপ্লোমা নিয়েছেন। তাই নিয়ে জাঁক করে এরা। জাঁক করবার মতোই বটে! এমন ছাত্র কোথায় মেলে—দেশের নতুন চেহারা এনে দিলেন যিনি, গোটা দুনিয়া নতুন আশায় মাতিয়ে তুললেন? পাশের এক ঘরে নিয়ে গেলেন—এইখান থেকে লেনিন ডিপ্লোমা হাতে করে নিয়েছিলেন। এক-শ পঁয়ত্রিশ বছরের লাইব্রেরি তখনই, সাড়ে-তিন মিলিয়ন বই —সেই বইয়ের সমুদ্রের মধ্যে কিশোর লেনিন ডুবে থাকতেন কত সময়।

রাস্তায় পড়েছি এবার। ফুরফুর করে বরফের গুঁড়ি ঝরছে। জোর-পায়ে আর এক বাড়ি উঠে পড়লাম। য়ুনিভার্সিটিরই এক বিভাগ—প্রাচ্য বিদ্যাগার ও গ্রন্থালয়। একটি মেয়ে গ্রন্থাগার থেকে বাংলা স্বর্ণলতা নিয়ে বেরুচ্ছে। সঙ্গে আর একটি। আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ায়। নভিকভা বললেন, এই যে— ফিফথ ইয়ারের দুটো মেয়ে এরা। বাংলা-ক্লাসের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করতে চাচ্ছিলে—এখন ক্লাস নেই, কপাল গুণে তবু এসে পড়েছে এরা। বয়স কি-ই বা, বিশ-বাইশ। উজ্জ্বল ঝলমলে চেহারা—একটির তো বিশেষ করে।

বাংলায় নাম লেখো আমার এই খাতায়—

লিখল, ইরা সেভতোভিদভা—। লিখতে লিখতে ফিক করে হেসে বলে, নামের শেষটা ভারি কঠিন—কি বলেন? শেষটুকু ইংরেজিতে লিখে দিল আগের লেখার নিচে—Svetovidova। আবার ঐ কটোমটো কথাটার বাংলা (বা সংস্কৃত) করে পুরো নাম বলল, ইরা শ্বেত-দর্শনা। অপর মেয়েটা ইরার চেয়ে ঢ্যাঙা —এমন ছটফটে নয়, স্থির-শান্ত, লাজুক ধরনের হাসি হাসে একটুখানি মুখ নিচু করে। নাম লিখল—এলেনা স্মির্নোভা। কড়া যুক্তাক্ষরের বানান—এই কলম তুলে আমারও ভাবতে হল—এলেনা ঝড়াক করে লিখে দিল বাংলায়।

তারিফ করছি : বাঃ, খাসা হাতের লেখা তোমাদের। লেখক মানুষ আমি, দিনরাতই কলম পিষি, আমি কিন্তু এমন পারিনে।

লেখক—কি নাম ?

নভিকভা নাম বলে দিলেন। ভ্রূ কুঁচকে মেয়ে দুটি ভাবছে। ভেবে মানিক হদিস পাবে না, তোমাদের জ্ঞানের চৌহদ্দির ভিতরে আমি নেই।

বললাম, খানকয়েক বাংলা বই দিয়ে যাচ্ছি তোমাদের। আরও সব ভারতে গিয়ে পাঠিয়ে দেব।

এলেনা বলে, আমাদের পত্র দিবেন, বঙ্গভাষায় লিখিবেন।

ঠিক দেবো। তোমরা জবাব দেবে তো ?

নিশ্চয় দিব। বঙ্গভাষায় উত্তর দিব, দেখিতে পাইবেন।

কিন্তু সে দেখা হয়ে ওঠেনি। যেহেতু আমিই লিখিনি চিঠি। বিলকুল ভুলে মেরেছি। খাতায় নোট করে এনেছিলাম—খাতা উল্টাতে উল্টাতে আজ মনে পড়ে গেল। এত দিন পরে এখন আর দেওয়া যায় না, কোথায় আছে কে জানে ? বিয়েথাওয়া করে সংসারধর্ম করছে হয় তো।

প্রাচ্য গ্রন্থাগার। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি, মুখোমুখি প্রায় সমান মাপের প্রেমচন্দ। আর আছেন আচার্য বররিকভ, ভারতের ভাষা-সাহিত্য নিয়ে যিনি জীবনপাত করলেন। ভারতের হরেক ভাষার বই আলমারির থাকে থাকে সাজানো। ভারতীয় নানা বইয়ের রুশীয় তর্জমা। অতিকায় রামায়ণ-মহাভারতের তর্জমা। কালিদাসের অনেক বই, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ও আরও একত্রিশখানা তর্জমা করে নিয়েছে। আরও অনেক, অনেক। গান্ধিজীর 'সত্যাগ্রহ সপ্তাহ' নামক চটি বই এবং 'রাজবিদ্রোহকা অভিযোগ'। বাংলা বই বড় কম। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজ-হাতে উপহারের বড়াই করে—বইটা নেড়েচেড়ে দেখছি—বিষবৃক্ষ, পঞ্চম সংস্করণ, ১২৯১ অব্দে ছাপা। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিতে লিখে উপহার দিয়েছেন, কিন্তু কাকে দেওয়া হল উল্লেখ নেই। মাইকেলের অনেক বই, তার মধ্যে দীননাথ সান্যাল সম্পাদিত সচিত্র মেঘনাদ বধ কাব্য। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ ও নৌকাডুবি।

সকলে ঘিরে এসে আলাপ করছে, ভাল ভাল কথা শোনাচ্ছে। ইরা-এলেনাও আছে, কিন্তু তারা ভিড়ের মধ্যে নেই। ঐ গোটা চারেক বাক্যেই চুকে গেল নাকি, লেখক সম্পর্কে যাবতীয় উৎসাহ উবে গেল ? বিষম দমে গেছি। দুই সখী মাথায় মাথায় এক হয়ে শলাপরামর্শ করছে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে, এক টুকরো কাগজ নিয়ে ইরা শশব্যস্তে কি-সব টুকে যাচ্ছে।

অবশেষে এগিয়ে এলো। ইরা বলে, সৌভাগ্যক্রমে আপনি এখানে শুভাগমন

করিয়াছেন। এই শব্দগুলির অর্থগ্রহণ করিতে পারি না, আপনার সাহায্য পাইলে আমরা পরম উপকৃত হইব।

কী কাণ্ড! কতকগুলো কথার বর্গ করেছে এতক্ষণ ধরে। এসে পড়েছি তো মাস্টারি করিয়ে নেবে। প্রথম কথাটা হল—'ভোটাভুটি'। বুঝিয়ে দিলাম—ভোট দেওয়া-দেয়ির ব্যাপার, ইংরেজিতে যাকে বলে ইলেকশন।

বিস্ময়ে ইয়ার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে: চমৎকার! ইংরেজি ভোট থেকে বাংলা কথা বানিয়ে নিয়েছেন?

হেঁ হেঁ মা-লক্ষ্মী, ক্ষমতা জান না তো আমাদের ভাষার। দুনিয়ার তাবৎ ভাষার উপর ছোঁ মেরে মেরে অমন বিস্তর কথা আমরা হজম করেছি।

তারপরের কথা—'পিটুনি'। কত রকমে চেষ্টা করছি, কিছুতে বুঝবে না। তবে তো ঘাড়টা নুইয়ে ধরে পিঠের উপর ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হয়। শেষটা তাই করলাম—সত্যি সত্যি নয়, আকারে-ইঙ্গিতে থিয়েটারের অভিনয়ের মতন করে। জন্মে পিটুনি খেলে না, বুঝবে কি করে আনন্দময়ীরা? স্ফূর্তি করে দেশবিদেশের ভাষা শিখছ, যে দিকে তাকাও ঝলমল করছে দুশ্চিন্তাহীন উল্লসিত জীবন।

পরের কথাটা হল 'সাগরেদ'। আরও সব অনেক। কী কষ্ট করে যে বাংলা শেখে! বাংলা শিখবেন তো ইংরেজিটা রপ্ত করে নেবেন আগে-ভাগে। বাংলা থেকে ইংরেজি দুটো অভিধান আছে—সুবল মিত্রের ও বেণীমাধব গাঙ্গুলির। বাংলা-শিক্ষার এই দুই হাতিয়ার। পড়তে পড়তে কোন কথা ঠেকে গেল তো অভিধান খুলে ইংরেজী প্রতিশব্দ দেখে নিন। তখনও না বোঝেন তো ইংরেজি-অভিধান খুলুন। হালফিল আমরা তো সব চলতি ভাষায় লিখছি—সে এমন, যে নিজের লেখা নিজেই কত সময় বুঝিনে। দু-খানি ভোঁতা হাতিয়ারের সম্বলে ঐ ব্যাসকূট ওরা ভেদ করবে কেমন করে? সামনে পেয়ে আমার তাই শরণ নিয়েছে।

কথার মানে হয়ে গেল তো উচ্চারণ। 'শ্যামা' 'ব্যথা' 'কৃষ্ণ'—বাংলায় ঠিক-ঠিক উচ্চারণ কি? সংস্কৃত কিম্বা হিন্দি উচ্চারণ নয়—বাংলা। এক একটা করে বলছি আমি, আর জিভের উপর ফেলে বার পাঁচ-সাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখস্থ করে নেয়। তার পরে ধরে বসল, রবীন্দ্রনাথের কথা বলে যান কিছু, তাঁর জীবন-সায়াহ্নের কথা। 'শেষের কবিতা'র পর কি কি বই লিখেছেন?

জোঁকের মতন ধরেছে, ছেড়ে দেবে না। না-না করে উঠি: দুপুর গড়িয়ে গেল, হলের সবাই বেরিয়ে পড়েছেন, চলে যাব এবার।

হাসেন কেন? যথার্থ বলছি, বিয়ে ধরা পড়ার আশঙ্কা নয়। হলের

লোকেরা সত্যি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এই সব বিদেশ জায়গায় ভয়টা কিসের ? রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভাষার পিশাতিয়েল আমি যখন—সরলমতি তরুণী দুটোকে যা বলব, সেই তো বেদবাক্য। 'শেষের কবিতার' পর রবীন্দ্রনাথ 'বউঠাকুরাণীর হাটে' হাত দিলেন—যদিস্যাৎ এমন কথাই বলি, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে আপত্তি করবে ? হাত এড়ানো গেল না, বলতেই হল কিছু। আহা, কী তদ্‌গত হয়ে শুনছে! শ্রদ্ধা-বিনত দৃষ্টি। আমার সেই অপরূপ ভাষণ কেউ যে আপনারা শুনলেন না! খুন করে ফেললেও আর বলছিনে. সে নিষ্ঠা কোথায় আপনাদের যে বলব ? হাসবেন, ভুল ধরবেন পদে পদে।

শহর ছেড়ে ছুটছি। পিচ-দেওয়া পথ—এমন মসৃণ, পায়ে হাঁটতে হলে পিছলে পড়ে যেতাম বোধহয়। শহরতলী পার হয়েছি। গ্রাম, কত গ্রাম। মাঠের পর মাঠ। কাঁকুরে পোড়োজমি। বড় জঙ্গল। পথ তবু ফুরোয় না। কতদূর রে বাপু ? ঘণ্টা দেড়েক হু-হু করে ছুটে—এইবারে বোধহয় পৌঁছে গেলাম।

গাঁয়ের নাম কোলতুশি। পাভলভ-নগরও বলে। বৈজ্ঞানিক পাভলভের সাধন-পীঠ পাভলভ-ইনস্টিট্যুট এখানে। সেই তীর্থে এসে পৌঁছলাম। বাড়ির সামনে পাভলভের বিশাল মূর্তি।

তাবৎ দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা পাভলভকে জানেন। আনাড়ি মানুষ আমি কি বোঝাতে যাব ? টুকেও আনি নি তেমন-কিছু। বিজ্ঞানে পাকাপোক্ত জন কয়েক আমাদের দলে—তাঁরা বলছেন, কিছু টুকতে হবে না মশায়, বাড়ি গিয়ে জলের মতন বুঝিয়ে দেব। অনেক খোশামোদ করেছি সেই মহাশয়দের, আজ দেব কাল দেব করে কাটিয়ে দিলেন।

বিপ্লবের উপর বিষম খাপ্পা ছিলেন পাভলভ। জারতন্ত্র খতম হলে রাগ করে তিনি ইংল্যাণ্ডে চলে গেলেন। গবেষণা সেখানে চলছে। এদিককার খানিকটা গুছিয়ে নিয়ে লেনিন তাঁকে আনবার জন্য লোক পাঠালেন। দেশের গৌরব অমন এক বৈজ্ঞানিক ভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকবেন, ব্রিটিশ জাত তাঁর গবেষণার ফলভোগী হবে—এমন হতে দেওয়া যায় না। পাঠালেন খুদ গোর্কিকে। পাভলভ যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করে ফিরিয়ে দিলেন তাঁকে। লেনিন দমলেন না। আবার লোক গেল: আপনি বিজ্ঞানের মানুষ—রাজনীতির ব্যাপারে যাচ্ছেতাই হোকগে, আপনার তাতে কি ? শহর থেকে দূরে নিরিবিলি গবেষণার সমস্ত রকম সুবিধা পাবেন। পছন্দ না হলে চলে আসবেন আবার।

এলেন পাভলভ। ব্যবস্থা দেখে খুশি হলেন। জীবন কাটিয়ে দিয়ে এখানেই

তিনি দেহ রেখেছেন। ভারি মনোরম জায়গা। ল্যাবরেটারি বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে উচ্ছল ঝরনা ঝরছে, উঁচু-নিচু জমি, ঘনশ্যাম গাছপালা—পাথুরে মানুষের মনেও কবিতা গুপগুপিয়ে ওঠে। এরই মধ্যে থেকে তপস্বী পাভলভ আজীবন বিজ্ঞান-সাধনা করে গেলেন।

দোতলায় উঠতে লেনিনের ছবি। ঘরে ঢুকে খুব বড় ছবি পাভলভের। অশীতিপর এক বৃদ্ধ—পাভলভের সাক্ষাৎ শিষ্য—এখানকার প্রধান। মোটামুটি একটু বোঝাছেন আমাদের—শরীর ও অভ্যাসতত্ত্ব সম্বন্ধে বলছেন। মীরা দোভাষিণী—তর্জমা ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ করে হেসে ফেলছে। থই পাচ্ছে না, এক রকম বোঝাতে গিয়ে অন্যরকম মানে দাঁড়াচ্ছে। বড্ড গোলমেলে ব্যাপার—স্পষ্টাস্পষ্টি বললও সেই কথা। বুড়া বৈজ্ঞানিক কিন্তু অবিচল—বলেই যাচ্ছেন তিনি। তাঁর কাছে জলের মতো তরল—অপরে কেন গুলিয়ে ফেলবে, তাঁর বোধশক্তি ধারণায় আসে না।

মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। ভিজতে ভিজতে ল্যাবরেটারি-বাড়ি গেলাম। দুর্গন্ধে তিষ্ঠানো যায় না নিচের তলায়। বোকা-ছাগল ভেড়া ইঁদুর ইত্যাদি জন্তু-জানোয়ার। এদের নিয়ে নানা রকমের গবেষণা চলে। ধুপধাপ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে বাঁচি। দু-একটা পরীক্ষা আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন। একটা কাঠের ফ্রেমে গোলকধাঁধার মতো নানা পথ। তার মধ্যে ইঁদুর ছেড়ে দেওয়া হল। ইঁদুরের গতিবিধির ছায়া পড়ছে একটা কাচের উপরে—সমস্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি। ঘণ্টার ক্ষীণ আওয়াজ—সঙ্গে সঙ্গে দেখি, মরীয়া হয়ে ইঁদুর ছুটল। কি কারণ? ইতিপূর্বে ইঁদুর দেখেছে, ঘণ্টা বাজবার এক সেকেণ্ড পরে ঐ জায়গায় বিদ্যুতের শক লাগে। ঠেকে শিখেছে, অতএব শব্দ হতে না হতে সে পালাল। সোজা পথে ছুটছিল—এক জায়গায় হঠাৎ সোজা পথ ছেড়ে এক পাশের বাঁকা পথে মোড় নিল। কেন? আর কয়েক ইঞ্চি সোজা পথে এগিয়ে দেখেছে, বিদ্যুতের শক লাগে। অতএব সে বাঁক ঘুরল, এক তিল দ্বিধা না করে।

কিন্তু লাভটা কি হল এত খরচপত্রের ল্যাবরেটারিতে এমনিতরো পরীক্ষায়? সাধারণ লোক আমরা—মোটা হিসাবটা বুঝিয়ে দিন। লাভ বিস্তর—মুরগি ডবল আণ্ডা পাড়ছে, গুটিপোকা অনেক বেশি রেশম বানাচ্ছে। মুরগির ব্যাপারটা শুনুন—

মুরগি একবার মাত্র ডিম পাড়ে রাত্রিবেলা। মোটামুটি বারো ঘণ্টার দিন, বারো ঘণ্টার রাত। ঘরের মধ্যে মুরগি রেখেছেন। ছ-ঘণ্টা দিনের মতো আলো দিয়ে কৃত্রিম দিনমান করুন। তার পরের ছ-ঘণ্টা অন্ধকার করে হোক

কৃত্রিম-রাত্রি। তার পরে আবার দিনমান, আবার রাত্রি। এক অহোরাত্রির মধ্যে দুটি রাত্রি বানানো হল—মুরগি বোকা বনে গিয়ে দু-বার ডিম পাড়ল। চলল এমনি। অভ্যাস শেষটা এমন পাকা হয়ে দাঁড়াল—আপনা হতেই দু-বার ডিম পাড়ে, আলোর ধাঁধা দেবার দরকার হয় না। ঐ মুরগির বংশের মধ্যেও দু-বার ডিম দেবার অভ্যাস বর্তে যাবে।

সন্ধ্যার পর শহরে ফিরে এলাম। সোজাসুজি হোটেলে নয়, অন্য এক জায়গা ঘুরে দেখে যাই। কিরোভ সংস্কৃতি-ভবন। মস্কোয় ফিরবার তাড়া—নবেম্বর-বিপ্লবের উৎসবের তিনটে দিন মাত্র বাকি। কাল রাত্রেই লেনিনগ্রাড ছাড়ছি, তার মধ্যে যতটা দেখে নেওয়া যায়। ছোটদের সংস্কৃতি-ভবন আগে দেখে এসেছেন, এটা হল বিশেষ করে বড়দের। বাচ্চাদের ব্যবস্থাও কিছু আছে এখানে, সেটা হল শিশু-বিভাগ। যে কোন পেশা হোক আপনার, যে ট্রেড-ইউনিয়নের লোক হন আপনি (সব রকম পেশারই ট্রেড-ইউনিয়ন আছে)—এখানে অবারিতদ্বার। আসুন, আমোদ-আহ্লাদ করুন, পড়াশুনো গান-বাজনা কলাচর্চা খেলাধুলা—যেমন অভিরুচি। রোজ হাজার পাঁচেক লোক আসে। ছুটির দিন হলে আট-ন'হাজার।

সাঁইত্রিশ বছর আগে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল এখানে—এই লেনিনগ্রাডে। সে আগুন—নজরে মালুম হোক আর নাই-হোক—বিশ্বের কোনখানে ছড়াতে আজ বাকি নেই। কর্মিক মানুষ খাটবে ও রোজগার করবে, শুধুমাত্র এই নয়—আনন্দ করবে তারা, সাংস্কৃতিক জীবনের ষোলআনা অধিকার তাদেরও। এমনি সব প্রতিষ্ঠান সেই জন্যে। এটা হল কর্মিক মাত্রেরই মেলামেশার জায়গা—ছাত্ররাও আসে। সাংস্কৃতিক কর্মিদের ট্রেড-ইউনিয়ন (Trade Union of Workers of Culture) নামে এক বিভাগ—ছাত্রেরা সেখানকার সভ্য। কুড়ি কোপেক, অথবা ছাত্র যে সরকারি বৃত্তি পায় তার এক শতক হল মাসিক চাঁদা। আর ঐ যে শিশু-বিভাগের কথা হল—শিশুদের কিছুই লাগে না, এমনি এসে জমে।

কিরভ নামে এক কর্মিক-নেতা নিহত হয়েছিলেন, তাঁর নামে প্রতিষ্ঠান। লেনিনগ্রাড-অবরোধের সময় এখানে হাসপাতাল হয়েছিল। হাসপাতালে বোমা মেরেছিল, আগুনে-বোমা—রোগিদের সরিয়ে ফেলতে হয়। লড়াইয়ের পর আগাগোড়া মেরামত করা হয়েছে।

কর্মিক-মানুষ যখন, নাচবে তো গেঁয়ো-নাচ, গাইবে তো গাঁয়ের গান—এমনি অবজ্ঞা পুষে রাখেন আপনারা। লোক-কলা অবহেলিত নয়, কিন্তু

ক্লাসিকাল অভিজাত কলারও পুরোপুরি চর্চা। নাটক করে নিজেরা—ভারি কদর থিয়েটারের। গোটা সোবিয়েত দেশ জুড়েই থিয়েটার-প্রীতি। টিকিট বিক্রি এজেন্টের মারফতে, সংস্কৃতি-ভবনে টিকিট কিনতে আসতে হবে না। কর্মিকদের ধারে দেওয়া হয় টিকিট। তিন মাস পরে শোধ করে। অপেরার দল আছে—বহু লোক অপেরার শিক্ষানবিশি করে, আঠেরো থেকে ষাট বয়সের সর্বশ্রেণীর লোক। জুলাই-আগস্টে দলে নতুন লোক নেওয়া হয়। যারা সক্ষম সমর্থ এবং গলায় যাদের সুর আছে, তারা দরখাস্ত করে। গত বছরের অপেরার পালা—কোয়ায়েট ফ্লোজ দ্য ডন (Quiet Flows the Don)। এমন অনেক আছে, গানের গ জানত না—পেশাদারের মতো এখন গান শিখে নিয়েছে। শেখানো হয় একেবারে মুফতে। লোকে টিকিট কেটে অপেরা দেখে, তাই থেকে খরচটা উঠে আসে। লাভ করা হয় না এক পয়সাও।

ব্যালের দল আছে, তার জন্যে টিকিট নেই। নাটুকে দল—একটা বড়দের একটা বাচ্চাদের। পুরানো ক্লাসিক নাটক এবং হাল আমলের সোবিয়েত নাটক —সব রকম অভিনয় করে। সোবিয়েতের নানা অঞ্চলের লোকনৃত্যের চর্চা হয়। লোকযন্ত্রের অর্কেস্ট্রা এবং নতুন আমলের আধুনিক অর্কেস্ট্রা। তরুণ ছেলেমেয়েরা সোবিয়েতের ও দেশবিদেশের সঙ্গীত শেখে, তার জন্য দরাজ-ব্যবস্থা।

লেকচার-হল। রাজনীতি অর্থনীতি শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত আন্তর্জাতিকতা—নানান বিষয়ে বক্তৃতা হয়। নামজাদা গুণী-জ্ঞানীরা এসে বলেন, লোকে ভিড় করে শোনে। খেলার বিভাগ—উঠোনে হুড়োহুড়ির খেলা, ভিতরে সময় কাটানোর খেলা। দাবার প্রতিযোগিতা হয়—সেটার খুব নাম। কলাচর্চার রকমারি ব্যবস্থা—দেড় হাজার লোক নিখরচায় নিয়মিত শিখে যায়। তরুণ-তরুণীদের জন্য নানারকম পার্টি ও অভিযানের ব্যবস্থা।

লাইব্রেরিতে নিয়ে গেল। চাঁদা লাগে না, সব রকমের বই আছে। একটু বক্তৃতা হল : আরও কয়েকটি ভারতীয় ডেলিগেশন এরই মধ্যে সম্বর্ধনা করেছি আমরা এই জায়গায়। ভারতকে আমরা ভালবাসি—ভারত শান্তি চায়, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কটা সেই জন্য বেশ ঘনিষ্ঠ। এই সামান্য প্রচেষ্টা দেখে যাচ্ছ, বোলো এর কথা দেশে ফিরে গিয়ে। আমাদের বক্তৃতার বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল—'ভারতের শান্তি-প্রচেষ্টা'।

মস্তবড় নৃত্যশালা, সাড়ে তিন-শ ফুট লম্বা। দু-শ মানুষ এক সঙ্গে নাচে। বলনাচ নাচছে ঐ দেখুন। ছেলেরা মেয়েরা তো বটেই, কিন্তু মেয়েয় মেয়েয় বেশি। এরা জুড়ি পায়নি, মেয়ের সংখ্যা অনেক বেশি—লড়াইয়ে বিস্তর ছেলে খতম হয়ে গেছে। ছেলেয় ছেলেয় নাচছে ওদিকে ক-জোড়া। আমরা ঢুকতেই

বাজনা থামল। যে যেমন ছিল, নাচ থামিয়ে দাঁড়াল। অভ্যর্থনা হবে একটুকু, তার পরে আবার নাচ। নাচবেন? আসুন না—দু-পা নেচে যান। না রে মাণিক—। মুহূর্তে আমরা কেটে পড়ি।

শখের ছবি আঁকা হচ্ছে একটা ঘরে। পটের মতো নিশ্চল একটি মেয়ে—তাকে দেখে দেখে ছোকরারা চতুর্দিকে ছবি আঁকছে। লোক-সঙ্গীতের ঘরে গেলাম। গান হচ্ছিল—বিপ্লবের আমলের এক লোক-গাথা। ছেলেমেয়েরা চেয়ার ছেড়ে দিল আমাদের জন্য। ইতালীয় লোক-সঙ্গীত চলল এর পরে। পুশকিনের গান গাইল এক ইঞ্জিনিয়ার-মেয়ে। এক বুড়ো কারিগর গান গাইলেন—মানে বুঝিনে, কিন্তু আমাদের দেশের মতোই কালোয়াতি গান।

॥ তেইশ ॥

সকালে বেরুলাম ফিনল্যাণ্ড-উপসাগর যেদিকটায়। শহরতলী। জলাজায়গা মাঝে মাঝে, সবুজ ক্ষেত, ফাঁকা ফাঁকা বাড়ি। দূর থেকে ঐ যেন পাহাড় বলে মালুম হচ্ছে।। না, পাহাড় নয়—খেলাধুলার স্টেডিয়াম। এ বস্তুও কিরভের নামে বানিয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। চোখ জুড়িয়ে যায়—আহা-হা, সীমাহীন সমুদ্র। ফিনল্যাণ্ড-উপসাগর। সবুজ দ্বীপ একটা—দ্বীপটা এদের নয়, ফিনল্যাণ্ডের এলাকায়। বড় রকমের একটা লাফ দিলেই তবে তো ফিনল্যাণ্ড গিয়ে পড়া যায়। আমার বাঁ-হাতের দিকে অনেকটা দূরে জাহাজ গাদাগাদি হয়ে ভাসছে। বন্দর। খাসা বেড়াবার জায়গা—ঘুরে ঘুরে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করছি। বসবার আসন থরে থরে নেমে গেছে ভিতর দিকে। সমতল কেন্দ্রভূমে খেলার জায়গা।

শহরে ফিরে মোটরগাড়ি ছেড়ে দিলাম। পায়ে না হাঁটলে মজা পাওয়া যায় না। এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় ঘুরি, দোকানে ঢুকে এটা-ওটা সওদা করি। যেখানে ঢুকি, সাড়া পড়ে যায়। মুখে না বলুক, চাউনিতে ঠাহর পাই। খাবার কিনে খাচ্ছে বহু লোক পথে দাঁড়িয়ে—আমার দেশে হামেশাই যেমন দেখতে পান। তাই দেখে এলাম, মানুষ সকল জায়গায় এক। সেই একদিন মস্কোয় দেখেছিলাম, গাড়িঘোড়া অগ্রাহ্য করে রাস্তা পার হয়ে মানুষ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। ব্যাপার কি—কোন সিনেমা-স্টার বেরিয়েছেন নাকি পথে। অতএব তুচ্ছ প্রাণ গাড়ির নিচে যায়ই যদি, কী করা যাবে! শুধু আমার দেশের মানুষকে মিছামিছি দোষেন আপনারা।

কেনাকাটায় কোট-প্যান্টলুনের বিশাল উদরগুলো ভর্তি। এ-রাস্তা ও-গলি ঘুরে ঘুরে হোটেলে ফিরলাম, বেশ দেরি হয়ে গেছে। নাকে-মুখে লাঞ্চ গুঁজে তক্ষুনি আবার কেউ কেউ বেরুবেন এদেশের আদালতে কি ধরনের বিচারকর্ম হয় দেখবার জন্ত।

কিছুদিন থেকে এক বিদেশি সাহেবকে দেখতে পাচ্ছি। মস্কোয় দেখেছি, তাসখন্দেও দেখেছি একবার। হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যেও নজরে পড়ে যাবে এমনি বেঢপ লম্বা। গুল্মরাজ্যে এক তালবৃক্ষ। সেই ভদ্রলোক আস্তোরিয়ায় এসে উঠেছেন। আমাদের দেশ এবং ব্রিটিশ-আমল হলে ভাবতাম, পুলিশের স্পাই পিছু নিয়েছে। ভদ্রলোক আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। তাকাতাকি এখন আর আমলের মধ্যে আনিনে। বিধাতাপুরুষ রূপ দিয়েছেন— কুচকুচে কালো রং, কালোবরণ চুল—অভাগা বর্ণহীন সাদা-চামড়ার দল দেখবেই তো তাকিয়ে তাকিয়ে। দেখে হিংসায় ফেটে মরবে।

লাউঞ্জে বসে ভদ্রলোক। হঠাৎ আজ কথা বলে উঠলেন, মাপ করবেন, আপনাকে এর আগে দেখেছি।

দুঃখিত, কিছুই আমি মনে করতে পারছিনে।

থাকেন কোথায় আপনি? কলকাতায়? তবে কলকাতায় দেখে থাকব।

আমি জানি, ভাঁওতা এটা। আলাপ জমানোর কায়দা। তর্ক না করে মেনে নিতে হয়। অযাচিতভাবে আত্ম-পরিচয় দিচ্ছে: ওয়াশিংটনে থাকি আমি। কারবার আছে। কংগ্রেসের মেম্বার। দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ানো নেশা বিশেষ। আমায় মশায় কেউ নেমন্তন্ন করেনি, গাঁটের পয়সায় এসেছি, পয়সা খরচ করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

থাকবেন কতদিন?

থাকবার জো আছে? ছ'টা মাস এ-রাজ্যে থাকলে ফতুর হয়ে যাব, ব্যবসা লাটে উঠবে। পরের আতিথ্যে আছেন—টের পান না, কী সাংঘাতিক খরচ এদেশে। এক্সচেঞ্জের চড়া হার—এমনি কায়দা করে রেখেছে, বিদেশের কেউ যত টাকাপয়সা নিয়ে আসুক কর্পূর হয়ে উবে যাবে।

আমরাও বুঝছি। অনেকেই আমরা ট্র্যাভেলারস-চেকে টাকা নিয়ে এসেছি এটা-ওটা কিনে নিয়ে যাব। দর শুনে আর কেনা যায় না। একজোড়া জুতো দেড় হাজার রুবল—হোন না আপনি রাজা রাজবল্লভ, ও-জুতোর একটা পাটিও তো পায়ে পরবার তাগত হবে না। অবশ্য রোজগার করলে পুষিয়ে যায়—এদের রোজগারও হাজারের মাপে। একটা ছোটগল্পের হাজার রুবল দক্ষিণা। অত ঘোরাঘুরির মধ্যেও বক্তৃতাদির ব্যাপারে সহস্রাধিক রোজগার হয়েছিল, দরাজ

হাতে সেই অর্থ ব্যয় করে এলাম। রূপকথায় সেই যে আছে, তোর বউ তোকে দিয়ে খাওয়ালাম এই আমার কলা!—সেই জিনিস আর কি!

কার্ল-মার্কস ফ্যাক্টরিতে গেলাম বিকাল বেলা। টিপটিপে বৃষ্টি—বছরের এই সময়টা লেনিনগ্রাড মুখ পুড়িয়ে থাকে। জারের আমলের ফ্যাক্টরি—নামটা শুধু পালটেছে—পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে। অনেকখানি জায়গা, অসংখ্য যন্ত্রপাতি। আগে খালি ছিট-কাপড় হত, এখন রেয়ন তৈরির বিরাট ব্যবস্থা করেছে। নতুন কয়েকটা যন্ত্র বানিয়েছেন এখানকার মিস্ত্রিরা—তার জন্য বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হয় তাদের।

বিদায় লেনিনগ্রাড! বিপ্লবের শতেক স্মৃতি যার সর্বত্র ছড়ানো! নিপীড়িত জনগণ নতুন আত্মবিশ্বাসে ফেটে পড়ল যেখানে। নতুন সমাজ-ব্যবস্থার সর্বপ্রথম পত্তন। রাত ১১-৪০-এর ট্রেনে চেপে মস্কো ফিরছি। বিশেষ ট্রেন দিয়েছে। স্প্রিঙের দরাজ ব্যবস্থায় ঝাঁকুনি একেবারে নেই। ট্রেনে যাচ্ছেন না তো—মনে হবে, কোন নবাব-বাদশার খুশমহলে আরামে গদিয়ান হয়ে আছেন। কাচের আঁটা-জানলার বাইরে তাকালে তখনই কেবল মালুম হবে, চলেছেন গাড়িতে। আমাদের ইতরসাধারণের জন্যে তো এই—পিতার উপরে আবার পিতামহ আছেন। দলের নেতা-উপনেতারা যে কামরায় যাচ্ছেন, সেখানে ঢুকে মনে হবে ইন্দ্রলোকের খানিকটা কেটে এনে ইঞ্জিনে জুড়ে দিয়েছে।

রেডিও শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকাল ঠিক আটটায় আবার রেডিও শুরু। কেমন করে থামানো যায়, রাতে কিছুতে ধরতে পারি নি। দিনমানে আধ-মিনিটের মধ্যে কায়দা পেয়ে গেলাম। নটা—দশটা। মস্কোয় পৌছতে আর পঞ্চাশ মিনিট। কুয়াশায় চারিদিক ভরে আছে। দিনমানে রোদ হয়, এবম্প্রকার ধারণা ভুলে গেছি ইদানীং। জলা জায়গা অনেক দূর ব্যাপ্ত। বড় জঙ্গল—অজস্র ঝাউগাছ। মাঠ আসছে মাঝে মাঝে—চষা-ক্ষেত। ক্ষেতের ধারে গ্রাম। সাদা ফুল যেন মুঠি মুঠি ছড়িয়ে দিয়েছে ক্ষেতের উপর। ফুল নয়—বরফ পড়ে আছে। মুরগির দল খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছে। সবুজ তৃণভূমি আসে হঠাৎ। ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে। হুশ-হুশ করে এক একটা স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে। প্লাটফরম বেশির ভাগ কাঠের উঁচু পাটাতনের উপর। অত্যন্ত নাবাল অঞ্চল, মালুম পাওয়া যাচ্ছে।

সেই হোটেল মেট্রোপোল। ঘর পাল্টে গেছে অনেকের, কপাল ক্রমে আমি পুরানো ঘর পেয়ে গেলাম। নিতান্ত নইলে নয় এমনি দু-চারটে জিনিস সঙ্গে

নিয়ে বেরিয়েছিলাম, বেশির ভাগ গাঁটরি-বাঁধা এখানে। গাঁটরি খুলে ছড়িয়ে আবার গৃহস্থালী জমিয়ে বসা গেল। কাল ৭ নভেম্বর—সারা সোবিয়েত-দেশ জুড়ে নভেম্বর-বিপ্লবের বার্ষিক উৎসব। আজকের দিনটুকু তা বলে বৃথা কাটাচ্ছি না—বিকালবেলা সিনেমা, রাত্রে পুতুল-নাচ। উৎসবের জন্য চতুর্দিকে সাজ-সাজ পড়ে গেছে, যাতায়াতের মুখে সেই সমস্ত দেখা যাবে।

সপ্তাহে সপ্তাহে একরকম চটি বই বেরোয়—মস্কো শহরের থিয়েটার ও সিনেমাগুলোয় কবে কোন পালা, ছাপা থাকে সেই বইয়ে। তাই থেকে বুঝে নেবেন; যে পালা দেখবার ইচ্ছা, যথাসময়ে সেখানে হাজিরা দিতে পারবেন। আমাদের যেখানে হাজির করল, সে-বাড়ির একতলায় দোতলায় দুটো সিনেমা-হল। নিচেরটা ছোটদের। ছোটদের পালা সেই মাত্র শেষ হয়েছে। সেই হলের ভিতর দিয়ে চললাম। শিশুরা হাততালি দিয়ে ঘোরতর খাতির জানাচ্ছে।

সিনেমা-ছবি চলে বটে রাশিয়ায়, তোড়জোড়ও বেশ, জনপ্রিয়ও; কিন্তু থিয়েটারের মতন নয়। ছায়ায় মন ভরে না, জীবন্ত মানুষজন দেখতে চায় মানুষে। আমার অন্তত এই ধারণা। ক্রাস (creche) আছে বাচ্চাদের জন্য। নানান রকম খেলনা। খেলাধুলায় ভুলিয়ে রাখবার জন্য নার্স মোতায়েন আছে। এইখানে বাচ্চা রেখে মায়েরা ছবি দেখতে গিয়ে বসেন। পালা ভেঙেছে, ঘরে যাবেন এইবার—কিন্তু মুশকিল, খেলা ছেড়ে ছেলে কিছুতে উঠবে না। কত রকমে মা লোভ দেখাচ্ছেন—বাড়িতে গিয়ে হেনো দেব তেনো দেব। বাচ্চা কানেও নেয় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই মজা দেখি ক্ষণকাল।

পুতুল-নাচ। আমেরিকায় সিনেমা-ছবি তোলার ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ। পুতুলের মুখে ভাববিকার নেই, কিন্তু তাড়িঘাড় অঙ্গ-চালনায় হুবহু জীবন্ত বানিয়ে তুলেছে। ডিরেক্টর ছবি তুলবেন। সেই ছবি চালান যাবে ইউরোপে। রেডিও শুনে বিষয়টা তাঁর মাথায় এসে গেল। টেলিফোনে তলব দিচ্ছেন সহকারীদের। সেক্রেটারি-মেয়েটা ঘুমুচ্ছিল—আলুথালু ভাবে ছুটে এসে টেলিফোন ধরল আধেক-বোজা চোখে। সেক্রেটারি খসখস করে নোট নিচ্ছে ডিরেক্টর যেমন যেমন বলছেন। মেয়েটার চোখের পাতা ঘন ঘন ওঠে পড়ে—ওটা মুদ্রাদোষ, অথবা ব্যাধি। এর পরে লোক-বাছাবাছি। নটনটীদের মাপজোপ হচ্ছে—ফিতে ধরে ডিরেক্টর পেট মাপছেন, বুক মাপছেন। নায়ক-নায়িকা বাছাই হয়ে গেল অবশেষে—নায়িকাকে খুদ প্রযোজক মশায় সঙ্গে নিয়ে এসে সুপারিশ করলেন। আর এক কুৎসিত পুরুষ—ভিলেন সাজবে সে। এদিককার এক রকম হয়ে গেল। তিনটে মেয়ে একসঙ্গে খটাখট টাইপ করে

যাচ্ছে—ডিরেক্টর বলে যাচ্ছেন। একজনকে বলছেন গল্প, একজনকে সংলাপ, আর একজনকে শট-ডিভিশনের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। এক সঙ্গে সমস্ত। গল্পটার নাম 'কারমেন'—ক্রেমলিন কথাটা চ্যাপ্টা চৌরস করে এই নাম দাঁড়াল।

শুটিং শুরু এবারে। নায়ক-নায়িকাকে চুম্বন করবে কিছু লম্বা সময় নিয়ে। গাছ থেকে টুপ করে ফুল ঝরে পড়বে, সেই সময়টা চুম্বনের ইতি। ফুল কখন পড়ে গেছে, ক্যামেরাম্যান ব্যস্ত হচ্ছে, এরা দু-জন কিছুতে মুখ ছাড়বে না। ডিরেক্টরের হুমকিতে শেষটা ছাড়াছাড়ি হল তো নায়িকা আয়নায় দেখে ক্ষেপে আগুন। মুখ ইনসিওর-করা, হাসির বিস্তর দাম, চুম্বন করতে গিয়ে দাঁত বসিয়েছে সেই মহা মূল্যবান মুখের উপর।···নায়িকা গান গাইবে—কি পরিমাণ দূর থেকে হলে কত টাকা, আগেভাগে তারও রেট বেঁধে কনট্রাক্ট পাকা করা আছে। গরুর প্রয়োজন সিনের মধ্যে। হন্তদন্ত হয়ে খবর দিল, গরু পাওয়া যাচ্ছে না। তবে লাগাও মহিষ। প্রযোজক এসে পড়ল এমনি সময়ে—এসব কিচ্ছু হচ্ছে না। কাগজপত্র দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল। যতদূর ছবি তোলা হয়েছে, সমস্ত বাতিল। গল্প গোড়া থেকে আবার সাজাতে হবে।

পুতুল-নাচ শেষ হলে যারা সব নাচাচ্ছিল, বাইরে এসে দাঁড়াল। পুতুলগুলো নেড়েচেড়ে দেখছি।

॥ চব্বিশ ॥

৭ নভেম্বর। বিপ্লবের স্মৃতি-উৎসব। এই বস্তু দেখবার জন্য আমরা পর্বত-মরু পার হয়ে এত আকাশ উড়ে এসেছি। লাল পতাকা আর কাস্তে-হাতুড়ির ছবিতে চারিদিক ঢেকে দিয়েছে। রাস্তার পাশে দুটো হাত দেয়ালও আজকের দিনে বোধকরি খালি পাবেন না।

রেড-স্কোয়ারে অনুষ্ঠান। আমাদের হোটেল-মেট্রোপোল থেকে দু-পায়ের পথ। হামেশাই যাই ও-দিকটায়, ক্রেমলিনের সামনে দিয়ে চক্কোর মেরে আসি। আজকে সে পথ বন্ধ। শহরের যাবতীয় মানুষ ঐ জায়গায় জমায়েত হবে, বাইরে থেকেও বিস্তর এসেছেন—যত্রতত্র হাঁটবার হুকুম নেই। গাড়ি তো চলবেই না।

ব্রেকফাস্ট তাড়াতাড়ি সারা হল। দোভাষি সবগুলো এসে জমেছে। হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে—কোন পথে কি ভাবে গিয়ে স্কোয়ারের কোন অংশে ঠাঁই নেবে, সেই সব ঠিকঠাক করছে নিজেদের মধ্যে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে যাব আমি;

নিচে অবশ্য আঁটোসাটো গরম কাপড় থাকবে। চীনের উৎসব-দিনে পিকিনে যেমনধারা পরেছিলাম। দোভাষিদের মধ্যে মীরা সকলের মাতব্বর। সে আড় হয়ে পড়ল: না, কক্ষনো নয়। মস্কো কী জায়গা, জান না। এই হিমের মধ্যে ফাঁকা রাস্তায় তিন-চার ঘণ্টা দাঁড়ালে নিউমোনিয়া সঙ্গে সঙ্গে। সে দায়িত্ব কে নিতে যাবে?

হাঁটছি মস্তবড় দল হয়ে। যেদিকে রেড-স্কোয়ার, তার ঠিক উল্টোমুখে নিয়ে চলল। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। রাজপথ ছেড়ে শেষটা গলিতে ঢুকি। অনেকক্ষণ এমনি এ-গলি সে-গলি করে হঠাৎ এক সময় দেখি, বেসিল-ক্যাথিড্রালের পিছন দিকে এসে পড়েছি। উৎসবের যাবতীয় মিছিল রেড-স্কোয়ার পার হয়ে এইখানে এসে ছড়িয়ে পড়বে।

লেনিন-মুসোলিয়ামের ডানদিকে ক্রেমলিনের দেয়াল ঘেঁসে গ্যালারি, সেইখানে আমাদের ঠাঁই। নানান দেশের বিস্তর মানুষ—রকমারি ভাষা ও বেশভূষা। সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে হবে। বসতে বাধা নেই, কিন্তু বসে পড়লে কিছুই নজরে আসে না। রেড-স্কোয়ারের ওপারে আমাদের ঠিক সামনাসামনি বিরাট অট্টালিকা—গুম, অর্থাৎ সববস্তুর সরকারি দোকান। বেসিল-ক্যাথিড্রালের উপরে মোভি-ক্যামেরা বসিয়েছে—মিছিল ঐমুখো যাবে, ওখান থেকে ছবি উঠবে ভাল। সুপ্রাচীন মৃত্যুবেদী আজ ফুল ও পতাকায় সাজানো—ফুলশয্যার পালঙ্কের মতো ঝলমল করছে। লোকারণ্য। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, শব্দসাড়া নেই। এই হাজার হাজার মানুষ ঠোঁটে যেন কুলুপ দিয়েছে। কয়েক দল সৈন্য গোর্কি রোডের দিক দিয়ে এসে বিপ্লব-মিউজিয়াম মুখো মার্চ করে চলে এল। তাদের পদ-দাপ ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে যায় ক্রমশ।

সময় হয়ে আসে। বসে ছিলাম, উদগ্র হয়ে সকলে উঠে দাঁড়াল। ক'টি বাচ্চা ছেলেমেয়ে এদিকে-ওদিকে—আপেল আর চকোলেট আমাদের হাতে গুঁজে গুঁজে দিচ্ছে। তারই ফোটো তুলছে নানান দল। ক্রেমলিনের ঘড়িতে সাড়ে-নটা। স্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে বাজনা ওঠে কোন দিকে। আর উল্লাস। নটা-পকার। দূর প্রান্ত থেকে আওয়াজ ভেসে আসে—মানে বুঝি না, গম্ভীর তীব্র তীক্ষ্ণ এক ধ্বনি। সেই আওয়াজ সারবন্দি সৈন্য-পুলিশের মুখে মুখে লম্বা হয়ে ছড়িয়ে গেল দূর-দূরান্তে।

ঠিক দশটা। কী আশ্চর্য, বাতাস উঠল এই সময়ে এক দমক, উপরে-নিচে দূরে-নিকটে পতপত করে নিশান উড়ল। লাখ লাখ লাল-পাখি পাখনা ঝেড়ে উঠেছে যেন। সাড়ে-দশটা ক্রেমলিনের ঘড়িতে। ব্যাণ্ড বেজে ওঠে। মিছিলের শুরু। সজ্জিত দু-খানা মোটরে দু-জন সকলের আগে। একটি হলেন

প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন; অপর জন মুস্কালিয়েভ্‌স্কো, মস্কো বিভাগীয় সৈন্যদলের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ। দলের পর দল সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে; গাড়ি ঘুরে ঘুরে যায় তাদের কাছে, গিয়ে অভিনন্দন জানায়। সৈন্যরাও আকাশ ফাটিয়ে পাল্টা জবাব দিচ্ছে।

নেতারা তারপর মুসোলিয়ামের ছাতে উঠে দাঁড়ালেন। বক্তৃতা হবে। সামনে দিয়ে মিছিল যাবে, সালাম নেবেন ওখান থেকে। এসে অবধি দেখছি, মুসোলিয়াম ঝাড়পোছ হচ্ছে, দেয়ালে নতুন করে রং ধরাচ্ছে। সমস্ত আজকের এই দিনটার জন্য। দুই দল ব্যাণ্ড মার্চ করে চলল রেড-স্কোয়ারের দু-পাশ দিয়ে। মচমচ মচমচ জুতো বাজিয়ে বিপ্লব-মিউজিয়ামের ওধারে গিয়ে তারা দাঁড়াল। সারা মাঠ নিস্তব্ধ ছিল, কলরোল ছাপিয়ে পড়ছে এখন।

অক্টোবর-বিপ্লবের সাঁইত্রিশ বছর পুরল (১৯৫৪)। সালতামামি বক্তৃতা হচ্ছে। কৃষিকর্মীদের জয়-জয়কার। বিস্তর পতিত জায়গা উদ্ধার হয়েছে, ধারণাতীত ফসল। কাজাক-গণতন্ত্র সকলের সেরা ফসল ফলিয়েছে এবার। বৈজ্ঞানিকরাও খুব কাজ করেছেন। জল ও স্থল-সৈন্য অনেক বাড়ানো হয়েছে। লড়াইয়ের সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি। দেশে দেশে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। গণতন্ত্রের শক্তি অনেক বেড়েছে এই এক বছরে। এশিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকা থেকে অনেকজন এসেছেন; এদেশ থেকেও অনেকে গিয়েছেন বাইরে। বিদেশি অতিথিরা জেনেবুঝে গিয়েছেন, সত্যিকার শান্তি-কামী আমরা। কিন্তু দুষ্ট লোকে এখনো লড়ায়ের পাঁয়তারা ভাঁজছে, তাদের সামলাবার জন্য প্রতিরক্ষার কড়া ব্যবস্থা করেছি। দেশব্যাপ্ত এই শান্তির পরিবেশে যে আঘাত হানবে, তার রক্ষা নেই। সেজন্যে তৈরি আমরা।

বক্তৃতা থামতেই বজ্রনির্ঘোষ। এক সঙ্গে অনেক কামান গর্জে উঠল ক্রেমলিনের ভিতর দিকে। কামান দেগে বক্তার অভিনন্দন। রেড-স্কোয়ারের চতুর্দিকে বড় বড় বাড়ি—কামানের আওয়াজ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার।

প্যারেড এবারে। পদাতিক-বাহিনী ওদের ওদিককার জনতা আড়াল করে ফেলেছে। চলছে তো চলছেই। বাহিনী বিপ্লব-মিউজিয়ামের পিছনে জমায়েত হয়ে আছে—মানুষের মহাসমুদ্র, এতদূর আগে ধারণায় আসেনি। খালি-হাতের মিছিল। এদের পরে তলোয়ারধারীরা। তারপরে এক পল্টন এলো, বন্দুক কাঁধে ফেলে তাঁরা চলেছে। পরের দলের বন্দুক আকাশমুখো তুলে ধরা। মেশিনগান উঁচিয়ে আসে এবার। যান্ত্রিক বাহিনী—বিচিত্র চেহারায় রাক্ষুসে গাড়িগুলো গর্জন করে চলেছে; দুনিয়া নখে ছিঁড়বে যেন। বুকের মধ্যে গুরগুর

করে, কানে তালা লাগে। প্যারাট্রুপ—প্যারাশুট নিয়ে চলেছে ট্রাকে। বিমানধ্বংসী কামানের বাহিনী—লরী বোঝাই সৈন্য, সেই লরী পিছনে একটা করে কামান টেনে নিয়ে চলেছে। ভারী কামান, হালকা কামান—রকমারি কামানের মিছিল। মাইন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে লাইনবন্দি ট্রাকের উপর। ট্যাঙ্ক চলেছে—গণতিতে আসে না। ভীষণ আওয়াজ।—পাথরে বাঁধানো রেড-স্কোয়ার গুঁড়ো গুঁড়ো করবে নাকি ?

ব্যাণ্ড-পার্টি মাঝে এক-একবার ঢুকে পড়ে বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে যাচ্ছে। কালিয়া-কোপ্তার মাঝে চাটনিটা ঘুরিয়ে নেবার মতন।

পৌনে-এগারো। মিলিটারি প্যারেড চুকল এতক্ষণে। পতাকাবাহী দল আসে নীল পোশাকে। ষোল গণতন্ত্রের ষোলটা আলাদা পতাকা সার দিয়ে আসছে। নীল পোশাকে তরুণ-তরুণীরা—তাদের পতাকায় নেতাদের ছবি। সারা দেশ জুড়ে শতসহস্র উদ্যোগ—সেই সব দলের লোকও আসে ভিন্ন ভিন্ন পোশাকে। রামধনুর তো সাতটা রং—আজকের উৎসবে কত রঙের বাহার, তার কোন লেখাজোখা নেই।

জনসাধারণের মিছিল। মাথার উপরে পতাকা। একটু উপর থেকে দেখছি তো—যেদিকে তাকাই, ঝিলমিল পতাকা উড়ছে। আর ফুল। সত্যিকার ফুল নয় ; সত্যি ফুল ক'টাই বা ফোটে হাড়-কাঁপানো শীতরাজ্যে ! দেদার কাগজের ফুল। দল-ছাড়া কয়েকটা মেয়ে এদিকে এসে বিদেশি আমাদের অভিনন্দন দিয়ে যায়। আকাশ-ফাটানো উল্লাসধ্বনি। ফুল দিয়ে কাস্তে-হাতুড়ি বানিয়েছে, বানিয়েছে ক্রেমলিন-চূড়ার তারা। এই ফুলগুলো সত্যিকারের। কাগজের অতিকায় কলসি। মার্কস ও এঞ্জেলসের দু-তিন মানুষ আকারের ছবি। ছবি আর প্লাকার্ডের মিছিল—কত-কি লেখা তুলে ধরে চলেছে, মূর্খ মানুষ পড়তে পারিনে। আনন্দ-সমুদ্রে তুফান উঠেছে। কয়েকটা বাচ্চা বাপ-দাদার কাঁধে চেপে মিছিল বয়ে চলেছে। ফুলের মতো চেহারা, মুঠিভরা ফুল—মিষ্টি রিনরিনে গলায় জকার দিয়ে যাচ্ছে তারা।

পিছনে চলে যাই, আরও উঁচুতে উঠে সারা মিছিল ভাল করে দেখব। আনন্দোচ্ছল জনতরঙ্গ অবিরাম বয়ে যাচ্ছে—শেষ নেই, সীমা নেই। ফাঁকা রাস্তা বয়ে এসেছিলাম, পুলিশে আটকে রেখেছিল, মানুষ দেখে দেখে পথ করে দিচ্ছিল। তখন ছিল স্তব্ধ গাম্ভীর্য। লক্ষ ধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল। লাল রঙের বিশাল বাড়ি বিপ্লব-মিউজিয়াম—তারই এদিক-সেদিক থেকে বেরিয়ে আসছে। কুসুমগুল্ম ও সবুজ ঘাসে ভরা একটুকু মাঠ ঐ। সারা সোবিয়েত দেশের সব চেয়ে মূল্যবান ভূমি। কত জনে নিদ্রাচ্ছন্ন এর

নিচে—বিপ্লবের বলি, নাম জানা নেই, গুণতি করেও রাখেনি ক'জন ছিল তারা। আর শুয়ে আছেন মুসোলিয়ামের পাতাল-কক্ষে কাচের আবরণের নিচে লেনিন ও স্ট্যালিন।*

ফিরে আসছি। রেডিও-র একজন পিছু নিয়েছেন: এই উৎসবের ব্যাপার রেডিও-য় আজ বলতে হবে আপনাকে। বাংলায় বলবেন, আপনার দেশের মানুষ শুনবে।

ভাল রে ভাল! শহর জুড়ে দেওয়ালি, বাড়িতে বাড়িতে আকাশে আগুন ঝরিয়ে দেবে, মস্কোর একটা মানুষ আজ সন্ধ্যায় ঘরে থাকবে না। আমি সেই সময়টা বুঝি বন্ধ ঘরের মধ্যে মাইকের সামনে ভ্যানর-ভ্যানর করব? ও সব হবে না মশায়। তা ছাড়া লিখে নেবারই বা সময় কোথা?—কাল। ভোরে উঠে লিখে ফেলব, রেকর্ড করে আসব এক সময় গিয়ে।

মীরাও সায় দেয়: কালকের জন্য বন্দোবস্ত করুন। সন্ধ্যাবেলাটা আজ দেখে-শুনে বেড়াবেন। বলশই থিয়েটারে একটা ভাল পালা আছে—'ঝড়ের আলো'। টিকিট করা হয়েছে।

[বেতার-ভাষণ]

সাতই নভেম্বর—মানুষের ইতিহাসে পরম স্মরণীয় সোবিয়েত-বিপ্লবের এই দিনটি। কোটি কোটি নিষ্পিষ্ট মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াল। নতুন জগৎ গড়ে তুলবে তারা—সুখের জগৎ, শান্তির জগৎ।

এদেশে পা দিয়ে অবধি দেখতে পাচ্ছি, এই মহা-মহোৎসবের জন্য সকলে দিন গুণছে। সোবিয়েত রাষ্ট্রের নানান অঞ্চলে চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছি—যেখানে যাই, আগামী উৎসবের তোড়জোড়। মানুষ হেসে নেচে তাদের সর্বোত্তম প্রাপ্তি জগতের সামনে জাহির করবে, তারই সর্বব্যাপ্ত আয়োজন।

নতুন রঙ ধরাচ্ছে বাড়িতে বাড়িতে, আলো আর পতাকা দিয়ে সাজাচ্ছে। ৬ই রাত্রে সারা মস্কো জুড়ে আলোর প্লাবন। ঘুরে ঘুরে এপথ-ওপথ হয়ে বেড়াচ্ছি। আট-শ বছরের সুপ্রাচীন নগরীর বুকের উপর বড় বড় সড়ক, আকাশচুম্বী প্রাসাদ। প্রবীণ সংস্কৃতি আর নবীন জীবনোল্লাস গলাগলি হয়ে আছে এখানে। এই রাত্রে বিচিত্র আলোর মালা পরে ভুবনমোহন রূপ ধরেছে মস্কো।

৭ই সকালবেলা কনকনে শীতের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম আমরা ভারতীয় দল। রেড-স্কোয়ার আমাদের হোটেল-মেট্রোপোলের অতি নিকটে। পায়চারি করতে করতে সকালবেলা অথবা সন্ধ্যার পর কতদিন লেনিন-মুসোলিয়ামের

*এখন স্ট্যালিন অন্যত্র কবরস্থ।

ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, আজকে কিন্তু চললাম একেবারে উল্টোদিকে। পথে মানুষজন সামান্য—কর্মব্যস্ত জনাকীর্ণ পথ খা-খা করছে আজ। পুলিশের দল ব্যূহ রচনা করে আছে মাঝে মাঝে। এমনি অনেক ব্যূহ পার হয়ে হাজির হলাম ক্রেমলিনের সামনে সমাধি-ভবনের ডানদিকের গ্যালারিতে। আমাদের জায়গা এখানে, এখান থেকে উৎসব দেখব।

উৎসব দশটায় শুরু। ক্রেমলিনের বড়-ঘড়িতে সাড়ে-নটা—আধঘণ্টা বাকি এখনো। চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। রেড-স্কোয়ারের এক প্রান্তে সুপ্রাচীন বেসিল-গির্জা, অন্য প্রান্তে ঐতিহাসিক মিউজিয়ামের লাল বাড়ি। আর সামনে স্কোয়ারের ওপারে গুম—অর্থাৎ সর্বদ্রব্য-বিপণির সুবিশাল প্রাসাদ। বেসিল-গির্জার পাশে পুরানো গোলাকার বেদী—সেকালে রাজাজ্ঞায় নৃশংস ভাবে হাত-পা-গলা কেটে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত এর উপরে। সেই বেদী ঘিরে ফুলে আর পতাকায় অপরূপ সাজিয়েছে। লাল পতাকা বাতাসে উড়ছে—অগ্নিশিখার মতো দেখাচ্ছে আমাদের এখান থেকে। গুমের গায়েও অমনি শত শত পতাকা। মোভি-ক্যামেরা সাজিয়েছে বেসিল-গির্জা, গুম আর মিউ-জিয়ামের উপরে। তিন দিক দিয়ে আক্রমণ—বিপুল এই উৎসব-সমারোহের যতখানি ধরে রাখা যায়।

গুমের লাগোয়া ওপারের ফুটপাথেও অগণ্য দর্শক। তাদের আড়াল করে সৈন্যবাহিনী ছবির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে রেড-স্কোয়ারের প্রান্তে। ব্যাণ্ড-বাহিনীর সোনার বরণ বাজনাগুলো ঝিকমিক করছে। একেবারে সামনের সারিতে দাঁড়িয়েছি, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা সেখানে। বিষম-দানশীল হয়ে পড়েছে ছেলেমেয়েগুলো—বাড়ির লোক আপেল-টফি-চকোলেট দিয়েছে খাওয়ার জন্যে, সমস্ত নিঃশেষে দিয়ে দিচ্ছে আমাদের। না নিলে শুনবে না—রাগ করে, জবরদস্তি করে। অগত্যা হাত পেতে নিয়ে, আবার ফাঁকমতো তাদের পকেটে ফেলে দিচ্ছি। টের পেয়ে পকেট চেপে সামাল হয়ে গেল। তখন আবার নতুন কায়দা খুঁজি। এই লুকোচুরি খেলা চলছে আমাদের। ক্লিক-ক্লিক ফোটো তুলছে এদিকে-ওদিকে। কামানের মতো দুটো বড় মোভিও আক্রমণ করতে ধেয়ে এসেছে এতদূর অবধি।

নটা-পঞ্চান্ন। ঐতিহাসিক মিউজিয়ামের দিক থেকে কী-এক শব্দ। সেই শব্দ সরলরেখার গতিতে সারবন্দি পুলিস ও সৈন্যদলের মুখে মুখে ছুটে বেসিল-গির্জা ছাড়িয়ে আরো দূর প্রান্তে মিলিয়ে গেল। প্রস্তুত সকলে। দশটা বাজল ক্রেমলিনের ঘড়িতে। নেতারা সমাধি-ভবনের অলিন্দে দাঁড়িয়েছেন। ব্যাণ্ড বেজে উঠল। প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন আর মস্কো-বিভাগের

সেনাপতি মুস্কালিয়াকো দুই মোটরে সৈন্যবাহিনীর সামনে ঝড়ের বেগে অভি-নন্দন দিয়ে চলেছেন। তারা প্রতি-অভিনন্দন জানাল। চারিদিক নিঃশব্দ ছিল, আনন্দ উত্তাল হল এক মুহূর্তে। দুই দল ব্যাণ্ড এগিয়ে এল দু-দিক থেকে। বাজাচ্ছে তারা সমাধি-ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে। বিপুল আনন্দ-কলরব—আকাশ ফেটে যায় বুঝি বা!

চুপ! বুলগানিন সম্ভাষণ করছেন সর্বজনকে। দেশজোড়া বিপুল শিল্প-প্রগতি ও কৃষি-সাফল্য—তার পরিচয় দিলেন। বিস্তর পতিত জমি উদ্ধার হয়েছে। রাশিয়া আর কাজাকিস্তান এই দুই গণতন্ত্র নির্ধারিত সময়ের আগেই লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিকদের বিপুল কর্মিষ্ঠতা। স্থল, জল ও আকাশে সৈন্যদল আধুনিক যন্ত্রপাতিতে শক্তিমান। সোবিয়েত জনগণ অসীম পরিশ্রমে দেশের সর্বত্র ঐশ্বর্য ও আনন্দ বহন করে এনেছে। গণতন্ত্রের শক্তি বেড়েছে পৃথিবীতে। শান্তির প্রচেষ্টা বহুব্যাপক হচ্ছে। সাংস্কৃতিক যোগাযোগ চলেছে দেশে দেশে। এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার নানা ক্ষেত্রের জ্ঞানী-গুণীরা দলে দলে এসে সোবিয়েত দেশের পরিচয় নিয়ে যাচ্ছেন। এদেশের অনেকেই নিমন্ত্রিত হয়ে ভিন্ন দেশে যাচ্ছেন। বিদেশের প্রতিনিধিরা নিঃসংশয়ে বুঝে যাচ্ছেন, সোবিয়েতের মানুষ একান্তভাবে শান্তিকামী। কিন্তু লড়াইবাজও আছে দুনিয়ায়। তারা চক্রান্ত করছে; তাই প্রতিরোধ ব্যবস্থা আমরা দৃঢ়তর করেছি। যাতে শান্তির পরিবেশ কেউ ক্ষুণ্ণ করতে না পারে···

ভাষণ শেষ হলে ক্রেমলিন থেকে কামান-নির্ঘোষ। তার যেন শেষ নেই, সীমা নেই। প্রতি নির্ঘোষে জনতা প্রবল চিৎকারে উল্লাস জানাচ্ছে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল গির্জার ওদিকটা।

তার পরে সৈন্যবাহিনীর মিছিল—খালি-হাতের সৈন্য, তরোয়ালধারী, বন্দুক কাঁধে ঠেশান-দেওয়া, আকাশমুখো-বন্দুক, সামনের দিকে উদ্যত-বন্দুক—। এমনি চলেছে দলে দলে।

যান্ত্রিকবাহিনী মোটরগাড়িতে। মেশিনগান দিয়ে সজ্জিত মোটর, বিমান-ধ্বংসী কামান মোটরে টেনে নিয়ে চলেছে। সেল নিয়ে যাচ্ছে, মর্টার নিয়ে যাচ্ছে। ভারী কামান, ভারী বিমান-ধ্বংসী কামান, ক্যাটারপিলার বিমান-ধ্বংসী কামান, প্যারাশুট-বাহিনী—আওয়াজে কাঁপছে চারিদিক। দেখতে আনন্দ লাগে, আতঙ্ক লাগে, বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়।

রণবাহিনীর মিছিল ক্রমশ বেসিল-গির্জা পার হয়ে চলে গেল। একটু স্তব্ধতা। বাতাস প্রবল হয়েছে ইতিমধ্যে। পতপত আওয়াজ করে পতাকা দুলছে স্তম্ভের শীর্ষে। বহু সহস্র নবীন প্রত্যাশা কেন্দ্রিত হয়ে যেন মর্মরিত ঊর্ধ্ব-আকাশে।

তারপর খেলোয়াড়ের দল। সামনে বড় বড় পতাকায় মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের ছবি। তারপরে বিভিন্ন গণতন্ত্রের নায়কদের। মাও-সে-তুঙের ছবিও দেখছি। সবুজ, নীল, বেগুনি খয়েরি—কত রঙের পোশাক! ঝলমল করছে চোখের সামনে, ঝিলিক দিয়ে চলে যাচ্ছে যেন সোবিয়েতের প্রস্ফুট যৌবন-শক্তি।

জনসাধারণের মিছিল তারপরে। সেই জন-সমুদ্রের তুলনা দেব, এমন ভাষা খুঁজে পাই না। পতাকার সমুদ্র। হাতে ফুল প্রায় সকলের—কাগজের ফুল, নানা রঙের। ফুল নেড়ে আমাদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছে। কত দেশের মানুষ এক হয়ে মিশেছি আমরা। আমি ভারতের, ডানদিকে চীনা এক মেয়ে, পিছনে পোলিশ বৃদ্ধ।…নিষ্পলক বিমুগ্ধ চোখে অসংখ্য মানবের এই বিচিত্র আনন্দলীলা দেখছি। সমাধি-ভবনের অলিন্দে স্থিরমূর্তি নায়কেরা। ফুল দিয়ে বানিয়েছে প্রকাণ্ড কাস্তে-হাতুড়ি, ফুলের তৈরি ক্রেমলিনের তারা। বাচ্চা কাঁধে তুলে মিছিলে বয়ে চলেছে, বাচ্চাদের হাতেও ফুল। ফুলে ফুলে চারিদিক পরিব্যাপ্ত। এই হাজার হাজার মানুষ ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে আর এক দিনের রক্তপরিপ্লাবিত আত্মদানের পুণ্যে ভাস্বর এই রেড-স্কোয়ারে।

জন-স্রোতের অন্ত নেই। সীমাহীন উল্লাস। একবার পিছনে গিয়ে উঁচু জায়গার উপর উঠে দেখলাম। অশ্রান্ত সমুদ্র বয়ে চলেছে—তারই মাথায় মাথায় জাহাজের চূড়ার মতো অসংখ্য পতাকা। আর দেখলাম, ব্যবস্থা বটে! একেবারে ফাঁকা রাস্তা দিয়েই তো এসে পৌঁছেছি—দশটা বাজার আগ পর্যন্ত এতটুকু শব্দ ছিল না কোনদিকে। কোন নিভৃত কন্দরে এত আনন্দ লুকিয়ে রেখেছিল—জীবন-কল্লোল সহসা নিষুপ্তি ভেঙে বিপুল প্রবাহে দশদিক ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

ফিরে চলেছি হোটেলে। এবারে ফাঁকা পথ নয়। রাস্তা-গলি ছাপিয়ে শতধারে ছুটেছে আনন্দ। হাতে ফুল গুঁজে দিয়ে যাচ্ছে, শেকহাণ্ড করে যাচ্ছে কত ছেলেবুড়ো পুরুষ-মেয়ে, কত চীনা কোরীয় আরবি জর্মন মানুষ! উপহার-পাওয়া ফুলে দু-হাত ভরতি। সেই ফুল, আমরাও যাকে পাচ্ছি, বিলোতে বিলোতে চলেছি। গান গেয়ে চলেছে দলে দলে, কাছে এসে আলাপ জমানোর চেষ্টা করছে। নতুন নতুন মিছিলের দল এখনও চলেছে বড়রাস্তা দিয়ে। অপরাহ্ন গড়িয়ে আসে, উল্লাস-প্রবাহ চলেছে তবু অবিরাম।

রবীন্দ্রনাথ এদেশে এসে বলেছিলেন, 'না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অপূর্ণ থাকত।' বহু মানবের আনন্দের পবিত্র তীর্থসলিলে অবগাহন করে আজকে বাংলার সাহিত্যিক আমি পরিতৃপ্ত হলাম।

॥ পঁচিশ ॥

এখন আর লেখা হচ্ছে না নিয়ম মতো। বিরক্তি লাগে। লেখক মানুষ—সাধ ছিল, এখানে যাঁরা লেখেন তাঁদের সঙ্গে কয়েকটা দিন মিলেমিশে হৈ-হৈ করব। কিন্তু এত দিনের মধ্যে কিছুই যোগাযোগ হল না। হতাশ হয়ে পড়ছি। যে দলের মধ্যে এসেছি, জন দুই-তিন ছাড়া সাহিত্যের কোন তোয়াক্কা রাখেন না কেউ। বাংলা সাহিত্যের তো নয়-ই। পিকিনে আনিসিমভের সঙ্গে খাতির জমেছিল—এখানে এসে শুনি, ভদ্রলোক গর্কি ইনস্টিট্যুট অব ওয়ার্লড লিটারেচার নামক মস্তবড় প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর, রীতিমত ওজনদার মানুষ। মস্কোয় এত ঘোরাফেরা করছি, একই জায়গায় থেকে তবু কিন্তু দেখা হল না একটি বার। কত জনকে বললাম। বটেই তো, বটেই তো—বলে প্রবল ঘাড় নাড়ে, দু-কদম যেতে না যেতে ভুলে মেরে দেয়।

দেশে ফিরবার সময় হয়ে এলো। খুব বেশি তো আর এক হপ্তা। সত্যিই তো ঘরবাড়ি বিকিয়ে দিয়ে আসি নি। ক'জনের দস্তুরমতো গৃহপীড়া দেখা দিয়েছে—শয়নে, স্বপনে, বিচরণে বাড়ির কথা। চিঠি লেখা বিষম বেড়েছে, ডোকসের লোক নাজেহাল হচ্ছে খাম-টিকিটের জোগান দিতে দিতে।

ঘোরাঘুরি চলছে ঠিক নিয়ম মতো। আজ সকালে নিয়ে চলল মিলিটারি একজিবিশনে—যার আসল নাম সোবিয়েত মিউজিয়াম অব আর্মস। ১৯১৯ অব্দে স্থাপনা।

১৯১৭ অব্দে বিপ্লব হল—সেই বিপ্লব-সৈনিকদের টুপি, ব্যাজ ও পিস্তল। তারি সম্মানের বস্তু এগুলো। আর দেখুন পতাকা। কাচের আড়ালে সাঁটা রয়েছে—বিবর্ণ নিশ্চল, একদিন এই পতাকা উড়িয়ে তারা জারের শীতপ্রাসাদ আক্রমণ করেছিল। সেই আক্রমণের ছবি—ফোটো তুলে রাখেনি কেউ, শিল্পী রঙ তুলি আর কল্পনায় এঁকেছে। দ্বিতীয়-কংগ্রেসে লেনিন সর্বহারার গভর্নমেন্ট ঘোষণা করলেন, তখনকার ফোটো ও কাগজপত্র। অর্ডার অব দি রেড ব্যানার—লাল পতাকার নামযুক্ত সৈনিকের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান—তার নমুনা রেখে দিয়েছে এখানে।

১৯১৮ অব্দে চারিদিক দিয়ে শত্রুরাষ্ট্র ঘিরে ফেলেছিল—তখনকার নানা পোস্টার ও ছবি। ব্রিটিশ-আমেরিকা-জার্মানি সীমান্তে সেনা মোতায়েন করল, বিষম অত্যাচার. দেশের ভিতরেও গণ্ডগোল কাঁপিয়ে তুলেছে শত্রুরা, ঘরে-বাইরে

লড়াই। তার হরেক ছবি ও কাগজপত্র। ব্রিটিশ, আমেরিকা, জর্মনি, জাপান ও ফ্রান্সের বন্দুক, মেশিনগান, টুপি, হেলমেট ইত্যাদি কেড়েকুড়ে নিয়েছিল সেই সময়, তার কিছু কিছু রয়েছে। আবার এই তরফের কামান, মাইন, গেরিলাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র, বোমা ফেলার যন্ত্র, হাতে-তৈরি পেটাই মেশিনগান। সেকালের হাতলওয়ালা বর্শা। জাপানি টুপি কেড়ে নিয়ে মাথায় চাপিয়ে জাপানি সেজেছে গেরিলারা; বিদেশির হামলা রুখেছে ঐ বেশে। সেই সব টুপি দেখতে পাচ্ছি।

এক লাল-সৈন্যের হাতের চামড়া তুলে নিল যেহেতু সে দলের কথা ফাঁস করে না। সেই সৈন্যের নামধাম ও যাবতীয় কাহিনী। কশাক টুপি, হাতবোমা, তলোয়ার, তলোয়ারের খাপ। শহীদজনের মূর্তি অনেকগুলি। একটা ব্রিটিশ সাবমেরিন এরা ডুবিয়ে দিয়েছিল, তার মডেল রেখে দিয়েছে। জলতল থেকে পরে ঐ সাবমেরিন তুলে তার মধ্যে ষড়যন্ত্রের দলিলপত্র পাওয়া যায়।

১৯১৭ অব্দের তোলা সোবিয়েত বীর-সেনাদের ছবি। তাদের বিভিন্ন অস্ত্রসজ্জা। প্রোপাগাণ্ডার ট্রেন ও জাহাজ বেরুল দেশের আনাচে কানাচে সর্বত্র—গণমানুষদের রাজনীতির পাঠ দিতে হবে। গণ্যমান্য নেতারা বেরিয়ে পড়লেন গাঁয়ে গাঁয়ে। সেই সব ট্রেন ও জাহাজের মডেল।

লড়াই ছেড়ে সংগঠন এবারে। পর পর তিনটে পঞ্চবার্ষিকী কল্পনার রূপদান হল। কত খাল কেটেছে, বাঁধ বেঁধেছে, জলধারা বইয়ে দিয়েছে উষর মরুতে। তেল-ইস্পাতের গোপন ভাণ্ডার পাতাল খুঁড়ে বের করে ফেলেছে। ছবিতে ছবিতে, দেখুন, কী কাণ্ড করেছে তামাম দেশটা জুড়ে। লড়াইয়ের সরঞ্জামও বানাচ্ছে ফাঁকে ফাঁকে। দুটো পঞ্চবার্ষিকীর মধ্যে বানিয়ে ফেলল চার-শ রণতরী, নানান রকমের বন্দুক মেশিনগান হাউইটজার।

দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধ। নাৎসি ফ্যাসি ও জাপান হামলা দিয়েছে রাশিয়ার উপর। অসংখ্য পোস্টার সে আমলের। এক দুর্গে সৈন্যরা আটকা পড়েছে, আঁকাবাঁকা অক্ষরে কে-একজন লিখে গেছে দেয়ালের উপর: আত্মদান করলাম, কিন্তু দুর্গ ছাড়িনি; তারিখ—২০ জুলাই, ১৯৪১। একটুকরা টিন ছিল এক পাশে—গুলিতে গুলিতে শতছিদ্র সেটিও। দেড় মাসে রাশিয়া খতম—এই ওদের হিসাব। হিসাব উল্টে গেল—জর্মনই হটছে।

গাইড বলে যাচ্ছে ইংরেজিতে। ছবি ও জিনিসপত্রে ঘটনার পর ঘটনা দেখিয়ে যাচ্ছে। রোমাঞ্চক রূপকথার মতো শুনছি। জর্মনদের হাতিয়ার-পত্র কেড়ে নিয়ে তাড়া করেছে তাদের। নীপার নদী পার হচ্ছে সৈন্যদল—তার এক বিরাট মডেল। নিরীহ লাঠির ভিতরে বন্দুক-রিভলভার; ছুরির

মধ্যে মাইক ; পিস্তল পেন্সিলের মধ্যে। গুপ্তচরেরা এই সমস্ত নিয়ে দেশের মধ্যে ঘুরত।

১৯৪৫ অব্দে পুরোপুরি জয়। জর্মনির প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙেচুরে গিয়ে পালাচ্ছে সৈন্যেরা বার্লিন মুখো—তার সুবৃহৎ মডেল।

রাইখস্টাগের চূড়ায় যে পতাকা এরা উড়িয়ে দিয়েছিল, সেটা পরম যত্নে এনে রেখেছে। বার্লিন শহর জ্বলছে, তার ছবি। রাইখস্টাগের মডেল। নানা অঞ্চলের সৈন্যরা রাইখের এখানে-ওখানে যা খুশি লিখেছিল, তার ছাপ রেখে দিয়েছে। জাপানেরও হার হল, গাদা গাদা অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছে সেখান থেকে।

সোবিয়েত-দুনিয়া শান্তি চায়। দেয়াল-জোড়া ম্যাপের উপর আলো বসানো—বিশাল দেশের যাবতীয় সম্পদের পরিচয় এই ম্যাপে। দেশের মানুষ সকলে মিলে সুখে-শান্তিতে এই বিপুল সম্পদ ভোগ করবে। রণজয়ের পর নানান দেশ থেকে উপহারের পাহাড় জমেছে। স্তূপীকৃত পতাকা—যা-সমস্ত জয় করে এনেছে, আর নিজেদের যা ছিল।

কত লোক মিউজিয়াম দেখতে এসেছে—মেয়েপুরুষ বাচ্চাবুড়ো আর ইউনিফর্ম-আঁটা সৈন্য। গাইডেরা বকবক করে বুঝিয়ে চলেছে—এদের এই মহা-ইতিহাস ছবির মতন ভাসছে আপনার চোখের উপর। কত সংগ্রাম, কত বীরত্ব, কত আত্মত্যাগ! বেদনার উদ্বেল সমুদ্র পার হয়ে অবশেষে রৌদ্রোজ্জ্বল কূল পেয়েছে।

বিজয়োৎসব। পরাজিত পতাকাগুলো এদেশ-সেদেশ থেকে বয়ে এনে প্রথমটা মুসোলিয়ামের সামনে রেখে দিল। লেনিন যার ভিতর শান্ত ভাবে ঘুমিয়ে আছেন। দেশের সমস্ত উল্লাস ঐ স্মৃতিমন্দিরের পাদপীঠে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তারপরে এই মিউজিয়ামের সংগ্রহে এনে রেখেছে। সমস্ত সাজানো-গোছানো। সর্বশেষে দেখি, খুদে হিটলারের বিশাল পতাকা আর ব্যাজ মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। তাদের উপর কিম্বা দেয়ালের গায়ে জায়গা হয়নি। গাইডের কণ্ঠ সহসা কঠিন হয়ে উঠল, কথায় আগুনের জ্বালা: আমরা শান্তি চাই। কেউ যদি পিছনে লাগতে আসে, তার মাথা ঠিক এমনি করেই ধূলায় লুটিয়ে দেবো।

চেকোভস্কি সুরকার। জ্ঞানীগুণীরা খুব জানেন, সাধারণের কথা বলতে পারব না। রাশিয়ায় এই নামে সিনি পড়ে। মস্কো শহরের বুকে মস্তবড় মূর্তি, ঐ নামে পার্ক। মনোরম এক হল বানিয়েছে—চেকোভস্কি কনসার্ট-হল।

সন্ধ্যার পর সেখানে গিয়ে বসলাম। নাচের আসর; অত বড় হল মানুষের ভিড়ে গমগম করছে।

রাশিয়ার রকমারি লোকনৃত্য। চোখে না দেখে নাচের কি মজা পাবেন? আহা-ওহো করেও লাভ নেই। কি আর হবে—নাম ক'টা নিয়ে নিন শুধু।

বার্চ-নাচ—গ্রাম্য পোশাকে একগাদা মেয়ে নাচছে। ডান হাতে নীল রুমাল, বাঁ হাতে বার্চ-শাখা। লাল গাউনে ছুটো পা ঢেকে গেছে, ঢেকে অনেকখানি স্টেজের উপর ছড়িয়ে আছে। হলদে রুমাল মাথায়। ধীরে ধীরে চলল। ঘুরছে, পা দেখা যায় না তো—মনে হল স্টেজই পাক দিচ্ছে মেয়েগুলোকে ঘিরে। নাচ নয়—কাঠের ঐ স্টেজের উপরে যেন ভেসে ভেসে বেড়ানো। যত সব ধুন্দুমার নাচ দেখায় পশ্চিমে—আজকের এই নাচ বড্ড মোলায়েম। গানের সুরগুলোও ভারি স্নিগ্ধ।

নাচের পর নাচ চলছে। ফিতে নাচ। তিন ঘোড়ার নাচ—ঘোড়ার ভঙ্গিতে নাচে তিনটে করে ছেলে; উত্তর-রাশিয়ার অতিপ্রাচীন এক লোক-নৃত্য। চৌকো নৃত্য—চারটে করে মেয়ে একসঙ্গে নাচে। মস্কো অঞ্চলের এক পুরানো নাচের সুর। ভলা গাছের উপর মাঝির নাচ। এক গ্রামকন্যার প্রণয়গাথা ও নাচ। কসাক মেয়েদের নাচ—নাচে তাবৎ দর্শকদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছে, বাজনাদারদের অবধি। নাগরদোলার নাচ। হাসি-হল্লার নাচ। নাচের এক পালা, নাম হল 'আমরা রাজহংসী'—কালো পাথরের বড় আংটি আঙুলে পরে হাত বাঁকিয়ে মেয়েগুলো দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেন রাজহংসী। কালো পাথর হল হাঁসের চোখ; আহা, সরোবরে ভেসে বেড়ায় ঐ দেখ হংসীর দল। রঙের খেলা—নাচে আর সাজপোশাকে রঙের ঢেউ খেলে যাচ্ছে, বারম্বার হাততালি পড়ে, ঘুরে ফিরে নাচতে হয়। রাশিয়ার পুরানো বাজনা—কত রকম তারের যন্ত্র, লেখাজোখা নেই। লোকনৃত্যের বাজনা। সোবিয়েত যুবনৃত্য ও গান—একবার দু-বার দেখে মানুষের তৃপ্তি হয় না। এক জিনিস বারম্বার করে দেখায়।

পরদিন, ১ নভেম্বর। রেড-স্কোয়ার দিয়ে যতবার যাই, লোলুপ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি মুসোলিয়ামের দিকে। ভিতরে গিয়ে দেখব, লেনিনের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াব। এত দিন যেতে দিত না, উৎসব ব্যাপারে রঙচঙ করা হচ্ছিল। উৎসব অন্তে আজ দোর খুলে দিয়েছে। চলেছি সেখানে, পায়ে হেঁটে যাচ্ছি। প্রকাণ্ড আয়তনের শ্বেত কুসুমস্তবক নিয়ে চলেছি।

রেড-স্কোয়ার আর মেজল্যুশান-স্কোয়ারের মাঝখানটায় ঐতিহাসিক মিউজিয়ামের লাল বাড়ি। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে অগুন্তি মানুষ। মুসোলিয়ামের

সামনে থেকে লাইনের শুরু—রেড-স্কোয়ার শেষ হয়ে ঐতিহাসিক মিউজিয়াম ছাড়িয়ে রেভল্যুশান-স্কোয়ারের বহুদূর অবধি চলে গেছে। বাচ্চা-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ সব রকম তার মধ্যে। বারো মাস তিরিশ দিন এই ব্যাপার। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ঢুকতে দেয়, কিউয়ের লেজ একটুকু খাটো হয় না তার ভিতর। মাথার দিক দিয়ে লাইনবন্দি ঢুকে যাচ্ছে, পিছন দিকে নতুন নতুন মানুষ জুটছে এসে। আমরাও আসছি রেভল্যুশান-স্কোয়ার হয়ে ঐ পিছন দিকে। আরে সর্বনাশ! আগে যারা দাঁড়িয়ে গেছে তাদের শেষ হতেই আজকের পাঁচটায় কুলাবে না।

না, বিশেষ অতিথি বলে আলাদা বন্দোবস্ত আমাদের জন্য। উর্দি-পরা কয়েকটা সৈন্য আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলল কিউয়ের পাশ দিয়ে মুসোলিয়ামের দরজার দিকে। কুসুমস্তবক জন আষ্টেক মিলে কাঁধে বয়ে চলেছেন।

দুয়ারের অদূরে এসে থমকে দাঁড়াতে হল। ঠিক বারোটা—পাহারা বদল হচ্ছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাহারা বদল। চারজন করে সৈন্য বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। দিন-রাত্রি শীত-গ্রীষ্ম-বরফ সর্বক্ষণ আছে তারা। এতটুকু নড়াচড়া নেই—অবিচল, পাথরে-খোদা মূর্তির মতো। তিনজন বন্দুকধারী ক্রেমলিনের ভিতর দিক থেকে আসছে রেড-স্কোয়ারের পাথরের উপর খটখট জুতোর আওয়াজ তুলে। তারা এসে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। দু-জন উঠল গিয়ে দরজার উপর; আগের চারজনের দু-জন নেমে এসে আবার তিনজন হল। মার্চ করে তিনজনে ক্রেমলিনে ঢুকে গেল।

ফুল ভিতরে নিতে দেয় না, দরজার কাছে রাখে। ভিতরে ঢুকলাম। লাল মার্বেলে গড়া চৌকো ধরনের বাড়ি—বাইরে থেকে ছোট মনে হয়। পয়লা দিনটা খুব খারাপ লাগছিল, এমনি এক সামান্য জায়গায় লেনিন-স্ট্যালিনকে রেখেছে! আজকে ভিতরে এসে দেখছি, ছোট বস্তু নয়। বিরাট ক্রেমলিনের পাশে বলেই এমন দেখাচ্ছে। চমৎকার প্যালিশ করা, হাত ঠেকালে পিছলে যায়। মাটির অনেক তল অবধি ঘর। সিঁড়ি দিয়ে নেমে নেমে ক্রমশ গর্ভগৃহে ঢুকে পড়লাম। সৈন্যের পাহারা ভিতরেও। সন্তর্পণে সবাই পা ফেলে ফেলে যাচ্ছি—এতটুকু জুতোর শব্দ না হয়। শান্ত ধ্যান-সমাহিত পরিবেশ। অবশেষে এসে পৌছলাম সমাধিগৃহে।

লেনিন ও স্ট্যালিন পাশাপাশি। কাচে-ঘেরা জায়গাটুকু। কে বলবে মৃত্যু।—কঠিন সংঘর্ষ ও কর্মের ক্লান্তিতে বিভোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। লেনিনের গায়ে কালো রঙের কোট। ছবিতে যা দেখেন, অবিকল সেই চেহারা। অদৃশ্য কোথা থেকে একটুকু আলো পড়েছে মুখের উপর—যেমন ধারা

জ্যোতি দেখা থাকে মহাপুরুষের মুখমণ্ডলের ছবিতে। ছোটখাট মানুষটি—হাত যেন ঈষৎ বিবর্ণ হয়ে গেছে। বারম্বার মুখে তাকাচ্ছি—ঘুমন্ত মানুষ ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। ঘুই দেহের তিন দিক প্রদক্ষিণ করে আবার উঁচুতে উঠে একটু বাঁক ঘুরে চলেছি। পা টিপে টিপে চলা—পাছে ঘুম ভেঙে যায়। নিঃশব্দে ভিন্ন দরজায় বেরিয়ে এলাম।

শেষ নয়। আরও অনেক আছে, আর কিছু এগিয়ে যাব। বাঁয়ে ঘুরলাম। উপরে উঠে যাচ্ছি ক্রমশ—ক্রেমলিনের দেয়ালের দিকে। ছোট একটু বাগান। তার পরে শহীদের কবরভূমি। বিপ্লবের বলি। পাইকারি কবর—নামধাম জানা নেই। কবর-ভূমি এমনি দুটো লম্বালম্বি অনেকটা জায়গা নিয়ে—মাঝে একটুখানি ফাঁক। মস্কো শহরের সব চেয়ে পবিত্র জায়গা—মরবার পর এখানে ঠাঁই পাবার জন্য সকলের ভারি লোভ। টেন ডেজ ছাট শুক দ্য ওয়ার্লড (Ten Days that Shook the World) বইয়ের মার্কিন লেখক রীডেরও কবর এখানে। আরও পাঁচ জন বড় বড় নেতার—তাঁদের আবক্ষ মূর্তি কবরের উপরে।

জায়গা নেই, একটুও জায়গা নেই আর ওখানে। অনেকে বলে গেলেন, মৃত্যুর পরে দেহ দাহ করে সেই ছাই খানিকটা ঐখানে ক্রেমলিনের দেয়ালের ভিতর ঢুকিয়ে রেখো। অনেক আছে এমন—দেয়ালের উপর পাথরের ফলকে তাঁদের নাম লেখা। ম্যাক্সিম গর্কিরও ছাই এখানে।

মস্কোর ভারতীয় এমব্যাসি দাওয়াত পাঠিয়েছেন আমাদের সকলকে। দেশে তো ফিরছেন, তার আগে ফূর্তি করে খাওয়া যাক একসঙ্গে। সুধীন্দ্রনাথকে আসতে বলে দিয়েছি। দু-জনে বেরুব। মোটরগাড়িতে নয়—পায়ে হাঁটব যত্র-তত্র। ট্রামে চড়ে বেড়াব, মেট্রোয় চড়ব। মস্কো শহর চষে বেড়াব। তারপর যথাসময়ে এমব্যাসিতে জুটে খানাপিনা করে সকলের সংগে বাসায় ফিরে আসব। সুধীন্দ্রনাথ অনেক দিন আছে মস্কোয়, তার সঙ্গে পথ হারাবার ভয় নেই। এমব্যাসির লোক—আমাদেরই পুরোপুরি আপন লোক সে।

এই যে শুনি, দু-চারটে মাত্র জায়গা দেখতে দেয় ওদের খুশি মতো? বিদেশির দিকে কড়া নজর—চলাচলের ব্যাপারে একটু হেরফের হলে ক্যাঁক করে টুঁটি টিপে ধরে?

সুধীন্দ্রনাথ একগাল হেসে বলে, তাই দেখুন। সারা বিকেল তো চক্কোর দিচ্ছি। নজর তুলে দেখল না একটিবার কেউ।

ঘণ্টা তিন-চার ঘোরাঘুরি হয়েছে। ট্রামে চেপে যাচ্ছি—কোন তল্লাট দিয়ে

কোথায় চলেছি, সুধীন্দ্রনাথ বলতে বলতে যাচ্ছে। সহজ মানুষ হল, নজর আছে বই কি! সবগুলো নজরই বোধ হয় আমাদের দিকে। যাদের মুখোমুখি বসেছি, তারা সোজা তাকাচ্ছে। চোখে চোখ পড়লে নজর নামিয়ে নেয়, ক্ষণ পরে আবার তাকায়। উল্টো দিকে যাদের মুখ, ঘাড় বাঁকিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখে তারা। এ তো বড় মুশকিল! সামনের দিকে এই ব্যাপার—পিঠের উপরটাও দৃষ্টির শূলে খোঁচাখুঁচি করছে, অনুমানে বুঝতে পারি।

সুধীন্দ্রনাথ বলে রূপ দেখছে আমাদের। কালো দেখতে পায় না বড়-একটা —দেখছে, আর হিংসের জ্বলছে মনে মনে।

॥ ছাব্বিশ ॥

শান্তি-আন্দোলনের সঙ্গে—কেষ্টবিষ্টু কেউ নই—কিঞ্চিৎ যোগাযোগ আছে আমার। পিকিনের শান্তি-সম্মেলনে একদা খানিকটা তড়পে এসেছিলাম। মস্কোর শান্তি-অফিসে এই সুবাদে ঢুঁ মেরে এলে কেমন হয়? ইচ্ছা মাত্রেই গাড়িতে পুরে পলকের মধ্যে তথায় হাজির করে দিল। সঙ্গে কৃষ্ণস্বামী—সিনেমার মানুষ, আমার পিকিনের সহযাত্রী। খাতির করে বসালেন ওঁরা। প্রশ্ন: শান্তির কাজকর্ম কেমন চলছে ভারতে? এবং উত্তর নিজেরাই দিচ্ছেন: নেহরুর দেশ, বিশ্বশান্তির আদর্শ তোমাদের—আন্দোলন খুব জোরদার নিশ্চয়। আমরা জোরে জোরে ঘাড় নাড়ি: হাঁ হাঁ—অত্র সন্দেহ নাস্তি।

পলিতকেশা এক বৃদ্ধা ঠাহর করে দেখছেন। ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে লোকে যেমন পুঁথি পড়ে। হঠাৎ উঠে গিয়ে তাকের উপর থেকে লম্বা-চওড়া এক বই নামিয়ে ফসফস করে অনেকগুলো পাতা উল্টালেন। তার পরে মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বাসু—

ব্যাপার জানি। বইটার চেহারায় মালুম হয়েছে—পিকিন শান্তি-সম্মেলনের বুলেটিন। চার ভাষার আছে—ওটা হল রুশ। আমার কাছে আছে ইংরেজী। আর বানিয়েছে চীনা ও স্পানিশে। ঐ যে বললাম, অধমকেও তুলে দিয়েছিল সেই আসরে। ছবি নিয়েছিল বক্তৃতার সময়—কেতাবে ছবি সহ বক্তৃতাটুকু ছাপা হয়ে আছে। ছবি তো সব বক্তারই রয়েছে—হুঁশ দেখুন তা হলে বুড়োমানুষের। আহা-মরি প্রাণকান্ত চেহারা নয় যে এক নজর ছবি দেখে অমনি চিত্তে দাগ কেটে রয়েছে। অথচ বই খুঁজে খুঁজে ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নাম বাতলে তবে ছাড়লেন।

শরীর বেজুত লাগছে, দুপুর থেকে শুয়ে পড়ে আছি। হীরেন মুখুজ্জে মশায় বললেন, সে হয় না—সাহিত্য নিয়ে যাদের নাড়াচাড়া, নিশ্চয় যেতে হবে তাদের। হিন্দির ব্যাপার যখন, যে ক'জন বাঙালি আছি সকলেরই যাওয়া উচিত।

ব্যাপার হল, অধ্যাপক প্রকাশ গুপ্ত হিন্দি সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বলবেন। ভোকসের ডাকে এসেছি—ভারত-সোবিয়েতের জানাশোনা ও ভালবাসা আরও ঘনিষ্ঠ হবে এই আশায় ডেকে এনে এত খাতিরযত্ন ও খরচপত্র করছেন। এসেছি যখন—যার যেটুকু বিদ্যে, জাহির করে যেতে হবে। আমাদের আছে কাল, বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে—আমার ও হীরেন মুখুজ্জে মশায়ের। এবং শ্রীমতী মদন বলবেন পাঞ্জাবি রূপকথা নিয়ে। প্রকাশ গুপ্ত হলেন এলাহাবাদ য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক। মাস্টার মানুষ, বলার অভ্যাস তো থাকবেই—কিন্তু পরমাশ্চর্য ব্যাপার, ডিগ্রি এবং চাকরি-প্রাপ্তির পরেও ভদ্রলোক পড়াশুনা রীতিমতো বজায় রেখেছেন।

তা গিয়ে লাভ হল অনেক, সত্যি বলছি। অনেক কিছু শিখে নিলাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। রুশ শ্রোতারাও শতকণ্ঠে তারিপ করলেন। ভারতীয় দল নিয়ে প্রথম এই গুণী-জ্ঞানীর আসর। শ্রীগুপ্ত দলের ষোলআনা মান রেখেছেন।

পরের সকালে রেডিও-অফিসে আমাদের ক-জনকে ডেকেছে। সোবিয়েতে এত দিন ঘোরাঘুরি হল, কেমন লাগল বলে যান এইবার। মুখের কথা রেকর্ড করে নিচ্ছে, সময় মতো পরে শোনাবে। প্রশ্ন করছেন বিনয়, আমরা জবাব দিচ্ছি। তার পরে কিছু আলোচনা হল সকলে মিলে। আমার আবার আলাদা একটু কাজ—গল্প রেকর্ড করা। বিনয় চারটে গল্প পছন্দ করে দিয়েছেন, সেগুলো পড়তে হবে। আজকে যদ্দুর হয় হোক—যা বাকি থাকে, কাল-পরশু দেখা যাবে।

বাইশ-চব্বিশ বছরের এক তরুণীকে দেখছি, কাজে নিমগ্ন। আড়চোখে চায় একবার, মিটিমিটি হাসে। বিনয় পরিচয় করিয়ে দেন: ভাল্যা ইগোরবোভা—রেডিও বাংলা-বিভাগের মেয়ে, খাসা বাংলা শিখেছে।

ভাল্যা রাঙা হয়ে ওঠে লজ্জায়: না না, বাংলা আমি কিছু জানি না।

লাজুক ভাব খাসা লাগে ওদেশের মেয়ের মুখে। খুনসুটি করি, নানা কথা জিজ্ঞাসা করি বাংলায়—কেমন জবাব দেয় দেখি। ঘাড় নিচু করে দুটো-একটা কথা বলে, আরে হাসে। আর বলে, বাংলা আমি একেবারে জানি না।

বরিস কারপুস্কিন—সুশ্রী এক যুবা, রেডিও-র ঐ বাংলা-বিভাগে অনুবাদের

কাজ করে। ভাল্যা বাংলা হরফে নাম লিখল আমার খাতায়, বরিসও লিখল। গল্পে গল্পে আমাদের থিয়েটার-জগতের 'মহর্ষি' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কথা উঠল। মস্কোয় গিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় এক সাহেব ছেলে হঠাৎ এসে তাঁকে বলল, আপনাকে দাদু ডাকিতে ইচ্ছা করি। মহর্ষি হকচকিয়ে গেলেন। বিনয়কে শুধাই, কে ছেলেটি খবর রাখেন কিছু? আছে সে এখন মস্কোয়?

বরিস বলে, আমিই তো সেই।

আবিষ্কার রীতিমতো। দেশে গিয়ে বলা যাবে, মহর্ষির নাতিকে খুঁজে পেয়েছি।

ভাল্যাকে বললাম, আমার দেশের পাড়াগাঁয়ে লাজুক মেয়ে দেখতে পাই— অবিকল তোমারই মতো।

ভাল্যা চুপি চুপি বলে, আপনি দাদা, আমি বোন আপনার।

ভাই পেয়েছি ভ্রাতুষ্পুত্রকে, বোনও এই পেয়ে গেলাম। দেশে ফেরবার ঠিক একটা দিন আগে। আমার শিষ্টশান্ত লক্ষ্মী বোনই বটে। এক দিনের তরে— ঐ এক সকালবেলা দেখে এলাম, আলাপ-পরিচয় হল। মস্কোয় তাকে আর পাই নি। আর কোনদিন দেখব না জীবনে। কিন্তু সুদূরবাসিনী তার লজ্জানত হাসি-ভরা মুখ নিয়ে চিরকাল আপনজন হয়ে রইল।

ভগ্নদূত এসে উপস্থিত। মস্কোর রাজপথে হু-হু করে গাড়ি ছুটিয়ে এসেছে। গাড়ি ছুটানো চোখে দেখিনি বটে, কিন্তু দুটো-তিনটে সিঁড়ি ধুপধাপ একসঙ্গে টপকানো দেখে স্বচ্ছন্দে অনুমান করা চলে। এসে অবধি চেষ্টা করছি, নিজ গোষ্ঠীর ভিতর বসে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইব, সেই সুদিন অত্র সমাগত। ইউনিয়ন অব রাইটার্স নামে জোরালো সমিতি—মস্কোর লেখককুল ঐখানে মোলাকাতের জন্য বসে আছেন। চলুন চলুন—

কী মুশকিল, আগে একটু খবরবাদ দেয়! ওঠ্‌ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, এ কেমন কথা!

আগে থেকেই নাকি ব্যবস্থা, গত কাল খবর দেবার কথা। কিন্তু যার উপরে ভার—ইত্যাদি ইত্যাদি।

একতলা বাড়ি, মস্তবড় কম্পাউণ্ড। লেখকমশায়রা গাড়ি চেপে আসছেন, গাড়িতে বেরুচ্ছেন। পচিশ-ত্রিশটা গাড়ি সর্বক্ষণ উঠানে। সমিতির কতগুলো ঘর আর কত রকমের বিভাগ, গণে পারবেন না।

এক ঘরে নিয়ে গেল। লম্বা টেবিল ঘিরে বসেছি—আমাদের তরফের এবং ঐ তরফের। অশীতিপর একজন রবীন্দ্রনাথের কথা তুললেন। রবীন্দ্রনাথ

রাশিয়ায় গেলেন, বিপ্লবের ধকল তখনো কাটেনি। নানান অভাব-অসুবিধা, খাবার-দাবার পাওয়া যায় না। কিন্তু দুর্যোগ কাটিয়ে উঠবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা চলেছে। রবীন্দ্রনাথকে রাখা হয়েছে শহরতলীর এক বাড়িতে। লোকজনের ঝামেলা কম, নিরিবিলি আছেন।

বৃদ্ধ লেখক মশায় বলতে লাগলেন, বিপ্লবের আগেও তাঁর কবিতার তর্জমা হয়েছিল এদেশে। আমরা তাঁর নাম জানতাম, লেখা পড়েছি। একদিনের কথা মনে পড়ে। পনের জন লেখক মোটমাট বসেছি একসঙ্গে। টেগোর প্রাজ্ঞ-বেশে। বারবার দেখছি তাঁকে, দেখে দেখে আশ মেটে না। মনে হল, প্রফেট। তাঁর মুখ-চোখ দাড়ি-পোশাক সব মিলিয়ে অপরূপ মনে হচ্ছিল। মৃদুস্বরে কথা বলছেন। সব চেয়ে আশ্চর্য, সঙ্গীতের মতো সেই কণ্ঠ। দু-ঘণ্টা ধরে চলল। আমাদের ভয় হচ্ছে, ক্লান্ত হয়ে পড়বেন তিনি। কিছু না। মস্কো তখন প্রায় এক বড়-গ্রামের মতো। এত বড় বৃহৎ দেশের রাজধানী এই—তিনি কিন্তু হতাশ হননি। মস্কোর লোকের খুব প্রশংসা করতেন। লেনিনগ্রাডে যাবার কথা, কিন্তু শরীরের জন্ত শেষ অবধি ঘটে উঠল না।

ভারি এক মজা হল সেই সময়। বৃদ্ধ বলতে বলতে হেসে উঠলেন: কেমন করে রটে গেছে, গির্জার এক পাদরিকে লুকিয়ে রেখেছি আমরা ঐ বাড়িতে। টেগোরের দাড়ি ও লম্বা পোশাক দেখে ভেবেছে তিনি পাদরি। বিপ্লবের জের আছে তখনো, পাদরি-পুরুতের উপর লোকের রাগ। বড়লোকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পুরানো ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় ছিল তারা। জনতা একদিন হামলা দিয়ে পড়ল। আমরা বলি, মস্তবড় কবি—ভারত থেকে এসেছেন, মহামান্ত অতিথি। তখন বলে, দেখতে দাও আমাদের ভাল করে। টেগোর উপরের বারাণ্ডায় এলেন। সকালবেলা, রোদে চারিদিক ভরে গেছে, তার মধ্যে ঐ সুঠাম সৌম্য দীর্ঘ-দেহ এসে দাঁড়ালেন। মুগ্ধ জনতার জয়ধ্বনি উঠল। তখন আবার নতুন উপসর্গ—রোজ এসে ভিড় করে: টেগোরকে দেখব। কবি বারাণ্ডায় বেরিয়ে আসেন, দেখে পরিতৃপ্ত হয়ে লোকে ফিরে যায়।

'রাশিয়ার চিঠি'র কথা তুললাম আমি। কবিগুরুর রাশিয়ায় আসা সার্থক হয়েছিল। কী আশ্চর্য সুন্দর ভাবে কত সংক্ষেপে এই দেশ ও আপনাদের কথা লিখে গেছেন। বইটার ইংরেজি হয়েছিল, কিন্তু শুনতে পাই বিলাতে প্রচার বন্ধ। আপনাদের রুশ-অনুবাদ নেই?

তাঁরা প্রায় আকাশ থেকে পড়েন: না—নেই তো। সে বইয়ের অনুবাদ পড়িনি আমরা।

আমার কাছে আছে এক কপি। আমার নিজের কয়েকটা বই আপনাদের জন্ত নিয়ে এসেছি, সেই সঙ্গে ওটাও দিয়ে যাব।

নিশ্চয় দেবেন, ভুলবেন না। আমরা তর্জমা করে ফেলব।

কাগজে দেখছি, 'রাশিয়ার চিঠি'র রুশ-অনুবাদ হয়েছে। আমার সেই কপি থেকেই হয়েছে কি না, বলতে পারিনে।

এইবারে সেই লেখকের নিজের কথা: ১৯২০ অব্দে কাবুল গিয়েছিলাম কূটনৈতিক কাজে। ভারতীয় কাগজ পড়তাম। ব্রিটিশের সঙ্গে লড়ছিলে তখন তোমরা। সেই সময়টা পেশোয়ার যাবার চেষ্টা করেছিলাম। আমি ফরাসি বলতাম। আমায় জবাব দিল: ভাইসরয়ের অফিস যতদিন সিমলায় আছে, তোমাদের কখনো অত দূর যেতে দেব না। আমি বলেছিলাম, অফিস আর কদ্দিন থাকে, তাই দেখ; তোমরা চলে গেলে তার পরে যাব। হয়েছেও তাই —তারা চলে গেছে। কিন্তু আমি যে বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি, কোথাও যাবার ক্ষমতা নেই। মনে মনে ভারত ঘুরি এখন। ভারতকে খুঁজে বেড়াই নানা বইয়ের মধ্যে। ভাবার অসুবিধা। ভারতের অনেক—অনেক বইয়ের তর্জমা হওয়া দরকার।

সম্ম একটা বই বেরিয়েছে—ভারত ও পাকিস্তানের গল্প। এর কথা আগে শুনেছেন। একজনকে বলি, সূচিটা পড় দিকি, কার কার গল্প নিয়েছে। যশপালের আছে গোটা চার-পাঁচ, কৃষাণচাঁদ, মুলুকরাজ—ওঁদের সব আছে। অজানা নামও অনেক। বাঙালি শুধু একজন—ভবানী ভট্টাচার্য। তিনি বাংলায় লেখেন না, থাকেনও না বাংলায়।

কী মশায়রা, বাংলার উপরে বিতৃষ্ণা কেন? বাংলা ছোটগল্প ভুবনের যে-কোন দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। তার একটারও ঠাঁই হল না?

আমাদের আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও হাঁ-হাঁ করে সায় দেন।

ওঁরা লজ্জা পেলেন। বলেন, জানতে পারিনে—খবরবাদ পাইনে তেমন-কিছু। আপনাদের তরফ থেকেও সাহায্য পাইনি। বরঞ্চ মনে হয়েছে, টেগোর তিরোধান করেছেন—বাংলা-সাহিত্যও গেছে সেই সঙ্গে।

বাঙালি লেখকদের কিঞ্চিৎ উদ্যোগী হতে বলি। আমাদের প্রচার নেই। দুনিয়া ছোট হয়ে গেছে। আপনার সাধনার ধন শুধু স্বদেশের ক'টা মানুষের মধ্যে আটক থাকবে কেন? বাইরে ছড়িয়ে দিন। বম্বে ও দিল্লির দিকে নজর তুলে দেখুন না একটু। সামান্ত সম্বল নিয়ে কত জনে কী ঢাকই না বাজাচ্ছেন!

আপনি যত জাঁদরেল মানুষ হোন, সোবিয়েত দেশ থোড়াই কেয়ার করবে যতক্ষণ না কোন কর্মিক-সংঘ পিছন থেকে আপনাকে ঠেলে দিচ্ছে। একলার

খাতির নেই—এক-গলায় অনেকের কথা বলুন, তবে শুনবে। যত রকম পেশা থাকতে পারে, সব পেশার লোক এক এক ইউনিয়ন গড়ে বসে আছে। তারাই আসল। ইউনিয়নগুলোকে হাত করে নিন, সারা সোবিয়েত দেশ তবে আপনার মুঠোর ভিতর।

ইউনিয়নের বড়-অফিসে চলেছি দুপুরের খানাপিনার পর। মস্কো শহরের সীমানা ঘেঁসে নতুন য়্যুনিভার্সিটি-পাড়ায়, লেনিন-পাহাড়ের দিকে। সেণ্ট্রাল কাউন্সিল অব ট্রেড-ইউনিয়নস। উঠানে পা দিয়েই চোখের মণি গর্ত থেকে ঠিকরে বেরবার জোগাড়। সশব্দে একজনে বলে উঠলেন, ওরে বাবা, এই হল ট্রেড-ইউনিয়নের বাড়ি—রাষ্ট্রপতি-ভবন নয়? ইউনিয়ন অফিস বলতে আমরা বুঝি, নিচু-ছাত ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভাপসা গন্ধ-ওঠা ঘরের মধ্যে হাতল-ভাঙা খান দুই চেয়ার ও নড়বড়ে টেবিল। চেয়ার ও মেঝের উপরে কয়েকটি মানুষ এবং দেয়াল-ভর্তি আরশুলা। আর এখানে কী কাণ্ড!

চারতলায় উঠে গেলাম লিফটে। নানান বিভাগ—অসংখ্য ঘর। ঝকঝক তকতক করছে। আসবাবপত্র একেবারে হাল ফ্যাশানের। বসে বসে কাজ করার মধ্যে যতখানি সুখ নিতে পারা যায়, সকল ব্যবস্থা করে রেখেছে।

সোবিয়েত ট্রেড-ইউনিয়ন জনসাধারণের সংস্থা। বেকার নেই, সক্ষম মানুষ মাত্রই কাজ পেয়েছে। যে-কেউ মেম্বার হতে পারে—কারখানার কর্মিক, অফিসের কেরানি, কারিগরি ও উঁচু ক্লাসের ছাত্র—সবাই। জাতি-বৃত্তির বাছবিচার নেই। ইস্কুলের মাস্টার, খনির শ্রমিক, বইয়ের লেখক, গাড়ির ড্রাইভার—সকলের আলাদা ইউনিয়ন; ইচ্ছে করলে যে কেউ মেম্বার হতে পারেন নিজ ইউনিয়নের।

সমস্ত ইউনিয়ন থেকে মেম্বার বাছাই করে নিয়ে আবার এক সংস্থা গড়ে, তার নাম সুপ্রীম ট্রেড-ইউনিয়ন। ওদের ভিতরে ভোট নিয়ে হয় সেনট্রাল-কাউন্সিল। সকলের বেশি ক্ষমতা এই কাউন্সিলের—তাবৎ ট্রেড-ইউনিয়নের মধ্যে যোগাযোগ-সাধন হল এদের প্রধান কাজ।

সরকারি ও আধা-সরকারি যাবতীয় ইলেকশনে ট্রেড-ইউনিয়নগুলোর বিস্তর প্রভাব। অগুন্তি মেম্বার। কর্মিকদের ভাতডালের ব্যবস্থা করেই দায়খালাস নয়। তীক্ষ্ণ নজর থাকে, কর্মিকরা যাতে ষোল-আনা মানুষ হয়ে জীবন কাটায়—শুধুমাত্র কাজের যন্ত্র না হয়ে ওঠে। এই কাউন্সিলের ব্যবস্থায় হাজার হাজার সংস্কৃতি-ভবন (Palace of Culture) চলছে। তা ছাড়া ছোটখাট ক্লাব যে কত, গণে শেষ হবে না। কর্মিক ও তার পরিবারের হরেক রকম খেলাধুলা পড়াশুনা ও ফূর্তিফাত্তির ব্যবস্থা। ক্লাবে এসে তারা ছবি

আঁকে, ফোটো তোলে, দরজির কাজ শেখে, তাস-দাবা খেলে, থিয়েটার করে, সিনেমা দেখে। গুণীজ্ঞানীরা এসে শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বক্তৃতা দিয়ে যান। প্রতি ক্লাবের সঙ্গেই শিশুকেন্দ্র—ছেলেপুলেদের শিক্ষা শরীর-চর্চা ও আমোদের ব্যবস্থা। বহু সহস্র লাইব্রেরি চালায় কাউন্সিল। তা ছাড়া সরকারি লাইব্রেরি ও ইস্কুল-কলেজের লাইব্রেরি আলাদা তো আছেই। লড়াইয়ের সময় হিটলারের দল বিস্তর জায়গা দখল করে নিয়েছিল, অনেক লাইব্রেরি পুড়িয়ে দিয়েছিল, তারপর সেই সব লাইব্রেরি আবার নতুন করে গড়তে হয়েছে।

লড়াইয়ে বাড়ি ভেঙে চুরমার করেছিল, এখন দেদার বাড়ি বানাচ্ছে কর্মিকদের বসবাসের জন্য। কর্মিকের প্রয়োজন মতো ঘরবাড়ি বন্দোবস্ত করে দেওয়ার কাজও ট্রেড-ইউনিয়নের। মাইনে-করা ইউনিয়নের ডাক্তার—কর্মিকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুফতে রোগি দেখে বেড়ান। ইউনিয়নের ইনস্পেক্টররা—পাকা লোক দেখে এই কাজে দেয়—তদারক করে বেড়ান, কর্মিকদের স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটছে কিনা কোথাও। প্রায় হাতে-মাথা-কাটার ক্ষমতা ওঁদের—দরকার হলে ফ্যাক্টরির কাজকর্ম থামিয়ে দিয়ে মামলা আনতে পারেন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। দোষত্রুটি সামলানোর জন্য, এমন কি, ফ্যাক্টরি-চালনা সরাসরি নিজ হাতে নিয়ে নিতে পারেন সাময়িক ভাবে। কর্মিকরা গোলমাল না করে, সেটাও দেখেন ওঁরা; গণ্ডগোল জমে ওঠবার আগেভাগে মিটমাটের ব্যবস্থা করেন সকলকে এক জায়গায় এনে বসিয়ে। ওভারটাইম কাজ করার নিয়ম নেই। কিন্তু জরুরি ব্যাপারে কখনো-সখনো বিশেষ হুকুম আসে। তখনও ইনস্পেক্টর নজর রাখবেন, কর্মিকদের শরীর খারাপ না-হয়ে পড়ে। পেনশন পায় সকল কর্মিক—পুরুষের ষাট আর মেয়ের পঞ্চান্ন বয়স হলে। কয়লার খনিতে যারা কাজ করে তাদের পেনশন অনেক আগে। পেনশন পেলেই যে কাজ ছাড়বেন, তার কোন মানে নেই। স্বাস্থ্য ভাল থাকলে চাকরি চালিয়ে যথারীতি মাইনে নেবেন, পেনসনের টাকাও আসবে।

অক্ষমতার পেনশন আছে। শরীর হঠাৎ অপটু হয়ে পড়লে পথে বসতে হবে না। সংসার-পোষণের দায়ঝক্কি থাকলে পুরো মাইনে পাবেন কাজকর্ম না করেও। অন্যথা মাইনের চার ভাগের তিন ভাগ। ভারী কাজ করতে পারছেন না, কিন্তু হালকা কাজের শক্তি আছে, এমন অবস্থায় মাইনের অর্ধেক দেবে, বাকিটা হালকা কাজ করে আপনি রোজগার করুন। চাকরির পঁচিশ বছর পুরলে মাস্টারমশায়রা পেনশন পাবেন। শক্তি থাকলে তারপরে চাকরিও চালিয়ে যাবেন পেনশনের সঙ্গে। সন্তান-প্রসবের সময় মেয়ে-কর্মিকরা যাবতীয় খরচখরচা পায়। এবং সাতাত্তর দিনের ছুটি। কোন কর্মিকের ধরুন শরীর খারাপ হয়ে

৬০

পড়েছে, তার জন্ত বলকারক হালি খাত্ত চাই। কিংবা একটা ছেলে একম পড়াশুনোয় কৃতিত্ব দেখিয়েছে, বৃত্তি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করতে হবে। ইউনিয়ন আলাদা ফাণ্ড জমিয়ে রেখেছে এই সব বাড়তি ব্যবস্থার জন্ত।

হাজার হাজার স্যানিটোরিয়াম ও বিশ্রামস্থান আছে ইউনিয়নগুলোর তাঁবে —পাহাড়ের উপরে সমুদ্রের কিনারে ভাল ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গায়। কর্মিকরা সেখানে মুফতে থাকতে পায়। এক মাস থাকবে—তার মধ্যে কারখানায় ছুটি মেলে আঠারো দিনের; সোস্তাল ইনস্যুয়েন্স-ফাণ্ড থেকে বাকি বার দিনের মাইনে দিয়ে দেয়। কর্মিকদের স্বাস্থ্য ও আনন্দের জন্ত নানারকম চেষ্টা—তার ফলে উৎপাদন বাড়ে, জিনিসপত্রের দাম কমে। কর্মিকদেরও মাইনে বেড়ে যায়। কর্মিকের পরিবার খুব বড় হলে সে ক্ষেত্রে বিশেষ ভাতা। ছেলেপুলের মধ্যে ইস্কুল-কলেজ ও য়্যুনিভার্সিটির ছাত্র থাকলেও বেশি টাকা। জাতীয় আয়ের সত্তর ভাগ জনসাধারণের কাছে ফিরে আসবে, এই হল আর্থিক ব্যবস্থা ওদের।

ধর্মঘটের কথা কখনো শুনিনে আপনাদের দেশে। কড়া আইন আছে বুঝি?

কার বিপক্ষে করবে বলুন ধর্মঘট? মালিক বলে আলাদা কোন দল নেই, নিজেরাই সব। ধর্মঘট তবে নিজেদের বিরুদ্ধে? সোবিয়েত দেশটাই হল এক সুবৃহৎ পরিবার। কত রকমের সমস্যা ওঠে। তেমনি সমাধানও করে নেয় নিজেরা বুঝসমঝ করে। চাকরি যাওয়া খুব কঠিন এদেশে; অতি-বড় অপরাধ করলে কালেভদ্রে চাকরি যায়। শোষণের মানুষ না থাকায় তিক্ততার কারণ ঘটে না কোন সময়।

ছুটলাম ওখান থেকে শহরের ভিতর দিকে। আর এক বড় প্রতিষ্ঠান—গর্কি ইনষ্টিট্যুট অব ওয়ার্লড-লিটারেচারস। ডিরেক্টর হলেন অ্যানিসিমভ, চীনে যাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সোবিয়েত-দলের নেতা হয়ে তিনি চীনে গিয়েছিলেন। সে কথা কি আর মনে আছে এত দিন পরে? দ্বিধা ভরে দোভাষিণীর মারফতে শুধালাম: মনে পড়ে আবছা রকমের কিছু? অ্যানিসিমভ গড়গড় করে একগাদা জবাব দিয়ে চললেন, দোভাষিণী ইংরেজি করে দিল: মনে পড়বে না কি বলছ? সাংহাইয়ে বক্তৃতার কমপিটিশন হল যে তোমার সঙ্গে! জিত তোমারই—হাততালির চোটে কানের পর্দা ছিঁড়ে যায়। তৎক্ষণাৎ আমি না-না—করে উঠি: আজ্ঞে না, তাহা মিথ্যে বলা হচ্ছে। তোমার বক্তৃতায় এমন হাততালি, আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে গিয়ে বৃষ্টির তোড়ে সৃষ্টিসংসার লণ্ডভণ্ড করে দিল। 'চীন দেখে এলাম' বইয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা আছে। পাকে-চক্রে আমিও সেই সময় ভারতীয় দলের নেতা হয়ে পড়েছি। কিন্তু বক্তৃতায় ঐ ব্যাপারগুলো

আগেভাগে বানানো নিতান্তই কাগজে-লেখা বস্তু—বাহাদুরি কারো নেই। না আমার, না অ্যানিসিমভের।

অ্যানিসিমভ তারপরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন। মনে নেই যে বলছ, দেখে যাও এদিকে এসে।—এসো।

দেয়ালজোড়া বইয়ের তাক। একটার সামনে দাঁড় করালেন। ওঁর হাতে সেই সময় একগাদা বই দিয়েছিলাম। তার একটাও অন্য কোথাও দেন নি। নিজের ইনস্টিট্যুটে সাজিয়ে রেখেছেন। কেমন জায়গায় ভাবতে পারেন? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। বাংলার লেখক আমরা তা হলে মোটামাট দু-জন—রবীন্দ্রনাথ এবং এই অধম। আপনারা দূর-ছাই করেন, আর এত দূরে কী পশার জমিয়ে আছি, ভাবুন একবার। এবং হিংসায় জ্বলে মরুন। ইতিমধ্যে অনেক দিন কেটেছে, আরও অনেকে নিশ্চয় জুটে পড়েছেন সেখানে। বেশ দিব্যি ছিলাম নিরালায়, কবিগুরুর পদপ্রান্তে। এখন ভিড় জমে গেছে।

গর্কির নামে প্রতিষ্ঠান—গর্কি-সম্পর্কীয় যত-কিছু এই এক জায়গায় সংগ্রহ করে রাখছে। হরেক পাণ্ডুলিপি একটা ঘরে—জানলা নেই, ভারী দরজা, দেয়াল অনল-পুরু। হাতের কাছে টুকরোটাকরা যে কাগজ পাওয়া গেছে, তার উপরেই গর্কি কলম চালিয়েছেন। আবার চওড়া মার্জিনে গোটা গোটা অক্ষরের পাণ্ডুলিপিও দেখছি। পরের পাণ্ডুলিপিও যত্ন করে দেখে কাটকুট করে দিতেন—নিদর্শন শত শত রয়েছে। চিঠিপত্রের সংগ্রহ—চেকভকে লেখা চিঠি, চেকভ তার যে উত্তর দিয়েছেন। বিপ্লবী শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার চিঠি, ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ইউরোপের এখান-ওখান থেকে শ্যামজী চিঠি দিতেন গর্কিকে।

গর্কির জিনিষপত্রের ভাণ্ডারই শুধু নয়—তাবৎ সাহিত্যের গবেষণাগার। জাতবেজাত ভুলে দুনিয়ার সমস্ত সাহিত্য এই আখড়ায় জমায়েত হবে—গর্কির সেই মনোবাসনা। ইনস্টিট্যুট অব ওয়ার্লড লিটারেচারস নামকরণ গর্কিরই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর আদর্শ ঠিক করেছিলেন 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'—এখানেও সেই এক বস্তু।

তিরিশ ভল্যুমে গর্কির যাবতীয় বই বেরুচ্ছে। অতিরিক্ত এক ভল্যুম হবে গর্কির চিঠিপত্র।

ইংরেজি-সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয়েছে বৃহৎ পাঁচ ভল্যুমে। ফরাসি ও জর্মন সাহিত্যের ইতিহাসও তৈরি হচ্ছে। সোবিয়েতে মোটমাট যতগুলো ভাষা চলে, প্রতিটি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, প্রতিটি সাহিত্যের ইতিহাস লিখছে। দেশের পুরানো রূপকথা নিয়েও জোর গবেষণা চলেছে।

॥ সাতাশ ॥

ক্রেমলিনে চলেছি। কত শত বার গেছি সামনে দিয়ে, আজকে ভিতরে যাব। রেড-স্কোয়ারের সামনে সদর গেট—ঐ পথে আমাদের ঢুকতে মানা। বিস্তর কড়াকড়ি। ভিতরে ঢুকে তার পরেও সর্বত্র চলাফেরা করতে দেবে না। লেনিন যেখানে থাকতেন, হাল আমলের কর্তারা থাকেন যেদিকটায়—দূর থেকে নজর করে যেটুকু যা দেখতে পান, কাছে যেতে দেবে না। অনেকটা পথ হাঁটতে হাঁটতে মস্কো-নদীর ধারে পড়েছি। ক্রেমলিনের অন্তদিকে নদী। নদীর কিনারে ছোটখাট এক দুর্গ—তখন কেউ ভেবেছে, এত বিশাল হয়ে উঠবে কালক্রমে? এত খাতির, এমন নামডাক?

সাতপাহাড়ের উপরে মস্কো শহর। যে পাহাড় তার মাথা সকলের উঁচু, ক্রেমলিন সেখানে। শহর পত্তনের একেবারে গোড়ায় ক্রেমলিন; তাকে ঘিরে দোকানপাট ব্যাপারবাণিজ্য ও লোকবসতি ক্রমশ জমে উঠল। ছোট্ট এক দুর্গ—বারম্বার চেহারা পালটে আজকে অভিনব ও বিরাটকায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোবিয়েত-সরকারের মূল ঘাঁটি; যত-কিছু শলাপরামর্শ বিবেচনা এখানে বসে হয়। ভারি ভারি রাজনীতিক সভা এখানে—আমাদের পণ্ডিতজীকে নিয়েও হয়েছিল। টানা উঁচু পাঁচিল—বিস্তর ঘরবাড়ি মাথা তুলে আছে ভিতরে। আকাশ-ছোঁওয়া বড় বড় গির্জা। পাঁচিলের উপরে মাঝে মাঝে চূড়া উঠে গেছে; চূড়ায় লাল-তারা। এই হল ক্রেমলিন। মস্কো শহর, তাবৎ সোবিয়েত দেশ এবং নিখিল ভুবন দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছে রহস্যময় ক্রেমলিনের দিকে। বিরাট স্থাপত্য—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশাল হয়েছে।

ক্রেমলিনের ভিতরে দেশের প্রাচীনতম মিউজিয়াম। বড় বড় শিল্পীর মূল্যবান অজস্র ছবি—বহুবিচিত্র শিল্পভাণ্ডার। ঐতিহাসিক বস্তুর বিপুল সংগ্রহ। তাবৎ রুশশিল্প, তার বিকাশ ও ক্রমোন্নতি এই একটা জায়গা থেকে মালুম হবে। ধাতব ও কুটিরশিল্প, হাতের কাজ, কাঠের কাজ—এবং সোনারুপোর কাজ বিশেষ করে।

ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের সঙ্গে শিল্পরীতির কত রদবদল হয়েছে, নিতান্ত উদাসীন লোকেরও নজরে না পড়ে উপায় নেই। এগারো শতক থেকে এই বিশ শতক—সাত-শ বছরের ধারবহতা ছবির মতন দেখবেন। রাজা-রাজপুত্র

রাজবধূ-রাজকন্যা সামন্ত-সেনানীদের যাবতীয় বিলাসভূষণ ও শিল্পসম্পত্তি সোবিয়েত আমলে এইখানে এনে জমা করেছে।

পিটার দ্য গ্রেটের তৈরি মিউজিয়াম। এক দিকে অস্ত্রাগার—জার এবং সেনানী-সামন্তদের। ষোল কিলোগ্রাম ওজনের ভারী অস্ত্রও আছে। রকমারি শিরস্ত্রাণ। বক্ষোভূষণ মণিমুক্তাখচিত। বিচিত্র কারুকর্মের বন্দুক—ষোল শতকের। তলোয়ার—পিটার দ্য গ্রেট ভারতীয় তলোয়ার ও ছোরা ব্যবহার করতেন, তা-ও রয়েছে। তলোয়ারের বিচিত্র খাপ। নানা রকম যুদ্ধের বাজনা সেকালকার। ঘোড়ার বর্ম, মানুষের বর্ম। পনের-ষোল শতকের বাসনকোশন। সোনার থালা। সোনা ও রুপার হরেক পাত্র—নাম বলতে পারব না। একটা পাত্রে সোনার ওজন পাঁচ সের হবে অন্তত। হাতির দাঁতের কৌটা। সোনা ও মণিমুক্তা-খচিত কৌটা। ঘড়িই বা কত রকমের! কাঠের ঘড়ি—স্প্রিংটুকু মাত্র ধাতুর। আর এক ঘড়ি—আকারে বিশাল, মণিমাণিক্যে রৌদ্রের আভা বেরোয়, ঘণ্টা বাজলে ঈগলপাখি মুক্তা ফেলে দেয় মুখ থেকে—দরজা খুলে যায়, যে ক'টা বাজল, সেই অক্ষর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। পিটার দ্য গ্রেটের মদ্যপাত্র, পোশাক। মণিমুক্তা-গাঁথা কত রকমের পোশাক—একটা পোশাকের ওজন প্রায় তিরিশ সের, এই গায়ে দিয়ে চলাফেরা করতেন। সোনার তৈরি মস্তবড় বাইবেল-কেস। বাইবেলের খাপ একটা-দুটো নয়—অনেক। রাজ-মুকুট, অভিষেকের জিনিসপত্র। হাতির দাঁতের সিংহাসন; মণিমুক্তা-বিজড়িত সিংহাসন। পিটারের বাপ রোমানভের সিংহাসন—চারটে হাতি চতুর্দিকে, বিস্তর কারুকার্য। সিংহাসনটা তৈরি হয়েছিল ভারতে; পারস্যের বণিকেরা কিনে নিয়ে উপহার দেন।

ঘোড়ার রাজকীয় সাজ, ঘোড়ার গায়ে দেবার জন্য পালকের কম্বল। সতের ও আঠার শতকের ঘোড়ায়-টানা গাড়ি। নানা জায়গা থেকে উপহার এসেছিল এসব। শীতে বরফের উপর দিয়ে নিয়ে যাবার স্লেজগাড়ি। রানীর শীতকালের গাড়ি—বাইশ ঘোড়ায় টানত, পিটার্সবার্গ থেকে মস্কো পৌছতে লাগত তিন দিন। দ্বিতীয়-ক্যাথেরিনের বিশেষ এক ধরনের গাড়ি, ফ্রান্সে তৈরি; দরাজ ভাবে স্প্রিং দেওয়ার দরুন গাড়ি দুলতে দুলতে চলে।

সারা বেলাও দেখে শেষ করতে পারিনে। কত আর টুকব? ক্লান্ত হয়ে এক সময়ে হাল ছেড়ে দিতে হয়।

বলেছি তো, এই ক্রেমলিনের ভিতরে খাসা খাসা গির্জা। জার থাকতেন না এখানে—করোনেশনের সময় এবং অবরেসবরে আসতেন। খোদ জার-জারিনা এবং তাঁদের ছেলেপুলে উজির-নাজির পুরুত-পাণ্ডার ধর্মকর্মের ক্যাথিড্রাল—

অতএব অতিশয় শৌখিন। উসপেনস্কি ক্যাথিড্রালের ১৪৭৯ অব্দে পত্তন। বলগোভেশ্চেন্‌স্কি ১৪৮৯ অব্দে এবং আর্কএঞ্জেল ১৫০৯ অব্দে বানানো। এদের স্থাপত্য ও দেয়াল-ছবিগুলোয় একবার নজর বুলিয়ে তাজ্জব হয়ে আসুন। আশ্চর্য অনেক ছবি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, শিল্পীরা খেটেখুটে উদ্ধারকর্ম শেষ করে ফেলেছেন।

তারপরে দেখুন ঢালাইয়ের কাজকর্ম। জারের কামান—কাঁসার কাছাকাছি একরকম মিশ্রধাতুতে তৈরি (১৫৩৬ অব্দ)। কারুকার্যে ভরা, বিরাট চেহারা, ওজনে চুয়াল্লিশ টন। বড় বড় শেল পাঁচশ মিটার অবধি যেতে পারে এই কামানে। তাতারের আক্রমণ ঠেকাবার জন্ম বানানো। কিন্তু শেষ অবধি ব্যবহারের দরকার হয়নি।

পৃথিবীর সাত আশ্চর্যের একটা আমি আগে দেখে এসেছি—চীনের মহা প্রাচীর। আর একটা এই এখানে—দৈত্যাকার ঘণ্টা। বেড় হল ছয় মিটার ষাট সেন্টিমিটার; ওজন দু-শ টন। দুনিয়ায় এর জুড়ি নেই। জারের ঘণ্টা—গ্রানাইট বেদির উপর রেখেছে, উপরে জারের ছবি। রুপা-তামা ইত্যাদি নানান ধাতু মিশিয়ে তৈরি। কারিগরের নাম আইভান মোটোরিন ও তার ছেলে মিখাইল। ১৭৩৩-৩৫ অব্দে এখানে এই ক্রেমলিনের ভিতরে তৈরি। ঢালাই হয়ে গেলে ঘষামাজার জন্ম ক্রেমের উপর তোলা হল। সেখানে কাজকর্ম চলতে লাগল। ১৭৩৭ অব্দে মস্কোয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ঘণ্টা আগুনে বিষম তেতে গেল; কাঠের ক্রেমও পুড়ে ছাই। ঘণ্টা পড়ল গিয়ে নালার মধ্যে—মস্কো-নদীর জলে ভরতি সেই নালা। গরমে-ঠাণ্ডায় ফেটে চৌচির। একটা টুকরো আলাদা হয়ে পড়ল, তার ওজন সাড়ে এগারো টন। পুরো একশ বছর ঐ নালায় পড়ে ছিল; ১৮৩৯ অব্দে তুলে নিয়ে পাথরের বেদি গেঁথে তার উপর রেখে দিয়েছে। টুকরোটা পাশে।

আজকে আমার বক্তৃতা। বিকালবেলা, ভোকস-অফিসে। সাংস্কৃতিক দলের হয়ে এসেছি—ঘোরাফেরা এবং খানাপিনা করে গেলেই হল না, ট্যাক্স দিয়ে যাও। সাংস্কৃতিক বচন শোনাও কিছু। তাতে ডরাই নাকি? গণ-তন্ত্রের যুগে সাহিত্যিক হয়ে আগডম-বাগডম লিখলেই শুধু চলে না, বলতে হয় দেদার। ভেবেছিলাম, বলব আধুনিক বাংলা উপন্যাস নিয়ে। গতিক বুঝে বিষয় পালটেছি—'গণজীবনে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব'।

কেন শুনুন। বাংলা সাহিত্য নিয়ে আপনারা জাঁক করেন। জাঁক করবার বস্তুই বটে। বহু সাধকের জীবন-সাধনায় মহাসাহিত্য গড়ে উঠেছে।

কিন্তু খবর রাখেন, বাহিরের কেউ আপনাদের পৌঁছে না ? এই রাশিয়াতেই দেখলেন গল্প-সংকলনের ব্যাপারে। ভারত-পাকিস্তানের গল্প বাছাই হল, তার মধ্যে বাংলা ভাষায় লেখা একটি গল্প নেই। সাহিত্য-দিক্‌পালদেরই প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যও মরে গেছে নাকি ? বুঝুন। মুশকিল হয়েছে, বাংলার কেউ ইংরেজিতে লেখেন না। লিখতেই বা যাবেন কেন ? এমন স্বচ্ছ প্রাণবন্ত ভাষা আমাদের, মনের গূঢ় ভাবরাজি ভাষায় এঁকে অতি সহজে প্রকাশ করিতে পারি। আর ওদিকে দেখুন, শফরীকুল শুধুমাত্র ইংরেজি লেখার গুণে আন্তর্জাতিক বাজারে শাহান শা হয়ে বসেছেন। স্বচক্ষে দেখে এলাম। শুধু এই সোবিয়েত দেশের ব্যাপার নয়, তামাম্ ইউরোপে চক্কোর দিয়ে দেখেছি—শরৎচন্দ্রের নামটাও জানেন না বিস্তর সাহিত্য-ধুরন্ধর। দুনিয়া ছোট হয়ে একেবারে ঘরের উঠানে এসে বসল—সেদিকে চোখ-কান বুঁজে থাকবেন আপনারা কত দিন ?

তা খোলাখুলিই বলি—বক্তৃতার এই যে নতুন বিষয়টা নিয়েছি, কিঞ্চিৎ যেন চোখ-রাঙানি এর ভিতর। বাপু হে, সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কথা বলে থাক, দাওয়াত দিয়ে এনে যত্নআত্তি করছ সেই বাবদে—কিন্তু বাঙালি জাতের মন পাবে না বাংলা-সাহিত্যের অবহেলা কর যদি। বাঙালির বড় গর্ব তার সাহিত্য নিয়ে। ভাষার জন্ম বাঙালি প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে, পৃথিবীর কোন তল্লাটে যা আর কখনো ঘটে নি।

গণজীবনে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব—পূর্বাপর একটা ইতিহাস দাঁড় করানো কঠিন ব্যাপার, বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়। দূর বিদেশে ঘোরাঘুরির মধ্যে অবসর কোথায় তেমন ? আর ফরমাস মতো বইপত্রই বা কে দেবে জুটিয়ে ? বক্তৃতা শুনবেন এখানকার সেরা মানুষরা। তবে সুবিধা আছে। জ্ঞানীগুণী তাঁরা যতই হোন, বাংলা সাহিত্যের কিছু জানেন না—নীরন্ধ্র অন্ধকার দৃষ্টির সামনে। অতএব শ্রীমুখে যা উচ্চারণ করব, তাই প্রায় বেদবাক্য ওঁদের কাছে। আপনাদের সামনে হলে—ওরে বাবা, কপালে ঘাম দেখা দিত, উ-আঁ করতাম বিশ বার—কাঠগড়ায় যেন খুনি আসামি। মস্কো শহরে কিসের পরোয়া ? ভাগ্যক্রমে পাণ্ডিত্য দেখাবার মওকা এসে গেছে, আপনারা মুখ বাঁকাবেন না এই নিয়ে।

গোড়া ধরে শুরু করা গেল—চর্যাপদ থেকে, বাংলা-সাহিত্যের যা প্রথম নিদর্শন। সাধনার এক বিশেষ ধারা নিয়ে ঐসব কবিতা—এবং সে ধারা গণসমাজেই। গণমানুষের অগণ্য জীবনচিত্র—জাল ফেলে মাছধরা, হরিণ-শিকার, ডোম-চণ্ডাল-শবরের ঘরবাড়ি, অনুরাগ-বিরাগ গীতিকাব্যের মধ্যে যেন বিজলী-চমক দিচ্ছে।

তুর্কিরা বঙ্গদেশ জয় করল। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়। সমাজের মাথায় থেকে যাঁরা শাসন করতেন, ক্ষমতা হারিয়ে তাঁরা সাধারণের মধ্যে নেমে এলেন। সংস্কৃত সাহিত্য এতাবৎ উঁচু শ্রেণীর একচেটিয়া ছিল, সেই সাহিত্য অতঃপর লৌকিক রূপ পেতে লাগল। ফলে বাংলা সাহিত্য লাভবান হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত সর্ববোধ্য সহজ রূপ নিয়ে হাটে মাঠে ঘাটে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল; উন্নত সংস্কৃতির ফটক খুলে গেল গণমানুষের সামনে। তেমনি আবার বিস্তর লৌকিক ধর্ম ও লৌকিক আখ্যান মার্জিত সাহিত্যিক রূপ পেয়ে গেল বিভিন্ন মঙ্গল-কাব্যে। মানুষের কথায় ভরা এই কাব্যগুলি। দেবতারা আছেন বটে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে নিতান্ত ঘরোয়া সম্পর্ক তাঁদের। স্ত্রীর সঙ্গে কোন্দল, আধিপত্য-বিস্তারের জন্য ছলাকলা, পেটের দায়ে অতি-সাধারণ বৃত্তি-গ্রহণ—মঙ্গল-কাব্যে মানুষ-দেবতায় ভেদ নেই।

দীন-চণ্ডীদাসের পদ আবৃত্তি করা গেল: 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' মানুষের উপর কেউ নেই, দেবতারাও নন—মানুষের মহিমা ঘোষণা করলেন বাংলার কবি। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ মাত্র নয়; বাংলার কবির মনের রঙে রাঙানো অনুপম সৃষ্টি। অনেক উপাখ্যান আছে, বাল্মীকির রামায়ণে যার নামগন্ধ নেই। অযোধ্যা আমাদের বাংলা দেশেরই কোন এক জনপদ—রাম-লক্ষ্মণ-সীতা যেন বাঙালি তরুণ ছেলেমেয়ে। জনজীবনে কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিশেষ প্রভাব। বাংলার কুমারী মেয়ে কামনা করছে, সীতার মতন সতী হই, রামের মতন পতি পাই, দশরথের মতন শ্বশুর পাই, লক্ষ্মণের মতন দেবর পাই···

সুযোগ পেয়েছি, সহজে ছেড়ে দেব ওঁদের? বিস্তর বাগাড়ম্বর করে তো চৈতন্যযুগে পৌঁছানো গেল। নবীন গণতান্ত্রিকতার প্লাবন বাংলা সাহিত্যে। চিরকালের কবিরা অতীতকেই মনোরম করে আঁকেন, এঁরা কিন্তু পুরাণের বহুনিন্দিত পাপময় কলিযুগকে প্রণাম জানালেন—'প্রণমহ কলিযুগ সর্বযুগ সার।'

মাইকেল মধুসূদনের প্রায় সমস্ত বই দেখে এসেছি লেনিন লাইব্রেরিতে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙালি কবিদের মধ্যে মাইকেলকে জানে এরা। বোধকরি, শুধুমাত্র তাঁকেই। মাইকেল থেকে নবীন বাংলা সাহিত্যের কথা শুরু করা গেল। বাংলা সাহিত্য কালের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে, সেই জন্যে এই সাহিত্য জনমনে এমন জীবন্ত। 'মেঘনাদ বধে' কবি রামায়ণের কাহিনী কালের ছাঁচে ঢালাই করে নিয়েছেন—পুরানো নৈতিক মান এই কাব্যে একেবারে পালটে গেল। অনাচারী ঐশ্বর্যশালী রাবণ কবির কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে। 'বীরাঙ্গনা কাব্যের' নায়িকারাও চিরকালের রীতিনীতি মেনে নিতে

পারছে না—বিদ্রোহিনী তারা। কাব্যের বহিরঙ্গেও বিদ্রোহের ছাপ। পুরানো পদ্ধতির পয়ারগ্রন্থি ছেদন করে অমিত্রাক্ষর ছন্দে মাইকেল কাব্যলক্ষ্মীর শৃঙ্খল মোচন করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র। য়ুরোপীয় সংস্কৃতি আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল—বঙ্কিমের সাহিত্যে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা। ভারতের সাধনার পাদপীঠে য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা—বঙ্কিম-সাহিত্যের এই হল মর্মকথা। 'আনন্দমঠ' নামে উপন্যাসের একটা গান 'বন্দে মাতরম্'। বিপ্লবভূমি এই রাশিয়ায় হাজার হাজার তরুণ-তরুণী প্রাণ দিয়েছে মানুষের মুক্তি-সাধনায়। আমার ভারতবর্ষেও ঠিক তেমনি—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জন্য। বিশেষ করে বাংলায়। ফুলের মতো ছেলেমেয়েরা কারাগারে দ্বীপান্তরের নির্বাসনে ফাঁসির মঞ্চে গুলির মুখে দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শেষ-নিশ্বাসের সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করে মন্ত্রের মহিমা দান করে গেল তারা। 'বন্দে মাতরম্' সর্বভারতের জাতীয় মহাসঙ্গীত হয়ে উঠল।

বাংলার প্রথম কৃষক-অভ্যুত্থান নীল-বিদ্রোহে। শ্বেত-শোষকদলের বিরুদ্ধে নিরন্ন চাষীরা রুখে দাঁড়াল। দীনবন্ধু এই নিয়ে নাটক লিখলেন—'নীলদর্পণ'। আন্দোলন বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হল এই নাটকে। নীলকরের অত্যাচার-কাহিনী দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। শেষ অবধি ব্যবসা গুটিয়ে দেশে পালাতে হল নীলকরদের।

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে দু-চার কথায় কি বলা যায়? তাঁর সৃষ্টি দেশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আটক হয়ে থাকেনি, বিশ্বমানসের সঙ্গে তিনি জাতীয় মানসের আত্মীয়তা সাধন করলেন। বিজ্ঞানের দয়ায় দূর বলে কিছু নেই আজ দুনিয়ায়। সব মানুষের মধ্যে চেনা-পরিচয়, রাজনীতি অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সম্পর্কে সকলের যোগাযোগ। এই বিশ্বজনীনতার এক বিচিত্র উপলব্ধি এনে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। দেশে দেশে পরিভ্রমণ করে তিনি ভারতের চিরন্তন সৌভ্রাত্র ও শান্তির বাণী প্রচার করলেন।

শরৎচন্দ্র ও নজরুল ইসলামের কথা বলে ইতি করা গেল। বক্তৃতা বড় হয়ে যাচ্ছে, তা ছাড়া আর এগুলে বিপদ আছে। বইটই কিছু নেই হাতের কাছে—ভ্রম বশে হয়তো বা কারো নাম বাদ পড়ে গেল। টের পেলে খেয়ে ফেলবেন তাঁরা আমায়। উপসংহারে এসে পড়েছি: বাংলা দেশ আজ খণ্ডিত; নানা সমস্যায় জর্জর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। তবু এখনো বঙ্গের উভয় খণ্ডেরই জনজীবনে বাংলা সাহিত্যের অতুল প্রভাব। অন্নের মতোই বাঙালির কাছে বাংলা সাহিত্যের আবশ্যক। বঙ্গভাষীর সংখ্যা ভারতের মধ্যে অনেক

কম হয়ে গেছে, এতৎসত্বেও কলম মাত্র উপজীবিকা অনেক লেখকের ; পাঠকেরাই তাঁদের পোষণ করেন।

নিজের বুক ঠুকে বলি, দেখছেন এই অধীনকে। পাঠকেরাই খাওয়ান-পরান। চেহারা দেখে কি মনে হয়—খুব খারাপ খাওয়ান না তাঁরা, কি বলেন ?

হাসির তোড়ে ঘর ফেটে যায়। কিঞ্চিৎ গায়ে-গতরে আছি, সেটা দেখিয়ে আমার পাঠকদের মহিমা-কীর্তন হল। রোগা ডিগডিগে লেখকরা আছেন—ঐ আসরে ভাগ্যিস তাঁরা নেই। থাকলে মুশকিলে পড়তাম।

পূর্ব-পাকিস্তানের (এখন বাংলাদেশ) পুণ্যদিন একুশে ফেব্রুয়ারি। বাংলা ভাষার জন্য তরুণেরা প্রাণ দিলেন, রক্তের অক্ষরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁদের ভালবাসা লিখে গেলেন। দেশে দেশে স্বাধীনতা ও ধর্মের জন্য বহু জনে প্রাণ দান করেছেন। কিন্তু মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দেওয়া প্রথম ওই পূববাংলায় দেখা গেছে।

মোটামুটি এই হল বক্তব্য। সেই যে আমার ভাই, ভ্রাতুষ্ক ভানিয়েলচুক, রুশে তর্জমা করে বুঝিয়ে দিল। আপনারা কেউ ছিলেন না তো! ওরা কি বুঝবে—ফাঁকি দিয়ে কিছু তারিফ কুড়িয়ে নেওয়া গেল। আমার পরে হীরেন মুখুজ্জে মশায়—তিনিও বাংলা সাহিত্য নিয়ে বলবেন। তিনি ছিলেন না, অন্য কোন কাজে বেরিয়েছিলেন, বক্তৃতা শেষ হবার মুখে এসে পড়লেন। ছিলেন না ভাগ্যিস—পণ্ডিত মানুষ, অতুলন বক্তা, তাঁর সামনে কথাই সরত না মুখ দিয়ে। কামারের কাছে সুঁচ-চুরি চলে না। কোন সভায় একদিন বলেছিলাম, বাংলা সাহিত্য দুনিয়ার এক সেরা সাহিত্য। হীরেন্দ্রনাথ চুপি-চুপি সমঝে দিলেন : দুনিয়া অবধি টানেন কেন, বড্ড বাড়াবাড়ি, ভারত ধরেই না-হয় বলুন। আমি বলি, গতিক দেখছেন তো! সাহিত্যকে আকাশে তুলে দিয়ে চলে যাই—ওরা খানিকটা বাদসাদ দিয়ে নিচ্ছে, তারপরে যত দিন যাবে নামতে নামতে আকাশ থেকে ক্রমশ ধরালোকে এসে পৌছবে। এখনকার মতো পাতালের তলে আশাকরি মুখ থুবড়ে পড়বে না আবার। হীরেন্দ্রনাথ আন্দাজে ধরেছেন, কাঁপিয়েছি আজকেও। শুরু করলেন তাই নিয়ে : আমার বন্ধু বোস মশায় ভালবাসার উচ্ছ্বাসে বাড়িয়ে বলেছেন হয়তো—তা হলেও বঙ্গসাহিত্য…ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইংরেজিতে বললেন। সে বক্তৃতা টুকে আনি নি, টোকা অসম্ভব। খরস্রোতে ছুটে চলেছে। অপরূপ বাচনভঙ্গি, লেখায় তার কিছুই বোঝা যাবে

না—কানে শুনতে হয়, চোখের উপর দেখতে হয়। সেই অপরাহ্নে দূর বিদেশের অজ্ঞাত পরিবেশে দুই বাঙালি আমরা প্রাণ ভরে বাংলাসাহিত্যের গুণগান করলাম।

বম্বেতেও এত পালা দেখলাম, মস্কো-আর্ট-থিয়েটারে একদিন তো যাওয়া উচিত। কিন্তু দেশে ফেরার জন্য পা বাড়িয়ে আছেন, প্রস্তাব কেউ কানে নেন না। শেষ পর্যন্ত মোটমাট পাঁচ জন হলাম আমরা। আর দোভাষিণী ইরা—ইংরেজি করে বুঝিয়ে দেবার জন্য। পালা হল 'উষ্ণ হৃদি'। (Warm Heart) কিছু দিন আগে কালিদাসের নাটক হয়ে গেছে। সময় নেই যে রয়ে-বসে কোন ভাল পালা দেখব এখানে।

হলে ঢুকে রাগ হচ্ছে। আন্তন চেকভের মতো গুণী নিজে গড়ে তুললেন—জগৎজোড়া নাম—সে বস্তু হল এই? হালফিল আমাদের কলকাতার থিয়েটার যে রকম দাঁড়াচ্ছে—ভাল বই খারাপ নয় এর চেয়ে। সিনসিনারি আহা-মরি কিছু নয়। বম্বেই থিয়েটার চোখ ধাঁধিয়ে মাথা খারাপ করে দিয়েছে—এখানে, ভেবেছিলাম, না-জানি আরও কি দেখতে পাব! শুরুতেই মুষড়ে পড়েছি তাই।

প্রেমের গল্প। হাসি-রহস্যও খুব। উনিশ শতকের পরিবেশ। একটা দৃশ্যে কিছু বাহাদুরি দেখতে পেলাম। জমিদার বাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে নৌকো চড়ে কাছারিবাড়ি যাচ্ছেন। বাড়ির নিচে নদী। উঠলেন বাবু সতর্ক হয়ে, জুতোয় জলকাদা না লাগে। ছেড়ে দিল নৌকো—গান-বাজনা ও স্ফূর্তি-ফাতি চলেছে খুব—ঘরবাড়ি, গির্জা, মাঠ, গাছপালা পার হয়ে নৌকো যাচ্ছে। অবশেষে কাছারিবাড়ির ঘাটে এসে লাগল। জমিদার সদলবলে নেমে পড়লেন। হলসুদ্ধ আমরাও নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে চলেছিলাম যেন। এখন কাছারিবাড়ি পৌঁছে গিয়ে সেখানকার কাজকর্ম দেখছি।

ব্যাপারটা বুঝলেন? নৌকো একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। স্টেজের উপরে দর্শকের দৃষ্টির উপর থেকে যাবেই বা কোথা? পিছনের পর্দা ঘুরে যাচ্ছিল এ তাবৎ—পর্দায় আঁকা গির্জা ঘরবাড়ি গাছপালা প্রভৃতি। আর আলোর কারসাজি। নৌকোর ভিতর গানবাজনার সমারোহ এবং নিখুঁত জীবন্ত অভিনয়—সমস্ত মিলিয়ে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায় দর্শকের। রেলগাড়িতে চড়ে হঠাৎ যেমন দেখেন—গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, গ্রামগুলো সামনের দিক থেকে পিছনমুখো চলছে। এখানেও সেই রকম করে দেখাচ্ছে, অতএব উল্টো রকম প্রত্যয় কেন হবে না?

আজবের বস্ত এগোর, মালুম হচ্ছে বলসইর সঙ্গে তফাতটা কোথায় এই থিয়েটারের। বলসইতে সিনসিনারি আলো সাজপোশাকের বাহার—একই টিকিটে যুগপৎ অভিনয় ও ম্যাজিক দেখতে পান ; এবং পালা বিশেষে সার্কাসও। মস্কো-আর্ট-থিয়েটারে শুধুমাত্র একটি বস্তু—অভিনয়। আমাদের থিয়েটারে প্রম্পট করার রেওয়াজ—গানের একটা কলি যেমন দু-বার করে গায়, থিয়েটারেও তাই। একবার উইংসের অন্তরাল থেকে প্রম্টার মশায়ের অ্যাকটিং শুনি, দ্বিতীয় বার উইংসের বহির্দেশে অভিনেতার। ইউরোপে কত দেশের থিয়েটার দেখেছি—প্রায়ই তো পয়লা সারির সিটে বসে। প্রম্ট শুনে শুনে বলার রেওয়াজ ওদের নেই। ঠোঁটের মুখস্থ মাত্র নয়, নাট্যকারের লিখিত বস্তু অন্তরের ভিতর থেকে পুরোপুরি নিজ বস্তু হয়ে বেরিয়ে আসে। আজকের এই হালকা নাটক, ডাকহাঁক করে ব্যাখ্যানের কিছু নয়—কিন্তু প্রাণঢালা কী অভিনয়ই করছে প্রতিজন!

ইরা ঠিক পাশের সিটে। পাত্র-পাত্রী কে কি বলছে, অন্ধকারে কানের কাছে গুনগুনিয়ে ইংরেজি করে যাচ্ছে। বিরক্তি লাগে। আঃ, থাম দিকি তুমি। নয় তো উঠে ওধারে গিয়ে বোসো, ওঁদের কারো যদি দরকার থাকে।

কথা বুঝছেন ?

না। কিন্তু সমস্ত বুঝতে পারছি।

সত্যি, অভিনয়ের মধ্যে কথা যে অতি-নগণ্য ব্যাপার, আজকের আসরে নিঃসংশয়ে টের পাওয়া গেল। নায়িকা সেজেছে ঐ যে তরুণী মেয়েটা, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি সর্বাঙ্গ দিয়ে ওর অভিনয়। চোখ বুঁজে আজও সেই অভিনয়ের ছবিটা যেন পাই। মনের গূঢ়লোকে যত রকম ভাবের আনাগোনা, মূঢ়তম দর্শকের কাছেও অবলীলাক্রমে সমস্ত মেলে ধরছে। মস্কো-আর্ট-থিয়েটারের নাম এমনি হয় নি।

॥ আঠাশ ॥

মস্কোর দোকানে জিনিস কিনতে যাওয়া ঝকমারি। যেখানেই যাবেন, কিউ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে যায়। অথচ দেশে আপনারা এতগুলি রয়েছেন, দুটো-একটা না নিয়ে এলে কেমন হয়? পুরো বেলা দাঁড়িয়ে থেকে জিনিস কিনতে পারবেন একটা, বড় জোর দুটো—এক কিউ শেষ করে অন্য কিউয়ে গিয়ে দাঁড়াবেন, অধিক কি করে হবে বলুন। আমাদের বটুক-দা'র বুদ্ধি ধরলে কেমন হয়, ভাবছি। বিলে মাছ ধরতে গেলাম বটুক-দা'র সঙ্গে। খোসলাবন ও জলকাদার ভিতর দাঁড়িয়ে ছিপ ফেলা। এক জায়গায় যা হবার হল, বাও তার পরে অন্যখানে। বটুক-দা খানিকটা চেঁচামেচি করে শেষে দেখি ডাঙায় উঠে কেয়াবন্ড ফি ঠেসান দিয়ে নিশ্চিন্তে বিড়ি ধরিয়েছেন। ও বটুক-দা, খালি-হাতে গেলে বাড়ির লোকে বলবে কি। বটুক-দা জবাব দিলেন, খালি কেন হবে? হাট ঘুরে যাব। হাট থেকে মাছ কিনে নিয়ে বলব, ধরে এনেছি। বিরক্ত হয়ে আমরাও এক একবার ভাবছি তাই। তুতোর, কাবুলে গিয়ে কিম্বা একেবারে দিল্লি পৌঁছে যা-হোক কিছু নিয়ে নেব। এত ঝামেলা কেন করি? বটুক-দার গল্পের উপসংহারও শুনে রাখুন। হাটে পৌঁছুতে দেরি হয়ে গেল, সব মাছ উঠে গেছে, এক ডালিতে শুধু ইলিশ আছে গোটা কয়েক। তাই সই। নির্ভীক বটুক-দা বাড়ি গিয়ে হয়তো বলেছিলেন, ইলিশমাছ ধরেছেন ছিপে। বটুক-দার বাড়ির ওঁরা অত্যন্ত ভালমানুষ, এক কথায় মেনে নিয়ে বঁটি পেতে মাছ কুটতে বসে গেলেন। আপনারা যে তা নন। এখনই বোধহয় চোখ ঠেপাঠেপি করেন: সোবিয়েতে খোয়া চাট্টি কথা কিনা! সিন্ধুরা কি বিরাত্রির কারো বাড়ি লুকিয়ে চুপি-চুপি সোবিয়েতের বই কেঁদে নিয়েছিল সেখানে। মস্কোর জিনিস ক্যাশমেমো সহ নয়ন সমুখে ধরে দিলেও কতবার আপনারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখবেন।

ভয় শুনে আমরা থ হয়ে যাই—আর ওরা কী কাণ্ড করে কেনাকাটার জন্য! ক্যামেরা গ্রামোফোন-রেকর্ড ঘড়ির দোকানে অবধি কিউ। এক মস্কো শহরেই দশ লক্ষ ঘড়ি কাবার হয়ে গেল এক সপ্তাহে। আরও যে যোগান দিয়ে উঠতে পারে না! গুম অর্থাৎ সর্ববস্তু-বিপণিতে ঢুকেছি—রথের মেলার মতো মানুষ ঠেলে পারা যায় না। ছোট ছোট দোকানে ঢুকে দেখেছি—এমন কি বইয়ের দোকানেও, যেখানে পাঠ্যপুস্তকের মরশুমটা বাদ দিয়ে কর্মচারীদের

আরামে শাক ভেজে ফুরোনোর কথা। ভিড় সর্বত্র—অবস্থার ইতরবিশেষ নেই কোনখানে। রুবল যেন পকেটে থেকে কামড়ায়, খরচ করে ফেলে নিশ্চিন্ত।

কেন হবে না বলুন—ভবিষ্যতের কোন ভাবনা যখন নেই। ছেলেপুলে, চাকরি-বাকরি, অসুখ-বিসুখ, বুড়ো বয়সের ব্যবস্থা—সকল দায় সরকারের। সাধারণ মানুষ কাজ করবে, খাবে, বেড়াবে, আমোদ-ফূর্তি করবে—ব্যস। ফালতু টাকা কিসের জন্য জমাতে যাবে? জিনিসপত্রের দর বেশি, রোজগারও অনেক বেশি তেমনি। ইস্কুল-মাস্টার মশায়ের কথাই ধরুন। চাকরিতে ঢুকলেন আট-শ রুবলে; বাইশ-শ রুবল অবধি মাইনে উঠবে। ইস্কুলে চার ঘণ্টার খাটনি—অন্যত্র ঠিকে পড়িয়ে (প্রাইভেট ট্যুইশানি নয়) উপরি-রোজগার হয়। আরও আছে। আমাদের দেশে একা মাস্টার মশায়ের শুধু আয়; স্ত্রী রাঁধাবাড়া করেন, ঘর-সংসার দেখেন। ওখানে স্ত্রীরও পৃথক আয় আছে—মেয়েপুরুষ সকলেরই কাজ। পারিবারিক আয় তবে কত বেড়ে গেল বিবেচনা করুন। একটি পয়সা কেউ সঞ্চয় করতে চায় না, দোকানে দোকানে তাই অত মজুত।

খানাপিনা অন্তে আজ আবার ইউনিয়ন অব রাইটার্সে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সারা দেশের কলমবাজদের একটিমাত্র ইউনিয়ন—সভ্য তাবৎ লেখকেরা। রাশিয়া বলে নয়—সোবিয়েতে যতগুলো গণতন্ত্র, সব জায়গার সকল লেখক। বিপুল প্রভাব অতএব। সাহিত্যকর্ম বলতে যা কিছু বোঝেন, সমস্ত ইউনিয়নের তাঁবে। শাখা আছে শহরে শহরে। গণতন্ত্রগুলো দরকার মাফিক নিজ দেশে আলাদা কনফারেন্স করে, তাদের কর্মকর্তাও আলাদা—কিন্তু সকলের মাথার উপরে এই ইউনিয়ন।

কাজকর্মের অবধি নেই। বিভিন্ন দপ্তরে সমস্ত ভাগ করা। যতগুলো ভাষা সোবিয়েত দেশে, প্রতিটির জন্য আলাদা এক এক দপ্তর। পৃথিবীর যাবতীয় সেরা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য পৃথক দপ্তর আছে। গ্রাতুক ভানিয়েলচুকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, সে হল বৈদেশিক দপ্তরের লোক। খাটছে অগুন্তি লোক—একদল ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে আছে, চীনা সাহিত্য নিয়ে আছে একদল, ইংলণ্ড-ফ্রান্স-আমেরিকার ইতিহাস ও সাহিত্যের চর্চা করে আর একদল। আলোচনার বৈঠক বসে প্রায়ই। বিদেশ থেকে বিস্তর বই আসে। কর্মীরা পড়ে শুনে যে বইয়ের তারিফ করে, অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা হয়। কোন কোন বই ছেপে বেরুবে, কোনটা বাতিল হবে—ইউনিয়ন তার বিচারের মালিক।

বিদেশি লেখকদের অনেক সময় দাওয়াত দিয়ে আনি আমরা ইউনিয়নের তরফ থেকে। আমাদের লেখকরাও বাইরে যান। অতিথি পেলে বড্ড খুশি হই। শুধু যে বন্ধুরাই আসেন, এমন নয়। বিরূপ মনোভাব নিয়ে এসে অনেকে তর্কাতর্কি গালিগালাজ করেন। শেষটা বুঝসমঝ হয়। পরস্পরের সাহিত্য আরও ভাল বোঝা যায় লেখকদের যাতায়াতে আলাপ-পরিচয়ে।

ইউনিয়নের বড়কর্তা কেউ হবেন, মুখপাত্র হয়ে তিনিই সব বলছেন।

দেয়ালে পোস্টার দেখছ ঐ? কংগ্রেস হচ্ছে—লেখকদের কংগ্রেস। অনেক বছর পরে হচ্ছে এবার। ব্যবস্থা ইউনিয়নের। বিপুল তোড়জোড় চলছে। আমাদের যত গণতন্ত্র, সব জায়গায় লেখকরা কনফারেন্স করছেন আসন্ন কংগ্রেস সম্পর্কে। এই কংগ্রেসে সোবিয়েতের সকল অঞ্চল থেকে লেখকরা আসবেন। বাইরের বড় বড় অনেক লেখককেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

ভারতের কাউকে বললেন?

কিষাণচন্দর তো আছেনই। আব্বাস এবং—

বাংলা সাহিত্যের কেউ নেই—জিজ্ঞাসার আগে থেকেই নিশ্চিন্ত আছি বলি, নিমন্ত্রণের লিষ্টি কি ভাবে আপনারা ঠিক করেন বলুন তো?

সদুত্তর মেলে না, আমতা-আমতা করছেন: যাঁদের নাম জানা আছে, সোবিয়েতের মানুষ যাঁদের বইটই পড়ে, তাঁদের মধ্য থেকে বলা হয়।

সেটা জানি। গোণাগুণতি কয়েকটা নামই ওঁদের জানা—অন্নপ্রাশন থেকে আদ্যশ্রাদ্ধ যাবতীয় ব্যাপারে ঘুরে-ফিরে তাঁদেরই ডাক আসে। বাংলা সাহিত্য বলে একদা এক বস্তু ছিল—সত্যিই কি বিশ্বাস করেন, তা একেবারে লোপ?

কিছুই তো খবর পাইনে—

দোষ আমাদের, অন্যের উপর রাগ করে কি হবে? রবীন্দ্রনাথের পর আর তো কেউ নজর তুলে বাইরের পানে তাকালেন না—পূবের শেষ প্রান্তে নানা সঙ্কট নিয়ে আছি পড়ে খণ্ডিত অবহেলিত একটি অঞ্চল। বিদেশের খাতির-আহ্বান এবং টাকাটা-সিকেটার যে সুযোগ আসে, ভারতের দ্বারপথ বম্বে এবং ভারতের রাজধানী দিল্লি অচিরে সমস্ত ভাগাভাগি করে নেন।

এই লেখক-কংগ্রেসেরই ব্যাপার! এঁরা একটা নাটক চেয়েছিলেন, যাতে ভারতীয় জীবন-চিত্র আছে। নাটকটা রুশে তর্জমা করে কংগ্রেসের গুণীজ্ঞানীদের মধ্যে অভিনয় করবেন। এমন একটা ব্যাপার—খবরটা দিল্লি পৌঁছানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নাটক চলে গেল। বাইরের কাকপক্ষী কেউ জানল না। ওঁরা বোকা ভাবে মাথা চুলকান: আমরা চেয়েছিলাম

ভারতীয় জীবনের সত্যিকার ছবি থাকবে নাটকে। এ নাটকের ঘটনাস্থল হবে৷ লণ্ডন কিম্বা প্যারি হলেও বেমানান হয় না। অথচ এসেছে ভারত থেকে, বাতিল করাও চলবে না। গোড়া বাংলাসাহিত্যে এই হাল আমলেও খাঁটি দেশি নাটক লেখা হয়েছে। কিন্তু হলে হবে কি—জোরদার মাতুল কোথায়, যথাসময়ে যথাস্থানে বস্তুটা যিনি গুঁজে দেবেন?

একজনে প্রশ্ন করলেন: ইউনিয়নের এমন সব ব্যবস্থা, লেখকদের এত সচ্ছলতা—কিন্তু ভাল সাহিত্য হচ্ছে কি তেমন?

হচ্ছে বই কি! খবর রাখেন না আপনারা—

সে তো বটেই। ভিন্ন দেশের পুরোপুরি খবর রাখা সোজা নয়। কিন্তু আগেও তো এই ছিল। সাহিত্য তবু নিজের জোরে বিদেশের ঘরে ঘরে বিদেশির মনে মনে আসন করে নিয়েছে। তেমন সব দিক্‌পাল সাহিত্যকার কোথায় আজকের দিনে?

ভদ্রলোক বললেন, দেশের উপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে, সেটা বিবেচনা করুন। বিপ্লবের পর থেকে চলছেই। ঘরের শত্রু, বাইরের শত্রু। তার পরে ঐ মহাযুদ্ধ—যার ধকল ষোলআনা এখনো কাটানো যায় নি। সাহিত্য হল শান্তির ফসল—ক'টা দিন আমরা শান্তিতে থাকতে পেলাম, বলুন।

আর এক কারণ হল, লেখকের স্বাধীনতা নেই।

চমকে ওঠেন তিনি: কে বলল?

আপনিই তো! কোন্ বই ছাপা হবে না হবে, এখান থেকে ঠিক করে দেন। কেউ অতএব এমন লিখবে না, কর্তাদের যা পছন্দসই নয়। যে কথাগুলো কর্তৃপক্ষ সকলকে শোনাতে চান, তারই সাহিত্য বানানো হচ্ছে। স্বাধীন সহজ সাহিত্য গড়ে ওঠে না তাই।

ভদ্রলোক হেসে বলেন, এই দেখুন—মিছে বদনাম দিলেন। কর্তা কেন হতে যাব—আমরাও তো লেখক। ইউনিয়ন লেখকদেরই—সমস্ত লেখক মিলে-মিশে গড়েছে। আর এই যদি নিয়ন্ত্রণ বলেন, এ জিনিস সকল দেশেই আছে।

আমাদের নেই। আমরা সব-কিছু লিখতে পারি। ছেপে ইচ্ছামতো বই বের করি—কারো পছন্দ-অপছন্দের ধার ধারিনে।

কিন্তু অপছন্দ হলে ছাপা বই বাজেয়াপ্ত হয়; পরিশ্রম অর্থব্যয় বাজে হয়ে যায় তখন। একই পদ্ধতির রকমফের। পাঠকের কাছে পৌঁছানো অনুচিত মনে হলে আমাদের ইউনিয়ন আগেভাগে বন্ধ করে, আপনাদের নির্বাচিত সরকার বন্ধ করে ছাপা হয়ে যাবার পর। কোনটা ভাল, বিবেচনা করে বলুন এইবার। ছাপানোর পরে না ছাপানোর আগে?

ক'টা বই বা বাজেয়াপ্ত হয় ভারতে! কালে-ভদ্রে কদাচিৎ।

এখানেও ঠিক তাই। বাতিল পাণ্ডুলিপি নিতান্তই গোণাগুণতি। শুধু ছুটো ব্যাপার নিয়ে আমরা লিখতে দিই নে—লড়াই বাধানো, আর ধনতন্ত্রে ফিরে যাওয়া। বাকি সব-কিছু লেখা চলে। সমাজতন্ত্রের নিন্দা চলবে না; কিন্তু রাষ্ট্রের মাতব্বরদের বিরুদ্ধে স্বচ্ছন্দে লিখতে পারা যায়।

বলতে লাগলেন, শত্রুরা রটায় আমরা নাকি সমালোচনা চাইনে। তাহা মিথ্যা। সমালোচনা ছাড়া এগুনো যায় না, দোষত্রুটির শোধন হয় না—এ কথা শিশুও জানে। এমন কি পাঠকদেরও আমরা ডেকে আনি আচ্ছা রকম সমালোচনা যাতে হয়—পাঠকে-লেখকে মিলে-মিশে দোষ-গুণের বিচার করেন। লেখক ক্রমশ ক্রটিশূন্য হয়ে ওঠেন পাঠকদের তাড়নায়। শুধুমাত্র পাঠকেরাই কনফারেন্স করে বইয়ের সম্পর্কে মতামত দেন—প্রত্যেকটি লাইব্রেরি ক্লাব শ্রমিকদের সংস্কৃতি-ভবন এমন কি ইস্কুল-কলেজের ভিতরে পাঠক-কনফারেন্সের ব্যবস্থা আছে। এই যে কংগ্রেস হবে, ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সবাই তাতে যোগ দেবেন। সারা অঞ্চলের লেখকরা দেখতে পাবেন, কাদের জন্ত লিখে থাকেন তাঁরা। নিরক্ষরতা নেই বলে বইয়ের বিষম চাহিদা। সাধারণ বই পনের-বিশ হাজার এবং গল্প-উপন্যাস হলে এক লাখ দেড় লাখ ছাপা হয়। লেখকের কি বিরাট দায়িত্ব বিবেচনা করুন। সামাল অতএব হতেই হবে। আর পাণ্ডুলিপির যে বিচার হয়, তা আমরা—লেখকরাই করে থাকি। ধুরন্ধর রাজনীতিক তার ভেতরে নেই। আমাদের ভুল হলে, উপরে বোর্ড আছে—সেখানে পুনর্বিচার হতে পারে।

কংগ্রেসের সঙ্গে বইয়ের প্রদর্শনী হবে—গত বিশ বছরের বই দেখানো হবে সেখানে। সোবিয়েতের বই বাইরের দেশে যত বেরিয়েছে, তা-ও থাকবে। গর্কির 'মা' উনত্রিশটা ভাষায় তর্জমা হয়েছে একশ-তিন দফায়। জনপ্রিয় বই আরও অনেক আছে।

কাজ নেই। যথা ইচ্ছা ঘুরে বেড়ানো, দোকানে ঢুঁ মেরে পছন্দ হলে কিছু কেনাকাটা করা। ভোকস আজ রাত্রে বিদায়-ভোজ দিচ্ছেন। বহু বিচক্ষণ ব্যক্তি এসেছেন। আমাদের রাষ্ট্রদূত কে. পি. এস. মেননকেও ডেকেছে। ভুল হয়ে যায়, বিদেশ-বিভুঁয়ে রয়েছি আমরা। ভোজের মধ্যেই জায়গা বদল। বদলি হচ্ছে—এর পাশে গিয়ে বসলাম খানিক, ও চলে এলো আমার পাশে। আছি মাত্র কালকের দিনটা। তারপর কে কোথায়! কথাবার্তা বেদনায় জড়িয়ে যাচ্ছে—আর দেখা হবে না এ জীবনে! মানুষ বড় ভাল, মানুষে

মানুষে তফাত নেই—দূরের মানুষরা অত সামান্য সময়ে একেবারে আপন হয়ে যায়!

মেনন বক্তৃতায় বড় জমিয়ে তুললেন: ভারতীয়দের সেবাযত্নের কথা শুনে লণ্ডনের কোন কাগজে লিখল, রাশিয়া ভারতের সঙ্গে প্রেম জমাচ্ছে (Russia is wooing India)। আরে বাপু, প্রেম জমানো কি—মিলন তো হয়েই আছে শান্তির মধ্যে (They have already been wedded in peace)। কথা কেমন রসিয়ে বলেন মেনন, যেখানে যান দিব্যি হাসিখুশির আবহাওয়া এনে ফেলেন।

বাঙালি ক'জনের কাল রাত্রে বিনয় রায়ের বাড়ি খাওয়া। আমাদের বরাদ্দ ভোজ—গুজরাটি ভায়াদের আগে হয়ে গেছে। গাঙ-খাল থেকে সদ্য ধরে-আনা জীবিত মৎস্যের ঝোল খাওয়াবেন, বিনয় কথা দিয়েছেন। মস্কো শহরে শেষ খাওয়া—খানাপিনা শেষ করে ঐ রাত্তেই প্লেন ধরব। ছিমছাম ছোট ফ্ল্যাটে স্বামী-স্ত্রী বাচ্চা ছেলেটি নিয়ে দিব্যি আছেন। অজু বলে ডাকে ছেলেটিকে—এমন মিষ্টি ছেলে! লহমার মধ্যে ভাব জমে গেল। বিস্তর সম্পদ অজুর! মস্কো শহরে খেলনার একজিবিশন আছে কিনা জানতে চাচ্ছেন? একজিবিশনে কি দেখবেন, অজুর যা আছে নিয়ে আসতে বলুন। বলতেও হবে না—বয়ে বয়ে নিজেই জেঠুদের সামনে জড় করছে। মস্কোর যত রকম খেলনা পাওয়া যায় সমস্ত—এর বাইরে কিছুই নেই। বিনয় আর জয়া দেবী দু'জনেরই চাকরি, অহরহ কাজে ব্যস্ত। ছেলে কিণ্ডারগার্টেন-ইস্কুলে পড়ে—সেখানে থাকতে হয়। শনিবার বিকালে মা-বাপের কাছে আসে, সোমবার ভোরবেলা চলে যায়। বাংলা শেখে বাড়িতে, ইস্কুলে রাশিয়ান। আমাদের সামনে কিছুতে রাশিয়ান বলবে না অজু। এত দিনে আমরা পাঁচটা-দশটা রুশ কথা শিখেছি। সকলে মিলে একটা পুরো প্রশ্ন দাঁড় করানো গেল। দুষ্টু অজু তারও জবাব দিয়ে দিল বিশুদ্ধ বাংলায়।

এ ছেলের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়া চাট্টি কথা নয়। মোটরে উঠে হুঁশ হল, দেরি হয়ে গেছে। জোরে চালাও—। বাঁধা-ছাঁদা এখনো কিছু বাকি। সেই কাজ সারা করে হোটেল থেকে এক্ষুনি এয়োড্রোমে ছুটতে হবে। মস্কো এয়োড্রোম, বুঝতে পারছেন, বিশ মাইলের ধাক্কা। প্লেন ছাড়বে ঠিক সাড়ে-বারোটায়। জোরে চালাও গাড়ি, আরও জোরে—

রবি ভাদুড়ি তিন ঘণ্টার উপর হোটেলে বসে আছেন, চলে যাবার আগে একটুকু যদি দেখা হয়। দেশের মানুষ পেলে কী যে করেন এঁরা সব। কথাবার্তার ফুরসত হল না—তিনিই লেগে-পড়ে স্যুটকেসে মালপত্র ঠেসে টানাটানি করে সেগুলো বাইরে এনে দিলেন। আরও কতজনের সঙ্গে ভাব জমিয়ে আছি

—খাবার বেলা বড় খারাপ হচ্ছে। এরোড্রোম অবধি চললেন ওঁদের কতক, প্লেনে চাপিয়ে দিয়ে ফিরে আসবেন।

কী কাণ্ড! বারোটা বেজে গেছে, সাড়ে-বারো হয়ে এলো—বসেই আছি, প্লেনের কর্তারা চুপচাপ। পল খোঁজখবর নিয়ে এসে বলে, ছাড়তে দেরি হবে। একটা বেজে গেল। কি হল, ওরা বোধহয় লেপ মুড়ি দিয়ে পড়েছে। দেখে এসো তো পল-ভাই আর একবার।

পল আবার উঠল। অনেকক্ষণ দেরি করে এসে বলে, ওঠো—

দুর্গা—দুর্গা!

পল বলে, মাঠের দিকে নয়—হোটেলে ফিরতে হবে। আবহাওয়া খারাপ, রাতে প্লেন ছাড়বে না।

রাত ঝিমঝিম করছে। দুর্ভোগটা ভাবুন—হাড়-কাঁপানো শীতে আবার এখন বিশ মাইল। রাস্তায় কদাচিৎ একটা-দুটো গাড়ি, দু-জন একজন মানুষ।

হোটেলের জোরালো আলোগুলো প্রায় সব নেবানো। করিডরে এখানে একটা ওখানে একটা—কায়ক্লেশে পথ খুঁজে চলা যায়। একেবারে নিশুতি হয়ে গেছে। দোতলায় অফিস-ঘরে মেট্রন মেয়েটা দেখছি ফাইল ও খাতাপত্রের মধ্যে মগ্ন হয়ে বসে কাজ করছে।

এতগুলো জুতোর আওয়াজে চমকে মুখ তোলে। দেখে হেসে ফেলল: এ কি?

সকালবেলা যাব। আবহাওয়া ভাল হলে খবর পাঠাবে।

মুশকিলে ফেললে! কি করি এখন বল দিকি—

মুশকিল আসানের জন্য ছুটোছুটি করছে। আমাদের বিছানাপত্র তুলে দিয়েছে এর মধ্যে; সকালবেলা ঘরগুলো ভাল করে ধুয়ে বীজাণুমুক্ত করে নতুন বিছানা পাতবে নব আগন্তুকদের জন্য। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে কোথায় মানুষজন, কোথায় কি! ডেকে তোল সকলকে—যেমন যেমন ছিল, তেমনি করে দিক।

ভোরবেলা উঠতে হবে—রাতের আর কতটুকু বা আছে!—উদ্বেগে ঘুম হয় না। সাড়ে-ছ'টায় পোশাক পরে তৈরি। সাতটায় ঘর থেকে বেরিয়ে পাক দিয়ে এলাম এদিক-সেদিক। মানুষজন দেখিনে, অন্ধকার থমথম করছে। আটটায় সময় হৈ-হৈ পড়ল—খবর এসে গেছে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে এখুনি বেরুনো। প্লেন ছাড়ল বেলা দশটায়। আকাশ অন্ধকার, কুয়াশায় ঢাকা। এই দস্তুর এখানকার। কাল দুপুরবেলাটা উজ্জ্বল রোদ দেখেছিলাম এক ঝলক। দেখেছিলাম আরও একটা দিন, মনে পড়ছে। এত দিন মস্কোয় কাটিয়েছি, তার মধ্যে মোটমাট দুটো রোদের দিন।

॥ উনত্রিশ ॥

যে পথে এসেছিলাম, সেই পুরানো পথ ধরে ব্যাক্ যাচ্ছি। দুপুরের খানা আখচুবিনস্কে। রাত্রি তাসখন্দে কাটবে। কাল দিনমানে সীমান্তের তেরমেস হয়ে কাবুল। ফিরছিও দুটো দল হয়ে। আমাদের নামিয়ে দিয়ে প্লেন পরের খেপে এসে পিছনের দল নেবে।

আখচুবিনস্কে নামতে গিয়ে সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়াই। বৃষ্টিবাদলা হয়ে গেছে, কাঁচা গ্যাংওয়ে জলকাদায় ভরতি। ওর মধ্যে নামি কোথা? ওরাও বলছে, রহুন—রহুন—। বাস এসে দাঁড়াল প্লেনের দরজার গায়ে। সিঁড়ি থেকে বাসের গহ্বরে। অফিসবাড়ি আধ মাইলের উপর—কাদা-জল ছিটাতে ছিটাতে বাস সেখানে পৌঁছে দিল। এবং খানাপিনা অন্তে ফিরিয়ে আনল প্লেনে।

মজা আছে আরও। যথারীতি দরজা এঁটে প্লেন তো ছেড়ে দিল। দৌড়চ্ছে তীরবেগে—এমনি দৌড়তে দৌড়তে হুশ করে উঠে পড়বে আকাশে। খানিকটা গিয়ে আর এগোয় না। এমন তো হবার কথা নয়। জানলা দিয়ে বাইরে দেখবার চেষ্টা করি। দেখবার কি আছে—চতুর্দিকে কাদাজল। আমাদের গাঁয়ের বিলের ধানক্ষেতে আষাঢ় মাসে চাষ দিয়ে যে রকমটা করে রাখে। ইঞ্জিন তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দিল। নিঃশব্দ। গতিক কিছু বুঝতে পারিনে—এ-ওর মুখে তাকাচ্ছি। পাইলট খোপ থেকে বেরিয়ে এলো।

হল কি মশাই?

কাদায় চাকা বসে গেছে।

পাড়াগাঁয়ে গরুর-গাড়ির চাকা এমনি বসে যায় কাদার মধ্যে। গাড়োয়ান এবং চড়ন্দারেরা, কখনো বা পাশের ভুঁইক্ষেতের চাষীদের ডেকে, সকলে মিলে ঠেলাঠেলি করে চাকা তুলে দেয়। চাকা-মারা বলে এই প্রণালীকে। কাজাকিস্তানে প্রান্তরের কাদায় নেমে, কি জানি, আমাদেরই বা চাকা মারতে বলে!

দরজা খুলে পাইলট ও অন্য অফিসারেরা টপাটপ লাফিয়ে পড়ে অফিস-ঘরের দিকে চলে গেল। তারপরে দেখি, বিস্তর লোক মিলে বড় বড় দুই লোহার পাত বয়ে আনছে। চাকার ঠিক সামনে কাদার উপরে পাত দুটো পেতে দিল। পাইলটেরা উঠে এসে আবার স্টার্ট দিয়েছে। প্রপেলার ঘুরছে

দুরন্ত বেগে, ঘোরতর আওয়াজ করছে। নড়ল প্লেন; কাদা থেকে চাকা বেরিয়ে লোহার উপরে উঠল। আর কি—বেশি কাদার জায়গাটা পার হয়ে এসে ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে যায়। তবে তো বোঝা যাচ্ছে, হামেশাই এই কাণ্ড ঘটে তোমাদের এখানে। নয় তো প্রকাণ্ড লোহার পাত এরোড্রোমে এনে মজুত রেখেছ কি জন্ত ?

মস্কো থেকে তাসখন্দ বারো ঘণ্টার পথ। দুই জায়গায় সময়ের ফারাক তিন ঘণ্টা। রাত একটায় ঠিক হিসাব মতোই তাসখন্দে নেমেছি। জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটেছে, যেন দিনমান। দিগ্‌ব্যাপ্ত মাঠের উপর এমন অপরূপ জ্যোৎস্না কত দিন দেখিনি! অনেকবারের আসা-যাওয়ায় এ জায়গা চেনা হয়ে গেছে। যাঁরা অভ্যর্থনায় আসেন, অনেকের নামও বলতে পারি। আজকে এসেছেন জন চারেক মাত্র। বলছেন, এরোড্রোমের রেস্তোঁরায় ব্যবস্থা হয়েছে—খাওয়া আগেভাগে চুকিয়ে নিন।

সে ভাল। শহরে পৌঁছে ডিনারে বসতে বসতে রাত পোহায়ে যেত। কিন্তু বাইরে আজকে গাড়ি একটাও নেই। যাব কিসে? মতলব কি তোমাদের? জামাইয়ের সেই গল্প। বিস্তর দিন শ্বশুরবাড়ি পড়ে থাকায় ধনঞ্জয়কে শেষটা পিটুনি খেয়ে সরতে হল। ভরা পেটে এখন আমাদের হাঁটাবে নাকি অত দূরের শহর অবধি ?

না, জায়গাও করেছে এবার এইখানে—এরোড্রোমের একেবারে কাছে, রাস্তাটা পার হয়ে গিয়েই। অসমাপ্ত বাড়ি, রাস্তায় পগার লাফিয়ে উঠানে পৌঁছুতে হয়। দালানে ঢালা-বিছানা, পাড়াগাঁয়ে বিয়েবাড়ি বরযাত্রীদের জন্ত যেমন করে। যাকগে, একটা রাত্রি মোটে—ক-ঘণ্টাই বা আছে রাত্রির!

কিছু রুবল আছে এখনও ট্যাঁকে। সীমানা পার হয়ে গেলেই রুবলের নোটগুলো পাকিয়ে কান চুলকানো ছাড়া কাজে আসবে না। অতএব প্রথম প্রাতঃকৃত্য, যে-বস্তু চোখের সামনে পড়বে কিনে ফেলে ট্যাঁক খালি করা। দোকানের খোঁজে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় শহর অবধি চলে গিয়েছি। গাড়ি ছুটিয়ে সেই অবধি এসে ওরা ধরল। প্লেনে ঢুকতে হবে এখনই। শীতকাল এসে পড়েছে, হিন্দুকুশ বেলাবেলি পাড়ি দিতে হবে। তেরমেস দ্রৌপদীর মতো একটুখানি ছুঁয়ে আমুদরিয়ার উপর এসেছি। বিদায় সোবিয়েত-ভূমি! অন্ধকার পাতালপুরী নয়, দিব্যধাম স্বর্গও নয়—আমার-আপনার মতোই হাসি-অশ্রুময় লক্ষ-কোটির সংসার সেখানে। মানুষগুলিকে বড় আপন করে পেয়েছিলাম। বিদায়, বিদায়।

কাবুল। কাবুল-হোটেলের নতুন রুম খুলে দিয়েছে, এবারে জায়গার অকুলান নেই। বন্ধু-মুরুব্বিরাও আছেন—অতএব আড্ডা দিই, নিমন্ত্রণ খাই এবং এমব্যাসির জীপে ঘোরাঘুরি করি। পরের দিনটা দিল্লির প্লেন ছাড়বার দিন নয়। উত্তম, বাবর-বাগ দেখে আসা যাক—বাদশা বাবরের কবর যেখানে। প্রশস্ত দুই চেনার-গাছ সিংহদ্বারের মতন। উপরে উঠে যেতে হয়। ফাঁকা পাহাড়ের দিকে চাঁদি-হাওয়া ছাত, সাদা চুনকাম-করা দেয়াল। বাবর ওখানে ঘুমুচ্ছেন। অদূরে পুরানো কেল্লার চিহ্ন। শ্বেতপাথরের নতুন মসজিদ বানানো হচ্ছে পাশে।

তারপরের দিনও প্লেন যাচ্ছে না—আবহাওয়া অতিশয় খারাপ। উত্তম। নেতাজি এই শহরের কোনখানে এসে লুকিয়েছিলেন, জায়গাটা তবে দেখে আসি। বাজার—ভারতীয়দের বিস্তর দোকানপাট। বাজার ছাড়িয়ে খিড়কি পাড়ায় ঢুকেছি। গলির মাথায় সঙ্কীর্ণ এক বাড়ি দেখিয়ে দিল। রণচক্রের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভারতবর্ষের নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলবেন, ঐখানে থেকে নেতাজি তার আয়োজন করছিলেন।

তারপরের দিন লটবহর নিয়ে এরোড্রোমে হাজির। সেদিনও বলে, ফিরে যান, সুলেমান-রেঞ্জে ঝড় বইছে। অতি উত্তম। ক্যামেরা ও ঘড়ি এখানে ভারি সস্তা ভারতের মতো কড়া ডিউটি নেই বলে। বাজারে ঢুঁড়ে ক্যামেরা পছন্দ করা যাক তবে। কিন্তু ঘরমুখো মন এখন—সহযাত্রী অনেকে হুঙ্কার ছাড়লেন: যতক্ষণ না সুলেমানের ভাল খবর আসে—রইলাম এইখানে চেপে বসে। তা যত দিন হোক, যত মাস হোক। চাই কি বছরই হোক পুরো। হোটেলে আর ফিরছিনে।

ঘণ্টা দুয়েক ধরে খবরাখবরের পর হুকুম এলো: ঢুকে পড় প্লেনে। দেখা যাক সেই অবধি গিয়ে।

উত্তম কথা। না হয় ফিরেই আসব। হোটেল আর যাচ্ছে কোথা?

ছোট্ট এক কৌটো আমাদের প্লেন। আকাশ-ব্যাপ্ত সুলেমান অদৃশ্য মুঠোর ভিতর কৌটাটা নিয়ে উপরে-নিচে ডাইনে-বাঁয়ে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে দেখছে, কোন সব চিজ রয়েছে এর ভিতরে। ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে তারপর—? কৌতূহলের অবসানে মুচড়ে দুমড়ে ছুঁড়ে দেবে কোন অজানা তুষার-স্তূপে? আমাদের চিহ্নমাত্র রইল না, এবং তৎসহ খাতা-ভরতি এই যত আজুব নিয়ে যাচ্ছি ভালমানুষ পাঠককুল বিমর্দনের জন্ত।

কিন্তু কিছুই হয় নি, সে তো টের পাচ্ছেন। লেখনীর শর-নিক্ষেপে নাজেহাল করে যাচ্ছি আপনাদের। সফদরজং-এরোড্রোম উপর থেকে সভয়ে দেখছি—

তুমুল হৈ-হল্লা; দাঙ্গা বেধেছে সম্ভবত কোন কিছু ব্যাপার নিয়ে। মামলা খুলে মালুম হল, প্রায় সেই ব্যাপার—ছোরা-ছুরি নয়, ফুল নিয়ে সব এসেছেন। স্বদেশের ভাইবেরাদাররা দল জুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; নানান সমিতির তরফ থেকেও এসেছেন। ভাইবেরাদার আমার কেউ নেই বটে, কিন্তু সমিতিরা তো ছাড়বেন না—তাঁরা পাইকারি হারে মালা দেন। বেঁটেখাটো দলপতি ভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন ইতিমধ্যেই— স্তূপীকৃত মালার নিচে থেকে জুতোসুদ্ধ এক জোড়া পা, বোঝার ক্লান্তিতে পা দুটো গুটিগুটি এগুচ্ছে। সেনাপতি যেন দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন—কাবুল থেকে সেতু-সাগর অবধি বিজয় করে ফিরলেন। অথচ জানেন আপনারা, জুতোর তলায় ধুলোমাটিও লাগতে দেয়নি সোবিয়েতের মানুষ। কোন বাহাদুরির জন্যে মাল্য-দান, বুঝতে পারি না। এক মহিলা নামলেন, তিনি আবার খাস দিল্লির অধিবাসিনী—রক্ষে নেই, তোড়া ও মালা উঁচিয়ে চতুর্দিক থেকে রে-রে করে ছুটেছে। আমি সেই ফাঁকে টুক করে লাইন ছেড়ে জনতার ভিতরে চলে গেলাম—প্লেনে আসিনি, সম্বর্ধনাকারীদেরই একজন যেন আমি। তারপরে ফাঁক বুঝে আরও কিছু পিছিয়ে সটান কাস্টমসের আওতায় ঢুকেছি।

শেষ

রচনাকাল : ১৯৫১

উৎসর্গ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয়বরেষু

॥ এক ॥

মা গো মা—তোর বালক আইল বনে,
শত্তুর-দুশমন দমন করে রাখিস ছি-চরণে—

জঙ্গলের মুখে আইট একটা। উঁচু জায়গা—কোটালের সময়েও জোয়ার-জলে ডোবে না। ঢেউয়ের আঘাতে আইটের এক প্রান্ত ধ্বসে পড়ছে—প্রতি বছরই গাঙের নিচে দশ-বিশ হাত তলিয়ে যায়। এমন খাড়া এদিকটা যে নৌকো ঘুরিয়ে দা-ভাঙার খালে না নিয়ে ডাঙায় ওঠা মুশকিল।

সদ্য ভেঙে-পড়া ঐ সব জায়গায় নজর করে দেখলে পাতলা-পাতলা সেকেলে ইট চোখে পড়বে। মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে। ইট রয়েছে যখন, বসতি ছিল নিশ্চয়। মানুষ ছিল, ঘরবাড়ি ছিল, মানুষের সুখ-দুঃখ ছিল। এখন কিছু নেই—হেঁতাল ও বলাঝোপে সমাচ্ছন্ন ভূমি-প্রান্তে নোনা জলের ঢেউ দিনরাত আছাড়ি-পিছাড়ি খায়।

ঝোপঝাড় ছাড়িয়ে অনতিদূরে ফাঁকার মধ্যে এক বকুলগাছ। বকুল এই অঞ্চলের গাছ নয়—কেমন করে এখানে এল, তার কোন পাকা ইতিহাস নেই। বাড়-বৃদ্ধি নেই বকুলগাছের—ফুল-ফল ধরে না, নতুন একটা ডাল গজাতে দেখা যায় নি বিশ-তিরিশ বছরের মধ্যে।

বনবিবি-তলা এটি। বাদার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনবিবি। এই একটি কেবল নয়—বনের এখানে-সেখানে তাঁর অনেক আস্তানা। জঙ্গলে ঢুকবার আগে বাওয়ালিরা থানে এসে সিন্নি মানত করে, পূর্ব-প্রতিশ্রুত মানত শোধ দিয়ে যায়। কেউ জীবন্ত মুরগি ছেড়ে দিয়ে যায় দেবীর তুষ্টির জন্য, কেউ বা বকুলগাছের গোড়ায় নিরামিষ ছাঁচ-বাতাসা সাজিয়ে দেয়। প্রতি বছর চৈত্র-পূর্ণিমার দিন ঢাক-

ঢোল বাজিয়ে সমারোহে দেবীর পূজা হয় এখানে। বছরের মধ্যে এই বিশেষ একটি দিন। দূর-দূরান্তর থেকে বিস্তর লোক জমায়েত হয়। আমোদ-ফূর্তি হয়। আলো-আলোময় হয়ে যায় জঙ্গলরাজ্য।

এবারের পুজোয় ভারি জাঁকজমক। আটটা ঢাক এবং তিনটে ঢোল-কাঁসি। ধামা ধামা বাতাসার হরির লুঠ। পাঁঠা পড়েছে পনেরটা—রক্তের স্রোত গড়িয়েছে বনবিবি-তলা থেকে প্রায় লা-ভাঙা অবধি। কবন্ধ পাঁঠার ছাল ছাড়িয়ে মহাপ্রসাদ এক পাশে চাঙারি ভরতি করে রেখেছে—পূজা অন্তে বখরা হবে মাতব্বরদের মধ্যে।

পূজার মতো পূজা। একা মধুসূদন রায় পঞ্চাশ টাকা চাদা দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও যদি কম পড়ে যায়, ভাবনার কি আছে—আরও দেবেন তিনি। যে-সে লোক নন মধুসূদন—রামনিরঞ্জন রায় নবাব সরফরাজ যাঁর দেওয়ান ছিলেন, সেই সুবিখ্যাত বংশের ছেলে। বিত্তেও নাকি অঢেল—কিন্তু আলাপে আচরণে ধরতে পারবে না। ভাইরা কলকাতায় থাকেন। মাটিতে পা দেন না তাঁরা—গাড়িতে ঘোরেন, গাড়ি থেকে নেমে পালিশ-করা উঠোন-মেজের উপর দিয়ে দোতলা-তেতলায় উঠে যান। মধুসূদন তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন হয়ে রায়গ্রামের পৈতৃক বাড়ি এবং এই বনবিবি-তলার অনতিদূরবর্তী মৌভোগের কাছারিবাড়িতে পড়ে থাকেন অধিকাংশ সময়। জঙ্গল হাসিল করে চাষবাসের ব্যবস্থায় মেতে আছেন। এমন দরের লোক, তা বলে বাছবিচার নেই। চাষা-ভূষোর আসরে বসে হল্লা করেন। মন্দ লোকে আরও নানা রকম রটনা করে। তাঁর জন্যে একখানা পিঁড়ি বা জলচৌকি—সকলের সঙ্গে এইটুকু মাত্র স্বাতন্ত্র্য।

সম্প্রতি আর একজন এসে জুটেছেন—মতিরাম সাধু। সাধু ব্যক্তি সত্যিই, পুজো-আচ্চার ব্যাপারে মুক্তহস্ত। মায়ের কৃপাও আছে তাঁর উপর—সচ্ছল সংসার, কোন রকম অভাব-দৈন্য নেই। বনবিবির পুজা এবং আনুষঙ্গিক সকল ব্যাপার শেষ হয়ে গেলে

বাজি পোড়ানো হবে—এই প্রস্তাব এবং যাবতীয় ব্যবস্থা মতিরাম করেছেন। খরচপত্র তাঁরই। বাজি পরমাশ্চর্য বস্তু। নামই শুনেছে সকলে, চোখে আর দেখেছে ক'জন? মায়ের পুজো তো ফি বছর হয়ে থাকে কিন্তু এত বেশি ভক্তের সমাবেশ (দোহাই মা, দোষ নিও না) দেখেছ কেউ কখনো?

আরও আছে। বাজির আগেই সেটা। কুস্তির পাল্লা হবে। পুরন্দর ও লা-ভাঙার মোহনায় নোনা-ওঠা চৌরস চরের উপর খানিকটা জায়গায় গরানের বেড়া দেওয়া। পুজো শেষ হতে বেলা গড়িয়ে এল—যত মানুষ তখন ভেঙে পড়ল এদিকে। মেয়েলোকও কিছু কিছু জুটেছে—ছায়াব দিকটায় একধারে একটু আলাদা মতো হয়ে তারা দাঁড়িয়েছে। ঢাকের বাজনা বন্ধ, তিনটে ঢোল বাজছে শুধু এক তালে। কাঁসি খ্যান-খ্যান করছে। লম্বা এক বাঁশের মাথায় অনেক উঁচুতে টাঙানো পিতলের কলসি—পড়ন্ত রোদ লেগে ঝিকমিক করছে। সকলকে যে হারাতে পারবে, এ কলসি তার। যারা হারবে, তারাও যে একেবারে খালি-হাতে ফিরে যাবে, তা নয়—এক-একখানা লাল গামছা দেওয়া হবে প্রত্যেককে।

ঘেরা জায়গায় এক প্রান্তে মাদুর পেতে দিয়েছে—মতিরাম সাধু ও মধুসূদন রায় সেখানে বসেছেন। এঁরা বিচারক। আর এক-দল লোক লাঠিসোটা নিয়ে তৈরি হয়ে আছে—কুস্তির মধ্যে যদি মারামারির উপক্রম হয়, সামাল দেবে। বেড়াও ঐ কারণে—কুস্তিগিররা মারামারির মুখে দর্শকজনের মধ্যে এসে না পড়তে পারে!

তবে কথা দাঁড়াচ্ছে, মারামারি করবে কারা? তাগত আছে ঐ রোগা পুঁটকে লোক ছুটোর, যারা মল্লক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়িয়েছে? জানুতে থাবা মেরে যখন প্রতিপক্ষকে তারা আহ্বান করছে, আর পায়তারা কষছে, হাসি চেপে রাখা দায়। পা হড়কে পায়তারার মুখেই পড়ে যাচ্ছিল একজন—ছোকরা ঢুলিটা আর পারে না, বাজনা থামিয়ে হি-হি করে হাসতে লাগল।

হাসো কেন?

পড়ে যাচ্ছ—আমি বলি ওস্তাদ, লাঠি-নড়ি একটা কিছু ভর দিয়ে দাঁড়াও।

বলেই জোরে জোরে বাজিয়ে উঠল। গরম হয়ে লোকটা কী গালিগালাজ করল, কারো তা কানে গেল না। হাসির লহর বয়ে গেল চারিদিকে।

তড়াক করে বেড়া টপকে ভিড়ের একজন বিচারকদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি লড়ব এক হাত—

মধুসূদন বললেন, বেশ তো! নামটা কী বলো।

কেতুচরণ ঢালি।

খাতায় লেখা হল কেতুচরণের নাম। মতিরাম বলেন, ওধারে ঐ বাইরে গিয়ে দাঁড়াও বাপু। আর কে কে লড়বে ভিতরে আসতে হবে না, ঐখান থেকে নাম বলো। পর পর ডাক পড়বে।

শেষটা বিষম জমে উঠল। বুড়োরাও ঘাড় নেড়ে স্বীকার করে, ছ-দশ বছরের মধ্যে এমন খেলা দেখে নি কেউ। মুহুর্মুহু বাহবা দিচ্ছে। প্রতিধ্বনি ঘুরে ঘুরে আসছে বনস্থলী থেকে। আকাশ বুঝি ফেটে যাবে!

পূজা উপলক্ষে সাঁকো বাঁধা হয়েছে লা-ভাঙার খালে। নিতান্তই অস্থায়ী সাঁকো—তোড়ের মুখে থাকবে না—আজকের দিনটেই যদি ভালোয় ভালোয় টিকে যায়, খুব রক্ষা। নইলে লোকজনের পারাপারে কষ্টের অবধি থাকবে না। ভর সন্ধ্যা। পূর্বাকাশে থালার মতো পরিপূর্ণ চাঁদ দেখা দিয়েছে। কলসি জিতে নিয়ে কেতুচরণ সাঁকো পার হয়ে এল।

মধুসূদনের বন্দোবস্ত-নেওয়া লাট এপারে। বাদা একবার কাটা হয়েছে। ছিটে-বন জন্মেছে। আগামী বছর আর-এক কাটা দিয়ে ধান ছড়ানো হবে। অল্পস্বল্প জন্মাবে। পুরো হাসিল হতে এখনো তিন-চার বছর। বেশিও লাগতে পারে—ঢেউয়ের মুখে মাটির বাঁধ কতটা টিকবে, সমস্ত নির্ভর করছে তার উপর।

সদ্য মাটি-ফেলা সঙ্কীর্ণ বাঁধের উপর দিয়ে হনহনিয়ে যাচ্ছিল কেতু। পায়ের শব্দ পেয়ে পিছন ফিরল। আশ্চর্য ব্যাপার তো! সেই মেয়েটা—ভিড়ের মধ্যে অগ্রবর্তী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কুস্তির প্রাণান্তক প্যাঁচ-কষাকষির মধ্যেও কেতু লক্ষ্য করেছে। হাজার জনের মধ্যেও চোখ পড়ে যায়, এমনি মেয়ে। হাত বাড়ালে ধরা যায়, এত কাছে—পিছন পিছন আসছে। কতক্ষণ এমনি আসছে, কে জানে!

কে গো?

আমি—

আমি বললে কি চেনা যায়?

নাম যদি বলি এলোকেশী দাসী, তাতেই বা কি চিনবে গো? মতিরাম সাধু হলেন আমার ঠাকুর। উই যে মৌভোগ—ঐ গাঁয়ে বাড়ি আমাদের।

জঙ্গলের ধারে ধারে নূতন বসতি গড়ে উঠছে। এলোকেশী একদিকে আঙুল দেখাল। দেড়-ক্রোশ দু-ক্রোশ দূর তো হবেই।

কেতুচরণ বলে, সোমত্ত মেয়ে একলা চলেছ, ডর লাগে না? সাধু মশায় ছেড়ে দিলেন যে বড়!

টের পেয়েছেন কিনা? বাবুবাবুর সঙ্গে কি রকম জমে গেছেন, দেখলে না? কত রাত অবধি চলবে—আমি বাপু বসে থাকতে পারি নে, ভাল লাগে না। তুমি যাচ্ছ দেখে ফুড়ুৎ করে পালিয়ে এসেছি।

হেসে উঠল এলোকেশী। হাসি যেন ঢেউ তুলে বয়ে যাচ্ছে নির্জন বনভূমির মধ্যে। হু-হু করে গাঙের হাওয়া আসছে—চুল উড়ছে এলোকেশীর, আঁচল উড়ছে।

কেতু বলে, ধরো—আমি যদি কোন রকম বে-ইজ্জতি করে বসি এখানে। কার কেমন রীতপ্রকৃতি, উপর দেখে তো জানা যায় না!

এলোকেশী আরও হাসতে লাগল।

তা পারো বোধ হয় তুমি। কী রকম দেখালে—উঃ! ধোপার পাটে কাপড় আছড়াবার মতো বেটাদের আছড়াতে লাগলে। মেয়েমানুষ আমি—আমার তো কথাই নেই।

প্রতিযোগীদের এক-একটাকে ধরে কেমন জব্দ করেছে, সেই সব গল্প চলতে লাগল। নিজের বীরত্বের ব্যাখ্যানে কেতুচরণ বড় খুশি। পথ দেখে চলছে না এলোকেশী, কেবল বকবক করছে। বাঁধের উপর পা ফসকে পড়ে গেল সে হাত দেড়েক নিচে পাশের জমির উপর। বসে পড়ে দু-হাতে মুখ ঢেকেছে।

কেতু বলে, কী হয়েছে? লাগল?

নাক-মুখ ছিঁড়ে গেছে হরগোজা-কাঁটায়। উ—হু-হু—

কাতরাচ্ছে, ঠোঁটে তবু হাসির রেশ। হরগোজা-ঝোপ আছে বটে, কিন্তু এ একেবারে গা বাঁচিয়ে হিসেব করে পড়া। জ্যোৎস্না ঝিকমিক করছে মুখের উপর। তবু কিন্তু কেতু ঠাহর করতে পারে না, কী হয়েছে তার। চোখে দেখছে ঠিকই, কিন্তু দেখেও যেন বুঝতে পারে না কোন-কিছু। আন্তরিক সমবেদনার সঙ্গে সে নিচু হয়ে ভাল করে দেখতে যায়।

এলোকেশী সরে বসল।

বেগার-দেওয়া দেখা দেখতে হবে না।

বেগার-দেওয়া হল কী করে?

বকের মতো উঁচু হয়ে অদ্দুর থেকে দেখা যায় নাকি? তুমি যাও গো যেমন যাচ্ছিলে। চলে যাও—দাঁড়ালে কেন?

কেতু অতএব বাঁধ থেকে নেমে সামনে এসে উবু হয়ে বসল।

দেখ, দেখতে পাচ্ছ—রক্ত বেরিয়ে গেছে এই দেখ।

দুটো আঙুল গালের উপর বুলিয়ে চোখের সামনে এনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এলোকেশী রক্ত দেখছে। কেতু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু সেটা প্রকাশ করে বলা চলে না। বরঞ্চ বিশেষ সহানুভূতি দেখানোই উচিত।

আ-হা হা—

কিন্তু তাতেও এলোকেশী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

উড়ো-দরদে কাম নেই। আমি হাড়ি-মুচি না কালো-কুচ্ছিৎ যে বিশ হাত দূরে অমন করে গিয়ে বসেছ?

বিশ হাত কেন—ব্যবধান বোধ করি বিশ ইঞ্চিও নয়। অকস্মাৎ এলোকেশী এক কাণ্ড করে বসল—কেতুর দু-চোয়াল সজোরে চেপে ধরে টেনে নিয়ে এলো একেবারে নিজের মুখের কাছে।

দেখতে পাচ্ছ না—কানা নাকি তুমি?

দু-হাতের বজ্র-আঁটুনি সাঁড়াশির মতো চেপে ধরেছে। বলে, দেখ—

দেখবে কি কেতুচরণ—সে স্তম্ভিত হয়ে গেছে দুঃসাহসী মেয়েটার রকম-সকম দেখে। একবার মনে হল, বাঘিনী ধরেছে তাকে। হিংস্র বটে, কিন্তু অতি মনোরম বাঘিনী।

হেসে উঠে হঠাৎ এলোকেশী ছেড়ে দিল কেতুকে। দিয়ে ভালমানুষের মতো বাঁধের ওধারে সরে বসতে যায়। কেতুচরণের রক্ত গরম হয়েছে, কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে। সে-ই বাগ মানবে না এখন। এত গৌরবের পিতল-কলসি পায়ের আঘাতে গড়িয়ে পড়ল—ছুটে গিয়ে ধরল এলোকেশীকে। কোমল এক-তাল কাদার মতো দু-হাতে চেপে ধরেছে। পাঁজাকোলা করে তুলে ধরেছে অবহেলায়।

এইবার?

এ কী কাণ্ড! কি কৌশলে ছিটকে পড়ে এলোকেশী জোড়-পায়ে লাথি দিল কেতুকে। আচমকা আঘাতে কেতু ভুঁয়ে পড়ে গেল। হি-হি করে উচ্চ হাসি হাসে এলোকেশী। বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতো হাসির স্রোত। বেকুব হয়ে কেতু গায়ের ধুলো ঝাড়ে। রাগও হচ্ছে তার।

পারলে না কিন্তু। আমি জিতলাম। একেবারে চিত হয়ে পড়েছ, পুরোপুরি হার হয়ে গেল! চালাকি আমার সঙ্গে?

কেতুচরণ এত সহজে হার স্বীকার করবে? আর এক-হাত সে লড়তে চায় বুঝি! এলোকেশী পালাচ্ছে। দৌড়, দৌড়। ছোট ছেলেমেয়ে যেমন কুমির-কুমির খেলে, সেই রকম। রূপসি-

ঝুপসি গেঁয়োগাছ—তারই মাঝে এঁকেবেঁকে দৌড়চ্ছে। বসে পড়ছে ক্ষণে ক্ষণে।

আর পেরে উঠছে না—হাঁপাচ্ছে এলোকেশী। চেঁচিয়ে ওঠে আর্তকণ্ঠে। চিৎকার শুনে কেতুচরণ থমকে দাঁড়ায়। এলোকেশী বলছে, তুমি নচ্ছার, অতি বজ্জাত—

সোঁ করে একটা হাউইবাজি উঠল আকাশে। লাল সাদা সবুজ তারা কাটছে। বনবিবি-তলায় বাজি পোড়ানো শুরু হল তবে এইবার! আনন্দে এলোকেশী হাততালি দিয়ে উঠল।

বাঃ, বাঃ!

কখন কেতুচরণের পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণের এত ব্যাপার কিছুই আর মনে নেই। হঠাৎ শিউরে খানিকটা দূর পিছিয়ে যায়।

মাগো! বাজির আগুন গায়ের উপর পড়বে না তো?

কেতুচরণ বলে, বাজি না দেখে ফিরে যাচ্ছ যে?

তুমি যাচ্ছ কেন?

আমার সঙ্গে তোমার পাল্লা? আমি থাকি সাঁইতলায়—হয়তো বা এখনই খর্মখেয়া বন্ধ হয়ে গেছে, ফলুইমাবি সাঁতরে পার হতে হবে। তারপর যদি গিয়ে দেখি, খিল দিয়ে শুয়ে পড়েছে—আস্ত এক-এক কুম্ভকর্ণ তো—সারা রাত তা হলে পেটে কিল মেরে গোয়ালঘরে পড়ে থাকতে হবে।

এলোকেশী বলে, আমারও সেই বিত্তান্ত। গিয়েই হাঁড়ি-বেড়ি ধরব। নইলে এক-সংসার লোকের নিবম্বু উপোস।

কাঁচাবয়সি মেয়ের ভারিক্কি কথায় কেতুচরণের বড় কৌতুক লাগে।

সংসারের গিন্নি নাকি তুমি?

হুঁ—। যে দিকটা না দেখব, একখানা অনাছিষ্টি ঘটিয়ে বসে আছে। আর প্যারি নে বাপু! চু-উ-উ—

দায়িত্বের কথা স্মরণ হতেই বিচলিত গিন্নি দৌড় দিল। দম ধরে ছুটেছে কপাটি-খেলার মতো। অদৃশ্য হয়ে গেছে ঝোপ-ঝাড়ের

আড়ালে, তবু ভ্রমরের একটানা গুঞ্জনের মতো মিষ্টি আওয়াজটা ভেসে আসছে। মুগ্ধ কেতুচরণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল। সবিস্ময়ে ভাবে, মানে কি মেয়েটার হঠাৎ এইরকম সঙ্গ নেওয়া ও পালিয়ে যাওয়ার? কেতু সকলকে হারিয়েছে—কেতুকে হারিয়ে দিয়ে আমোদ পেতে চাইল? তা হারিয়ে দিয়েছে ঠিকই।

গুঞ্জন অনেকক্ষণ আর শোনা যায় না। চৈত্র-পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সেই বনঝোপের ধারে কেতু তবু নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা পথ যেতে হবে, সে কথা আর মনে নেই। বনবিবির জকার উঠছে ঘন ঘন—উৎসব শেষ হল এতক্ষণে।

॥ দুই ॥

চৈত্র-পূর্ণিমায় দেবী নাকি ঐ বকুলতলায় চাক্ষুষ হয়েছিলেন। দাওয়ালিদের মুখে মুখে সেই গল্প। মধুসূদন রায়ের ম্যানেজার দুর্লভচন্দ্র হালদার জঙ্গল-কাটা ও বাঁধবন্দির বোজগণ্ডা মিটিয়ে দেবার সময় ঈশ্বরবৃত্তি খাতে জনপিছু দু-পয়সা চার-পয়সা—এই রকম আদায় করে। সকলে স্বেচ্ছায় দিয়ে যায়। মাঝিরাও মর্জাল বনকর-স্টেশনে নৌকার কুত করবার সময় মায়ের নামে কিছু কিছু জমা রেখে আসে। অন্য ব্যাপারে যাই হোক, মায়ের নামে দেওয়া একটি আধেলা কেউ এদিক-ওদিক করে না। বার্ষিক পূজায় সমস্ত খরচ করা হয়।

করুণাময়ী বনবিবি। বাদাবন তাঁর রাজ্য। হিংস্র বাঘ-কুমির ও দাঁতাল তাঁর কাছে পোষা মেষের মতন। খলসি ফুল, হেঁতাল ফুল, গরান ফুল—এই তিন ফুল ফোটে চৈত্রমাসে। তার মধু সঞ্চয় করে মৌমাছি। সাদা রং—এক-এক ফোঁটা অবিকল মুক্তোর মতো। রেখে দিলে গড়িয়ে পড়বে না। সেই মধু মায়ের পুজোয় দাও, মা বড় খুশি হবেন। বাদাবনের এখানে-সেখানে বনবিবির অসংখ্য মন্দির ছড়িয়ে আছে। দেড় হাত লম্বা দেড় হাত চওড়া একটুখানি

জায়গা মেপে নাও, হাতখানেক উঁচু গোলপাতার একটু ছাউনি করো, ঘরের সামনে উবু হয়ে বসে 'মা'-'মা' বলে ডাকো বার কয়েক—ব্যস, হয়ে গেল মায়ের মন্দির। ফুল যদি না-ই জোটাতে পারো, গরান-পাতায় পুজো কর, মা-জননী তাতেই তুষ্ট।

তবে বকুলতলার কথা হল আলাদা। এর নামডাক বেশি—অত্যন্ত জাগ্রত স্থান। উত্তর অঞ্চল থেকে যারা বাদাবনে আসে, তারা সর্বাগ্রে নৌকা বাঁধে এখানে—এই লা-ভাঙার মোহনায়। পুরুত-পাণ্ডা অথবা কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি নেই, মায়ের বালক নিজেরাই গিয়ে বকুলতলার রজ সর্বাঙ্গে মাখে (অশীতিপর ঝুনো বাওয়ালি মায়ের কাছে বালকই)। বাদার কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই মুহূর্তেই বাদা ছেড়ে চলে যাওয়ার বিধি—তিলার্ধ গড়িমসি করতে নেই, দেবী কুপিত হন তা হলে। এর পর আবার যখন আসে, আগের বারের মানত শোধ দিয়ে তবে জঙ্গলে ঢোকে।

বনবিবির করুণার অন্ত নেই। সাংঘাতিক রকম গোনাহ্ না থাকলে কেউ মরে না বাদায় এসে। বাদাবনের নীতি-নিয়ম তোমাদের জনসমাজের মতো নয়। সেই সব নিয়ম জেনে নাও আগেভাগে, সাবধান হয়ে প্রতিপালন করো, সাবধানে বেড়াও, কথাবার্তা সামাল হয়ে বলো—কোন ভয় নেই, মায়ের দয়া সব সময় তোমায় ঘিরে থাকবে। কাজকর্ম চুকিয়ে ঘরের মাণিক ঘরে ফিরে যাবে, কেউ কোন রকম ক্ষতি করতে পারবে না।

থানের মাহাত্ম্য বলছি, শ্রবণ করো। সেই যে দেবী প্রত্যক্ষ হয়েছিলেন, সেই উপাখ্যান। ভক্তিযুক্ত হয়ে শুনবে। অবিশ্বাসী যদি কেউ থাকো, পুঁথি বন্ধ করো এখানেই।

মোম-মধু সংগ্রহের মরশুম হচ্ছে চৈত্রমাসের মাঝামাঝি থেকে পুরোপুরি জ্যৈষ্ঠ অবধি। নানারকম ফুল ফোটে জঙ্গলে, গাছে গাছে বিস্তর চাক হয়। মধুর প্রাচুর্যে চাকের রং ঘষা-কাচের মতো হয়ে ওঠে, টলমল করতে থাকে চাক। বাতাস এলে মধুর ভারে চাকের অংশ ভেঙেও পড়ে কখন কখন।

মউলেরা দলের পর দল এই সময় বাদায় ঘোরে। এক দল

এসেছিল কেশবপুর অঞ্চল থেকে। সে অনেক দূর—জোয়ার মেরে উঠতে হয়, দু-তিনটে গোন লাগে। আকাশমুখো তাকিয়ে তাকিয়ে তারা ঘাড় ব্যথা করে ফেলল—আশ্চর্য ব্যাপার, মৌমাছি উড়তে দেখল না কোথাও। নিয়ম হচ্ছে, মৌমাছি দেখলেই বনবাদাড় ভেঙে তার অনুসরণ করবে। এমনি ভাবে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে গাছের মাথায় চাকের আবিষ্কার হয়। কিন্তু মরশুমে এসে এমন ডাহা বেকুব আজ অবধি কেউ হয় নি। কী দোষে কি হচ্ছে—সকলের মন খারাপ—রাত্রিবেলা রান্নাবান্না করল না তারা, রান্নায় মন নেই। খালের মধ্যে নৌকো বেঁধে চুপচাপ শুয়ে পড়েছে।

ওদের মধ্যে নিমাই কাপালি উৎকৃষ্ট গুণিন—নীতি-নিয়ম মেনে ষোল-আনা শুদ্ধাচারে থাকে। নিমাই স্বপ্ন দেখছে, ভাঁটার মতো গোল গোল চোখ, মূলোর মতো দংষ্ট্রাপংক্তি, গালপাট্টা গোঁফদাড়ি—এক বিরাট পুরুষ বলছেন, মহামাংস খাই নি অনেক দিন—খাইয়ে তুষ্ট কর্, সব দোষ খণ্ডন করে দেবো। মধুর ভরা নিয়ে যাবি আমার বরে।

গুণিন বলল, জলে-জঙ্গলে ঘুরি, ধ্যান জানি নে, জ্ঞান জানি নে—কী করে পূজো করব, বিধান দাও ঠাকুর।

মহাভোগ ছেড়ে দিয়ে যাবি ডাঙার উপর। বাঘের মূর্তি ধরে আমি নেবো। তারপর যে বনে পা দিবি, মাথা তুলে দেখতে পাবি গাছে গাছে মধুর ভাণ্ডার। এক যাত্রায় দশ ক্ষেপের মধু নিয়ে যাবি।

গুণিন ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠল। ভরা পূর্ণিমা—আরণ্য রাত্রি দিনমানের মতো ফুটফুট করছে। দিনমান ভেবে পাখি ডাকছে ডালে ডালে। তাড়াতাড়ি নিমাই সকলকে ডেকে তুলল, শলাপরামর্শ চলল অনেকক্ষণ ধরে।

দলের মধ্যে ফেলনা নামে বোকাটে ধরনের এক ছোকরা—কোন কাজের নয়। সে উঠল না কিছুতে, অঘোরে ঘুমুতে লাগল। তাকে জাগিয়ে তোলবারও অবশ্য প্রয়োজন নেই। ফেলনার মা দশ বাড়ি ধান ভেনে গোবর-মাটি লেপে দিন গুজরান করে। ফেলনা

পালিয়ে চলে এসেছে, বুড়ি কিচ্ছু জানে না। বাদায় আসবার লোক জোগাড় করা কঠিন হয় অনেক সময়, ভয়ে সকলে আসতে চায় না। এদের দাঁড়ের লোক কম পড়েছিল—নিমাই কাপালিই ভুজুং-ভাজাং দিয়ে ফেলনাকে এনেছে। এনে ঠকেছে। ধরো, কোন মুল্লুক থেকে চাল-ডাল নুন-তেল, রান্নার জল, খাবার জল বয়ে আনতে হয় —তিন বেলা তিন কাঁসর ঐ দুষ্প্রাপ্য ভাত গিলছে, খাবার জলটুকু গড়িয়ে নেবার মুরোদ নেই, এক ফেরো খাবে তো তিন ফেরো জল ঢেলে ফেলবে। অকর্মার ধাড়িটাকে নিয়ে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে তারা।

চোখ টেপাটেপি করে নিজেদের মধ্যে অবশেষে তারা সাব্যস্ত করল, ফেলনাকে দিয়ে দক্ষিণ রায়কে তুষ্ট করা যাক। কঠিন ব্যাপার কিছু নয়—যেমন গোগ্রাসে সে খায়, তেমনি বেহুঁশ হয়ে ঘুমোয়। রাত দুপুরে গাঢ় নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তাকে নামিয়ে বনের প্রান্তে রেখে দিলে টেরই পাবে না। বাঘরূপী দক্ষিণ রায় যথাসময়ে পরমানন্দে মুখে গ্রাস তুলে নেবেন, দাঁতের আঘাতে তখনই যদি তার কিছু সাড় হয় এক লহমার জন্য। গাঁয়ে ফিরে সত্যি কথাই বলবে তারা—ফেলনা বাঘের পেটে গেছে। এ কিছু অবিশ্বাস্য ব্যাপার নয়—অনেক ক্ষেত্রেই তো ঘটে এ রকম। ভালমতো মাল যদি মেলে, তার থেকে কিছু মধু ও নগদ দু-পাঁচ টাকা ফেলনার মা বুড়িকে দিয়ে দিলে হাঙ্গামা মিটে যাবে।

তখন ঘন জঙ্গল বনবিবি-তলা এবং পুরন্দর ও লা-ভাঙার এপার-ওপার জুড়ে। রাত ঝাঁ-ঝাঁ করছে, অঘোরে ঘুমুচ্ছে ফেলনা। নৌকো এগিয়ে মোহনায় নিয়ে এল। কেউ কি স্বপ্নেও ভেবেছে এত বড় জাগ্রত স্থান এটা? রাতে বাদায় নামা বিধেয় নয়। কিন্তু নিমাই কাপালি মন্ত্র পড়ে বাঘবন্ধন করেছে। এ ছাড়া কাচের চৌখুপির মধ্যে টেমি জ্বলছে। আলোর নিকটে জানোয়ার এগোয় না। খুব সতর্ক হয়ে তারা নামল। আর ভিতর-বনে যাবারও প্রয়োজন হবে না। ভাঁটা সরে গেছে, ফেলনাকে চরের উপর ফেলে রেখে সরে পড়বে।

ধরাধরি করে নামাতে কিন্তু ফেলনা জেগে উঠেছে। এটা অভাবিত। বুদ্ধি করে তাড়াতাড়ি নিমাই সামলে নিল। বলল, না বানচাল হয়েছে রে ফেলনা, জল উঠছে। নাম একটু—সবাই আমরা নামছি। জলটা সেঁচে ফেলব।

ঘুমের ঘোরে ফেলনা বুঝতে পারে নি—যেমন বলেছে, তেমনি সে নেমে দাঁড়াল। ভাল করে বুঝবার আগে এরা নৌকোয় এক ধাক্কা দিয়ে বেশি জলে নিয়ে গেল। ভাঁটার খরস্রোতের সঙ্গে চারখানা দাঁড় পড়ে নৌকো যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

ফেলনা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। এতক্ষণে বুঝেছে এদের ষড়যন্ত্র। ভয় করছে।

চরের কাদায় দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে, ফেলে যেও না—নিয়ে যাও তোমরা। আর অত ভাত খাবো না। যে কটা দেবে, চাইব না আর তার উপর।

দাঁড় টানার ছপছপানি হচ্ছিল, সে শব্দ ক্রমশ দূরবর্তী হয়ে আর শোনা যায় না। জলের তরঙ্গে ঝিলিক দিচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে পাগলের মতো হয়ে বনপ্রান্তে সে দৌড়তে লাগল। হাপুস-নয়নে কাঁদছে হাঁদা ছেলেটা। মায়ের কথা মনে হচ্ছে, আকুল হয়ে ডাকছে, মা-মা-মা—

শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখে, মানুষ-জন কেউ নয়—বাঘ। তীব্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে। লাফ দিয়ে ঘাড়ে পড়বে তো এইবার।

মা গো—বলে মর্মান্তিক চিৎকার করে বকুলতলায় সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তখন এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। তোমরা বলবে, ফেলনা যদি অজ্ঞান হয়েই থাকে, এ কাহিনী দশজনার কাছে প্রচার করল কে ? প্রচার করেছে ফেলনাই। স্বপ্নে দেখেছে, তবু ব্যাপারটা সত্যি—নইলে বেঁচে আবার দেশে-ঘরে ফিরে এল কেমন করে, সে কথা বলো। দেখল, এক পরমাসুন্দরী মেয়ে বকুলতলায় নেমে এলেন। মাথায় সোনার মুকুট ঝিকমিক করছে, পূর্ণিমার আলোর মতো ফুটফুটে গায়ের রং। ফেলনার মাথাটা কোলে তুলে নিলেন

তিনি। বাঘ মুহূর্তে পোষা কুকুরের মতো শুয়ে পড়ল তাঁর পায়ের কাছে। মেয়েটি ধীরে ধীরে ফেলনার গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন। মধুর আবেশে তার সর্বদেহ আচ্ছন্ন হয়ে এল। জঙ্গলে হঠাৎ যেন কত ফুল ফুটেছে, চিত্তহরা মৃদু বাজনা বাজছে যেন চারিদিকে !

মেয়েটি হালকা পালকের মতো তাকে তুলে নিলেন। নিয়ে ঘাটের জলে নামলেন। প্রকাণ্ড আয়তনের কালো এক কাঠের গুঁড়ি ভেসে ছিল সেই জায়গায়। এখন জোয়ার আসছে, ভরা কোটালের দুরন্ত দুর্বার স্রোত। গুঁড়ি দুলছে একটু একটু। সেই গুঁড়ির উপর ফেলনাকে শুইয়ে দিলেন। শিমুলের গুঁড়ি নাকি ? সেই রকম কাঁটা-কাঁটা। কাঁটা বিঁধছে ফেলনার পিঠে, উঃ-আঃ করছে। বুঝতে পারলেন দেবকন্যা। কাশের গোছা তুলে এনে বিছানার মতো পেতে দিলেন কাঁটার উপর। তারপর পরম যত্নে ফেলনাকে শুইয়ে একটা থাবড়া দিলেন গুঁড়ির গায়ে—

যা, চলে যা—

গুঁড়ি খরবেগে ভেসে চলল। ভাঁটা শেষ হয়ে গিয়ে জোয়ার—তবু উজান কেটে একমুখো ভেসে চলেছে। আবার জোয়ার এল। আবার ভাঁটা। চলেছে, চলেছে।

দু-দিনের পর বাড়ির ঘাটে এসে লাগল। ছেলের জন্য কেঁদে কেঁদে ফেলনার মা বুড়ির চোখ অন্ধ হবার দশা। এমনি সময় পাড়ার কে যেন এসে বলল, ও বুড়ি, দেখসে এসে ছাওয়াল তোর পালঙ্কে শুয়ে ভেসে ভেসে আসছে।

লোকারণ্য ঘাটে। জনতার কোলাহলে ফেলনার ঘুম ভাঙল। এত মানুষ—কিন্তু একজন কেউ জলে নামছে না তাকে তুলে নিতে।

ওরে ফেলনা, কিসের সওয়ার হয়ে এসেছিস ?

ফেলনা তাকিয়ে দেখে, গাছের গুঁড়ি নয়—সুবিশাল কুমির। কুমির চুপচাপ গা ভাসান দিয়ে আছে। ফেলনা নেমে এল, কুমির জলতলে অদৃশ্য হল ধীরে ধীরে।

এর অনেক দিন পরে মউলের দল ফিরল। কুমিরের সওয়ার কেলনা তখন মায়ের নির্বিঘ্ন আশ্রয়ে। যে শোনে, সে-ই অবাক হয়। সেই থেকে মহিমা প্রচার হল বনবিবির পীঠস্থান ঐ বকুলতলার।

বনবিবির অপার করুণা। বাদাবনে তাঁর রাজত্ব। বাদার এলাকায় প্রবেশ করার আগে সির্নি মানত করে যাও। বনের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ভরা নিয়ে ফিরবে।

॥ তিন ॥

সে রাতে সেই যে এলোকেশী গুঞ্জন তুলে ছুটে পালাল, কেতুচরণ তারপর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জ্যোৎস্নার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমকে চলে গেছে। বিদ্যুতে যেন ঝলসে দিয়ে গেছে হিয়ে-মন-প্রাণ।

হিয়ে-মন-প্রাণ ইত্যাদি গোলমেলে বস্তুর খবরাখবর কেতুচরণ কস্মিনকালে রাখত না। সম্প্রতি কেবল কিছু কিছু শুরু করেছে উমেশের কাছ থেকে। সাঁইতলার মাঙ্গধর মোড়লের ছেলে উমেশ—কেতু তাদের বাড়িতে আছে। দুর্বুদ্ধি হয়েছিল মাঙ্গধরের—উমেশকে শৈশবে পাঠশালা পাঠায়। ফলে হতভাগাটা বাড়ির কাজকর্মে কোনদিন মন দিল না—গান গায়, ছড়া বাঁধে, আড্ডা দিয়ে বেড়ায় এখানে-ওখানে। মাঙ্গধরের সে দুচক্ষের বিষ—রাগ করে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দিয়েছিল একবার। কিন্তু একটিমাত্র ছেলে কয়েকটা দিন না দেখে মন কেমন করতে লাগল। আবার উমেশ ফিরে এল। তারপর থেকে মাঙ্গধর বিশেষ কিছু বলে না, সাঁইতলার মোড়লঘরের ছেলের অধোগতি পূর্বপুরুষদের কীর্তিকলাপের সঙ্গে মনে মনে তুলনা করে নীরবে নিশ্বাস ফেলে শুধু।

কেতুচরণ প্রায় সম্বিত হারিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বনমোরগের ডাকে চমক ভাঙল। মোরগ ডাকছে—সকাল হয়ে গেল নাকি? না—

জ্যোৎস্নায় ভুল করে সকাল বলে ভেবেছে। বাদাবনে মোরগ অজস্র। লোকে মানত-করা মোরগ ছেড়ে দিয়ে যায়—বনবিবির সেই সব মোরগ বনে চরে বনমোরগ হয়ে গেছে। সকাল হবার আগে এদিকে-সেদিকে শুনতে পাবে, অগণন মোরগ ডাকছে। দিনমানেও যখন-তখন শুনবে। হঠাৎ ভুল হয়ে যায়, গ্রামে এসে পড়লাম নাকি? বনবিবির জীব, ধরে স্বচ্ছন্দে বাড়িতেও নিয়ে যেতে পারো—বাধা নেই। যাবার সময় শুধু মুখের কথা বলে যেও, নিয়ে যাচ্ছি মা—। তারপর মুরগির ছা-বাচ্ছা হলে অর্ধেকগুলো বনে ছেড়ে দিয়ে যেও বনবিবির নামে। নিশ্চয় দিয়ে যেও, অবহেলা কোরো না। নইলে দেখবে, সমস্ত মরে যাচ্ছে একটাও টিকে থাকবে না শেষ অবধি।

কেতু বাড়ি পৌঁছল, তখনও খানিকটা রাত আছে। জয়-করে-আনা সেই কলসি উঠানে নামিয়ে রাখল, ভারবোঝা নামিয়ে যেন বেঁচে গেল। ডাকাডাকি করল না কাউকে। চোখের ঘুম পেটের ক্ষিধে সমস্ত লোপ পেয়েছে, শুতে বসতেও মন চায় না। কাঁধে ভূত চেপে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—উঠোন এবং বাইরের অনেক দূর অবধি ঘুরে ঘুরে সে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিল।

মাস্তধর কাশতে কাশতে সকলের আগে দোর খুলে বেরুল। জ্বলে উঠল কেতুকে দেখতে পেয়ে।

সেই যে দুপুরবেলা এক পাথর গিলে বেরিয়ে পড়লে—ব্যস, আর কোন পাত্তা নেই। কোন লাটসাহেবের দরবার আলো করে বসেছিলে বল দিকি বাপু?

কেতু ভালমন্দ জবাব দেয় না। কথা-কাটাকাটি করতে তার এখন রুচি নেই।

মাস্তধর বলে, তিন বেলায় খোরাকিতে পাকি তিন সের করে চাল লাগে। লাটসাহেব সেই ঝক্কিটা নিয়ে নিলে তো পারে! তাহলে আর কাজের কথা বলতে যাব না।

খোঁটার জবাবে কেতুচরণেরও বলার ছিল। বলতে পারত, এই যে ঘর ছাওয়া, ভুঁই নিড়ানো, হাটবাজার করা, যখন যা

আটকাচ্ছে, সর্বকর্ম করে বেড়াচ্ছি সে কি শুধু তিন বেলা রাঙা চালের ভাত আর গোটাকয়েক লঙ্কা-পোড়ার জন্য? আসল ব্যাপারে তো বোঝা যাচ্ছে, একেবারে ফক্কিকার। নামে তালপুকুর, এখন আর ঘটি ডোবে না। রোসো, আবার কোনো একটা সুলুকসন্ধান পেলে হয়। সুড়ুত করে সরে পড়ব, চোখ গরম করা বেরিয়ে যাবে। তোমার ঐ হুড়াদার ছেলেকে ভুঁই নিড়াতে বসিয়ে দিও, ঘাসে-ধানে যে তফাত বোঝে না। ধান মেরে সাফ করে ঠিক সে ঘাসগুলোই রেখে আসবে।

এসব কিছুই সে বলল না। দিন এলে তখন বলবে। বলে, সমস্ত সেরে-সুরে তো বেরিয়েছিলাম। গরুর জাবনা অবধি মেখে রেখে গিয়েছি। কোন্ কাজটা আটকে আছে শুনি?

আটকায় নি? কোটালে ঘোলাজল এসেছে। গাঁয়ের মানুষ কেউ বাড়ি ঘরে ছিল না, বিকাল থেকে সবাই গাঙের ধারে।

সত্যি নাকি?

কেতু খবর শুনে বিচলিত হল। মনে মনে হায়-হায় করছে গ্রামে না থাকার জন্য। ঘোলাজল গাঙে হামেশাই আসে না— বছরে দু-চারবার মাত্র। এমনও হয়েছে, কোন বার আদৌ আসে নি। দেদার চিংড়ি পড়ে ঘোলা জলে। অঞ্চল জুড়ে সাড়া জাগে।

সদুঃখে মাস্থধর বলতে লাগল, ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ মারল সকলে, ঝোল-অম্বল-চচ্চড়ি-ভাজা খাচ্ছে, খটিতে দু-চার টাকার বিক্রিও করেছে। সারা গাঁয়েব মধ্যে আমরাই কেবল নিরামিষ খেলাম। করব কি, একজনে বুড়োথুথড়ে আর একটি অকালকুষ্মাণ্ড—

অনুতাপে কেতু বিগলিত হয়ে যায়। ঘাড় নেড়ে বলে, একা ওমশা কি করবে, তার কি দোষ? একলা মানুষের কর্ম তো নয়! ডিঙি বাইবে না মাছ ধরবে? তা বেশ তো—একটা রাতের মধ্যে কি শেষ হয়ে গেল? এখনই রওনা হচ্ছি।

উমেশের মায়ের উদ্দেশে হাঁক দিয়ে কৌতুককণ্ঠে বলে, ডয়াকলার কাঁদিটা কেটে রেখো মামি। দু-ভেরে বেরুচ্ছি। গলদা-চিংড়ি আর ডয়াকলায় মজে ভালো।

রাতে উপোস গেছে—তবু ফ্যানসা ভাত রান্না হওয়া অবধি সবুর সইল না। কাঁচা-চিঁড়ে কোঁচড় ভরে নিয়ে তাই চিবোতে চিবোতে উমেশের সঙ্গে গাঙমুখো চলল। উমেশের কাঁধে বৈঠা ও খন্তি, কেতুচরণ খেপলা-জাল নিয়েছে। একটা টোকাও নিল, রোদ চড়ে উঠলে কাজে লাগবে।

তাই বটে, ঘোলা জলেব তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। নাম বটে ঝলুইমারির গাঙ, কিন্তু আসলে বড় খাল একটা—নদী একে বলা চলে না। জলের ধারে যেন হাট বসে গেছে। কাল বিকাল থেকে চলছে—রাতের মধ্যে আরও জানাজানি হয়ে দূর-দূরান্তরের লোক এসে পড়েছে। কত নৌকো! নৌকো যাদের নেই, পারে দাঁড়িয়ে জাল ফেলছে। কিন্তু এখন আর মাছ পড়ছে না তেমন। এত হৈ-চৈর মধ্যে বনের বাঘ পালিয়ে যায়, এ তো জলের মাছ।

উমেশ বোঠে ধরেছে, কেতু জাল বাইছে। দেড় প্রহর বেলা হল, একটা ঝুড়ি বোঝাই হল না এখনো।

উমেশ বলে, দূর দূর! এ কী হচ্ছে? কালকে গাদা-গাদা মেরেছে। এমন হল, শুনলাম, শেষটা খটিতেও আর নিতে চায় না।

আসবার মুখে স্বচক্ষে তার নমুনা দেখে এসেছে বটে! চারটে চিংড়ির খটি—মাছ শুকিয়ে তারা বাইরে চালান দেয়। গরানের আগুনে যেন অনির্বাণ রাবণের চিতা জ্বালিয়েছে। তবু দেখে এল, ঝুড়ি ঝুড়ি চিংড়ি বাইরে পচছে—এখনো তার ব্যবস্থা করতে পারে নি।

উমেশ প্রস্তাব করে, আর পারা যায় না—নৌকো বেঁধে একটু ছায়ায় গিয়ে বসা যাক।

উঁহু, দোখালায় চলো। দুদিক থেকে মাছ উঠে এক জায়গায় জমেছে।

ভাঁটার টান ধরেছে—কোটালের টান। উজান কেটে নৌকো দোখালায় নেওয়া শক্ত। কিন্তু দুই মরদ-জোয়ান রয়েছে, আর

ঐটুকু এক ডিঙি। দরকার বুঝলে ডিঙি কাঁধে করে বয়েও তো খালে নিয়ে ফেলতে পারে!

দোখালায় এসে মাছ পাওয়া যাচ্ছে বটে—কিন্তু নিতান্ত গুঁড়ো-চিংড়ি। কুড়িখানেক এই বস্তু নিয়ে কেতু হেন লোক ঘরে ফিরছে, এর চেয়ে হাস্যকর কী হতে পারে? চিৎকার করে উমেশের মাকে যে গলদা-চিংড়ির আশ্বাস দিয়ে এল, তারই বা উপায় কী?

উমেশকে বলে, পাড়ে ধরো দিকি—

উমেশ পরমোল্লাসে বলে, সেই ভাল। গীত গাওয়া যাক গাছতলায় বসে বসে। যা হয়েছে, এতেই দু-বেলা বেশ চলে যাবে। আর দরকার কী?

কেতু বলে, তুমি গাও—আমি শুনি। শুনতে শুনতে আর এক রকমে চেষ্টা দেখি।

ধবজিটা হাঁটুর নিচে ধবে দু-হাতে চাপ দিল। মড়মড় করে ভেঙে গেল সেটা। বেশ দু-খানা লাঠির মতো হল। তার একটা হাতে নিয়ে টোকাটা মাথায় চড়িয়ে জলের কিনাবে অতি সন্তর্পণে সে এগুচ্ছে।

উমেশ গান ধরেছে। কেতুচরণ গান শুনছে ঠিকই, কিন্তু নজর ওড়ার জঙ্গলের দিকে। জলেব আবর্তে চিংড়ির দাড়ির রক্তাভ ক্ষীণ চিহ্ন ভেসে উঠছে এক একবার। অনভ্যস্ত চোখ কিছুই দেখবে না, আঙুল দিয়ে দেখালেও ধরতে পারবে না। কিন্তু কেতুর নজর জলের তল অবধি চলে যায়। দু-হাতে দিচ্ছে লাঠির বাড়ি, জলের উপব চিংড়ির দাড়ি লক্ষ্য করে। আহত আধ-মরা মাছ চিত হয়ে পড়ছে। স্রোতে ভেসে যাবার আগে তাড়াতাড়ি খালুইতে নিয়ে তুলছে সেগুলো। বাছাই মাছ—খেপলা-জালে এ বস্তু কদাচিৎ ওঠে। যাক—নিশ্চিন্ত! মামি ভয়াকলার কাঁদি সত্যি সত্যি যদি কেটে থাকে, বৃথা যাবে না।

কিন্তু বিপত্তি ঘটল। অনেক দূরে একটা বাঁকের মুখে কারা ডাকাডাকি করছিল পারে যাবার জন্য। মেয়েলি গলা। কেতুচরণের তত ইচ্ছা নয়—অনেকখানি উল্টো যেতে হবে। বেলা দুপুর,

পরোপকার করতে গেলে বিস্তর দেরি হয়ে যাবে। কিন্তু লোটে উমেশের হাতে—ঝপ-ঝপ করে বেয়ে পারার্থীদের কাছে সে চলে গেল। গলা শুনে আন্দাজ করেছিল হয়তো। সামনাসামনি এসে উমেশ কেতুর গা টেপে।

পদ্ম—সেই যে···

পদ্ম, তার মা মুখ্যি-বুড়ি ও বড় ভাই পাঁচু। উমেশ পদ্মর গল্প সুগোপনে করেছে কেতুর কাছে। বনবিবির পুজো দেখতে কাল দল জুটিয়ে এরা গিয়েছিল। বাজি ইত্যাদি দেখে অনেক রাত হয়ে গেল বলে মৌভাগে কোন্ কুটুম্বের বাড়ি কাটিয়েছে। অনেকক্ষণ বসে আছে খাল-ধারে—একটা নৌকো কোন দিকে নেই, মাছ ধরতে সমস্ত কলুইমারি গিয়ে জমেছে।

এই তবে পদ্ম? নিটোল কালো মেয়ে—আর যাই হোক, পদ্মফুলের রংটা কিন্তু পায় নি। কেতুচরণ ইতিমধ্যে ধাঁ করে টোকা ফেলে বড়-চিংড়ির খালুই ঢেকে দিয়েছে। লোভনীয় মাছ—সকলের চোখের সামনে আলগা রাখা উচিত নয়।

কিন্তু পদ্মর গতিক দেখ—তিন ক্রোশ পথ দিব্যি মেরে এল, আর ডিঙিতে পা দিয়েই ননীর পুত্তলি উত্তাপে গলে পড়েন। কেতু হাঁ-হাঁ করে ওঠে—কিন্তু তার আগেই সে হোগলার টোকা মাথায় দিয়ে মেমসাহেব হয়েছে।

এবং যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল—বাঃ, খাসা চিংড়ি তো! ধরলে বুঝি তোমরা?

উমেশ কেতুর মনোভাব বোঝে। ভয়ে ভয়ে সে তার দিকে তাকাল। কেতুচরণ কানে নেয় নি—তাড়াতাড়ি এখন আপদ-বালাইগুলোকে পারে পৌঁছে দিতে পারলে যে হয়!

পাঁচু স্পষ্টাস্পষ্টি চেয়ে বসল, জলের মাছ তো! খেতে দাও কটা আমাদের—

নির্জীব কণ্ঠে উমেশ একটা শব্দ করল, যার অর্থ হাঁ-না—দুই-ই হতে পারে।

পদ্ম মারমুখি হয়ে ওঠে : না-না—মাছ-টাছ কেন দেবে ? অত খাতির কিসের ? একটুখানি এগিয়ে শুধু যদি বাড়ির ঘাটে আমাদের তুলে দিয়ে এসো—

উমেশ ঘাড় নিচু করেছে। লজ্জায় মরে যাচ্ছে, ভাব দেখে বোঝা যায়। বাড়ি পৌঁছে দেবার প্রস্তাবে, তার উপর, কেতু আপত্তি করে উঠল।

বেলা হয়ে গেছে, ক্ষিধেয় নাড়ি পটপট করছে, এখন পেরে উঠব না।

পদ্ম সুর নরম করে বলল, সে-ও গেরস্ত বাড়ি গো ! ক্ষিধের উপায় হবে। সত্যি, আর পারা যাচ্ছে না—হেঁটে হেঁটে আমার পা ব্যথা হয়ে গেছে।

ফিক করে সে হেসে ফেলে। আজব মেয়ে—এই মেঘ এই রৌদ্র খেলা করে তার মুখে।

উমেশ জুত পেয়ে বলল, তা হলে মাছও নেবে বলো। পাঁচু-দা সরল মানুষ—ভাল দেখেছে, মুখ ফুটে বলল—তোমার মতো মনে তার জিলিপির প্যাঁচ নেই।

ভাল রে ভাল ! ভালোবাসা করবি—তা নিজের যা আছে, দানসত্র করগে না ! কেতুর কষ্ট-করে-ধরা মাছ জিজ্ঞাসাবাদ না করে দিয়ে দিচ্ছে। তবু কিন্তু এই অবস্থায় মুখের উপর কিছু বলা চলে না—তা কেতুচরণ যত বড় স্পষ্টভাষীই হোক।

উমেশ বলছে, পাঁচটা কি ছ'টা চিংড়ি আছে বেশ মোটা মতন। ও ক'টা সমস্ত নিয়ে নিতে হবে। আর নয় তো, নেমে পড় এখানে। নৌকো আর এগোবে না।

পদ্ম বলে, নিতে পারি এক কড়ারে। গান শোনাতে হবে।

উমেশ ঘাড় তুলে সগর্বে তাকাল কেতুর দিকে। কেতু এখন বোঠে ধরেছে আর ফিস্‌ফিস্‌ করে পাঁচুর সঙ্গে গল্প জমিয়েছে কাছাকাছি বসে। উমেশের দিকে তাদের নজর নেই। উমেশ এমন শব্দ করে আমান দেয় : বা:—আমার আবার গান !

তবী তোলে না। পদ্মদের ঘাটে পৌঁছে দিয়েও সেই কথা।

গান শোনাবে তো বলো। নইলে খালুই ছোঁব না।

উমেশ কথাও বেশ কইতে পারে,—লেখাপড়া শিখেছে, পারবে না কেন? বলে, ফাঁকি দিয়ে এদ্দূরে নিয়ে এসে—এই বুঝি কলির ধর্ম পদ্ম!

নির্দয় পদ্ম বলে, গান গাইবে, আর খেয়েও যাবে দু-জনে। তবে মাছ নেবো। আমার হাতের তরকারি খেলেই-বা একদিন।

পদ্মর মতো মেয়ে আর একটি যদি দেখতে পাও। খাওয়াচ্ছে সামনে বসে—তা-ও রণমূর্তি।

উমেশ এমনই একটু কম খায়। তার উপর আসনপিঁড়ি হয়ে পরম ভব্য ভাবে বসবার দরুন গলা দিয়ে ভাত বেশি নামছে না। কিন্তু কেতুচরণের সম্পর্কে যে কথা বলতে পারবে না। সাধারণ জন-তিনেকের ভাত-ব্যঞ্জন ইতিমধ্যেই শেষ করে বসে আছে।

পদ্মর তবু সন্তোষ নেই। বলে, উঠত? গুড় আনলাম কার জন্যে তবে? গুড়-তেঁতুল দিয়ে মেখে জল ঢেলে নাও।

ঢেঁকুর তুলে কেতু বলে, ওরে বাবা, আর পারব না।

খেতেই হবে।

গুড়ের বাটি পাতে উপুড় করল। ঘটি থেকে হুড়-হুড় করে জল ঢেলে দিল।

উমেশ বলে, যা খাওয়ান খাওয়ালে পদ্মমুখী, পাতের কোল থেকে হাত ধরে ওঠাতে হবে আমায়। নিজের বলে পেরে উঠব না।

মাদুর পেতে দিয়েছি। হাত ধুয়ে গড়িয়ে পড়োগে। কী কাজ আর এখন?

সত্যি, ভারি যত্ন করল। কেতুচরণ পদ্মকে এই প্রথম দেখল। এর অনেককাল পরে আবার ভিন্ন অবস্থায় দেখা হয়েছিল। সেদিন সর্বপ্রথম কেতুর মনে উঠেছিল, পরম যত্নে এই দিনের এই সামনে বসে খাওয়ানোর কথা।

ঘুমানো হবে না, কিছুতে না, ঘুমোলে বিষম মুশকিল হবে—এমনি বলাবলি করতে করতে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে কেতু দেখল, বেলা একেবারে পড়ে গেছে। আরে সর্বনাশ! উমেশের মা ডয়াকলা কুটে হয়তো বসে আছে তাদের অপেক্ষায়, লোভী মাস্তধব ঘর-বার করছে। ছি-ছি! নিতান্ত স্বার্থপরের মতো কাজ হয়েছে। কি কৈফিয়ত দেবে তারা ফিরে গিয়ে?

উমেশকে ডেকে তুলে তাড়াতাড়ি ঘাটে গিয়ে দেখে আর-এক বিপদ। বোঠে নেই—জোয়ারের তোড়ে ডিঙিটা দুলছে শুধু।

বিনা বোঠেয় যাবে কি করে, কে নিয়ে নিল বোঠে? খোঁজ, খোঁজ—

বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না। গা ধুয়ে ভিজে কাপড়ে চোর উঠে এলো পশুরতলার দিক থেকে। হি-হি-হি হেসে একেবারে শতখান হয়ে পড়ে।

সত্যি, এমন হাসি হাসে এই বাদাবাজ্যের মেয়েগুলো! হাসির তোড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে জোয়ার-লাগা দেহের যৌবন।

উমেশের দিকে চেয়ে পদ্ম বলে, গান না শুনিয়ে পালাচ্ছিলে। যাও, চলে যাও না। আমি কিচ্ছু জানি নে।

বিপন্ন উমেশ বলে, দিয়ে দাও মাইরি। তাড়া আছে।

কেতুচরণ কিছু গরম হয়ে বলে, কাজের সময় কি রকম মস্করা তোমাদের? দিয়ে দাও।

পদ্ম রাগ মানবার মেয়ে নয়। উদাসীন কণ্ঠে বলে, তোমাদের বোঠে জলে পড়ে ভেসে গেছে বোধহয়। আমি তার কি জানি?

তারপর কিঞ্চিৎ করুণার্দ্র হয়ে বলে, আচ্ছা গান তো আরম্ভ হোক। দেখি, খুঁজে-পেতে পাড়ের জঙ্গলে কোনখানে যদি আটকে থাকে।

উমেশ বলে, এ কি একটা গান গাওয়ার জায়গা? যখন যেখানে হোক, গাইলেই হল?

পদ্ম আবার হেসে ওঠে : কি রকম জায়গা চাই ? সামিয়ানা-ঝাড়লণ্ঠন লাগবে, আসর বসাতে হবে ?

অতএব নিরুপায় উমেশ একবার গলা-খাঁকারি দিয়ে ডিঙির উপর জুত করে বসল।

পদ্ম বলে, রোসো ভিজে কাপড় ছেড়ে আসি। আর তোমাদের বোঠে এনে দিই। দোয়েল-পাখির মতো যেন নাচের ভঙ্গিতে সে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বোঠে নিয়ে ফিরে এল অনতিপরেই। সঙ্গে এসেছে পান-খাওয়া তেল-জবজবে এক ছোকরা।

ছোকরাটাকে উমেশ ইতিপূর্বে দেখেছে। হাঁ, দেখেছে বই কি! বেজার মুখে উমেশ সম্ভাষণ করে : কখন আসা হল ? এতক্ষণ দেখতে পাই নি তো।

পদ্মই জবাব দেয়, তোমরা ঘুমুচ্ছিলে সেই সময় এসেছে। দাদা দোকান দিয়েছে তাই একে খবর দিয়ে নিয়ে এলো। আমাদের দোকানে থাকবে।

উমেশ বলল, গান কিন্তু হবে না। গলা ভেঙে গেছে।

কে ভেঙে দিল গো ?

বহু-প্রচলিত এদের এই স্থূল রসিকতা। কিন্তু পাল্টা জবাব দিতে উমেশের মন হল না। বলে, কাঁচা-তেঁতুলের ঝোল খেয়েছিলাম কি না!

হলই না-হয়। গলাখান আছে ভাল। কত খোশামদি করাবে আমায় দিয়ে ?

বোঠে মাটিতে ফেলে তার উপর পাশাপাশি চেপে বসল পদ্ম আর সেই লোকটা। হঠাৎ বোঠে হাতে তুলে নিয়ে যে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়বে, তার উপায় নেই।

উমেশ অগত্যা গান ধরল—রাবণবধ পালার গান—'কও দেখি হে লঙ্কাপতি, রাম কি বস্তু সাধারণ ? চলো, রামের সীতে রামকে দিয়ে হইগে গিয়ে শরণাপন।'

অতি-পুরানো গান কথাগুলো তবু কেমন গোলমাল হয়ে

যাচ্ছে। গলা ভাঙার কথা মিথ্যে করে বলেছিল, কিন্তু সত্যিই যে ফ্যাসফেসে আওয়াজ বেরুচ্ছে হাঁসের মতো!

শেষ হয়ে গেলে উমেশ কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পায় না। পদ্মই মন্তব্য করে: মন্দ নয়। কিন্তু যা-ই বলো সেবারে শুনিয়েছিলে, সে রকমটা হল না।

উমেশ নিজেও জানে সেটা। যাত্রা শুনতে সে এসেছিল এখানে। রাবণ-বধ পালা—অনেকবার শোনা। গান শুনে পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল। পালা শেষ হবার পর আসরের লোকজন বিদায় হয়ে গেল, উমেশ তখন অধিকারীকে ধরে বসল।

পালা গাওয়া নয়, এ হল তোমাদের লাঠিবাজি করে বেড়ানো।

অধিকারী বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে, লাঠিবাজি বলছ কাকে?

হাঁ, গানের মাথায় লাঠি মারা—

সে নিজে গেয়ে শুনাল। অনেকদিন ধরে অনেক যত্ন করে শেখা গানটা। বড় উতরে গিয়েছিল—এতকাল পরেও পদ্ম যে আজ গান শোনানোর বায়না ধরল, এই তার একটা প্রমাণ। পদ্ম সেদিন ঘুরঘুর করছিল তাদের আশেপাশে। কথাবার্তায় রাত হয়ে গেল বলে উমেশও দলের সঙ্গে খেতে বসেছিল। পদ্ম দেওয়া-থোওয়া করছিল পরমোৎসাহে।

পদ্ম বলছে, কি হয়েছে আজকে বলো তো? বড় মুখ করে আমি পদাকে টেনে নিয়ে এলাম।

জবাব না দিয়ে উমেশ বোঠে তুলে নিয়ে নৌকায় উঠল। বিদেশি মানুষটা—পদা হল বুঝি ওর নাম—হেসে ওঠে। পদ্মও তো হাসে, কিন্তু ও লোকটার ঝকমকে দাঁতের ঐ বস্তু, হাসি কক্ষনো নয়—শাণিত ছুরি দিয়ে খোঁচা-মারা। হাসতে হাসতে সে হিতোপদেশ দেয়: বোঠে বাইতে জান—তাই কোরো। গান গাইতে যেও না, ও তোমার হবে না।

ছপছপ ছপছপ বোঠে বেয়ে ফিরে চলেছে। কেতুচরণ বলে,

বাড়ি গিয়ে কি জবাবদিহি করবে, ভেবে-চিন্তে বের করো দিকি একটা-কিছু।

উমেশ অন্যমনস্ক ছিল। চমকে উঠে বলল, ও সে হবে। কিন্তু শুনলে তো ঐ কি বলল? গান নাকি হবে না আমায় দিয়ে! গানই গাইব আমি—গান গেয়ে কাঁদিয়ে যাব, এই আমার পণ।

॥ চার ॥

মৌভোগ নাম দিয়েছেন মধুসূদনই। নিজ নামের সঙ্গে একটু মিলও আছে। গ্রাম বসে গেছে—চাষী ইতিমধ্যেই পঁচিশ-ত্রিশ ঘর এসে বসত করছে। আরও আসবে। মধুসূদনের প্রখর দৃষ্টি—যারা আসছে, সর্বরকম সুবিধা দিচ্ছেন তাদের তিনি।

মতিরাম সাধু মাস চারেক আগে এসে ঘর তুলেছেন। সাধু তাঁর কৌলিক উপাধি—অথবা রক্তাম্বর ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন বলে লোকে সাধু নামে অভিহিত করে, সেটা জানা যায় না। সাধু—অথচ কারো কাছে সিকি-পয়সার প্রত্যাশী নন। বরং দান-ধ্যান তাঁরই অনেক। এ হেন ব্যক্তি কোন আশায় বাদা অঞ্চলে এলেন, কে জানে? এলোকেশী আর ছোট ভাই পতিরামকে নিয়ে সংসার। উঁহু, সংসার তাঁর বিষম ভারি। কত জনে যে নিয়মিত পাত পাড়ে এবং রাত্রিবেলা এক-একটা মাদুর বিছিয়ে বাইরের দাওয়া ও ঘরগুলোয় শুয়ে পড়ে, তার সীমা-সংখ্যা নেই। ঘরের পর ঘর তুলে উঠোন গোলকধাঁধা করে তুলেছেন, তবু জায়গার অকুলান পড়ে কখনো কখনো। পতিরাম সোনা-রুপোর কাজ করে—সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। রাস্তার ধারে চালাঘরে তার দোকান। দেখতে পাওয়া যায়, সারাদিন প্রদীপের সামনে ঘাড় নিচু করে ঠুকঠুক করে সে কাজ করছে। এত বড় সংসারের সমস্ত দায়ঝক্কি—মতিরামেরও ঠিক বলা যায় না, ঐ এলোকেশী মেয়েটার। কেতুর কাছে যে মিথ্যে বড়াই করে নি।

বিকালবেলা নিদ্রোত্থিত মতিরাম রক্তচক্ষে জলচৌকির উপর পা ছড়িয়ে বসে কুলকুচো করছেন। কাঁধে কলসি--কলসির মুখে গোঁজা গামছার পুঁটুলি—কেতুচরণ এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। ভক্তিযুক্ত ভাবে সে সাধুর পদধূলি মুখে মাথায় দিল।

কোত্থেকে আসছ বাপু? চিনি-চিনি করছি, ও হ্যাঁ—

মতিরাম বারকয়েক তার আপাদমস্তক চেয়ে দেখলেন। এক-গাল হেসে কেতুচরণ বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমায় না চিনলেও কলসিটা ঠিক চিনবেন।

এই কলসি তো সেদিন জিতে নিলে? বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও।

কেতুও খোশামুদি করে একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে মতিরাম চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, দৃষ্টি অন্দরের চৌরিঘরের দিকে।

চশমা চোখে এক শৌখিন ব্যক্তি কানাচের দিক দিয়ে বেরুচ্ছে টিপিটিপি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে। মতিরাম মধুকণ্ঠে আহ্বান করলেন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হয় ম্যানেজার মশায়। ওদিকে কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

থতমত খেয়ে লোকটি বলে, আপনার খোঁজে।

আমি বাইরের ঘরে ঘুমোই। জানা নেই বুঝি?

দেখতে পেলাম না। তাই মনে করলাম—

লোকটি দুর্লভচন্দ্র—মধুসূদন রায়ের কর্মচারী। দুর্লভ নিজে বলে ম্যানেজার। ম্যানেজার জঙ্গলের মধ্যে একহাঁটু জলে দাঁড়িয়ে গাছগাছালি কাটায়, নিজেও কুড়াল ধরে কখনো-সখনো। বাঁধ-বন্দির মাটি কাটা হচ্ছে, নিজেই গজকাঠি নিয়ে কুয়ো মাপতে লেগে যায়—

আড়ে চার, দীর্ঘে সাড়ে-পাঁচ। চার ইন্টু সাড়ে-পাঁচ কত হবে, হিসেব কর্ না রে পুঁটে। আঠারো। থাড়াই দুই, তা হলে মোট কালি হল আঠারো দুনো বত্রিশ। পুঁটে, তোর পাওনা তা হলে দাঁড়াচ্ছে—

আবার কাজকর্ম অন্তে কে বলবে, ইনি সেই দুর্লভ? চোখে চশমা, পরনে খোপদস্ত জামা-কাপড়, পায়ে বার্নিশ-করা চিনাবাড়ির জুতো।

ফুরফুরে গন্ধ বেরোয় সর্বাঙ্গে, মস-মস করে হাঁটে, কারণে-অকারণে পকেটের রঙিন রুমাল বের করে মুখ মোছে।

মতিরামের ডাকে দুর্লভ কাছে এসে দাঁড়ায় অগত্যা।

তারপর—কী বৃত্তান্ত? বাদাবনে সোনা ছড়ানো আছে—সেই তো?

দুর্লভ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, ঠাট্টা করেন কেন? সত্যি কথা, সোনাই বটে। সুঁদুরকাঠের ভরা সাজিয়ে মাতলায় চালান দেবো। মুনাফার টাকায় যত খুশি গিনি গেঁথে নেবেন। তা হলে সোনা কুড়ানো হল কিনা, বিবেচনা করুন। বনকারের বাবুদের সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে—দামের দিকে সুবিধা তো হবেই। তা ছাড়া চালানে যা লেখা থাকবে, তার দেড়া মাল নৌকো বোঝাই হবে।

পুঁজি মিলবে কোথা? আমার টাকাকড়ি নেই। গরজও নেই টাকার। ধনে সারবস্তু কি আছে, সমস্ত মনে। মায়ের নাম জপ করে কোন রকমে দিন কেটে গেলেই হল।

কিন্তু একথা দুর্লভ বিশ্বাস করে না। এ অঞ্চলের কেউই করবে না। খরচপত্রের বহর দেখে ইতিমধ্যে রটনা হয়ে গেছে, মতিরাম সাধু মন্ত্রবলে সোনা তৈরি করতে পারেন। মধুসূদনের কাজ করে দুর্লভ খুশি নয়—সে জীবনে উন্নতি করবে। যার নেই মূলধন, সে-ই যায় বাদাবন। সেই বাদাবনে এসে পড়েছে সমাজ-পরিজন ছেড়ে। কিন্তু সে কি এই জন্যে? ক-পয়সা আয় করা যায় মাটি-কাটার ভদারকে? লোকজনও সেয়ানা হয়ে যাচ্ছে। আঠারো ছুনো সত্রিশ নয়, ছত্রিশ—শিখে যাচ্ছে ধারাপাতের মহিমায়। সামান্য দশ-পাঁচ টাকার জন্য নোনা জল, শুলোর আঘাত ও পশুর কামড় খাওয়ার মানে হয় না।

নানা সুখ-দুঃখের কথাবার্তা বলে এবং কাঠের ব্যবসায়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বর্ণনা করে দুর্লভ চলে গেল। তার গমনপথের দিকে চেয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে অস্ফুট কণ্ঠে মতিরাম বললেন, হা রামজাদ.!

এবং সঙ্গে, সঙ্গেই অন্তরঙ্গ সুরে কেতুচরণের সঙ্গে মুলতুবি আলাপন শুরু করলেন।

কোথা থেকে আসা হচ্ছে, কিছু বললে না তো বাবা।

কেতুচরণ বলে, দূর বেশি নয়। সাঁইতলায় মান্মথর মোড়লের বাড়ি এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম—

দ্বিধান্বিত কণ্ঠে মতিরাম বলেন, সাঁইতলা মানে—

ঘাড় নেড়ে কেতু বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, শুকদাঁড়া-সাঁইতলা। বাড়ি আমার এদিগরে নয়, নামডাক শুনে এসেছিলাম। তা ঘেন্না ধরে গেল সাধুমশায়। এখন একেবারে কিচ্ছু নেই—যত ছ্যাঁচোড়ের বসতি।

মতিরাম প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিলেন।

বেলা তো একেবারে গেছে। এখন আবার চান-টান করবে নাকি ?

চান খুব ভালো রকম হয়ে গেছে। গেবো কেমন! ধর্মখেয়া বন্ধ—মাঝি শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। অত বড় ফলুইমারি সাঁতরে পার হয়ে এলাম। কুমির-কামটে গন্ধ পায় নি, তাই বাঁচোয়া।

আহা-হা, বড্ড কষ্ট পেয়েছ—

কেতু হাসছে, কিন্তু মতিরাম শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন : কে আছিস ? সন্ধ্যে হয়ে যায়, বাবার খাওয়া-দাওয়া হয় নি। এলোকেশীকে বল, তাড়াতাড়ি পাক-শাকের জোগাড় করে দিক।

কেতু বলে, পাক করতে যাব কোন দুঃখে। আপনার নাম শুনে এসেছি সাধু মশায়, মনে মনে আপনাকে গুরুবরণ করেছি।

মতিরাম জিভ কেটে বলেন, গুরু ওটা কি বলছ—কীটস্য কীট আমি।

কেতু একগাল হেসে বলে, বড়রা বলে থাকেন ঐরকম। খবরাখবর না নিয়ে কি এসেছি ? মন্তোর দিতে হবে, অমনি দুটো দুটো পাতের প্রসাদও পাবো। স্বজাত হই আমি আজ্ঞে।

মতিরাম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আর-একবার তাকালেন তার দিকে। আর কিছু বললেন না, খড়ম খটখট করে ভিতরে চলে গেলেন।

অতএব কেতুচরণ আর সকলের সঙ্গে দুপুর ও রাত্রিবেলা যথারীতি দাওয়ায় পাত পেতে বসে, খাওয়ার পর বাইরের ঘরে

মাহুর পেতে গড়ায়। এই রকম প্রতিপাল্য সাকুল্যে কত জন—কেতু চেষ্টা করেছে, কিন্তু গ়ণে ঠিক করতে পারল না। কখন কে আসছে, চলে যাচ্ছে—কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। অতিথি-বাৎসল্য নিয়ে কেউ প্রশংসা করলে মতিরাম জিভ কেটে বলেন, ছি-ছি, কেন তোমরা লজ্জা দাও বলো দিকি? কার কে-বা খায়? সবাই মায়ের সন্তান—মা যা জুটিয়ে দেন, সকলে মিলে ভাগযোগ করে খাই।

কখনো-বা বলেন, আগের জন্মে ধেরে খেয়েছিলাম, এ-জন্মে ধার শোধ দিয়ে যাচ্ছি। ওঁরা উত্তমর্ণ—ওঁরাই মান্য। ওঁরা ঋণমুক্ত করছেন আমায়।

পতিরাম সারাদিন কাজ করে—স্নান ও খাওয়ার সময় একবার মাত্র বাড়ির মধ্যে ঢোকে। বড় ভাল কারিগর। আশ্চর্য লাগে, এ হেন লোক শহরে-বাজারে না গিয়ে বাদাবনের প্রান্তে দোকান সাজিয়ে রেখেছে কি জন্যে? কারুকর্মের কদর বোঝবার লোক এ অঞ্চলে কোথায়? গহনাই-বা পরে ক'জন।

মতিরাম মাঝে মাঝে হঠাৎ খুলনা চলে যান। দু-পাঁচ দিন কাটিয়ে ফিরে আসেন। যেসব নৌকোয় যান—মাঝিরা বলে, ঘাটে নেমে সোজা গিয়ে ওঠেন পুরানো-কালিবাড়ি। ঘর-সংসার থাকলেও আসলে তো সাধক মানুষ—অন্তরে আহ্বান আসে, আর ছুটে মায়ের পদতলে গিয়ে পড়েন।

একটা জিনিস কেতুচরণ লক্ষ্য করছে, মতিরাম চলে যাবার পরেই দুর্লভ হালদার ব্যবসায়ের কথাবার্তা বলতে আসে। দেখা হয় না—বিফলমনোরথ হয়ে এলোকেশীর হাতের দু-একটা সাজা পান খেয়ে পরম দুঃখে ফিরে চলে যায়।

একবার অমনি রওনা হয়েছেন মতিরাম। ক্রোশ দুই আন্দাজ চলে গেছেন, পিছন থেকে ডাক শুনে নৌকো থামাতে বললেন। ঝোপ-ঝাপ জল-কাদা ভেঙে কেতুচরণ ছুটে আসছে, প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে।

কাছে এলে মতিরাম বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন: ভাল জায়গায় যাচ্ছি—পিছু ডেকে ভণ্ডুল দিলি কেন রে? কী হয়েছে?

কেতু বলে, ফিটের ব্যামো হয়েছে এলোকেশীর।

মতিরাম অতিমাত্রায় ব্যস্ত হলেন।

বলিস কি রে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। অজ্ঞান হয়ে হাত-পা কষছে ঘরের মধ্যে। তাই দেখেই ছুটে এলাম।

নৌকা উজান নিয়ে যাওয়া কষ্টকর। মতিরাম নামলেন। দ্রুতপায়ে চললেন—দৌড়োবার মতো। কেতুই পিছিয়ে পড়ছে। আসবার সময় এত ছুটে এসেছে, এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—সেই জন্যেই কি?

হ্যাঁ এলোকেশী রোগিই বটে! দুর্লভ তার হাত চেপে ধরেছে। এলোকেশী বলেছে, না-না—এ সমস্ত কি!

ঝাঁকি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল তো, দুর্লভ দুই কাঁধে দু-হাত রেখে স্পর্শ করে।

বাবাকে বলে দেবো সমস্ত।

নির্ভীক দুর্লভ বলে, বোলো। না বলো তো অতি-বড় দিব্যি রইল। বলবে, ম্যানেজারের সঙ্গে বিয়ে দাও। পারবে না বলতে—লজ্জা করবে?

এলোকেশীর সর্বদেহ কাঁপছে। পানের ডাবর সরিয়ে দুর্লভ মেজেয় চেপে বসল। কোলের উপর টানছে তাকে।

আপনি থেকে তুমিতে এসে পৌঁচেছে এক মুহূর্তে। এমনি সময়ে ভেজানো দরজা খুলে মতিরাম ঢুকলেন। খড়মের আওয়াজে ফিটের যাবতীয় লক্ষণ আরোগ্য হয়ে রোগি মুহূর্তে সামলে উঠেছে। দুর্লভ তক্তাপোশে পা ঝুলিয়ে বসে। এলোকেশী মেজের উপর পানের ডাবর নিয়ে যথারীতি কাঁতি দিয়ে সুপারি কুচোচ্ছে।

ম্যানেজার মশায়ের আগমন হল কখন।

দুর্লভ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল প্রথমটা। সামলে নিয়ে বলল, এই তো—এই এখনই। ভারি এক সু-খবর আছে। বনকরে ঢুকবার চেষ্টায় আছি, আশা পেয়েছি। যতই হোক সরকারি চাকরি—সব দিক দিয়ে সুবিধে। কি বলেন? মূলধন নিয়ে

আমরা কাঁইকুঁই করছিলাম—এ যদি লেগে যায়, বিনি-পয়সায় কাঠের ব্যবসা ফাঁদব। আপনাকে ভাগিদার হতে হবে।

এমন মনোরম প্রস্তাবের পরও মতিরামের কিছুমাত্র উৎসাহের লক্ষণ দেখা যায় না। চুপচাপ—যেন একটু বাঁকা-দৃষ্টিতেই চেয়ে আছেন তিনি। দুর্লভ পুনরায় বলে, ঈশ্বর-জানিত লোক আপনি—দেবীস্থানে বলবেন, যাতে কার্যসিদ্ধি হয়।

কিন্তু বলতাম কি করে দেবীর কাছে? আমি রওনা হয়ে যাবার পর তবে তো আপনি এসেছেন।

দুর্লভ বলে, তা ঠিক। আপনি ফিরে এলেন—সেই জন্যই দেখা হয়ে গেল। বরাত-জোর আমার।

মতিরাম কঠিন স্বরে বললেন, আজকে একদিনের ব্যাপার নয়—প্রায়ই আসেন এমনি। কত অসুবিধা হয়, বিবেচনা করুন দিকি! রায়বাবুর লোক আপনি—উপযুক্ত আদর-অভ্যর্থনা হয় না।

দুর্লভ উদারভাবে বলে, আমি তাতে কিছু মনে করি নে।

কিন্তু আমি যে করি! লোকে মনে করে। আর সে মনের কথা যে মনে-মনে রাখে, তা-ও নয়—মুখেও বলছে অনেক-কিছু আমার অবর্তমানে যখন-তখন ঢুকে পড়েন বলে। আপনারা বড়দরের মানুষ—উঁচু কান অবধি হয়তো সে-সব পৌঁছয় না।

দুর্লভ বলে, যখন-তখন আসি, কে বলল?

মতিরাম বলেন, জিজ্ঞাসা করলে সবাই বলবে? বলতে হবে কেন, আমি টের পাই। এ রকম আসবেন না আর। আসবার দরকার হলে একটা লোক পাঠিয়ে খবর নেবেন, আমি বাড়ি আছি কি না। অনর্থক এসে হয়রান হয়ে যান, আমার কষ্ট হয়।

দুর্লভ মুখ কালো করে বলে, ভালো মনে করে আসি তা বেশ, আসবই না আর কখনো।

ভেবেছিল, একটু-কিছু প্রতিবাদ আসবে। কিন্তু মতিরাম সেদিক দিয়ে গেলেন না সহজভাবে বললেন, চলুন তা হলে—একসঙ্গে যাওয়া যাক। কি খবর আছে, শুনতে শুনতে যাই—দেরি করলে গোন মারা যাবে, দেরি করবার জো নেই! চলুন!

দুর্লভকে সঙ্গে নিয়ে তবে বেরুলেন—এক রকম গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার শামিল। দুয়োরের সামনে কেতুচরণ দাঁত বের করে হাসছে—ও-বেটা এদিকে কি করতে এসেছিল? মতিরামের অনুপস্থিতিতে পাহারা দিয়ে বেড়ায় নাকি—সেইজন্যে দুশমনটাকে রেখেছে?

রোদ চড়চড় করছে। দুর্লভের ছাতির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে মতিরাম চললেন। দু-জনে যেন কত সম্প্রীতি!

॥ পাঁচ ॥

সাঁইতলা অনেকগুলো। শুধু সাঁইতলা বললে ধরা যায় না, শুকদাঁড়া-সাঁইতলা জুড়ে বলতে হবে। পুরানো এবং বিখ্যাত জায়গা। কেতুচরণ আশায় আশায় গিয়েছিল সেখানে। কিন্তু সেকালের খ্যাতিটাই আছে, সেসব কর্মীপুরুষ নেই।

সাঁইতলার মোড়লদের লোকে এক ডাকে চেনে। চোর-চক্কোত্তি মশায় ঐ বংশের। চক্রবর্তী বটে, কিন্তু জাতে ব্রাহ্মণ নন। অসাধারণ কর্মকুশলতার জন্য লোকের মুখে মুখে উপাধিটা চলেছিল। সেসব অনেককালের ব্যাপার—লোকে এখন গল্প বলে উড়িয়ে দেয়।

এক মাদার উপর পঞ্চাশ ঘরের বসতি, জোয়ান ছেলেই অন্তত পক্ষে শ' দেড়েক। সে আমলে কেউ কখনো লাঙলের মুঠো ধরে নি, ব্যাপার-বাণিজ্য করে নি। সমস্তটা দিন দেখতে পাবে, টেড়ি কেটে গন্ধ-তেলের বাস ছড়িয়ে তাস-দাবা খেলে অথবা ঘুড়ি উড়িয়ে কাটাচ্ছে। কী সুখেরই দিন, অভাব বা ভাবনা-চিন্তা ছিল না কোনরকম।

তা বলে নিষ্কর্মা নয়—তারা বসে খায় না। রাত্রিবেলা—বিশেষ করে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে কাজের চাপাচাপি। নৌকোর কাজে যেত জনকতক—কতক ঘরের কাজে, কতক বা ক্ষেতখামারের

কাজে। খাল বা খাড়ির মধ্যে নৌকো বেঁধে আছে, মোড়লদের ডিঙি নিঃশব্দে লাগল গিয়ে তার পাশে। ঘুম ভেঙে উঠে মাঝিরা দেখবে কোমরের গাঁজিয়া কেটে টাকা-পয়সা সমস্ত নিয়ে গেছে। গাঁজিয়া কাটার সময় কাঁচির পোঁচে চামড়ার এক পর্দা যদি কেটে যেত, তাতেও বোধহয় সাড় হত না। এই হল নৌকোর কাজ। আবার দেখ, আগুন জ্বেলে আগুনের আলোয় চারিদিক দিনমানের মতো করে সতর্ক চাষীরা রাত্রি জেগে পাহারা দিচ্ছে—তারই মধ্য থেকে যেন ভানুমতীর খেলায় খামারের ধান, এমন কি হালের বলদ পর্যন্ত, কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক চলে যাচ্ছে। সাঁইতলার মোড়লদের পক্ষেই সম্ভব শুধু এ ধরনের সাফাই ক্ষেতের কাজ। চেষ্টা করে দেখ—আর কেউ এমনটি পেরে উঠবে না। ঘরের কাজকর্ম হামেশাই অবশ্য দেখে থাকে দশজনা। কিন্তু সাঁইতলাব সঙ্গে সাধারণ ছিঁচকে ও সিঁধেলদের তুলনা হতে পারে না। মান্যধর মোড়ল এবং অন্য বুড়ো মুরুব্বিরা তাঁদের আমলের গল্প করে, শুনে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়।

মন্তোর-তন্তোর গুণ-জ্ঞানই বা কত রকমেব জানা ছিল! ম্যাড়ি-আঁটার মন্তোর—ধূলো পড়ে ছুঁড়ে মারো কুকুরেব গায়ে, মাড়ি এঁটে গিয়ে কুকুরের মুখ থেকে আওয়াজ বেরুবে না, ঘেউ-ঘেউ করে গৃহস্থকে জাগাতে পারবে না, কামড়াতেও আসবে না। আবাব এমনও আছে—দশ-বিশটা কুকুব ডেকে ডেকে মরে গেলেই-বা কি, গৃহস্থের সাড় হবে না নিদালি মন্তোরের গুণে। চাবি-খোলাব মন্তোব ছিল এক রকম—মন্ত্রপূত ধূলোর কণিকা মাত্র তালার গায়ে ঠেকিয়ে দাও, যত শক্ত তালা হোক আপনি খুলে পড়বে। সেকালের সেই সব ধুরন্ধরেরা গত হয়েছেন—মন্তোর-তন্তোর শিখে রাখে নি কেউ। আর দিনকাল বদলেছে, লোকের নিষ্ঠা নেই, মন্তোর তেমন খাটেও না একালে।

প্রবীণেরা ছোকরাদের রীতিমতো পরীক্ষা করতেন কে কতদূর বিদ্যা আয়ত্ত করেছে। এ-বাড়ির ঘটিবাটি জিনিসপত্র ও-বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে প্রায় চোখের উপর দিয়ে, অথচ তিলমাত্র টের পাবে না।

টের পেলে পরীক্ষায় হার হয়ে গেল, তাতে হেয় হতে হবে সাঁইতলার মেয়ে-পুরুষ সকলের চোখে। শেষ পরীক্ষাটা বিষম কড়া। পাখি ডিমের উপর বসে তা দিচ্ছে—সেই ডিম সরিয়ে আনতে হবে পেটের তলা থেকে। মগডালের উপর বাসা—গাছে উঠবে, বাসার ভিতর হাত ঢুকিয়ে ডিম চুরি করবে, নেমে আসবে গাছ থেকে। এত কাণ্ডের মধ্যেও পাখি টের পাবে না, উড়ে পালাবে না। এই যদি পাবো মোড়লরা তোমায় অবাধ-ছাড়পত্র দিয়ে দেবেন। শহরে-বাজারে তখন নিঃশঙ্কে রুজি-রোজগারে লেগে যেও, বড়-বিচ্ছেদ সব চেয়ে বড় ওস্তাদ স্বর্গীয় চোর-চক্রোত্তির আশীর্বাদে কখন কোনরকম বিপত্তি ঘটবে না।

কিন্তু এখন এ সমস্ত নিতান্তই গল্পকথা। একটু রাত হলে দেখবে, সাঁইতলার ঘরে ঘরে দরজায় খিল এঁটে সবাই নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। সাঁইতলার জোয়ান ছেলে রাত্রিবেলা দুয়োরে খিল দেয় এবং পড়ে পড়ে ঘুমোয়! মান্যধর হেন মাতব্বর ব্যক্তির ছেলে উমেশ কুলকর্ম ছেড়ে পিতৃপুরুষের নাম ডুবিয়ে বড়দলে তারক বাড়ুজ্জের কাছে রাগ-রাগিণী ও তবলার তাল রপ্ত করতে যায়। বোঝ তাহলে অবস্থা! কম দুঃখে কেতুচরণ সাঁইতলা ছেড়েছে!

তারক বাড়ুজ্জে ওস্তাদ গাইয়ে—অঞ্চলজোড়া খাতির। বাদা-রাজ্যের সুবিখ্যাত গঞ্জ বড়দল—সেইখানে তাঁর আস্তানা—সাঁইতলা থেকে ক্রোশ তিনেক তো হবেই। বাজখাঁই গলা বাঁড়ুজ্জে মশায়ের, গানের কথারও সব সময় মাথামুণ্ডু পাওয়া যায় না—কিন্তু একবার একখানা ধরলে একবেলার মধ্যে ছাড়েন না। এ-মানুষকে সম্ভ্রম না করে উপায় নেই।

দুপুরে নাকে-মুখে দুটো গুঁজে উমেশ বড়দল রওনা হয়ে পড়ে। সিকিটা-দুয়ানিটা বাপের তহবিল হাতড়ে নিয়ে যেতে হয়—যেদিন যত দূর জোটে। প্রণাম ও পদধূলি-গ্রহণের পর বাঁড়ুজ্জে আড়চোখে তাকিয়ে দেখেন, অবশিষ্ট কি পড়ে রইল পদপ্রান্তে। শুকো-প্রণামে তিনি বেজার হন—এটা-সেটার নাম করে উঠে পড়েন—উমেশের এত পথ ভেঙে আসা পণ্ডশ্রম হয়। তাই রোজই

সে গুরুপ্রণামী কিছু-না-কিছু জোগাড় করবেই—নগদ কড়ি না জোটে তো নিতান্ত পক্ষে আধ সের খানেক চাল।

প্রণামাদির পর তারক তান ধরেন। খানিক পরে হঠাৎ থেমে গিয়ে হাসি-হাসি মুখে প্রশ্ন করেন, বুঝলে ?

কি বুঝবে উমেশ ? গোড়ায় কিছুদিন সে বোকার মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকত। ক্রমশ সাহস সঞ্চয় করে একদিন সে ঘাড় নাড়ল। ঘাড় নেড়ে বলে, আজ্ঞে না—কিছুই না—

গুরু পরম বিস্ময়ে বলেন, বলো কি গো ? আচ্ছা, আবার শোনো।

রাত্রি একপ্রহর দেড়প্রহর অবধি এমনি গান শুনে জলকাদা ভেঙে বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি এসে, বাপ না জানতে পারে—টিপিটিপি দরজার তালা খুলে উমেশ শুয়ে পড়ে।

ঘুরপথ যদিচ—বড়দলের পথে পদ্মদের বাড়ি হয়েও যায় মাঝে মাঝে। একদিন নিরিবিলি পেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, পদ্ম, তুমি যৈবনে যুগিনী হয়ে রইলে ?

মুখ শুকনো করে পদ্ম বলে, কপাল !

সে বড় দুঃখের কাহিনী। পদ্মর বিয়ে হয় সাত বছর বয়সে। শিবের মতন বর—বয়স এবং নেশার ব্যাপারে তো বটেই। তা হতভাগীর কপালে সইল না। বছর তিনেকের মধ্যে সে পাট চুকিয়ে মেয়েটা এখন ধিঙ্গি হয়ে বেড়াচ্ছে।

উমেশ বলে, সাঙা করো না কেন ? তাতে তো বাধা নেই।

মানুষ পাই কোথা ?

পদ্ম হেসে আকুল। এতক্ষণের ছদ্মগাম্ভীর্য একফালি ছেঁড়া-ন্যাকড়ার মতো যেন সে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

বিরক্ত হয়ে উমেশ বলে, হাসবার কি হল গো ?

ঐরাবত হাতি গেলেন তল, খেঁকশিয়ালি এসে বলে হেথায় কত জল ! মোড়ল-খুড়ো এসে ফিরে গেলেন, এবারে নিজে তুমি ঘটক হয়ে এলে ?

মাতব্বর এসেছিল, এ-খবর উমেশ কিছুমাত্র জানে না। অর্থাৎ

বোঝা যাচ্ছে, তার এ-বাড়ি আসা-যাওয়া নিয়ে দস্তুরমতো কানাকানি চলছে। করে কি মানুষগুলো? এটা বাদাবন নয়—পুরোপুরি আবাদ জায়গা। শুধু মাত্র ধান-চাষের চলন—বছরের মধ্যে মাস তিনেকের খাটনি। বাকি ন' মাস পরনিন্দা পরচর্চা না হলে তারা কাটায় কি নিয়ে?

সাগ্রহে উমেশ জিজ্ঞাসা করে, বাবা এসেছিলেন? তা কি কথাবার্তা হল? কি বললেন তোমার মা-ভাই?

হবে না—সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে।

উমেশ মুখ কালো করে বলে, অপাত্র হলাম আমি কিসে? স্বজাত, করণীয় ঘর—ঘরবাড়ি জমাজমি রয়েছে—

তা যতই থাক, চোরের ঘরে মা মেয়ে দেবে না। দাদা তেল-নুন মাথায় বয়ে বিক্রি করে—সে তবু অনেক ভাল, সৎপথে আছে।

হায়, হায়—কালে কালে হল কি! এত খাতির ছিল সাঁইতলার মোড়লদের—আজকে ঘরের মেয়েটা অবধি মুখের উপর স্পষ্টাস্পষ্টি চোর বলে মুখ বাঁকাচ্ছে।

উমেশ সামলে নিল। একটা গুণ আছে—যেমন কথাই হোক, টক্কর দিয়ে তার উপরে উল্টো কথা চাপান দিতে পারে। পাঠশালায় যে ক-খ-ঠ শিখেছিল, তারই গুণ।

বলল, চোর আমরা না তুমি?

পদ্ম ভীত হয়ে বলে, আমি কার কি চুরি করলাম?

করেছ বই কি! কার বুকের মধ্যে থেকে কি মাণিক চুরি করেছ—পাঁজর একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছ—মনে মনে একটু-খানি ভেবে দেখ দিকি পদ্মমণি।

জুতসই কথাটা বলে ফেলে উমেশ টিপি-টিপি হাসছে পদ্মর দিকে চেয়ে। এমন সময় সেই পদা লোকটা—মাথায় কেরোসিনের টিন, সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে—হুমদাম করে এসে টিনটা উঠানে নামাল। মাথার উপরের গামছার বিড়েটা খুলে বাতাস খাচ্ছে, খুবই পরিশ্রান্ত হয়েছে—অনেক দূর থেকে আসছে নিশ্চয়। পদ্ম ও

উমেশের দিকে তাকাতে তাকাতে ব্যস্তভাবে আবার সে বেরিয়ে গেল।

উমেশ বলে, এখনো রয়েছে। পাকাপাকি পুষে রাখলে তবে ?

পদ্ম বলে, ভারি করিৎকর্মা। অনেকদিন ধরে ব্যাপার-বাণিজ্য করছে, অনেক জানাশোনা। দোকানের চেহারা এরই মধ্যে ফিরিয়ে ফেলেছে। খুব খাটে।

লোক ভাল নয় কিন্তু—

বলে একটু থেমে পদ্মর মনোভাব বুঝে উমেশ ধীরে ধীরে বলতে লাগল, আমাদের চোব বললে পদ্মমুখী—কর্তারা কি করতেন বলতে পারি নে, কিন্তু দশের মুখে শুনে দেখো, অতি-বড় শত্রুও আমায় ঐ অপবাদ দেবে না। পদা কিন্তু এক নম্বরেব জোচ্চোর। ব্যাপাব-বাণিজ্যের কথা হচ্ছিল—সে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। লোকটার পিঠের দিকে নজব কবে দেখো, তুমিও হয়তো দেখবে কিছু-কিছু।

বুঝতে না পেরে পদ্ম অবাক হয়ে চেয়ে আছে।

দিন কতক চিটেগুড়ের ব্যবসা কবেছিল। নৌকো-বোঝাই গুড়ের নাগবি নিয়ে বড়দলের হাটে বেচে আসত। আগে কি হয়েছিল জানি নে—একদিন দেখলাম জমজমাট হাটেব মধ্যে পাইকারেরা ঘিবে ফেলে দমাদম আছাড় মেরে পাঁচ-সাতটা নাগরি ভেঙে ফেলল। ভিতরে শুকনো ডেলা-মাটি, শুধু মুখের দিকটায় গুড় খানিকটা। জিনিস হল চিটেগুড়—কাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে পরখ করবে, সে উপায় নেই। তাবপরে—বুঝতে পাবছ—হাটুবে মার আরম্ভ হয়ে গেল। যে কিছু জানে না, কিছু বোঝে নি—সে-ও কাঁধের বোঝা নামিয়ে রেখে ছুটে৷ কিল মেরে হাতের সুখ করে। গাঙে ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে পদা সেদিন বক্ষে পায়।

থেমে গিয়ে ক্ষণকাল পদ্মর দিকে চোখ পিটপিট করে চেয়ে উমেশ আবার বলে, কোন-কিছু কিনবার নাম করে পদাকে বড়দল যাবার কথা বোলো তো একদিন, দেখি কী জবাব দেয়।

॥ ছয় ॥

শ্রাবণ মাস গেল, ভাদ্রও যায়-যায়। উমেশ নিতান্ত মরীয়া হয়ে অবশেষে বলল, কই বাড়ুজ্জে মশায়, কিছুই তো হয় না। তবে আর মিছে জল-কাদা ভাঙি কেন ? আপনার মতো মানুষের পদাশ্রয়ে যখন হল না, এবার ইস্তফা দেবো মনন করেছি।

কণ্ঠস্বরের ব্যাকুলতায় বা অপর যে কারণে হোক—তারক বাড়ুজ্জে সদয় হয়ে বললেন, কান দিয়ে নিতে পারলে না যখন—তা বেশ, অন্য পথও আছে। কাল একটা খাতা বেঁধে নিয়ে এসো।

কাগজ এ অঞ্চলে সহজলভ্য নয়---তবে অদৃষ্টে থাকে তো এই বড়দল গঞ্জেরই কোন দোকানে দু'চার পয়সার মতো মিলে যেতে পারে। তারকের গানের মধ্যেই ফাঁক কাটিয়ে একবার সে বাজার ঢুঁড়ে এল। পাওয়াও গেল—বাদামি রঙের চাউশ কাগজ। কাগজ গণে বেছে আলাদা করে রেখে এসেছে, পয়সা না থাকায় কিনতে পারে নি। পরদিন সকাল সকাল এসে কাগজ কিনে দোকান থেকেই একেবারে খাতা বেঁধে নিয়ে হাজির হল।

খাতায় বাড়ুজ্জে বোল লিখে দিলেন। নানা বাদ্যযন্ত্রের বোল—গোটা তিরিশ হবে গুণতিতে। পড়িয়ে শোনালেন একবার আগাগোড়া। বললেন, আপাতত এই থাকল। মুখস্থ করো। সইয়ে-সইয়ে ক্রমশ দেবো।

কেতুচরণ চলে যাবার পর বাইরের কাজের ঝক্কি সম্পূর্ণ বাপ-বেটার উপর পড়েছে। মাস্তধরের উপরেই পৌনে ষোলআনা—উমেশের আর সময় কোথা ? সকালবেলার দিকটা ইতিপূর্বে তবু সে সংসারের কাঠকুটোর জোগান দিত, গোরু-বাছুর বেঁধে দিয়ে আসত ঘাসের জায়গা দেখে, কোনদিন বা খড় কুচিয়ে রাখত রাতে গোরুর জাবনা হবে বলে। বুড়ো মাস্তধরের কিছু খাটনির আসান হত

তাতে। খাতায় বোল লিখে দেওয়ার পর আর-এক উপসর্গ—বাড়িতে যে সময়টুকু থাকে, তার মধ্যেও একতিল ফাঁক নেই। পুবে ফরসা না দিতেই শোন, উমেশ সশব্দে বোল মুখস্থ করছে—ধিন তারে তেরে কেটে—। কিছুতে মুখস্থ হয় না, পাতার পর পাতা জুড়ে অসংখ্য অর্থহীন শব্দ—উল্টোপাল্টা হলে চলবে না—কি মুশকিল বলো দিকি! উমেশ স্মরণশক্তিকে ধিক্কার দেয়। বোলের সমুদ্র কাটিয়ে কতদিনে যে গানের কূলে পৌঁছবে, তার কোন হদিশ পায় না।

জলকাদার এই সময়টা ছাতি লাঠি দুয়েরই প্রয়োজন হয় চলাচলের জন্য। গোলপাতায়-ছাওয়া ছাতি—বন্ধ করা যায় না, কিন্তু জল মানায়। কাপুড়ে ছাতির চেয়ে অনেক ভাল। আর লম্বা লাঠি আগে কাদার মধ্যে দিয়ে আন্দাজ বুঝে তবে পা ফেলতে হয়। পদে পদে পা হড়কায়, তখন লাঠি ঠেকনো দিয়ে খাড়া থাকতে হয়। কথা চলিত আছে—বড়দলের মাটি, দুই ঠ্যাঙ আর লাঠি। অর্থাৎ শুধু দুই পায়ের ভরসায় পথ এগুনো নিরাপদ নয়।

সেদিনও উমেশ যথারীতি বড়দল চলেছে। কিন্তু খানিকটা গিয়ে কেমন আলস্য লাগল—অত পথ আর যেতে ইচ্ছে করে না। বৃষ্টিটাও এই সময় বিষম চেপে এসেছে। পদ্মদের বাড়ি ঢুকে সে দাওয়ায় উঠে পড়ল। পুব-দুয়ারি ঘর—জলের ছাটের জন্য দরজা বন্ধ। লাঠির আগা দিয়ে ঠুকঠুক করে সে দরজায় ঘা দেয়।

পাঁচু-দা আছ নাকি? ও পাঁচু—

পাঁচু অবশ্য উদ্দিষ্ট নয়। সে এক দোচালা দোকানঘর বেঁধে ফেলেছে রাস্তার উপর—এই অপরাহ্নবেলা সেখানে তার থাকবার কথা। উমেশ রাস্তা দিয়েই এসেছে, সেই জায়গাটায় এসে ছাতা আড়াল দিয়েছিল—পাঁচু দেখতে পেয়ে দোকানে বসবার জন্য পাছে খাতির করে ডাক দেয়।

কিন্তু আজ এই অভদ্রার দিনে খদ্দেরপত্তোর কোথা—পাঁচুর তাই দোকানে যাবার তাড়া নেই। তা ছাড়া একজন লোক

তো রয়েইছে দোকানে। ভাত খেয়ে পাঁচু একটু আরাম করে শুয়েছে—ঘুমও এসে গিয়েছে। উমেশের ডাকে পদ্ম গিয়ে দরজা খুলল।

ও-মা! এই ভন্নার মধ্যে—কি মনে করে?

উমেশ জাঁক করে বলে, ঝড় হোক তুফান হোক—যেতেই হবে। আমি না গাইলে বাড়ুজ্জে মশায়ের তবলা বাজিয়ে সুখ হয় না। গুরুর হুকুম—উপায় কি?

পাঁচুর মাদুরের উপর গিয়ে বসল। তার গায়ে ঝাঁকি দেয়, ওঠো ও দাদা—বেলা পড়ে এল, কত ঘুমুবে!

পদ্মর দিকে চেয়ে বলে, ঠাণ্ডায় গলা ব্যথা করছে—একটু চা খাওয়াতে পারো? সেইজন্যে এলাম।

দোকানের মাল গস্ত করতে পাঁচু এই সেদিন খুলনা গিয়েছিল। জিনিসপত্তরের সঙ্গে এক কৌটো চা এনে রেখেছে। কোথায় যেন পদ্ম চা খাওয়া দেখে এসেছিল—দাদার কাছে ফরমায়েশ করেছিল তাই। বেশি রকম সর্দিকাশি হলে কিম্বা বাড়িতে ভাল লোক কেউ এলে তখনই চা বেরোয়। পিতলের ঘটিতে জল গরম করে তার মধ্যে পাতা ফেলে গুড়, আদা এবং কদাচিৎ দুধ সহযোগে সমারোহে চা-পান চলে।

চায়ের আয়োজন হতে লাগল। উমেশ আজ নিজেই প্রস্তাব করে, একটু গানবাজনা হলে হত না?

এতদিন বাড়ুজ্জের সাকরেদি করে ঐ বিদ্যায় খানিকটা লায়েক হয়েছে—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ সে। গান শুনে সেই যে ফাজিল পদ্মটা হাসাহাসি করেছিল, সে অপমান আগুনের মতো জ্বলে। তার প্রতিবিধান করবেই সে নতুন গান শুনিয়ে পদ্মর কাছ থেকে তারিফ আদায় করে।

প্রস্তাবটা পাঁচুর চমৎকার লাগে। বাদলাবেলা কি করা যায়—আসর জমানো যাক বসে বসে। বলে, তা যেন হল, কিন্তু বাজনার কি হবে? একখানা খোল ছিল—দল-ছাউনি ছিঁড়ে তার কেঁড়েটা মাত্তোর রয়েছে।

উমেশ সগর্বে বলে, আমার সমস্ত আছে। হরমনি অবধি কিনে ফেলেছি। রোসো—নিয়ে আসছি।

আবার বাইরের অবিরল বৃষ্টিধারার দিকে তাকিয়ে বলে, থাকগে। এর মধ্যে আনতে গেলে যন্তোর নষ্ট হয়ে যাবে। খালি—গলায় হোক না। একখানা ধরো পাঁচু-দা—

পাঁচু সলজ্জে ঘাড় নাড়ে!

আমার মেঠো গান। আচ্ছা, সে না হয় দেখা যাবে এর পর। তোমার একখানা কালোয়াতি শুনি। ওস্তাদের কাছে যাচ্ছও তো কম দিন নয়।

এমনি একটু-আধটু অনুরোধের অপেক্ষায় ছিল—পাঁচু বলতেই আ-আ-আ করে উমেশ তান ধরল।

চায়ের জল গরম করতে পদ্ম রান্নাঘরে গেছে। উমেশ ডাক দেয়, গেলে কোথা পদ্মমুখী? ঘরে কাবাবচিনি আছে? কিম্বা লবঙ্গ?

লবঙ্গ এনে দিয়ে পদ্ম একপাশে পিঁড়ি পেতে বসল। বসে চা তৈরি করতে লাগল। তান ছেড়ে উমেশ গান ধরল এইবার। গৃহস্থ-বাড়ি ওস্তাদি কসরতের জায়গা নয়—কৃষ্ণলীলার সাদা-মাঠা একটা গান ধরেছে: জল আনিবার করে ছলা, কদমতলায় দেখিস কালা—

চোখ বুজে গাইছিল উমেশ। গানটিও দীর্ঘ। আস্তন্ত বার চারেক অনেকক্ষণ ধরে গেয়ে অবশেষে সে চোখ খুলল। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করে, কেমন লাগল তোমাদের?

পদ্মর মা মুখিবুড়ি দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়। উচ্ছ্বসিত হয়ে বুড়ি বলে, আহা-হা—কী একখানা গাইলে! পাঁকে ডুবে আছি—তুমি বাবা, ঠাকুরদেবতার কথা শুনিয়ে যেও এমনি মাঝে মাঝে।

পাঁচুও বলে, বেশ-ভালো।

মুখ পুড়ে যায় এই ভয়ে পাঁচু চা খায় না। কষ্টেসৃষ্টে দু-একবার খেয়ে দেখেছে, স্বাদও কিছু নেই। কয়েক কুচি সুপারি মুখে দিয়ে সে উঠে পড়ল। বলে, বৃষ্টি ধরল বোধহয় এইবার। দেখিগে যাই—দোকানে ঝাঁপ এঁটে পদাও হয়তো ঘুম মারছে।

পাঁচু বা মুখ্যিবুড়ি কি বলে না বলে তার জন্য উমেশের মাথাব্যথা নেই। পদ্মর দিকে চোখ ফিরিয়ে দ্বিধান্বিত ভাবে প্রশ্ন করল : তুমি যে কিছু বলছ না ?

কাঁসার বাটিতে চা ঢেলে উমেশের দিকে এগিয়ে দিয়ে পদ্ম একেবারে মোক্ষম মন্তব্য ঝাড়ল :

যার কর্ম তাকে সাজে। তোমাদের মোড়ল-পাড়ায় কেউ কখনো গিয়েছে এপথে ? তাদের বৃত্তি ধরো, জুত হবে। গাওনাবাজনা হবে না তোমায় দিয়ে।

কেন ? কি জন্য হবে না ? বাড়ুজ্জে মশায় কি বলেন জানো। আমার কথায় পেত্যয় না পাও, শুনে এসো তা-হলে তাঁর কাছে গিয়ে।

কথা আটকে আসে। হায় রে, এই পদ্মই আগে আগে তার আনাড়ি গলার গানের কত প্রশংসা করত! কষ্ট করে এখন যত শিখছে, ততই কি খারাপ হয়ে যাচ্ছে ? ব্যাপার হল, ভূত স্কন্ধে এসে ভর করেছে—সেই বলাচ্ছে ওকে দিয়ে এইরকম।

দুঃখিত স্বরে বলে, পরের মুখের কথা একেবারে মুখস্থ বলে গেলে পদ্ম! আগে তো এরকম ছিলে না।

উঠে দাঁড়াল উমেশ। যাবার মুখে বলল, আচ্ছা—খালি-গলায় আর নয়। হরমনি-টনি নিয়ে আবার একদিন আসব। সেদিন কি বলো শোনা যাবে।

পদ্ম ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানায়।

উঁহু, ফুরসত নেই। এক-সংসারের কাজ নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাই, বসে বসে গান শুনব কখন ?

গভীর স্থিরদৃষ্টিতে উমেশ ক্ষণকাল তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর হাতের ইসারায় বাইরে ডেকে নিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলল, পদ্ম, সামাল করে দিচ্ছি—বিদেশিরে মন দিও না, বিপাকে পড়বে।

হাসি-হাসি চোখ তুলে পদ্ম বলল, না—মন ঝাঁপিতে পুরে রেখে দিয়েছি। দেশি মানুষ কেউ চায় তো ঝাঁপিসুদ্ধ দিয়ে দেবো।

তারপর ফিক করে হেসে বেহায়া মেয়ে বলে, দিই তো শুধু জ্ঞান-মান দেবো বিদেশিকে।

উমেশ বলে, হাসি-মস্করা নয়। লোকে নানান কথা রটাচ্ছে পদার সম্পর্কে।

পদ্ম গম্ভীর হয়ে বলে, সে একজন তো তুমি। হাতনেয় বসে সেদিন তার চিটেগুড়ের ব্যবসা নিয়ে কত রকম কুচ্ছো করলে।

কথার মধ্যেই পদা এসে পড়ে।

চা হচ্ছে, পাঁচু গিয়ে বলল। থাকে তো দাও আমারে এট্টু—

উমেশের দিকে নজর পড়তেই সে বাঘের মতো গর্জন করে ওঠে।

কি বলেছিস আমার নামে? আমি নাকি ঠেঙানি খেয়ে খেয়ে বেড়াই সব জায়গায়?

উমেশও সমান তেজে জবাব দেয়, মিছে কথা? বড়দলের আড়তদার সকলে মরে যায় নি—চলো না, মুকাবেলা করে আসি।

পদা সুর বদলে বলল, বেকায়দায় পড়লে সবাই অমন খেয়ে থাকে—হেঁ-হেঁ সব শম্মাকে জানি। তুই খাস নি?

বিষম রেগে গিয়ে উমেশ বলে, না—কক্ষনো না। কারো সঙ্গে জুয়াচুরি করতে যাই নে, আমি ঠেঙানি খাব কেন?

খাস নি—খা তা হলে। বড় বাড় হয়েছে, ভারি লম্বা-লম্বা কথা!

উমেশের গালে মারল বিষম এক চড়। চোখে সে অন্ধকার দেখল—চড় নয়, যেন হাতুড়ির ঘা। তারপরেও ঘুষি উদ্যত করেছে।

পদ্ম মাঝখানে পড়ে বাঁচিয়ে দিল।

কি করো? এই তো তালপাতার সেপাই—মরে যাবে যে।

ফাঁক পেয়ে উমেশ ছুটে পালাল। উঠান ছাড়িয়ে রাস্তার উপর পড়ে চেঁচায়, দেখে নেবো—চিনিস নি সাঁইতলার মোড়লদের। হাত দুখানা থাকবে না। একখানা মুচড়ে ভেঙে নেবো—এই যে মারলি, তার বদলে।

॥ সাত ॥

ঘটনাটা চাউর হয়ে পড়ে। মান্তধর মোড়লের ছেলের গায়ে হাত তুলেছে কোথাকার কোন্ হটকো লোক। এখন আর একা উমেশের নয়—সমগ্র মোড়লপাড়ার এবং ক্রমশ সাঁইতলা গ্রামেরই মান-অপমানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামসুদ্ধ মরে গেছে কি একেবারে?

পাড়ার বল পেয়ে মান্তধর নিজে গিয়ে একদিন পাঁচুকে শাসাল, ভালোয় ভালোয় ওটাকে বিদেয় করো বলছি—নইলে কপালে তোমার ভোগান্তি আছে।

পদা ছোকরা সত্যিই কাজের, সন্দেহ নেই। মাথায় টিন ও হাতে বোতল নিয়ে পাঁচু বাড়ি বাড়ি কেরোসিন সরবরাহ করে বেড়াত, সেই মানুষ এরই মধ্যে দোকান দিয়ে বসেছে—সত্যি কথা বলতে গেলে সে শুধু পদারই গুণে। এইভাবে অন্তত যদি বছর খানেক চালানো যায়—পাঁচুর আশা, হাতে-গাঁটে দু-পয়সা জমিয়ে ভাল পণের মেয়ে ঘরে আনতে পারবে। হাঁ-না কিছু না বলে মান্তধরের পাশ কাটিয়ে সে সরে গেল।

পদ্ম মারমুখি হয়ে এসে পড়ে।

তোমার চালের উপর চাল দিয়ে বসত করি নে মোড়ল-খুড়ো যে উঠোনের উপর দাঁড়িয়ে কথা শোনাতে এসেছ। ডেকে আনো তোমার ওমশা আর মাতব্বর দশজনাকে—ওর যা বলবার সকলের মুকাবেলা বলবে।

অপমানিত মান্তধর রাগে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে গেল।

কদিন পরে এক রাতে দমাদম ঢিল পড়তে লাগল পাঁচুর ঘরের বেড়ায়। পদা এদিকে ভারি শৌখিন—মাটিতে শোয় না, এক তক্তাপোশ জোগাড় করে এনেছে। শিয়রের বালিশ শুধু নয়—পাশবালিশ চাই তার। ছেঁচা-বেড়ার চৌরি ঘরখানায় একদিকে

পাশবালিশ আর একদিকে পাঁচু—মাঝখানে রাজা-মহারাজার মতো সে ঘুমোয়। আওয়াজ পেয়ে পদা ঝাঁপ খুলে বেরুতে যাচ্ছে, হাত ধরে পাঁচু তাকে টেনে রাখে।

গোঁয়াতুঁমি কোরো না। কজন এসেছে, ঠিকঠিকানা নেই। ওরা তো চায়ই তুমি বাইরে বেরোও—হাতের মাথায় যাতে পেয়ে যায় তোমাকে।

সকালবেলা দেখা গেল, বিশ্রী কাণ্ড—চষা আউশ-ক্ষেতের এত ঢেলা উঠানে পড়েছে যে পা ফেলবার জায়গা নেই।

এই রকম ব্যাপার চলল প্রায় অবিচ্ছেদে। দিনমানে পাঁচুর ঘরবাড়ি ঠিকই—সন্ধ্যা হতে না হতে আর কারা যেন সমস্ত দখল করে নেয়। বাড়ির চারটি প্রাণী বেলাবেলি খেয়েদেয়ে স্ব-ঘরের ঝাঁপ এঁটে দেয়। ঘুমোয় না—আতঙ্কে ঘুম হয় না—শব্দ-সাড়া শুনে লোকের গতিগম্য সম্পর্কে যেটুকু আন্দাজ পাওয়া যায়, তাই ফিসফিসিয়ে বলাবলি করে। ছমছম উঠান কাঁপিয়ে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে এই শোন দমাদম ঢেঁকির পাড় পড়ছে ঢেঁকিশালে। মউজ করে ফড়ফড় আওয়াজে হুঁকো টানছে, সে রকমও যেন শুনতে পাওয়া গেল।

এক রাত্রে ফেউ ডাকছে খুব। একটু পরে গোয়ালে ছড়মুড় করতে লাগল। মুখ্যিবুড়ি চেঁচাচ্ছে, গোয়ালে কেঁদো পড়েছে—ওরে পদা, ও পাঁচু, উঠে আয় তোরা।

পদ্ম তাড়া দেয়। চুপ করো মা, কেউ ওরা বেরুবে না।

বেরুবে না—আর ইদিকে গরু-ছাগল মেরে মেরে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাক—

ও-মা কি বলে! কেঁদোবাঘে লাঠি মারবে?

গজর-গজর করে অবশেষে বুড়ি থামল। চারিদিক নিঃশব্দ। অনেকক্ষণ কেটে গেল। কেঁদোবাঘ হঠাৎ বিকৃত গলায় কথা বলে উঠল বাইরে থেকে।

আচ্ছা থাক্—ভালমন্দ খেয়ে নে। কতদিন বাঁচবি এরকম করে?

আবার এক রাত্রে হঠাৎ দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ঘরদোর পুড়িয়ে জতুগৃহ-দাহের অবস্থা করে বুঝি! অন্ধকারের মধ্যে নৈশ বাতাসে ভলকে ভলকে হল্কা বেরুচ্ছে, ছেঁচা-বেড়ার ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া ঘরে ঢুকে দম বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। চেঁচামেচিতে লাঠিসোটা নিয়ে পাড়ার লোক এসে পড়ল। মানুষ দেখে তখন পাঁচুরা ঝাঁপ খুলেছে। শয়তানি দেখ, একটা কলসি ঠেশান দিয়ে গেছে ঝাঁপের গায়ে, ঝাঁপ খুলতেই কলসি কাত হয়ে কি-এক তরল বস্তু গড়িয়ে পড়ল। আর পাঁচু লাফিয়ে পড়তে ভূমিশায়ী হল পা পিছলে। কলসিতে কি রেখেছিল বলো দিকি? কাদা আর পচা-গোবর, কিম্বা তার চেয়েও খারাপ কিছু—দুর্গন্ধে বমি হবার উপক্রম। খড়ের গাদা থেকে খড় টেনে ছাচতলায় এনে আগুন দিয়েছে। দিয়েই সরে পড়েছে। আগুন দেওয়াটা আসল নয়। বর্ষার সময় চাল ভিজে—আগুন ধরবে না, শত্রুরা জানে। ওরা চেয়েছিল রাত-দুপুরে নোংরা বস্তু মাখিয়ে নরক ভোগ করানো। আড়ালে-আড়ালে—হয়তো বা কোন গাছের মাথায় বসে তারা এখন এই দুর্ভোগ দেখে হেসে খুন হচ্ছে।

উৎপাত সীমা ছাড়িয়ে গেল। পাঁচুরা ইতিমধ্যে ছেঁচা-বাঁশের গায়ে আবার এক সারি গরানের ছিটে লাগিয়ে বেড়া বেশি মজবুত করেছে, বেড়া ভেঙে যাতে ঘরে ঢুকতে না পারে। তা হলে হবে কি---ভয়াবহ কাণ্ড! একদিন দেখা গেল, তীক্ষ্ণধার ফলা বিঁধে আছে পদার শয্যার পাশবালিশে। বেড়ার দিকে সুবিধা করতে না পেরে, বোঝা যাচ্ছে, তারা চালের উপর উঠেছিল। চালের ছাউনি কিছু উঁচিয়ে ফেলে তারই মধ্য দিয়ে লম্বা আছাড়ের ফলা নামিয়ে দিয়েছে। দিয়েছে ঠিক তাকমাতো—হিসাব করে—যে জায়গাটায় পদা শোয়। উঃ, কি অবস্থা হত যদি ঐ রাত্রে সে নিজের জায়গায় ঘুমিয়ে থাকত!

পদা ওদের চেয়েও সেয়ানা। গণ্ডগোল জমে উঠবার পর থেকে বেশ শব্দসাড়া করে তারা তক্তাপোশের উপরে শোয়। খানিক পরে আলো নিভিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে দু-জনে চলে যায় তক্তাপোশের নিচে।

উপরে বিছানার উপর পাশবালিশটাকে কাঁথা চাপা দিয়ে রাখে—যেন মানুষই ঘুমুচ্ছে কাঁথা মুড়ি দিয়ে।

কালাটা বালিশ থেকে ছাড়িয়ে তুলতে দস্তুরমতো বেগ পেতে হল। কালা হাতে তুলে পদা হি-হি করে হাসে।

ভুঁড়ি ফাসাতে চেয়েছিল—বুঝলে? কি রকম ধার দিয়ে এনেছে দেখ, চকচক করছে। বিষ লাগানো থাকে এর আগায়। একটু যদি কোথাও খুঁচিয়ে দিতে পারত—আর দেখতে হত না, নির্ঘাত খতম।

মুখ্যিবুড়ি হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল। পাড়ার লোক জমায়েত হয়ে কাণ্ডটা দেখছে সকৌতুকে। পদ্ম গালে হাত দিয়ে শুকনো মুখে যেন অসাড় হয়ে বসে আছে।

পরের দিন দেখা গেল, পাঁচুর ঘরবাড়ি দোকানপাট খা-খা করছে, সবসন্ধ পালিয়েছে। উমেশের কথা খাটল না অবশ্য—পদা ছুটো হাতই অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় নিয়ে চলে গেছে।

কেতুচরণ মান্যধরের বাড়ি বেড়াতে এলো। এসেছে উমেশের কাছে—এখানে থাকার সময় উমেশের সঙ্গে বড় ভাব জমেছিল। উমেশকে সে ভোলে নি।

উমেশ সমাদরে আহ্বান করে, এসো—। হাত ধরে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে।

কেমন আছ?

কেতুচরণ অবাক হয়ে গেল। ডুগিতবলা, ঢোলক, ফুলট-বাঁশি, কত্তাল, খঞ্জরি, এমন কি হারমোনিয়ামও—কত রকম বাদ্যযন্ত্র, তার সীমাসংখ্যা নেই। মেজের চতুর্দিকে সমস্ত ছড়িয়ে আছে। মাঝখানে একটা মাদুর পেতে উমেশ কেতুকে নিয়ে বসাল।

গান শোন একখানা—

একখানা বলে পর পর চারখানা শোনাল। জিজ্ঞাসা করে, কেমন লাগে?

কেতুচরণ গানের কিছু বোঝে না, তবু মাথা নেড়ে তারিফ করে, ভালো—

তবে যে বলে আমার দ্বারা হবে না?

হবে না কি বলো, এই তো হয়ে গেছে—

উমেশের অবস্থা দেখে সহানুভূতিপরবশ হয়ে আরও জোর দিয়ে কেতু বলে, এত ভালো এ পাইতক্কের ভিতর আর কেউ গায় না।

দরদের কথায় হঠাৎ উমেশের চোখ ভরে জল আসে।

আহা, কাঁদো কেন?

শোন ভাই একটা কথা। একঘর লোক এরা ভিটেছাড়া করে দিল। আমি এ সইতে পারি নে। কোথায় দুয়োর-দুয়োর ভিখ মেঙে বেড়াচ্ছে—খাচ্ছে কি খাচ্ছে না—

পাগলের মতো সে নিজের গাল চড়ায়।

আমিই বলেছিলাম। বুঝলে? রাগের মাথায় মাথামুণ্ডু কি বললাম, তাই ওরা সত্যি ভেবে নিল। একজনের ঘর ভেঙে দিলাম, মহাপাতকী আমি ভাই—

॥ আট ॥

মতিরাম একদিন স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা করলেন, দুটো দুটো পেটে খাবার জন্য নিশ্চয় এসো নি। উদ্দেশ্যে কি, খুলে বলো তো বাবা—

কেতুচরণ খপ করে তাঁর দুই পা জড়িয়ে ধরল।

কি হল—অাঁ? পায়ে আছাড় খেয়ে পড়লে, হয়েছে কি তোমার?

দয়া করতেই হবে দয়াময়—

ধীরে ধীরে পা ছাড়িয়ে নিয়ে মতিরাম বললেন, কি করতে পারি বলো? আমি অতি সামান্য ব্যক্তি—

বড়রা বলেন ঐ রকম। সহজে ধরা দেন না। ঐ যদি পেতায় পাবো, এত জায়গা থাকতে বাদার জঙ্গলে এসে পড়লাম কি জন্যে?

একটু বিরক্ত স্বরে মতিরাম বলেন, ভবানী-বিষয় ছেড়ে খুলেই বলো না কি ব্যাপার—

কিছু শিক্ষাদীক্ষা দেবেন—এই আর কি! কত জায়গায় ঘুরলাম, শুধুই ফক্কুড়ি। কোন শালা কিছু দিল না।

শিখতে চাও ? কি শিখবে এখানে থেকে ?...তা বেশ, দোকানে গিয়ে বোসো সকাল থেকে। পতিরামকে বলে দেবো—হাতে ধরে কাজ শেখাবে।

সেকবার কাজ নয় আজ্ঞে—

কেতুচরণ টিপিটিপি হাসে। কুঞ্চিত চোখে চেয়ে আছেন মতিরাম। কেতু বলে ফেলে, নিদালি মন্তোরটা আমায় শিখিয়ে দিতে হবে সাধু মশায়! এ দিগরের মধ্যে আপনারই শুধু ও-জিনিস জানা আছে, সকলে বলে।

কি— কি মন্তোর বললে ?

ঐ যে ধুলো পড়ে দাওয়ায় রেখে দিলে ঘরের মানুষ বেহুঁশ হয়ে ঘুমোয়—

ঘুমোক আর জেগে থাকুক—তোমার সেজন্য মাথাব্যথা কেন ? মন্তোর পড়ে ঘুম পাড়িয়ে করতে চাও কি তুমি ?

কণ্ঠস্বর পর্দায় পর্দায় উগ্র হচ্ছে। কিন্তু কেতুচরণ দৃক্‌পাত করে না, হাসছে তেমনি।

বজ্রকণ্ঠে মতিরাম বলেন, মতলব কি তোর ?

কেতু কাতর হয়ে বলে, গতর জল করেও কিছু করতে পারলাম না। গুরু আপনি, গুরুর কাছে লুকোচুরি কি—হাতে-গাঁটে কিছু যদি সেন্ত হত বিয়ে করে দশজনার একজন হতাম। ছন্নছাড়া জীবনে ঘেন্না হয়ে গেছে। তা কলিযুগে সোজা পথে পাবেন শুধুই তেপান্তরের মাঠ—রাতদিন খেটে পেটের ভাতটা জোটানো যায় না। আপনার নাম-যশ শুনে আশায় আশায় ছুটে এসেছি সাধু মশায়—

নাম-যশ শুনেছিস যে, নিদালি পড়ে আমি মানুষজন ঘুম পাড়াই। চুরি-চামারি আমার পেশা—তাই শুনেছিস ?

কেতুচরণ বলে, মন্তোরের গুণে রাজার ঐশ্বর্য হয়েছে—সবাই সেই কথা বলে!

মতিরাম খড়ম তুলে ছুটে যান।

বেরো ছুঁচো পাজি হাঁহাকা—

দাঁত বের করে হাসতে হাসতে কেতুচরণ তখনকার মতো বাইরের ঘরে নিজের আস্তানায় চলে গেল। অন্ধকারে মাদুরটা টেনে নিয়ে একটু গড়িয়ে পড়বার উদ্যোগে আছে, মতিরাম সেখানেও গিয়ে পড়লেন।

এ বাড়ির ত্রিসীমানায় নয়। এত বড় কথা মুখের উপর বলিস—অঞ্চল-ছাড়া করব তোকে। বেরো—বেরিয়ে যা বলছি ঘর থেকে—

গোলমাল শুনে এলোকেশী অবধি চলে এসেছে।

কনো কি বাবা? বৃষ্টি পড়ছে—এর মধ্যে কোথায় যাবে?

না—

বৃষ্টি অন্তত ধরে যাক।

উঁহু, এক্ষুনি—এই মুহূর্তে। এমন কথা আমার সম্বন্ধে যে ভাবতে পারে, কিছুতে তার ঠাঁই হবে না।

ঝুপঝুপে বৃষ্টি। ঘন অন্ধকার। ব্যাঙ ডাকছে, জলকাদায় হাঁটু অবধি ডুবে যায়। এই দুর্যোগের মধ্যে বেরুতে হল কেতুচরণকে। মতিরাম তিলার্ধ তিষ্ঠোতে দেবেন না গৃহাঙ্গনের মধ্যে—মেয়ের মিনতিতেও নয়। বাড়ির সীমানা ছাড়িয়েই এক চাষীর ধান তোলবার খোলেন; একখানা চালাঘরও আছে। বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে কেতুচরণ সেই চালার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু যথাসময়ে যেই পাত পড়েছে—আহারার্থী সকলে এঘর থেকে ওঘর থেকে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে, এই থেকে বুঝতে পারা গেল—কেতুচরণও ছুটতে ছুটতে উঠান পার হয়ে দাওয়ায় উঠে এঁটো-পাতের সামনে বসে পড়ল। ভাত পাতে দিয়েছে এমনি সময় মতিরাম এলেন। কেতুকে দেখে তেড়ে যাচ্ছিলেন, এলোকেশী হাত টেনে ধরল।

পাতের কোল থেকে তুলে দিও না বলছি বাবা—

চু-উ-উ—কবে একদিন ঝিলিক হেনে পালিয়েছিল। এলোকেশীর এই আর এক মূর্তি—বাঘের মতো হুঙ্কার দিয়ে উঠল। মতিরাম থমকে দাঁড়ালেন। খুব নরম হল।

বেশ, খেয়ে-দেয়ে বিদায় হয়ে যায় যেন। এ বাড়ির এই শেষ খাওয়া। তিন-চারটে কাঠের ভরা ভোররাত্রে বেরিয়ে যাচ্ছে, তার একটায় চলে যাক যে-জায়গায় ওর খুশি।

রায় দিয়ে মতিরাম রাগে গরগর করতে করতে চলে গেলেন।

কেতু ধীরে সুস্থে খাওয়া শেষ করে অভ্যাস মতো কলকেয় আগুনের জন্য রান্নাঘরের দোরে দাঁড়িয়েছে। এলোকেশী বলে, চলে যাচ্ছ তাহলে?

হুঁ। তামাক ছিলিমটা খেয়ে—

এলোকেশী ভিতরে ডাকল: শোন—

এত জনের রাঁধাবাড়া করে ক্লান্ত সুন্দর মুখ রক্তাভ হয়েছে। হাত ধরল সে। সেই একদিন লা-ভাঙা পার হয়ে এসে নতুন বাঁধের উপরে—আর এই। কেতুর বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ছে।

এলোকেশী বলে, রাগ পুষে রেখো না কিন্তু।

সহসা জবাব আসে না। জড়িয়ে জড়িয়ে কোন গতিকে কেতু বলল, উঁহু—রাগের কি আছে?

বাদলার মধ্যে দূর-দূর করে বাবা তাড়িয়ে দিচ্ছে, তবু রাগের কিছু নেই?

মুখ টিপে হেসে এলোকেশী বলে, আমার খাতিরে বলছ?

এতক্ষণে উত্তর খাড়া করেছে কেতুচরণ। বলে, গুণীন লোকে কত লাথি-ঝাঁটা মেরে থাকেন। উনি তবু হাতে মারেন না—শুধু মুখেই দুটো একথা-সেকথা বলছেন। এতে রাগ করলে মন্তোর আদায় হয়!

কাঠের নৌকোয় চলে যেতে বয়ে গেছে কেতুর। আবার সে সেই চালাঘরে গেল। রাতটা তো কাটুক এইভাবে, দিনমানে দেখা যাবে।

ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি হচ্ছে—জলের ছাঁট থেকে গা বাঁচানো দায়। ভিজে মেঝে—একটু যে জুত করে বসবে, সে জায়গা নেই। ঘুমও নেই চোখে। এলোকেশীর ঐরকম হাসি—তার হাত ধরার কথা

মনে ভাবছে। এলোকেশীর হাসি ঝিলিক দিচ্ছে যেন বৃষ্টি-বাদল ও অন্ধকারের মাঝে।

রাত দুপুর। একটা ব্যাপার দেখে তড়াক করে সে উঠে দাঁড়াল। ক'টা লোক অতি সন্তর্পণে ছুড়কোর ফাঁকে গুঁড়ি মেরে মতিরামের শোবার ঘরের দিকে গেল। এ কাজের কাজি কেতুও তো ছিল কিছুদিন—চলাফেরা দেখে বুঝতে দেরি হয় না, তারই স্বগোত্র লোক। নিঃশব্দ-পায়ে সে-ও গিয়ে কাছাকাছি বাতাবিলেবু-গাছের আড়ালে দাঁড়াল।

তিন জন। ঠুক-ঠুক করে একজনে দরজায় টোকা দিল বার কয়েক। অতঃপর আর সন্দেহের কিছু নেই—গৃহস্থর সাড়া নিচ্ছে। তিন জন হোক অথবা দশজন হোক, কেতু গ্রাহ্য করে না। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে সে জাপটে ধরল একটাকে। মর্মান্তিক যন্ত্রণায় লোকটা আর্তনাদ করে উঠল, অপর দু-জন ছুটে পালাল।

খুট করে দরজা খুলে মতিরাম বেরুলেন এই সময়। চোরের চিৎকার কানে যেতে না যেতে বেরিয়ে পড়েছেন, অতএব জাগ্রত ছিলেন তিনি। সাধুসন্ত লোক তো বটে—না ঘুমিয়ে জপতপে নিমগ্ন ছিলেন সুনিশ্চিত।

কি হে, নিশিরাত্রে লাগিয়েছ কি তোমরা?

কেতুচরণ জাঁক করে বলে, বেটা চুরির মতলবে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছিল। দরজায় ঘা দিয়ে পরখ করছিল। বুঝতে পারে নি, যম রয়েছে পিছনে।

এমন আসন্ন সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়ে দিল, অথচ কি আশ্চর্য ব্যাপার—মতিরামের আক্রোশ কেতুচরণের প্রতি। চোখ পাকিয়ে বলেন, তোকে তাড়িয়ে দিয়েছি না? কি জন্যে আবার বাড়ির চৌহদ্দির ভিতর ঢুকেছিস?

কেতুচরণ বলে, আমি না এলে এতক্ষণ যে আপনার সর্বস্ব খাঁহা-খাঁহা মুল্লুক বেরিয়ে যেত সাধুমশায়—

লোকটাকে এখনও ধরে আছে। মনে হল, কী যেন রয়েছে

লোকটার কাপড়ের মধ্যে—কেতুর গায়ে ফুটছে। খুব জোরে নাড়া দিতে আর এক তাজ্জব। সিঁদ-কাঠি বেরিয়ে ছিটকে পড়ল।

থাপ্পড় কষিয়ে দিল কেতুচরণ। পালোয়ানের হাতের থাপ্পড়ে লোকটা চোখে সরষেফুল দেখে।

চেনেন তো সাধুমশায়, কী জিনিস এটা—কোন্ কর্মে লাগে? এইবারে পেত্যয় হল?

মতিরাম কিন্তু আরও ক্ষেপে ওঠেন।

তোকে কে খবরদারি করতে বলেছে রে হারামজাদা? মাইনে-করা দারোয়ান নাকি তুই?

অকারণ গালিগালাজে কেতুচরণও ধৈর্য হারাল। বুক চিতিয়ে একেবারে কাছে গেল মতিরামের।

মুখ সামলে কথা বলবেন সাধুমশায়। ভালোর তরে বলে দিচ্ছি। গুরু বলে মান্য করি, কিন্তু তাতে রক্ষে হবে না।

মতিরাম চমকে গেলেন। কিন্তু পরিণাম যা-ই ঘটুক, সঙ্গে সঙ্গে নরম হওয়া চলে না। বললেন, বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বসেছি, তাই যাবি কিনা বল্।

কেতু ক্ষিপ্তের মতো চেঁচিয়ে বলল, না—। দম নিয়ে আবার বলে, একটা হেস্তনেস্ত না করে আমি এক-পা নড়ব না এই জায়গা থেকে।

কাপড়ের প্রান্ত কোমরে জড়িয়ে গেরো-দেওয়া। কাপড় ধরে পিছনে কে আকর্ষণ করছে কেতুকে। বাঁ-হাতে সরিয়ে দিতে গিয়ে অতি-কোমল স্পর্শ—এলোকেশী যে! কখন এলোকেশী এসে পড়েছে এই বচসার মধ্যে। এলোকেশী হাত ধরে টানছে তাকে পিছন দিকে।

হাত ছিনিয়ে নিয়ে কেতু বলল, চোর ধরলাম—তার জন্যে বাহবা নেই। উল্টে যাচ্ছেতাই করে বলা। চেঁচামেচি করব। লোকজন আসুক—বেটার কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে থানায় নিয়ে যাক। তবে নড়ব এখান থেকে।

এসো বলছি—

কেতুচরণ গ্রাহ্য করে না।

তখন কাঁদো-কাঁদো হয়ে এলোকেশী বলে, এত করে বলছি, কেলেঙ্কারি না করে ছাড়বে না? পায়ে মাথা খুঁড়ব নাকি তোমার? ছেড়ে দিয়ে চলে এসো বলছি।

চু-উ-উ—করে মাঠ ভেঙে পালিয়েছিল, সেই চপল মেয়ের মুখে এমন পাকা-বুদ্ধির কথা! বাঘবন্ধন মন্ত্রে বহরদারেরা জঙ্গলের বাঘ বশ করে—শিকারের টুঁটি ছেড়ে বাঘ পোষা কুকুরের মতো সুড়সুড় করে লেজ গুটিয়ে চলে যায়। কেতুচরণও কি মন্ত্রের জোরে চোর ছেড়ে দিয়ে নত মাথায় এলোকেশীর পিছু-পিছু চলল। আর— একি, কী করে দেখ বেহায়া বেপরোয়া মেয়েটা! বাপ-খুড়ো এবং এক-বাড়ি লোকের চোখের সামনে তার হাত ধরে ঘরের ভিতর নিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিল।

ব্যাপারটা কি তা হলে? অনেক রকম কথা মনে আসে, নানা সন্দেহ হয়। সাধুমশায় প্যাঁচে পড়ে গেছেন, ভাবে ভঙ্গিতে মালুম হচ্ছে। তবে এলোকেশী মেয়েটা ভাল। সে যা বলছে, না শুনে পারা যাবে কেমন করে?

যাবার সময়টা আমাদের মুখ না পুড়িয়ে তুমি ছাড়বে না?

ঐ কথারই জের ধরে কেতুচরণ তম্বি করে: এমন করে মুখ পোড়াব—কেউ আর না তাকায় তোমাদের দিকে। নয় তো সাধুমশায়কে সামাল করে দাও, বাবদিগর আমার চলে যাবার কথা মুখ দিয়ে বের না করেন।

এলোকেশী ঘাড় নেড়ে জোর দিয়ে বলে, যাবেই তুমি। এই লাঞ্ছনা-গঞ্জনার পরে আমি থাকতে দেবো না। পুরুষ-জোয়ান কেন হেনস্তা সয়ে পড়ে থাকতে যাবে এখানে?

তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ঘনিষ্ঠ মৃদুকণ্ঠে বলে, থাকব না আমিও।

কেতু আশ্চর্য হয়ে বলে, তুমি?

জল টলমল করে উঠল এলোকেশীর চোখে।

কি সুখ আছে বলো দিকি এই আগুনে পুড়ে রাঁধাবাড়া আর

দেওয়া-থোয়ার মধ্যে ? কথা বলবার জো নেই—ভালমন্দ ছুটো কথা কারো সঙ্গে বলতে গেলে বাবা কি খোয়াবটা করেন তা সেদিন চোখেই তো দেখলে।

ম্যানেজার খোয়াব হয়েছে—সে কাজে কেতুচরণই তো অগ্রণী। এলোকেশীর মুখের দিকে চেয়ে তার মনের তলায় কি আছে, কেতু বোঝবার চেষ্টা করে। এত যে বৈরাগ্যের বুলি বলল, সে কি দুর্লভের সেই অপমানের জন্য ? একটা প্রশ্ন অনেক দিন কেতুচরণের মনে আনাগোনা করছে, সেইটাই সে জিজ্ঞাসা করে বসে।

তোমার মতো মেয়ের এতদিনের মধ্যে ঘর-সংসার কেন হল না তাই ভাবি।

বাদা অঞ্চলে মানুষ কোথা ? সবই তো জন্তু-জানোয়ার।

অতীত জীবনের যবনিকা একটুখানি তুলে ধরল এলোকেশী।

ছেলেবেলা এক মহকুমা-শহরে থাকতাম। সে অনেক দূর। ইস্কুলে যেতাম—

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বলল, বিশ্বাস করতে পারো, বিনুনি দুলিয়ে আমি ইস্কুলে যেতাম—বিনুনির আগায় রাঙা ফিতে বাঁধা ? উকিল-হাকিমদের মেয়ের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসতাম ? সব ছেড়েছুড়ে আসতে হল অজঙ্গি জায়গায়। সত্যি বলছি কেতু, একটুও ভাল লাগে না। আমায় উদ্ধার করতে পারো এই জল-জঙ্গল থেকে ?

কেতুচরণ সাগ্রহে বলে, যাবে সত্যি ?

যাবোই। একটু ভাল জায়গা পেলে বেরিয়ে পড়ি। এখানে দম আটকে আসে।

নিশ্বাস ফেলে সে চুপ করল। ক্ষণকাল উন্মনা হয়ে থাকে। স্নিগ্ধার কথা মনে পড়ে যায়—নামের বানানটা রপ্ত করতে এলোকেশীর খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু সকল মেয়ের মধ্যে বেশি ভাব ছিল ঐ স্নিগ্ধার সঙ্গে। এখন যদি দেখা হয়ে যায়, সে কি চিনতে পারবে ? কোথায় কোন্ বড়-ঘরে বিয়ে হয়ে গেছে স্নিগ্ধার ! সোনাদানা পরছে, মোটর চড়ে বেড়াচ্ছে, থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখছে, কত শৌখিন সাজ-পোশাক তার অঙ্গে···

অনেক দিন পরে অতীতের মহকুমা-শহর এলোকেশীকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। কেন সে থাকবে এরকম ভাবে—কিসের জন্য? মতিরামের তত দোষ নেই—মেয়ের বিয়ের চেষ্টা তিনি অনেকবার করেছেন। এলোকেশীর মা আপত্তি করত। মা মারা যাবার পর—মেয়ে ইতিমধ্যে বড় হয়ে গেছে—এলোকেশীর নিজেরই ঘোরতর আপত্তি এখন। জাত-কুল হিসাব করে একটা আধা-জংলির সঙ্গে সাত-পাক ঘুরিয়ে দেবে—সেই লোকের বাড়ি ধান ভেনে কাপড় কেচে জল তুলে বাসন মেজে চিরজন্ম কাটাবে, ভাবতেও আতঙ্ক হয় তার।

রাত শেষ হয়ে এসেছে, কেতুচরণ তখন ঘর থেকে বেরুল। কানের মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করছে, ধমনীতে রক্ত নয়—আগুনের ধারা বইছে যেন। ঈশ্বর, হেই মা বনবিবি, এতবড় পৃথিবীর মধ্যে হাত দশেক জায়গার উপর ছোট একটু ঘর তুলতে দাও কেতুকে। ঘর করবে সে এলোকেশীকে নিয়ে। অদ্ভুত মেয়ে বটে এলোকেশী—নিঃসঙ্কোচ। কেতুর গায়ের বল দেখেই মজে গেছে একেবারে। নোনা রাজ্যে অমন ফুটফুটে রং বজায় রাখে কি করে? পদ্মফুলের মতো ভুরভুরে গন্ধ বেরোয়—কি মাখে সে গায়ে? কিন্তু গন্ধ বা গায়ের রং নিয়ে কেতুচরণের মাথাব্যথা নেই—এসবের মহিমা সে বোঝে না। মুগ্ধ হয়ে দেখে সে এলোকেশীর নিটোল স্বাস্থ্য। আর দেখে দুরন্ত সাহস। চলনে-বলনে ভাবে-ভঙ্গিতে যৌবনের উত্তাল ঢেউ যেন ছড়িয়ে বেড়ায়—যেন ছিটিয়ে দেয় চারিপাশে যারা আছে, তাদের মধ্যে।

॥ নয় ॥

চলে যাচ্ছে কেতু। যাচ্ছে বটে, কিন্তু ফিরে আসবে মোটামুটি রকমের টাকার যোগাড় করে। আসবে ফিরে এলোকেশীকে নিয়ে যাবার জন্য।

লা-ভাঙার কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে—চলতি নৌকো পেলে বলে-কয়ে পার হবে। এখনো মুখ-আঁধারি, ভাল করে সকাল হয় নি। হঠাৎ দেখা গেল, হনহন করে দুর্লভ হালদার চলেছে।

ম্যানেজার মশায় না? চললেন কোথা এত সকালে?

নৌকোর চেষ্টায়। কোনো শালা নৌকো দেবে না। দেড়া ভাড়া কবুল করলেও না। বলে, মাটি লেগে যাবে। শোন কথা! নৌকোয় মাটি লাগবে না, জল লাগবে না, বাতাস লাগবে না—তবে গাঙে-খালে না রেখে কাঁথা মুড়ে সিন্ধুকের মধ্যে রাখলেই তো হয়!

বলতে বলতে দুর্লভ কেতুর দিকে আসছে। চাষের ঘেরির চারিদিক বাঁধবন্দি—নদীর নোনা জল ঢুকতে না পারে। সেই বাঁধ অবিরত সতর্ক প্রহরায় রাখতে হয়—বিশেষ এই বর্ষাকাল ও কোটালের সময়টা। চারিদিক জলমগ্ন—কাছাকাছি এক-কোদাল মাটিও পাওয়া যায় না। মাটি অনেক দূর থেকে এনে বাঁধে ফেলতে হয়—সেইজন্য নৌকোর প্রয়োজন।

কেতু বলে, মাটি বওয়াবয়ি করতে গেলে নৌকো সত্যি বড্ড জখম হয়ে যায়, নতুন করে আলকাতরা দিতে হয়। তা আপনাদের কাছারির নৌকো কি হল?

সেটা নিয়ে বাবু রায়গাঁ চলে গেলেন। সে নৌকো থাকলে কারো খোশামুদির ধার ধারি? রায়গাঁয় ভারি একটা চুরি হয়েছে যে—বাবু খবর পেয়ে ছুটে গেছেন। এদিকে আর এক সর্বনাশ—পনের-বিশটা ঘোগ হয়েছে কোটালের জলের চাপে। এখন ঝিরঝির করে

জল ঢুকছে। আকাশের যা অবস্থা—যেমন-তেমন একপশলা বৃষ্টি হলে বাঁধ ভেঙে নৈরেকার হবে।

এত বড় দুঃসংবাদেও কেতু মুখ টিপে হাসে। ব্যাপারটা এই আবাদ অঞ্চলের অতি-সাধারণেও বোঝে। মধুসূদন রায় হাজির নেই—যত প্রলয়ঙ্কর ঘটবার সম্ভাবনা অতএব এখনই। বাঁধে নতুন মাটি দেবারও এই উপযুক্ত সময়। মাটি ঢালছে, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির জলে ধুয়ে সাফ হয়ে যাচ্ছে—সে মাটির মাপজোপ হওয়া সম্ভব নয়। দুর্লভ হালদার সদয় হয়ে যা খাতায় লিখবে তা-ই মঞ্জুর। অবিশ্বাস করো তো—বেশ, ফেলা হবে না একঝুড়িও মাটি। বাঁধ রসাতলে গেলে দুর্লভ দায়ী নয়।

কেতুর নিকটবর্তী হয়ে গলা নামিয়ে দুর্লভ প্রশ্ন করে, ইয়ে হয়েছে। একটা কথা শুনলাম—রাত্রে কী গোলমাল বাধিয়েছিলি রে?

বাধাতে দিল কই ভাল করে? প্রথম মুখেই তো এলোকেশী টেনে নিয়ে গিয়ে দুয়োরে খিল দিয়েছিল। অবাক কাণ্ড—সেই-টুকুই দুর্লভের কানে পৌঁছে গেছে! কথা বললেই কি অমনি বাতাসে উড়ে উড়ে বেড়ায় বীজ-ফাটা শিমুল-তুলোর মতো?

দুর্লভ বলে, সাধু চায় না বাইরের কেউ ও-বাড়ির সংস্পর্শে থাকে। কীর্তিকলাপ তাহলে জাহির হয়ে পড়বে কিনা! যেগুলো ঘোরে-ফেরে দেখতে পাস, সবাই ওর চেলা। তোমার উপর অত খাপ্পা কেন, বুঝতে পারলি তো এখন?

কেতুচরণ ন্যাকা সেজে বলে, কিছু বুঝলাম না ম্যানেজার মশায়। হেঁয়ালির মতো লাগছে।

দুর্লভ হেঁ-হেঁ করে হাসে।

তা জানি। তোর দেহ যেমন ধারা স্থূল, বুদ্ধিও তেমনি হবে তো! বুঝিস নি—বোঝ্ তা হলে একটা একটা করে। হাতে-নাতে চোর ধরলি—ভালমন্দ কিছু না বলে সে বেটাকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল। কেন বল তো?

কেতু বলে, সাধু মানুষ—দয়ার শরীর—

সাধু না কচু। চোরের থলেদার। বুঝসমঝ আছে—অর্ধেক বখরা। এ বড় তোফা ব্যবসা। টাকাকড়ি উথলে পড়ছে দেখতে পাস নে? পতিরাম দোকানে বসে ঠুকঠুক করে—আঙুল ফুলে তাতে কি আর শাল-সেগুন হয় রে?

ব্যাপার এখন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল কেতুর কাছে। দুর্লভ বলছে, চোরেরা সোনাদানা এনে দিয়ে যায়, সাধু মজা লোটে বাড়ি বসে। স্যাকরার দোকান দিয়ে রেখেছে গয়নাগাটি গালাবার জন্য। সোনার বাঁট বানিয়ে সরিয়ে দেয়।

এখন কেতুচরণ ভাবছে, খুলনার কালী-বাড়ি মতিরামের নিয়মিত যাতায়াত—সে কি তবে সোনার বাঁট সরানোরই অছিলা? দুর্লভ আক্রোশ মিটিয়ে মতিরামের কাজকর্মের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে অবশেষে একটু থামল। চতুর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে কেতুর দিকে।

বলে, আমিও বাদাবনের ঘুঘু। অপমান হজম করি নে। বন্দোবস্ত ষোলআনা সারা। তোকে সাক্ষি দিতে হবে—যা-কিছু দেখেছিস শুনেছিস সমস্ত। সাধু-শালার সগোষ্ঠি শ্রীঘরে না পাঠাই তো আমার নাম দুর্লভ হালদার নয়, দুর্লভ কুকুর।

পাল-তোলা এক নৌকো আসছে। এখনো বাঁকের আড়ালে—পালটাই শুধু লক্ষ্য করা যায়।

বাবু এলেন নাকি? এরই মধ্যে ফিরলেন যে! কাছারির নৌকো বলেই ঠেকছে।

নৌকো দেখে দুর্লভ অতি-দ্রুত পুবন্দরের দিকে দৌড়ল।

কেতুচরণকেও ফিরতে হয়। কুকুর-বিড়ালের মতো দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে, তা সত্ত্বেও যেতে হবে মতিরামের বাড়ি। যেতেই হবে। এলোকেশীর সঙ্গে কোন রকমে দেখা করে সমস্ত কথা বলবে। সাধুর গোষ্ঠিসুদ্ধ জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে দুর্লভ। সেই গোষ্ঠির মধ্যে এলোকেশীও পড়ে যায় যে! বিগত রাত্রের এবং জ্যোৎস্নামগ্ন সেই এক জঙ্গল-কাটা মাঠের এলোকেশী!

ব্যাপারটা তা ছাড়া পুরোপুরি বিশ্বাস্যও নয়। মতিরাম সাধু রগচটা হলেও খ্যাতিমান ব্যক্তি। তিনি, এবং সেই সঙ্গে এলোকেশীও, তা হলে চোর! ছি-ছি, এলোকেশী চোর হতে পারে? দুর্লভ গায়ের জ্বালায় এই সব রটনা করছে।

কেতুচরণ তক্কে তক্কে আছে সেই ভোরবেলা থেকে। রাত্রের ঐ কাণ্ডের পর মতিরামের বাড়ি ঢুকে পড়তে পারে না তো—হা-পিত্যেশ বসে আছে খ'লেনের চালার খুঁটি ঠেশ দিয়ে। প্রহরখানেক বেলায় এলোকেশী সাবান ও গামছা নিয়ে স্নানের জন্য ডোবার ঘাটে চলেছে। ঘরের মাটি তুলে এখানে-সেখানে এমনি সব ডোবার সৃষ্টি হচ্ছে। জল কিন্তু নোনা—রান্নার কাজে লাগে না, বাসন ও গা-হাত-পা ধোয়াই চলে শুধু। এদিক-ওদিক চেয়ে কেতু সুড়ুত করে এগিয়ে এল। এতক্ষণে এইবার ফুরসত হয়েছে নিরিবিলি দুটো কথা বলবার।

মুখ কালো করে এলোকেশী আগাগোড়া শুনল। শুনে কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকে। তারপর বলল, একটা নৌকোর যোগাড় দেখ। নিশুতি হয়ে গেলে তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব!

হঠাৎ বাজ পড়লে যেমন হয়, কেতুচরণের তেমনি অবস্থা। নিষ্পলক হয়ে সে চেয়ে রইল এলোকেশীর দিকে।

এলোকেশী সামাল করে দেয়: কেউ যেন টের পায় না—খবরদার!

বলে পরনের ভিজে কাপড়ে সর-সর আওয়াজ তুলে নিটোল অঙ্গের গৌর আভা বিকীর্ণ করে দ্রুতপদে সে বাড়ির দিকে চলে গেল।

কী বলল এলোকেশী—এ কি সত্যি হতে পারে? মেয়েটার রীত-ব্যাভার কেতুচরণ মনে মনে তোলাপাড়া করে। কোন-কিছুই অসম্ভব নয় ওর পক্ষে।

॥ দশ ॥

অনতিপরে ঠিক দুপুরবেলা বিষম কাণ্ড। সাধু মতিরামের বাড়ি পুলিশ। দুর্লভ মুখে যা বলল, কাজেও করেছে ঠিক তাই—একটু এদিক-ওদিক হল না। বড়-দারোগা এবং নীল কোর্তা ও চাপরাশ-আঁটা দফাদার-চৌকিদারের দল হুড়মুড় করে উঠানে ঢুকল। থানা অনেক দূরে। রাত থাকতে সেখানে থেকে এরা বেরিয়ে পড়েছে।

মতিরাম কোথা? শোন। ঘরের মধ্যে বসে কি করো, বাইরে চলে এসো।

কারা তোমরা?

হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন মতিরাম। উঁকি দিয়ে দেখে সুড়-সুড় করে বেরিয়ে এলেন। সবিনয়ে হাত কচলাচ্ছেন।

কি ভাগ্যি, হুজুররা আমার বাড়ি! ঘেমে গিয়েছেন যে! ওরে কে আছিস, পাখা এনে দে খানকয়েক। তা আমার উপর কোনো আদেশ আছে নাকি?

আদেশ এই যে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও ঘুরবে। যা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক উত্তর দেবে। তোমার বাড়ি খানাতল্লাস করতে এসেছি।

সোজা অপমান নয় তো—মতিরামের মুখ ছাইয়ের মতন পাংশু। ঘরবাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজছে, বিশেষ করে যে ঘরটায় মতিরাম থাকেন। জিনিসপত্র সামান্যই—পকেট গীতা, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, পূজার কোশাকুশি—সাধকজনের গৃহে যা-সমস্ত প্রত্যাশা করা যায়।

খানাতল্লাসের সাক্ষিস্বরূপ জনকয়েককে সঙ্গে এনেছে। বাজে লোকজনও কিছু জমেছে। মর্মাহত মতিরাম তাদের বলেন, দেখেছ তোমরা? মায়ের পাদপদ্মে পড়ে আছি, নির্বিরোধী লোক—কারো

সাতেও থাকি নে, পাঁচেও থাকি নে। শত্রুতা করে কে উড়োখবর দিয়েছে, হুজুররা তার উপর নির্ভর করে···ছি-ছি-ছি!

এমনি সময় দারোগা আঙুল দিয়ে দেখায়ঃ কাঁচা-মাটির লেপ দেখা যাচ্ছে না ওখানে—সাধুর তক্তাপোশের তলায়?

এলোকেশী বলে, ইঁদুরে মাটি তুলেছিল—আমি গর্ত বুজিয়ে গোবর-মাটি লেপে দিয়েছি।

তুমি? দারোগা কৌতুক-দৃষ্টিতে এক নজর তাকাল তার দিকে। কি দেখল, কে জানে। মুখে মৃদু হাসি ফুটল। বলে, তা আমাদের আবার খুঁড়ে ফেলতে হবে জায়গাটা।

মতিরাম প্রবল আপত্তি করে ওঠেন।

ঘর খুঁড়বেন? ভেবেছেন কি বলুন তো আপনারা? এখান থেকে বসত ওঠাতে চান? তাই স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিন না—

দারোগা বলে, ইঁদুরের গর্তে সাপও বেরিয়ে পড়ে কি না অনেক সময়। এসেছি যখন, সমস্ত দেখব। যাবার সময় তোমার ঘরের মেজে যেমন ছিল, আবার তেমনি করে দিয়ে যাব।

কোদাল ধরে দুটো চৌকিদার মাটি তুলে স্তূপাকার করেছে। পরিশ্রম বৃথা হল না। একটা মেটে-হাঁড়ি পোঁতা আছে—সরা দিয়ে ঢাকা। সরা তুলতেই ঝিকমিক করে উঠল।

কি হে সাধু?

মতিরাম শুষ্ক মুখে বললেন, আমারই জিনিস হুজুর, আমার পরিবারের গয়না।

এলোকেশীর হাত ধরে কাছে নিয়ে এসে বলেন, আমার এই মেয়ের বিয়ের সময় দেবো বলে যক্ষের ধনের মতো আগলে বেড়াচ্ছি। বাদাবাজো চোর-ডাকাতের ভয়—ঘরের মধ্যে তাই পুঁতে রেখে দিয়েছি। মন বোঝে না—রাত দুপুরে দরজা এঁটে মাঝে মাঝে দেখি, ঠিক আছে কি না। তাই হুজুর কাঁচা-মাটি দেখতে পেলেন।

দারোগা বলে, থানায় চলো। গয়না তোমার পরিবারের কি মধু রায়ের পরিবারের বিচার হবে সেখানে। আমরা যদ্দুর পারি করব, সদরের ফৌজদারি আদালত বাকিটা করবে।

রায়গ্রামে মধুসূদনের বাড়ির দোতলায় লোহার আলমারি থেকে গয়নার বাক্স নিয়ে সরে পড়েছে। দুঃসাহসিক চুরি—সন্দেহ হয়, চাবি খোলার মন্ত্র সে চোরের জানা। মধুসূদন সে সময়টা জঙ্গলে গিয়েছিলেন। শিকারের নাম করে প্রায়ই তিনি বাদাবনে ঢুকে পড়েন। জঙ্গলের ফিরতি এসে তবে চুরির কথা জানতে পারেন ঘটনার দশ-পনেরো দিন পরে। মতিরামকে এর মধ্যে জড়িত করায় উপস্থিত সকলের বিস্ময় বেড়ে গেল সাধুর সম্পর্কে।

মতিরাম পুনশ্চ প্রতিবাদ করেন, গয়না মধুবাবুর নয়—আমি বলছি। অযথা হয়রানি করবেন না হুজুর। বাদা অঞ্চল হলেও মগের মুলুক নয় এটা।

দারোগা চটে গিয়ে বলে, বাজে বকবক কোরো না। আপোষে যাবে, না কোমরে দড়ি বেঁধে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হবে?

কেতুচরণ এলোকেশীর কথামতো গাঙের ধারে নৌকোর চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করছিল। খবর শুনে সে ছুটতে ছুটতে এসেছে। মতিরাম এত লাঞ্ছনা করেছেন, তবু সে বেদনা বোধ করে তাঁর জন্য। সকাতরে বলে, সেই বেগুনবেড়ে অবধি টানাটানি করলে বুড়োমানুষটা মারা পড়বেন একেবারে। মধুবাবুকে এখান থেকেই জিজ্ঞাসা করে নেন হুজুর, গয়না তাঁর কিনা?

দারোগা বলে, মহালে আছেন এখন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সকালবেলা এসে পৌঁচেছেন। ঘাটে দেখেছি।

একজন চৌকিদারকে দারোগা বলল, দেখে আয় কাছারিবাড়ি গিয়ে। বলে আসবি, কোথাও বেরিয়ে না পড়েন—আমরা যাচ্ছি।

অতদূর—কাছারিবাড়ি অবধি যেতে হল না। পথেই দেখা। মধুসূদন রায় তিলার্ধ বসে থাকবার মানুষ নন। বাঘে হামলা দিয়ে বেড়াত, সেই জায়গায় এখন ধানের পত্তন হচ্ছে—সমস্ত তাঁর নিজের হাতের রচনা। মৌভোগের আবাদ—এবং বলতে গেলে অঞ্চলটাই তাঁর নখদর্পণে। দুর্লভ যে ছেড়ে যাবে-যাবে করে, কারণও এই। কোন-কিছুই মধুসূদনের চোখে ফাঁকি পড়ে না।

ওরই মধ্যে সামান্য যেটুকু দুর্লভ এদিক-ওদিক করে, তা-ও বুঝি টের পেয়ে যান। তাঁর হাসির রকম দেখে দুর্লভের সন্দেহ হয়, মনের মধ্যে অসোয়াস্তি ঠেকে।

বাঁধের নানা অংশে যোগ হচ্ছে—শুনতে পেয়ে মধুসূদন খাওয়ার পরেই বিশ্রাম না নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। জন দশেক কোদালি ও দুর্লভ চলেছে সঙ্গে। দুর্লভ মাটি ফেললেই ভেসে যাচ্ছে, তিনি তাই নিজে দেখিয়ে দেবেন মাটি ঢালবার কায়দা। একজনে বিচালির বোঝা নিয়ে চলেছে, জলের টানে মাটি কিছুতে যদি না দাঁড়ায় বিচালির আঁটি গুঁজে স্রোত-রোধের চেষ্টা হবে।

চৌকিদার পথের মধ্যে খানাতল্লাসির কথা বলল। মধুসূদন মৃদু হাস্যে সমস্ত শুনলেন।

দুর্লভ বলে, হীরামুক্তো বলছে যখন—ও গয়না নির্ঘাৎ রায়বাড়ির। গোটা জেলার হাঁড়ির খবর রাখি। শালা বলেই বলছি—সব শালাকে চিনি—বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন। কেবল আপনারা—এই রায়-বাবুরা ছাড়া।

মধুসূদন বললেন, তুমি তা হলে এদের নিয়ে এগোও দুর্লভ। দারোগার সঙ্গে কাজ মিটিয়ে আমি ঐ পথে চলে যাব।

আজ্ঞে হ্যা—

এগিয়ে এসে দুর্লভ কানের কাছে চুপি-চুপি বলে, শুনলেন তো? রক্ত-বসনের নিকুচি করেছে। টিপটাপ দিয়ে আসবেন, যাতে বেশ ভাল রকম ঠেসে দেয়।

মধুসূদন গিয়ে মতিরামের উঠানে দাঁড়ালেন। গয়না দেখানো হল।

দারোগা বলে, রায়বাবু, আপনার বাড়ির জিনিস কিনা দেখে বলুন—

মধুসূদন ঘাড় নেড়ে বলেন, হঁ্যা।

এলোকেশী সামনে ছুটে এসে আকুল কণ্ঠে বলে, ভাল করে দেখুন। বাবার মাজায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে থানায় নিয়ে

যাবে। ফাটকে আটকাবে। আপনার এলাকায় আশ্রয় নিয়ে আছি। আমাদের ভাল অবস্থা দেখে সকলের চোখ টাটায়। আপনি একটু ভাল করে নিরিখ করে দেখুন রায়বাবু।

খুব ভাল করেই দেখছেন মধুসূদন। গয়না নয়—এলোকেশীর মুখ, আপাদমস্তক অঙ্গশোভা। অপমানের বেদনা রূপের প্রখরতা ঢেকে মেঘম্লান দিনের মতো একটি স্নিগ্ধ আভা বিস্তার করেছে। মধুসূদন দেখছেন। বনবিবির পুজোর অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখেছিলেন —হাজার মানুষের মধ্যেও এ মেয়ে নজরে পড়বে। এত কাছাকাছি এলোকেশীকে এই তিনি প্রথম দেখলেন।

দারোগাকে বললেন, গয়না আমারই বটে! চিনতে পেরেছি। কিন্তু যা চুরি হয়েছে, সে জিনিস নয়। এ সমস্ত আমি দিয়েছি এই মেয়েটাকে। নিজের ইচ্ছেয় দিয়েছিলাম।

সকলে স্তম্ভিত। দারোগা মুখ টিপে হাসতে লাগল।

দেখে মধুসূদনের আরও জেদ চাপল। লোক না পোক - ভ্রূক্ষেপ করেন না তিনি দুনিয়ার কাউকে। বলতে লাগলেন, ইচ্ছে করে না, বলুন দিকি, এমন মেয়েকে গয়না পরাতে? নিজের হাতে কানে পরিয়ে দিয়েছিলাম এই দুলজোড়া। আরও দেবো। আপনারা চলে যান দারোগা সাহেব। দু-রকম কথা আমার কাছে প্রত্যাশা করবেন না, কোর্টেও ঠিক এই বলে আসব। আপনারা অপদস্থ হবেন।

রুষ্ট দারোগা মতিরামের দিকে চেয়ে কটু মন্তব্য করে যায়ঃ নমস্কার সাধু মশায়—চললাম। তোমার একটা ব্যবসায়েরই খবর পেয়েছিলাম। আরও নানা ব্যবসা আছে। খুশি হলাম। উন্নতি হোক। ভবিষ্যতে আবার দেখাশুনো হবে আশা করি।

দারোগা সদলবলে চলে গেল। লোকজন ক্রমশ পাতলা হয়ে এসেছে। কেতুচরণও যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখল, এলোকেশী কোনদিক দিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

জোগাড় হল নৌকোর?

উঁহু—

কেঁদে ফেলবে, এমনি তরো ভাব। কেতুচরণ প্রবোধ দেয়ঃ হয়ে যাবে দু-একদিনের মধ্যে, আটকে থাকবে না। হুকুম করেছ যখন—দেখো, ভূতে জুটিয়ে আনবে। খবর দেবো, তুমি তৈরি হয়ে থেকো।

বুকের ভিতর কেতুর কী যে হচ্ছে—সামলে থাকা দায়। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করেঃ কোথায় যাবে?

এলোকেশী অধীর কণ্ঠে বলে, হিসেবপত্তোর করে রেখেছি নাকি? দূর-দূরন্তর—যে জায়গায় নিয়ে যাবে তুমি। এই ছ্যাচড়ার দল যেখানকার খোঁজ না পায়।

বাদাবনের বাইরে শান্তিনগর নামে একটা জনালয়ের পত্তন হচ্ছে। জায়গাটা ভাল—ধান-মাছ সুপ্রচুর। তারও চেয়ে বড় কথা, জলের অভাব নেই—নতুন-কাটা দীঘির কানায় কানায় মিঠা জল টলমল করছে। অতএব ভাবি আরামের জায়গা হয়ে উঠবে। কেতুচরণ এর তার কাছে শান্তিনগরের নামই শুনেছে—মনের মধ্যে সহসা তার একটা ছবি খেলে গেল।

এলোকেশী এই অবস্থার মধ্যেও হেসে ফেলে বলল, দেশান্তরী হয়ে যাব গো তোমার সঙ্গে। রাজি?

বিমূঢ় দৃষ্টিতে কেতু চেয়ে থাকে। এমন ভাগ্য—সহজে কি প্রত্যয়ে আসে? কথা বলতে হয়—তাই বলল, তোমার বাপ-খুড়ো, আর এই এত বড় সংসার—ছেড়ে যাবে সমস্ত?

বোলো না, বোলো না। সংসারে তো দিনরাত্তির দাসীবৃত্তি। বাপ-খুড়ো মরে গেলে কেউ যদি খবরটা নেয়, নাম করে একগণ্ডুষ জল দেবো। কারও ওদের মুখ দেখবার আর প্রবৃত্তি নেই।

কেতু চলে গেল। মাটির উপর দিয়ে চলছে, তা আর মনে হয় না। নৌকো ভাড়া করবার অনেক চেষ্টা করছে—কিন্তু এ অঞ্চলে ভাড়ার নৌকো কেউ রাখে না। কাজে কর্মে লোকে দূরের গঞ্জ থেকে নৌকা নিয়ে আসে, কাজ অন্তে ফেরত পৌঁছে দেয়। তা ছাড়া, ভাড়া কতক্ষণের জন্য করতে হবে, কত দূরে কোথায় যেতে হবে—কোন-কিছুই কেতু জানে না। কোন সম্পদই

নেই পৃথিবীতে—ভাড়ার নামে বিশ্বাস করে নৌকো কে-ই বা সঁপে দিতে যাচ্ছে তার হাতে ?

মতিরাম মধুসূদনকে ঘরের ভিতর তক্তাপোশে বসিয়েছেন। নিজের হাতে তামাক সেজে হুঁকোর জল বদলে হাতে দিলেন—দিতে গিয়ে হাত জড়িয়ে ধরলেন তাঁর। এতক্ষণের এই ধকল এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি—কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, আপনি আমার ইজ্জত বাঁচালেন রায়বাবু।

মধুসূদন উচ্চহাসি হেসে উঠলেন।

ইজ্জত-হানির কি হল মশায়? কে কম যায় ভেবে দেখুন দিকি? ঐ যে দারোগা-পুলিশ—ওরা চোর নয়? রায়বাড়ির ছোটবাবু—আমিই বা কোন্ কৈবল্যানন্দ স্বামী! সব এক গোয়ালের গরু সাধুমশায়—কেউ কটা, কেউ বা কালো। একটুখানি যা রঙের তফাত।

হাসির দমকে দেহ আকুঞ্চিত হচ্ছে। গায়ের পাটভাঙা গরদের জামা খসখস করছে নড়াচড়ায়। এলোকেশী পান সেজে ডিবেয় ভরে এনে দিল। মধুসূদন হাসি থামালেন তাকে দেখে। প্রসঙ্গ ঘুরে গেল।

এমন বাড়বাড়ন্ত সুন্দর মেয়ে—বিয়ে দিচ্ছেন না কেন সাধুমশায়?

এলোকেশী আড়ালে সরে গেল। চমৎকার চেহারা কিন্তু বাবুটির। বনবিবি-পুজোর দিন দেখেছিল—কিন্তু এত নিকট থেকে নয়। আড়ালে গিয়েও সে বেড়ার ফাঁক দিয়ে আর একবার দেখল ভাল করে। দেখতে চমৎকার বটে, কিন্তু বড় পলকা। সারা দেহের মধ্যে বুঝি একখানিও হাড় নেই। গরদের ওয়াড়-দেওয়া একটা তাকিয়া-বালিশ যেন নড়াচড়া করছে মতিরাম সাধুর বিছানার উপর। বড় বংশের ছেলে, অগাধ ঐশ্বর্য—অথচ দেখ, একটুখানি অহঙ্কার নেই। তবে বেহায়া বিষম—সকলের মধ্যে অসঙ্কোচে এলোকেশীর রূপের প্রশংসা করলেন, ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই।

মধুসূদন বলেন, জবাব দিলেন না আমার কথার? ভাল পাত্র জুটিয়ে দিতে পারি—দেবেন মেয়ের বিয়ে?

আপনার আশ্রয়ে রয়েছি রায়বাবু। যেমন আদেশ করেন, তাই হবে?

আগ্রহের আমেজ নেই কথার মধ্যে। মধুসূদন পুনশ্চ জোর দিয়ে বললেন, আমি বলি কি—মেয়ের বিয়ে চুকিয়ে দিন, আর দোকানপাট তুলে সরে পড়ুন তল্লাট থেকে। দারোগা আবার মোলাকতের আশা দিয়ে গেছে—তার আগেই।

মতিরাম বলেন, মশা মাছি আর মাৎসর্যের উপদ্রব কোন জায়গায় নেই বলুন? হিংসেয় কে পুলিশে খবর দিয়েছিল। সেই ভয়ে আমার বাঁধা-দোকান তুলে দিতে বলছেন?

একটু থেমে হাসিমুখে আবার বললেন, শ্রীমধুসূদন সহায় আছেন, কারো আমি তোয়াক্কা রাখি নে।

একলা মধুসূদন কেন, তেত্রিশ কোটি ঠাকুর-দেবতার যাঁকে ডাক দেবেন তিনিই এসে সহায় হবেন। মেয়ে পবঘরি হয়ে গেলে কারো কিন্তু টিকি দেখতে পাবেন না। সে আপনি ভালোই জানেন সাধুমশায়। জানেন বলেই মেয়ের বিয়ের গা করেন না। কিন্তু শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড উড়ে যায়—পুলিশের নজরের মধ্যে আপনার স্যাকরার ঠুকঠুকি বজায় থাকবে কি? থাকে ভালোই—আমার কিন্তু একটুও ভরসা হয় না।

গোটা তিনেক পানের খিলি একসঙ্গে মুখে পুরে মধুসূদন উঠলেন।

ব্যস্ত আছি, চললাম। ঘোগ-মেরামতে বেরিয়েছি। ঘোগের মুখে দুর্লভচন্দ্র আমার গোটা আবাদ বের করে দেবার জোগাড় করেছে।

হাসতে হাসতে মধুসূদন বেরিয়ে পড়লেন। মানুষটিকে পাগল বলে অনেকে। সেয়ানা পাগল। দিলদরিয়া মেজাজেরও বটে। হাঙ্গামা চুকে গেছে—গয়নাগুলো ফেরত চাইল না তো! সে প্রসঙ্গ তুললই না একেবারে।

॥ এগার ॥

পাগল! পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে এসে বাদারাজ্যে ঢুকেছে।

মধুসূদনের দিকে বাঁকা-দৃষ্টিতে চেয়ে দুর্লভ মন্তব্য করছে। টিকে সর্দারকে ডেকে চুপিচুপি শোনায়, চেয়ে দেখ্ টিকে—পাঁচ সিকের মাটির তদারকে এসে বিশ টাকার গরদের পাঞ্জাবির কি হাল করেছে। ও কাদা-মাটির দাগ এদিগরে তোলা যাবে না। আর তুলবেও না দেখিস—কালকে পাঞ্জাবি হয়তো জিতু বুনো বা আর কাউকে দিয়ে দেবে। অমন কত দিয়েছে!

টিকে থেমে দাঁড়িয়ে শুধু শুনল, হাঁ-না কিছু বলল না। তারপর যথাপূর্ব মাটি এনে ফেলছে। বাঁধেরই এখান-ওখান থেকে মাটি কেটে যে জায়গায় গর্ত হয়েছে সেইখানে চাপাচ্ছে। মধুসূদন খানিক দূরে পশুরগাছের শিকড়ের উপর বসে বিড়ি খাচ্ছেন, আর নিবিষ্ট হয়ে টোকচা খাতায় একটা হিসাব দেখছেন।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তবু ছেড়ে দেবেন না তিনি। যেন পণ করে বেরিয়েছেন, বাঁধের যেখানে যা-কিছু টুটাফুটা—সমস্ত মেরামত করে ফেলবেন এই এক যাত্রাতেই। কাছারিবাড়ি থেকে পেট্রোম্যাক্স এনে ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, সেই আলোয় কাজ হচ্ছে। এত খাটতেও পারে মানুষটা! খেটে ক্লান্ত হয় না। আরে বাপু, চোখ বুজলে ফক্কিকার, মুখাগ্নি করবারও একজন কেউ নেই—তোমার এত খাটুনির সম্পত্তি খাবে তো বারোভূতে!

দুর্লভ গজর-গজর করছে। রাগে পড়ে দু-চার কথা বলছে টিকে সর্দারের কাছে। টিকে পুরোপুরি মধুসূদনের লোক—একান্ত আজ্ঞাবহ। তার সামনে কিছু বলা উচিত নয়। কিন্তু সামলাতে পারে না। দেয় বলে দিকগে। ক'টা দিনই বা আছে আর এই মনিবের অধীনে!

প্রহর দেড়েক রাত্রে কাজকর্ম সমাধা হল। খাতা থেকে মুখ তুলে মধুসূদন সহাস্যে বলেন, দেখ—নিরিখ করে দেখ তোমরা—আর কোন জায়গায় কিছু পাওয়া যায় কিনা।

দুর্লভ বলে, আজ্ঞে না। সব ঠিক হয়ে গেছে।

কাজ কতটা হল এবার ?

তা হয়েছে, যথেষ্টই হয়েছে। গণতিতে নিতান্ত কম হবে না।

আমি গণেছি। আঠাশটা—এইটুকু সময়ের মধ্যে হয়ে গেল। আর পাঁচ দিন ধরে তুমি ঘোগ মেরেছ সাকুল্যে—

দুর্লভ তাড়াতাড়ি বলে, চৌদ্দ-পনেরোটা হবে।

উঁহু, ন'টা। তা-ও আমার গোনা।

মুখস্থর মতো মধুসূদন বলতে লাগলেন, ছাব্বিশটা রোজ লাগিয়েছ, তার দরুন তেরো টাকা। দৈনিক দশ পয়সা হিসাবে পাঁচ দিন তামাক পুড়িয়েছ সাড়ে বারো আনার—

দুর্লভ বলে, আজ্ঞে—ভুঞ্চক পাবেন না। আমি যথাধর্ম লিখেছি।

মধুসূদন বললেন, হ্যাঁ দুর্লভচন্দ্র, তোমার লোকজন কি মাপজোপ করে তামাক খায় ? দশ পয়সা হিসাবে খেয়েছে—কোনও দিন ন-পয়সা কি এগারো-পয়সা হল না ?

দুর্লভ স্পষ্টাস্পষ্টি বলে ফেলে, তা খেলে আমি কি করতে পারি ? যা ভাবছেন, তা নয়। দুর্লভের কপালখানা ছোট, কিন্তু নজর ছোট নয়। টাকার কমে আমি ছুঁই নে—এই একটা কথা বলে দিলাম হুজুর।

যা লাগিয়েছ, ঘোগের ছেঁদা দিয়ে আমার গোটা মৌভোগ আবাদ যে পুরন্দর গাঙে গিয়ে নামবে।

রাত দুপুর অবধি পরিশ্রম, তার উপর লোকজনের সামনে বারম্বার বক্রোক্তিতে দুর্লভের মেজাজ বিগড়ে গেল। বলে, তবে আপনি লোক দেখুন রায়বাবু। আমায় দিয়ে এর বেশি হবে না।

বনকরের চাকরি ঠিকঠাক হয়ে গেছে তবে ?

এই আর-এক জ্বালাতন। মানুষটার সকল দিকে নজর। দুর্লভ

চাকরির জন্য তদ্বির-তাগাদা করছে এবং অনেকটা সুরাহাও হয়েছে —সমস্ত মধুসূদনের জানা।

দুর্লভ বলল, আজ্ঞে, বিশ্বাসই হল আসল। মনিবের বিশ্বাস হারিয়েছি—তবে আর কী রইল বলুন ?

মধুসূদন হেসে উঠলেন।

তোমায় বিশ্বাস করতাম—এ বড় আজব কথা শোনালে দুর্লভ। করিৎকর্মা চালাক লোক বলে ভালবাসি, এটা ঠিক। বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে তুমিও কখনো মাথা ঘামাতে না। তা চাকরি ছাড় আর যা-ই করো—ভোরবেলা বাদায় বেরুচ্ছি, তাতে যেন বাগড়া না পড়ে।

রাত দুপুর অবধি খাটিয়ে বাঁধের কাজ শেষ করবার অর্থ এতক্ষণে বোঝা গেল। জঙ্গলে যাচ্ছেন। প্রায়ই যান এইরকম—অনেক কালের অভ্যাস। উদ্দেশ্য বোঝা মুশকিল। পাগল মানুষ নিঃসন্দেহ—কখনো উচ্চহাসি হেসে বলেন, জঙ্গলরাজ্য বিজয় করে ফেলবেন তিনি। আগে-আগে হতও তাই—এক একটা লাটের জরিপ ও বন্দোবস্ত করে নিয়ে হাসিলের ব্যবস্থা করতে যেতেন। সেসব বন্ধ আপাতত। শিকারের খুব তোড়জোড় দেখতে পাওয়া যায় যাত্রার সময়টা। কিন্তু ফিরে আসেন নিরামিষ হাতে। একবার কেবল গোটা চারেক কাঁকপাখি নিয়ে এসেছিলেন। সেবারে দুর্লভ যায় নি—মুখ টিপে হেসে টিকে সর্দারকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কত নিল রে ?

সে কি ?

কিনে এনেছিস নিশ্চয় কোন শিকারির কাছ থেকে।

ঘাড় নেড়ে টিকে বলে, উঁহু, হুজুর নিজে মেরেছেন। গুলিতে ছিদ্দির হয়ে রক্ত পড়েছে, দেখতে পাও না ?

দুর্লভ বলে, গুলি বুঝি একলা তোর হুজুরেরই আছে ? যার গুলিই লাগুক, ছিদ্দির হবে—রক্তও পড়বে।

গাঙের লোনা জল সকালের রোদে ঝিকমিক করছে। তরঙ্গ দোলা দেয় নৌকোয়—মানুষগুলো দুলছে, মানুষের অন্তরাত্মাগুলো দোলে এক-এক সময়। উঁচু-নিচু আঁকাবাঁকা তৃণহীন দুই কূলের

মধ্য দিয়ে জলধারা ছুটেছে। গেঁয়োবন—ঝুপসি ঝুপসি বন চলেছে শ্রেণীবদ্ধভাবে। ভিজে চরের উপর তিতির পাখি লম্বা ঠোঁটে খুঁটে খুঁটে বেড়াচ্ছে। ছোট্ট পাখি—পাঁচ-সাতটা এক-এক জায়গায়। যেন সারি বেঁধে ঘুরঘুর করে নাচছে সখীর দল।

গোগড়ো গাছের জঙ্গল এবার—মাইলের পর মাইল। খেজুর-গাছের মতন দেখতে। ফলও খেজুরের মতো—বিষাক্ত, খাওয়া যায় না। ওপার ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। নৌকো ভেসে ভেসে যাচ্ছে একখানা দু-খানা—লাল পালের নৌকা, শাদা পালের নৌকো…

মাটির উনুনে মেটে-হাঁড়িতে চা তৈরি হল, চা ও টিন-কাটা বিস্কুট খেয়ে মধুসূদন বাদায় নামলেন। সঙ্গে টিকে যাচ্ছে এবং আরও দু-জন। মাঠালে যাচ্ছেন, অর্থাৎ জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে শিকার হবে। অত্যন্ত বিপজ্জনক এই প্রণালী। দুর্লভ অত কষ্ট করবার মানুষ নয়, তারা একদল নৌকোয় রইল।

টিকে বলে, রাঁধাবাড়া তা হলে সেরে রেখো ম্যানেজার। চাঁদের আড়ায় গিয়ে নৌকো বাঁধবে। আমরা ঐদিকপানে চললাম।

সরু খাল অরণ্যে সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে। নৌকো কোথাও দাঁড় বেয়ে কোথাও বা ধ্বজি মেরে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল। বন্দুক হাতে মধুসূদন সকলের আগে, টিকে সকলের পিছনে। জোয়ারের জল উঠেছিল—সেই জল জমে জমে আছে, কাদায় প্রায় হাঁটু অবধি বসে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ কাটল। একটুখানি যে বসবে, সে উপায় নেই। বড় কষ্ট হলে কোন একটা ডাল বা ঝুলে-পড়া লতা ধরে ঐ কাদারই মধ্যে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিতে পারো। তবে মধুসূদনের ক্লান্তি নেই—বনে এসে আরও যেন তাঁর বল বাড়ে। দৈত্যের-মতো-দেহ টিকে সর্দার অবধি হাঁপিয়ে পড়েছে—আর মধুসূদন রায় জলকাদা ছিটকে ডালপালার নিচে দিয়ে গুড়ি মেরে চলেছেন তো চলেছেনই।

পরিচ্ছন্ন উঁচুমতো একটা জায়গা পেয়ে অবশেষে মধুসূদন বসে পড়লেন। কাবান বলে এমনি জায়গাকে। কাঠুরেরা কাঠ

কেটে এখানে এনে এনে ফেলে, তারপর টুকরো করে নৌকোয় বোঝাই দেয়।

আর তিনজনও একদিকে একটু আলাদা হয়ে বসল। গলায় ঝোলানো থলিটা নামিয়ে টিকে সসম্ভ্রমে এগিয়ে দিল মধুসূদনের দিকে। বোতল-গ্লাস বের করে গ্লাসে একটু ব্রাণ্ডি ঢেলে মধুসূদন জল মিশিয়ে নিলেন।

কি রে, লোভ হচ্ছে?

বলে মুখ বিকৃত করে আবাব বললেন, ম্যালেরিয়া-মিকশ্চার—বিষম তেতো, থ্যাক্-থুঃ—

আজ্ঞে না, ছি-ছি!

বলে টিকে সলজ্জে ঘাড় ফেরাল। আবও খানিকটা দূবে সবে সকলে বসল। মৃদু হেসে মধুসূদন গ্লাসে চুমুক দিলেন। তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন তারপর: এগোতে লাগি। তোবা জিবিয়ে নে বসে বসে।

টিকে ব্যস্ত হয়ে বলে, একলা যাবেন কেন হুজুব! জায়গাটা গরম। সবাই উঠছি আমরা।

মধুসূদন তাড়া দিয়ে ওঠেন।

উঠলেই হল? থলি-সুদ্ধ রেখে যাচ্ছি—শেষ কবে তবে উঠবি। টাকার মাল—এক ফোঁটা পড়ে থাকে তো গুলি করব তোদের ধরে ধরে।

সামনে থাবে না, মধুসূদন জানেন। বন্দুক নিয়ে হাসতে হাসতে তিনি চললেন।

খুঁজে পাবি তো আমায়?

আজ্ঞে, তা পাবো না কেন? পায়ের গর্ত ধরে ঠিক ঠিক গিয়ে পৌঁছব। কিন্তু খাল পার হয়ে যাবেন না হুজুর। বিষম খাবাপ ওদিকটা।

মধুসূদনের বিচার-বিবেচনার জন্যে লোকগুলো ভালবাসে তাঁকে। রায়বাবুর সঙ্গে নরকে বেড়িয়েও সুখ। বেশি দেরি কবে নি তারা—কয়েক রশি গিয়েই মধুসূদনকে পাওয়া গেল। ছুটো

খাল এক জায়গায় মিশেছে—সেই মোহনায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন তিনি। লোকগুলোর শব্দ-সাড়ায় মুখ ফেরালেন।

খাল দুটোর কিনারা ধরে দু-দিক দিয়ে বাঁধ এসে এখানে মিশবে, বাক্স বসানো হবে এই জায়গায়। কেমন হবে, বল্। এক বাক্সর মুখেই তাহলে সমস্ত আবাদের জল মরবে। কি বলিস?

টিকে হাসে।

সমস্ত বাদাবন হুজুর আবাদ করে ফেলতে চান। একছিটে জঙ্গল থাকতে দেবেন না। এ ছাড়া অন্য চিন্তা নেই।

অনেক দিন সে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। কথা না পড়তে মধুসূদনের মনোভাব বুঝতে পারে। বাদাব লাটগুলো একের পর এক বাঁধবন্দি হয়ে মানুষের অন্ন জোগাবে, জানোয়াব তাড়িয়ে দিয়ে মানুষ ঘরবসত করবে—এটা শুধু মনের অভিলাষ মাত্র নয়, বন কাটতে কাটতে সত্যিই বহুদূর এগিয়ে গেছেন তিনি। বনরাজ্য জয় করতে করতে এগোচ্ছেন। ইদানীং এই কয়েকটা বছরই যা-কিছু মন্থরতা দেখা যাচ্ছে।

চাঁদের আড়া খালের নাম। বাওয়ালিরা বলে, চাঁদ সদাগর নৌকোর পথ সংক্ষেপ করতে এই খাল কেটেছিলেন। পৌঁছুতে দুপুর হয়ে গেল। ক্ষিধেয় সকলের কণ্ঠাগত-প্রাণ। তার উপরে মুশকিল—নৌকোব নিশানা নেই কোনদিকে। এতক্ষণেও পৌঁছল না—কি ব্যাপার?

কু—উ—উ—

দু-হাত একত্র মুখের উপর বসিয়ে টিকে কু দিচ্ছে। বাদাবনে কদাপি নাম ধরে ডাকাডাকি কোরো না। মানুষের গলা বুঝতে পারলে বাঘ যেখানে থাক চলে আসবে। দ্বিপদ খাদ্য অত্যন্ত দুর্লভ কিনা! এসে অলক্ষ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে সুলুক-সন্ধান খুঁজে। আবার বাঘই নয়—তাদের উপরেও অনেক রকম আছেন। তাঁরা আরও ভয়াবহ। যাক ওসব। ঠিক-দুপুরে জনহীন বাদায়

ভয় দেখানো উচিত হবে না। মোটের উপর ঐ যা বললাম—দরকার পড়লে কু দিয়ে সঙ্কেত কোরো, কথা বলতে যেও না।

কু—উ—উ—

টিকের সঙ্গে সকলে যোগ দিয়েছে। কল-কল করে ভাঁটার জল নামছে। জোরে হাওয়া বইছে, আওয়াজ বেরুতে না বেরুতে ভেসে চলে যায়। বনের এই মজা, একটু আওয়াজ করলেই সর্বত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। এক ক্রোশ দূরে লোক কথা বলল, মনে হবে ঠিক কানের কাছে দাঁড়িয়ে বলছে। কেন হয় বলো দিকি? বিপন্ন মানুষেব ডাক বনবিবি কানে শুনে নেন, তারপর নিজেই জঙ্গলে জঙ্গলে বাতাসের সঙ্গে সেই ডাক শুনিয়ে বেড়ান।

এত কু দিচ্ছে—যেখানে থাকুক, নৌকোর লোকেরও কু দিয়ে জবাব দেবার কথা। কিন্তু কান খাড়া করে কিছুই শোনা যায় না। উপায় কি তবে? ক্লান্তিতে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। গোলঝাড় অজস্র। টিকে কয়েকটা গোলের ধেড়ো নুইয়ে নরম পাতা বাঁধল পরস্পরের সঙ্গে। গদি-পাতা বেঞ্চির মতো হল।

হুজুর, বসুন—

তোরা?

আমাদেরও হচ্ছে।

আরো কয়েকটা বসবার জায়গা করল ঐ রকম। উল্টোপাল্টা হয়ে চারিদিকে মুখ করে সকলে বসে—বিপদ যে-কোন দিক দিয়ে উদয় হতে পারে। আর কু চলছে মাঝে মাঝে। বিরক্ত হয়ে টিকে একটা গাছে চড়ল। খানিক ওঠে, এদিক-ওদিক তাকায়। আরও উপরে বেয়ে ওঠে।

কু—উ—উ—উ—

খুব জোরে কু দিয়ে ওঠে। ফন-ফন করে তারপর অতি-দ্রুত নেমে এলো। সোল্লাসে বলে, আসছে ওরা। দেখতে পেয়েছি। ধ্বজি ঠেলে ঠেলে বেগোনে আসছে।

বিরক্ত মধুসূদন বলেন, সাড়া দেয় না কেন?

বাতাস উল্টো দিকে—শুনতে পাচ্ছে না। এখন বুঝতে

পারলাম। বেচারারা ভারি কষ্ট করছে—চারখানা ধবজি মেরেও না এগোচ্ছে না।

বসে কালহরণ নিরর্থক। কূলে কূলে তারা নৌকোর উদ্দেশে চলল। হাঁটা নয়—প্রায় দৌড়ানো। হুর্লভরা দেখতে পেয়ে একটু পছন্দমতো জায়গায় গেঁয়োর শিকড়ের সঙ্গে নৌকো কাছি করল।

ও হরি—রান্না বসে নি এখন পর্যন্ত! চেষ্টা করেছিল নাকি—বাতাসে উনুন ধরাতে পারে নি। উনুন এবার ডাঙার উপর নামিয়ে আনা হল, চারি দিক থেকে শুকনো কাঠ ভেঙে জড়ো করল। ঘিরে বসেছে সকলে—হাওয়ার দাপটে যাতে আর বিঘ্ন না ঘটে। জন্তু-জানোয়ারের তত আশঙ্কা নেই—আগুনের কাছাকাছি তারা বড়-একটা আসে না। ভাত না রাঁধুক—বুদ্ধি করে খেপলা-জালে মাছ ধরে এনেছে। মাছের ঝোল-ভাত নামতে কতক্ষণ লাগবে!

খেয়ে তখনই আবার মধুসূদন বেরুবেন। সঙ্গে শুধু টিকে। তিলার্ধ বিশ্রামের সময় নেই। জঙ্গলে জঙ্গলে একটা বেলা হয়রান হয়ে এলেন। মাচালে এ অঞ্চলে সুবিধা হবে না—হরিণগুলো ভারি শয়তান, হাওয়ায় গন্ধ পায়, পাতা নড়লে ছুটে পালায়। গাছালের ব্যবস্থা করতে হবে। মাচালে শিকার করতে হয় তো আরও দক্ষিণে চলে যাও—একেবারে সাগরের কাছাকাছি। এমনও বন আছে যেখানে মানুষের পা পড়ে নি কখনো, বন্দুকের আওয়াজ হয় নি। মধুসূদন পরের মুখে বর্ণনা শুনেছেন, একবার নিজের যাবার ইচ্ছা আছে। যাবেনই। গিয়ে শুধুই মরা পশু-পাখি হাতে ঝুলিয়ে ফিরে আসবেন না, সে লোক তিনি নন—ছুভেদ্য জঙ্গল কেটে আর একটা মৌভোগ বসাবেন। সবুজ ধানবনে-ঘেরা সমৃদ্ধিবান গ্রামের পর গ্রাম জেঁকে উঠবে—বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমি অবধি একছিটে জঙ্গল থাকবে না, এই তার পণ।

কিন্তু সে সব একদিনের ব্যাপার নয়। আপাতত গাছালের আয়োজনটা শেষ করতে হবে বেলা ডুববার আগেই। উঁচু গাছের চূড়ার ডালপালা দিয়ে মাচা তৈরি হবে তাঁর ও টিকের

বসবার মতো। গাছের উপর থেকে বন্দুক বাগিয়ে দু-জনে সারারাত্রি জন্তুর চলাচলের উপর নজর রাখবেন।

ঘন্টাখানেক পরে দ্রুত পায়ে তাঁরা ফিরলেন। এত শীঘ্র ফিরবার কথা নয়, কি-একটা ঘটেছে! নৌকোয় উঠে মধুসূদন চুপি-চুপি বলেন, খুব সামাল! একটা বাঁশি আমাদের দাও, আর একটা তোমরা রাখো। কু দেওয়া এ অবস্থায় ঠিক হবে না, এমন-তেমন বুঝলে সিটি মারবে।

অবস্থাটা বললেন তিনি। সকালবেলা সেই যে তারা হেঁটে এসেছিলেন—কাদার উপর পায়ের দাগ পড়েছিল—এবার গিয়ে দেখলেন, সেই পদচিহ্নের উপরই বাঘের থাবার দাগ পড়েছে। অর্থাৎ বড়-মিঞা পিছু নিয়েছেন। মধুসূদনরা আসছিলেন—প্রভুও বরাবর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়েছেন, দুটো বন্দুক দেখে বাড়াবাড়ি করতে ভরসা পান নি। গোলঝাড়ে এঁরা বিশ্রাম করছিলেন। তিনিও থাবা পেতে বসেছিলেন অনতিদূরে। সে থাবা আকারে এমন প্রকাণ্ড—

টিকে বলে, যেন একজোড়া বগি-থালা ম্যানেজারমশায়। বাদায় এতকালের আসা-যাওয়া, তা এমন তাজ্জব কখনো নজরে আসে নি।

এটা বোঝা গেল, গাছাল বৃথা যাবে না। এ তল্লাটে বাঘের স্বচ্ছন্দ বিচরণ। আরও একটা অকাট্য প্রমাণ, মাচা বাঁধতে হয় নি—একটা তৈরি মাচা গাছের উপর রয়েছে। বেশ বড়-সড় মাচা—দু-জনে সেখানে বসা কেন, গড়িয়েও নিতে পারবেন মাঝে মাঝে। অর্থাৎ অন্য শিকারী সদলে ঐ মাচায় গাছাল দিয়ে গেছে দু-পাঁচ দিনের মধ্যে।

সমস্ত গুছিয়ে তাঁরা জঙ্গলে ঢুকলেন। বিকালবেলা, কিন্তু ইতিমধ্যেই আঁধার হয়ে আসছে। সূর্য নিচু-আকাশে নামলেই বাদাবনে সন্ধ্যা হয়ে যায়।

॥ বারো ॥

দু'জনে গিয়ে তো গাছে উঠলেন। গাছের উপর দিব্যি পা দোলাচ্ছেন। ভাল যে দুটো বন্দুক ছিল, কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে গেলেন। নৌকোয় প্রায়-নিরস্ত্র এতগুলো লোক—যা তোরা বাঘের পেটে এখন! লোভাতুর বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে—শুনে অবধি দুর্লভ কেঁপে গিয়েছে। সোয়ারিখোপের মাঝামাঝি সরে গিয়ে বসল। একটা গাদা-বন্দুক সম্বল—একবার দেগুড় করেই বারুদ ঠাসতে বসে যেতে হয়। উঃ—আক্কেল-বিবেচনা আছে মধুসূদন রায়ের!

কি বিড়-বিড় করো ম্যানেজারমশায়?

দুর্লভ চাপা গলায় তর্জন করে: তোদের হুজুরের চৌদ্দ-পুরুষান্ত করছি।

সকলে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছে। দুর্লভ বলতে লাগল, এখানে গলা ছাড়বার জো নেই। মা-বাপের আশীর্বাদে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারি তো দশের মুকাবেলা হাঁকডাক করে বলব, পাগল-ছাগলের তাঁবেদারি করা আমায় দিয়ে আর পোষাবে না।

ভাঁটা সরে গেছে। সকালবেলাকার উচ্ছল খাল এখন বিঘতখানেক চওড়া আঙুলচারেক গভীর নালা মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু-কূলের বেঁটে গেঁয়ো-গাছগুলো মোটা গোড়া এবং অজস্র শিকড়ে অক্টোপাসের মতো মাটি কামড়ে আছে। ভরা জোয়ারের সময় আধেক-ডোবা এই সব গাছই প্রসন্ন-স্নানরত হাজার হাজার আরণ্য শিশুর মতো মনে হচ্ছিল।

নৌকো একেবারে ডাঙার উপর। দু-ধারে খালের গর্ভে নোনা-কাদা পড়ন্ত ক্ষীণ আলোয় চিকচিক করছে। কাত হয়ে পড়েছে নৌকো। ছোট ছোট গর্ত থেকে এক রকম আণবিক কাঁকড়া বেরিয়ে আসছে, মেটে রঙের অতি-ছোট উড়ুক্কু মাছ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাদের। হাতে কাজ না থাকলে তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে তাকিয়ে

তুচ্ছ এই জীবলীলা দেখা চলে। নিচু খুঁটির উপর ছই—একদিকে গোলপাতার বেড়া, বাকি তিনদিক একেবারে ফাঁকা। দুর্লভ গুটি-শুটি হয়ে আছে। বিপদ বুঝলে শজারু যেমন কাঁটা গুটিয়ে জড়সড় হয়ে থাকে, তেমনি অবস্থা।

মাথায় এক বুদ্ধি এল দুর্লভের। ছাতা মেলে একধারে আড়াল দিল। গায়ের গলা-বন্ধ কালো কোটটা খুলে টাঙাল অন্যপাশে। কোট দেখে অস্পষ্ট আলোয় মনে হতে পারে, মানুষই বসে আছে একজন। শিকারি-বাঘ দুটো লাফ দেয়—এক লাফে শিকারের ঘাড়ে পড়ে, আর এক লাফে শিকার নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে পড়ে। বাজপাখির ছো দেওয়ার মতো—চক্ষের পলকে ঘটে যায়। দূর থেকে ঝাঁপ দেয়, অতএব কোটটাই মানুষ বলে ভাববে। কোট মুখে করে সরে পড়বে দুর্লভের এই ভরসা।

সন্ধ্যা হল। শাঁক বাজছে এদিকে-সেদিকে। গাছের মাথায় বসে মধুসূদনের ধাঁধা লেগে যায়, গ্রামের মাঝখানে রয়েছেন বুঝি। শঙ্খের আওয়াজ কি ভাবে আসছে, তা যে না জানেন এমন নয়। বাদাবনে পারতপক্ষে রাতে নৌকো বাইতে নেই। এক-এক জায়গায় পাঁচ-সাত-দশখানা নৌকো একত্র কূলে বেঁধেছে, সন্ধ্যাবেলা মাঝিরা গ্রাম-ঘরের রীতি রক্ষা করছে শাঁখ বাজিয়ে। দু-পাঁচ ক্রোশ দূরের আওয়াজও মনে হবে সামনের ওই গাছগুলোর আড়াল থেকে আসছে। গাছের আড়ালে যেন ঘর-বাড়ি—গৃহস্থ-বউরা শাঁখ বাজিয়ে গোলায় গোয়ালে তুলসীতলায় সন্ধ্যা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। এই প্রায়-সম্মোহ বনভূমি কোন গ্রামের বাগিচারই গাছপালা যেন।

আরো অনেক কথা ভাবেন মধুসূদন। ভাবতে ভাবতে সম্বিৎ আচ্ছন্ন হয়ে আসে। তিমির-তন্দ্রিত গহন-অরণ্য মানুষের সুখ-দুঃখ-বিমথিত জনপদ হয়ে উঠবে—যেমন ছিল এককালে। বনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার শতবিধ পরিচয়। পুরানো দীঘি-জাঙাল, অট্টালিকা, নিমকির কারখানা, জাহাজঘাটার ভগ্নাবশেষ, নানা বিচিত্র অর্থপূর্ণ নাম···

কোথায় গেল সে সব! কেমন করে গেল! মধুসূদন বন্দুকটা আর-এক ডালে ঝুলিয়ে নড়েচড়ে পিছনে ঠেশ দিয়ে আরাম করে বসলেন। টিকে মাচার উপর আরও কিছু পাতা ভেঙে গদির মতো করে দিয়েছে। অনেক দূর অবধি নজর চলে। রাজাধিরাজ উঁচু সিংহাসনে বসে চতুর্দিকের প্রকৃতিপুঞ্জ নিরীক্ষণ করছেন, এমনি এক অবাস্তব অনুভূতি পেয়ে বসে মধুসূদনকে। চোখে যতদূর দেখা যায়, দেখছেনই—কল্পনায় ভবিষ্যৎ দেখছেন। অতীতও দেখতে পাচ্ছেন যেন সুস্পষ্টভাবে।

সমৃদ্ধিবান জনপদ। নদীর কূলে কূলে বসতি। ঘাটে এসেছে মগেরা। গোড়ায় আসত ব্যাপার-বাণিজ্য করতে—কিন্তু কতটুকুই বা লভ্য করা যায় সদ্‌ভাবে বাণিজ্য করে! দলে দলে এখন পঙ্গপালের মতো এসে পড়ে। পর্তুগিজরাও আসে। প্রথমটা এসেছিল খ্রীস্টের মহিমা প্রচার করতে, তারপর দেশটা চেনা-জানা হয়ে যেতে জাহাজের বহর সাজিয়ে আসে। কামান থাকে জাহাজে। গ্রামে আগুন দেয়। বুড়ো আর বাচ্চাগুলোকে ফেলে দেয় আগুনে। ধনসম্পত্তি লুটেপুটে জাহাজ বোঝাই করে। শক্ত-সমর্থ মেয়ে-পুরুষ-গুলোও জাহাজে তুলে নিয়ে যায় সমুদ্রপারে বিদেশের বাজারে বিক্রির জন্য।···

ভূমিকম্প। বাসুকি ক্ষিপ্ত হয়েছেন—পাপের পৃথিবী বইবেন না আর কাঁধে। শঙ্কান্বিত জলস্থল থর-থর কাঁপে। গাছগাছালি উপড়ে পড়ে, ঘরদোর ভেঙে চুরমার হয়। হাম্বা-হাম্বা রব তুলে গোয়ালের গরু দড়ি ছিঁড়ে ছুটোছুটি করে। বিপন্নের আর্তনাদে আকাশ ফেটে যায়। চড়-চড় শব্দে মাটি ফাটে—মুখব্যাদান করে বসুন্ধরা গিলে ফেলবে বুঝি সমস্ত! তারপর করাল সমুদ্রতরঙ্গ ছুটে এসে জলতলে চারিদিক নিশ্চিহ্ন করে ফেলল। হাটখোলা, সদাগর-বাড়ি, নন্দবালা-কুমুদবালার দোলমঞ্চ, জাহাজঘাটা—দেখতে দেখতে একগলা জল সর্বত্র।

আবার শতেক বছর ধরে পলি পড়ে পড়ে ভূমিলক্ষ্মী শ্যামানন উন্মোচন করেছেন ধীরে ধীরে সমুদ্র-গুণ্ঠন সরিয়ে দিয়ে। জীব এসে

বসতি করছে—প্রাচীন অট্টালিকার ইটের স্তূপে সাপ-বাঘ-বুনোশুয়োরের আস্তানা।

সেই সন্ধ্যা-রাত্রে সমস্ত অরণ্যভূমি চকিতে যেন জনপদ হয়ে দাঁড়াল, মধুসূদন অতীত সমৃদ্ধি চোখের উপর দেখতে পান। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, মানুষ-জন···বিয়ে হচ্ছে, গ্রামবধূরা পাড়ায় পাড়ায় জল-সয়ে বেড়াচ্ছেন, ঢুলি-কাঁসিদার পিছনে চলেছে বাজাতে বাজাতে। নিঝুম চণ্ডীমণ্ডপে দাবা নিয়ে বসে দুই প্রবীণ, চাষীরা বাঁকে করে ধানের আঁটি দোলাতে দোলাতে আনছে। নিশিরাত্রে চকচকে সড়কি হাতে গ্রাম পাহারা দিয়ে ফিরছে জোয়ান ছেলেরা।

ছায়াছবির মতো আবার সব বিলীন হয়ে গেল। মধুসূদন রায় উদ্ধত ঘাড় নেড়ে মনে মনে বলেন, আমি—আমি ফিরিয়ে আনব আবার। উত্তেজনায় স্থির থাকতে পারেন না, খাড়া হয়ে দাঁড়াতে যান মাচার উপরে। কিন্তু উপরেও ডালপালা—মাথায় ঠোক্কর খেয়ে বসে পড়তে হয়। সহসা শঙ্কা জাগে, কতদিন বাঁচবেন আর তিনি!

উত্তর কালের মানুষ, তোমাদের উপর ভার দিয়ে যাচ্ছি—এই আমার দিব্যি দেওয়া রইল, বনের কবল থেকে ফিরিয়ে এনো আমাদের এই সুপ্রাচীন পিতৃ-পিতামহের বাসভূমি।

টিকে ফিসফিসিয়ে বলে, হুজুর, শিঙেল বলে সন্দ করি, তৈরি হন।

বহুদর্শী টিকের অনুমান মিথ্যা নয়। শিঙেল হরিণ চলে গেল ধীর-মন্থরভাবে। পাল্লার মধ্যে এসেছিল, তবু মধুসূদন তাক করলেন না। মন নেই ওদিকে।

আর বাবুর হাতে বন্দুক থাকতে টিকের পক্ষেও দেওড় করা চলে না। রাগে দুঃখে তার নিজের বুকেই গুলি মারতে ইচ্ছে করে।

॥ তেরো ॥

কেতুর অবহেলা নেই। তবু নৌকোর চেষ্টায় চারটে দিন কেটে গেল। অবশেষে জোগাড় হল এক বাছারি-নৌকো। কী করে হল, ভদ্রজন তোমরা তা জিজ্ঞাসা কোরো না।

এলোকেশীকে বিকালবেলা খবর দিয়ে এসেছে। অনেক রাত্রি হল—এখনো আসে না কেন? বাঁনতলার অন্ধকারে কেতুচরণ বোঠে হাতে অপেক্ষা করছে। জোলো-হাওয়ায় শীত ধরে যায়। চারিদিক নিঃশব্দ—পাখনার ঝটপটি শুধু এ-গাছে-ওগাছের পাখির বাসায়। এলোকেশী হয়তো উপহাস করেছিল—সেই কথা সত্যি মনে করে কেতুচরণ এতকাণ্ড করে নৌকো জুটিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, দিগ্‌ব্যাপ্ত জ্যোৎস্নার মধ্যে ঝুপসি-ঝুপসি জঙ্গলে ভরা এক মাঠের কথা। আর চার দিন আগেকার সেই বেহায়াপনা—বাপ-খুড়ো এবং এক-উঠান লোকের সামনে এলোকেশী তার হাত ধরে টেনে নিয়ে দরজায় খিল দিয়েছিল। ভিতরে কিছু আছে—হাঁ, নিশ্চয় আছে—নইলে এত দুঃসাহস অমনি-অমনি আসে না।

ঐ যে—আসছে এলোকেশী টিনের ক্যাশবাক্স হাতে। ক্যাশ-বাক্সটা নিয়ে এসেছে—চিরদিনের জন্য যাচ্ছে তাহলে ঠিক। লঘু-পায়ে এসে সে নৌকোর উপর উঠল। মাটিতে পা ঠেকিয়ে নয়—বাতাসে বাতাসে ভেসে এলো যেন। নইলে এত নিঃসাড়ে কী করে আসে!

ফিসফিস করে এলোকেশী বলে, যা ভয় করছিল—

ডাকাত মেয়ে, ভয় আছে নাকি তোমার। কেতুর ঠোঁটের আগায় কথাগুলো এসেছিল, কিন্তু মুখে সে কিছু বলল না।

এলোকেশী কৈফিয়তের ভাবে বলে, কাজকর্ম সেরেসুরে সবাই শুয়ে পড়লে তবে আসতে হল কিনা। তাই এত রাত। কতক্ষণ এসেছ?

বাজে কথা না বাড়িয়ে কেতু জলের উপর সাবধানে বোঠের টান দিল। তাড়াতাড়ি বারকয়েক বেয়ে মাঝ-গাঙে টানের মুখে এনে ফেলল। নৌকো তীরবেগে ছুটেছে।

কী ভাবছিল এলোকেশী অন্যমনা হয়ে। হঠাৎ চমক ভেঙে উঠল।

কদ্দূর এলাম?

তা এসেছি মন্দ কি! মর্জালের মুখ ঐ সামনে।

আরে সর্বনাশ! উড়িয়ে নিয়ে এসেছ। অনেকটা পথ এসে পড়েছি তো!

কেতু পরম পুলকে বলল, কেউ আর নাগাল পাচ্ছে না। ভয় আমারও ছিল, কোথায় কোন চেনা-মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!

ফিরতে হবে যে—

কেতু সবিস্ময়ে বলে, কেন—কি হল?

একটা কাজ বাকি আছে। সেটা না হলে কোনখানে গিয়ে সোয়াস্তি পাবো না।

বোঠে তুলে কেতু উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। এলোকেশী বলে, দুর্লভকে অমনি-অমনি ছেড়ে দেওয়া হবে না। এত শত্রুতা সাধল, তার কিছু হওয়া চাই।

তাতে পরমোৎসাহ কেতুর। এলোকেশীর ইচ্ছাক্রমে দুর্লভের শাস্তিবিধান—এলোকেশীর ঘরে বসে যে দুর্লভের হাসাহাসি ও পান-খাওয়া দেখেছে—এর চেয়ে করণীয় কাজ কী থাকতে পারে কেতুর?

এলোকেশী প্রশ্ন করে: কি করা যায় বল দিকি?

করা তো কত কিছুই যেতে পারে। নাক-কান কেটে বোঁচা করে দিতে পারি। কানা করে দেওয়া যায়—খানিক স্যাড়াসেজির আঠা চোখে দিয়ে মণির ওখানটা আঙুলে ঘুলিয়ে দিলে, বাস, দুনিয়া অন্ধকার।

চিন্তিত ভাবে পুনশ্চ বলে, মুশকিল হল, রায়গাঁর সদরে চলে গেছে সে হারামজাদা। অনেক দূর। তা-ও হত—কিন্তু বিষম

উজোন কাটিয়ে যেতে হবে। পাশখালির ভিতর লা ঢুকবে কিনা, তা-ও বলা যাচ্ছে না।

যেতে হবে—। এলোকেশী জেদ ধরল: বুঝলে—নৌকো না নিয়ে গেলে হবে না। ভয় নেই, তোমার কিছু করতে হবে না। আমায় পৌঁছে দাও—যা করতে হয় আমি একাই করব।

ভয়? যেন ভয় পেয়েই কেতু এগুতে চাচ্ছে না—এই কথা এলোকেশী ইঙ্গিতে বলল। পথ যত কষ্টের হোক, এর পরে কোনমতে আর দ্বিধা করা চলে না।

নৌকোর মুখ ঘুরাল। প্রাণপণে বাইছে। গায়ে ঘাম বেরিয়ে গেল, কিন্তু পথ এগিয়েছে সামান্যই। এক জায়গায় নৌকোটা ধরে কেতুচরণ সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

গেল কোথায়? আশ্চর্য তো—কিছুই না বলে ছুটে বেরুল। এলোকেশী উদ্বিগ্ন—একা-একা কী করবে ভেবে পায় না। তবে যেখানে ফিরে এসেছে, জায়গাটা মৌভোগ থেকে দূরবর্তী নয়। কেতু গামছায় বাঁধা পুঁটুলিটা নৌকোর খোলে এলোকেশীর ক্যাশবাক্সের উপর রেখে দিয়েছে। এই পুঁটলি নিয়েই কেতুচরণ এলোকেশীদের বাড়ি উঠেছিল—তার যথাসর্বস্ব এর ভিতর। যথা-সর্বস্বের ওজন—কেতু আর এলোকেশী দু-জনের মিলে—সের আষ্টেক হবে বড় জোর। যথাসর্বস্ব সঙ্গে নিয়েই তারা মৌভোগ ছাড়ল।

ফিরে এসে কেতুচরণ কাড়ালে বসে আবার বোঠে ধরেছে। এলোকেশী বলে, গিয়েছিলে কোথা?

বজ্জাত মানুষ—শুধু-হাতে কাছে যাওয়া ঠিক হয় না। তা পেয়েছি—একটা হেঁসো-দা জোগাড় করে আনলাম।

মধুসূদন রায়ের জঙ্গল-কাটা লোকজন কাছাকাছি কোথায় ছিল—হেঁসোখানা সেখান থেকে জুটিয়েছে।

অনেকক্ষণ কাটল। মুখ বেঁকিয়ে কেতু বলে, আর হয় না। বিষম বোগোন। লা মোটে নড়ছে না—ঠাহর পাও?

তবে?

হালে বসতে পারো তো বলো। আমি তা হলে আর-একটা বোঠে ধরি, দুই বোঠেয় কিছু কাজ হবে।

দেখি চেষ্টা করে—

নৌকো ঘুরে যায় না যেন। খবরদার! বানচাল হবে তা হলে।

বাঁক দুই গিয়ে পাশখালির মুখ। উল্টোপাল্টা ঢেউ কাটিয়ে এলোকেশী অবলীলা-ক্রমে নৌকো খালের মধ্যে নিয়ে তুলল।

বিস্ময়ে কেতুচরণের চোখে পলক পড়ে না।

বাঃ রে, বাঃ—পাকা মাঝি যে তুমি!

এলোকেশী হেসে বলে, কিন্তু দাঁড়ি তুমি মোটেই ভাল নও। নৌকো এগোয় কই?

এগোবে—এই দেখ, সাঁ সাঁ করে চলবে এইবার—

ঝপ্‌ঝাস করে কেতুচরণ খালে লাফিয়ে পড়ল। ঠেলছে নৌকো। গায়ের সমস্ত শক্তিতে জীবন পণ করে ঠেলছে। রায়গাঁ পৌঁছুতে কতক্ষণই বা সময় লাগবে এত কষ্ট করলে! দুর্লভের হাঙ্গামাটুকু চুকিয়ে তারপর ভেসে পড়বে সে আর এলোকেশী। ঐ যেমন পুঁটলি ও ক্যাশবাক্স একত্র আছে, অমনি জীবন-ভোর একত্র থাকবে দু-জনে। জলজঙ্গল ছেড়ে উত্তরের ডাঙা অঞ্চলে—হয়তো বা শান্তিনগরে গিয়ে ঘর বাঁধবে।

গাঙের অনতিদূরে রায়বাড়ি। ফটকের লাগোয়া গোলপাতার চৌরিঘর—আমলা-গোমস্তারা সেখানে থাকে। দুর্লভও নিশ্চয় সেই ঘরে এসে উঠেছে। কেতু কিন্তু গাঙের ঘাটে নয়—খাঁড়ির মধ্যে নৌকো নিয়ে এলো। জায়গাটা চৌরিঘরের একেবারে কানাচে বললেই হয়। আর কোন নৌকো নেই। কাজ সেরে এখান থেকে খাঁড়ির অপর মুখে সোজা বড়-গাঙে পড়বে, তুড়ুক-সওয়ারের মতো তীব্র স্রোতে দুলতে দুলতে চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

পোহাতি-তারা উঠে গেছে, রাত আর বেশি নেই। পাড়ে লাগতে না লাগতে এলোকেশী লাফিয়ে পড়ে। মোটে তার সবুর সইছে না।

কেতু বলে, নৌকো বেঁধে আমিও যাচ্ছি। রোসো—একলা যেও না, একলা যাওয়া ঠিক নয়।

হাত তার নিশপিশ করছে দুর্লভের চোখ ভুলিয়ে দেওয়া—অন্তুতপক্ষে হেঁসোর পোঁচে নাক-কান কাটার জন্য।

এলোকেশী বলে, আসছি এক্ষুনি। এসে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।

অর্থাৎ সে খবরাখবর নিতে গেল—ঘরে আছে কিনা দুর্লভ, কোথায় ঘুমুচ্ছে, বাইরের লোক কেউ সেখানে আছে কিম্বা নেই। অসঙ্কোচে চলে গেল—যেন বাড়িটার অন্ধিসন্ধি তার নখদর্পণে, হামেশাই আসা-যাওয়া আছে এখানে। একা যাওয়া এক হিসাবে অবশ্য ভাল হয়েছে। কেতুচরণ সঙ্গে থাকলে দুর্লভের সন্দেহ হতে পারত। তবু কেতু বার বার ভাবছে, ডানপিটে মেয়ে একখানা বটে—বাপরে বাপ!

গেল তো গেল—ফিরবার নাম নেই। খব তো ঐ—খোঁজখবর নিয়ে আসতে কতটুকু সময় লাগে! রাতের মধ্যেই অঞ্চল ছেড়ে সরে পড়বার মতলব—কিন্তু সে আর ঘটে ওঠে কই? দুর্লভ যদি ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে তো সবচেয়ে ভাল—নিঃশব্দে সাফাই হাতে কাজ সেরে ফেলবে।···হাঁসকল তুলে বা অপর কোন কৌশলে দরজা খুলে ফেলে শয্যার পাশে দাঁড়াল, হাত বুলিয়ে নাক-চোখ-কানের অবস্থানও অনুভব করে নিয়েছে, ধারালো অস্ত্রটা তারপর আঁধারে একটু ঝিকমিকিয়ে উঠল, ওরে বাবা রে!···ধুপধাপ দৌড়ানোর শব্দ—আততায়ী কোন দিকে যে হাওয়ার মতো মিলিয়ে গেল, কিছুমাত্র নিশানা নেই। প্রতিবেশীরা এসে জিজ্ঞাসা করে, কি গো, কি হয়েছে হালদার মশাই? মুখে দরদের কথা বলতে বলতেও মুখ টিপে হাসে সকলে। দুর্লভ হালদার তার পর থেকে খোনা-খোনা কথা বলে, লোকের সামনে নাক-কান ঢেকে বেড়ায়—

ভাবতে গিয়ে কেতুচরণ একাই খল-খল করে হাসে। কিন্তু এলোকেশীর হল কি বলো তো? মেয়েটাকে ও-ভাবে একলা যেতে দেওয়া উচিত হয় নি।

কেতুর সকল উৎসাহ হিম হয়ে আসছে। দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায়

বসে মনে হচ্ছে, হাত-পাগুলো পর্যন্ত জমে অসাড় হয়ে গেল—চলে ফিরে বেড়াতে পারবে না সে আর।

পদশব্দে সচকিত হয়। দুর্লভ আর এলোকেশী দু-জনে—দুর্লভের হাতে লণ্ঠন। সাংঘাতিক মেয়ে সত্যিই—ঘরে বোধকরি বেশি লোকজন, ভুলিয়ে তাই খালধারে এনেছে। ঘুম থেকে ডেকে তুলে ভুজুংভাজাং দিয়ে আনতে দেরি হয়ে গেল। চুপিসারে কাজটা আর হবে না, কেতুচরণকে চিনে ফেলল যে দুর্লভ! কিন্তু তা বলে উপায় কি? ক্ষতিও নেই, আর তারা এ তল্লাটে ফিরছে না বরঞ্চ ভালই হল—ইচ্ছে থাকলেও সে বা এলোকেশী কেউ ফিরে আসতে পারবে না। অনুমানে হাত বুলিয়ে কেতু পিছনের হেঁসো-দার বাঁট মুঠো করে ধরল। ঠিক আছে। এলোকেশীর ইশারার অপেক্ষা।

দুর্লভ বলছিল, এলে তা যেন একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে। থাকো না আর খানিক—কি হয়েছে! জানাজানি হল তো বয়ে গেল—একদিন তো হতই। মধুবাবুর চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি—কোনো শালার আর পরোয়া করি নে। নৌকো কে বেয়ে নিয়ে এলো—এই, কে রে তুই?

কেতুর দিকে চেয়ে বলে, এত তাড়া কিসের রে? এখনো বিস্তর গোন আছে। থাক না বসে। কে তুই, মুখ ফেরা দিকি—

কেতুচরণ মুখ ফেরায় না—ভালমন্দ জবাবও দেয় না কিছু। সে কি দুর্লভের ভিটে-বাড়ির প্রজা যে পরম বশম্বদ হয়ে হুকুম তামিল করবে!

এলোকেশী পরিচয় দিয়ে দিল: আমাদের কেতুচরণ গো—

তারপর দরদ-ভরা কণ্ঠে বলে, ভারি কষ্ট করে নিয়ে এসেছে। কেতু না থাকলে আসা মুশকিল হত। মন গুমরে কেঁদে কেঁদে মরছি এ ক'দিন—জোর করে এসে পড়ে আজকে সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করে বলে, তুমি কিন্তু কক্ষনো যেতে না—হুঁ, সরকারি ঘেরিবাবু এখন—বয়ে গেছে আমাদের মতন খেঁদি-পেঁচির খোঁজখবর নিতে।

কেতুচরণ চমকে তাকাল তাদের দিকে। তাই তো রে! চলনে-বলনে আনন্দের লহর খেলে যাচ্ছে। লণ্ঠনের আলোয় দেখল, এলোকেশীর দু-চোখে অশ্রুর দাগ। অর্থাৎ এতক্ষণ ধরে কান্নাকাটি ও মন-বোঝাবুঝি চলছিল। আর মশার ঝাঁক এদিকে কেতুর গায়ের অর্ধেক রক্ত শুষে নিয়েছে।

লণ্ঠনটা তুলে ধরে দুর্লভ সহসা উচ্চহাসি হেসে ওঠে।

দেখ, চেয়ে দেখ, কি মূর্তি হয়েছে হতভাগার!···কাদামাটি গায়ে মেখে অমনি ভাবে এতক্ষণ রয়েছিস—হ্যাঁরে কেতু, মানুষ না জন্তু তুই?

মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা অবধি নোনা কাদা লেপটে রয়েছে। অদ্ভুত চেহারা। এলোকেশীও হাততালি দিয়ে হি-হি করে হাসতে লাগল।

এলোকেশী হাসছে—যার জন্য রাত্রির অন্ধকারে কুমির-কামটের ভয় অগ্রাহ্য করে নৌকো ঠেলে নিয়ে এসেছে। অবিশ্রান্ত হাসি হেসে গড়িয়ে পড়ছে দুর্লভের গায়ের উপর। দুর্লভও হাসছে। ফুলকোঁচা-দেওয়া ধুতি দুর্লভের পরনে, চোখে চশমা। রাতে অমনি কোঁচানো ধুতি পরে শোয়—না, এরই মধ্যে বদলে এসেছে? রাত্রিশেষে লণ্ঠনের ম্লান আলোয় পাশাপাশি ওদের মানিয়েছেও চমৎকার।

কলকণ্ঠে এলোকেশী বলে, আয়না থাকলে দেখতে পেতে, ও কেতুচরণ, ডোরা-কাটা চিতেবাঘের মতো হয়ে গেছ।

কেতুচরণ বোঠে দিয়ে পাড়ের মাটিতে আঘাত করল।

তুমি তো ফিরছ না এখন এলোকেশী, আমি চললাম। না বলে নৌকো নিয়ে এসেছি, সেইখানে আবার বেঁধে আসতে হবে।

একটু গিয়ে নৌকোর খোলে নজর পড়ল। চিৎকার করে বলে, নিয়ে নাও তোমার জিনিস—

এলোকেশী কি বলছিল—কোন কথা কেতুচরণের কানে পৌঁছল না। ক্যাশবাক্স ছুড়ে দিল ঝাঁড়ির মাঝখান থেকে। বাক্স খুলে গিয়ে জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়ল।

স্রোতের সঙ্গে নৌকা ভেসে চলেছে, বাওয়ার প্রয়োজন নেই। কুয়াসাচ্ছন্ন উষায় নিশ্চল প্রেতমূর্তির মতো কেতুচরণ বোঠে ধরে চুপচাপ বসে রয়েছে।

॥ চোদ্দ ॥

কতদিন গেল তারপর? হিসেব করে দেখ, হিসেবের কড়ি বাঘে খায় না। এরই মধ্যে হঠাৎ একবার অনেকগুলো টাকা কেতুচরণের হাতে পড়ে গেল। সড়কি ও লাঠি সম্বলে বড় এক বাঘ মেরেছিল তারা। মরা-বাঘ সদরে দেখিয়ে সরকারি পুরস্কার পাওয়া গেল। তিন জন ছিল—প্রত্যেকের ভাগে পড়ল এক কুড়ি পাঁচ। টাকাগুলো পিতলের ঘটিতে পুরে কেতু মাটির নিচে পুঁতল। আর ভাবনা কিসের!

কিন্তু ইতিমধ্যে আর-এক ল্যাঠায় জড়িয়ে পড়েছে। দিগম্বর বিশ্বাসের মেয়ে টুনিকে সে পছন্দ করে ফেলেছে, বিয়ে করবে। বিয়েথাওয়া করে সংসারী হবে এবার। এলোকেশী যেমনধারা সংসার পেতেছে দুর্লভের সঙ্গে। দুর্লভ এখন আর মধুবাবুর মাটি-কাটা বাঁধবন্দীর ম্যানেজার নয়, বনকরের চাকরি নিয়ে কোথায় সরে পড়েছে। মতিরামও দোকানপাট তুলে ভাইকে নিয়ে কোন মুল্লুকে গেছে, খোঁজখবর নেই। কেতুচরণ কিন্তু মৌভোগের মায়া কাটাতে পারে নি। দিগম্বরের ওখানে বেশির ভাগ সময় কাটায়, কাজকর্ম করে—যেমন এককালে করত মাতঙ্গধরের বাড়িতে। ওরই মধ্যে ফাঁক কাটিয়ে এক-একদিন সে মৌভাগে চলে আসে। মৌভোগ পুরোপুরি গ্রাম এখন। জঙ্গল হাসিল হয়ে লোকবসতি আরও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। হাটবাজারের প্রয়োজন। মধুসূদন হাট বসাবার জন্য তাই উঠে পড়ে লেগেছেন। বড়দলের হাট কানা করে দেবেন, এই অভিপ্রায়।

অনেকদিন ধরে অনেক টালবাহানা করে কেতুচরণ অবশেষে

স্পষ্টাস্পষ্টি প্রস্তাব করল দিগম্বরের কাছে। জবাব শুনে চক্ষু কপালে উঠল। মেয়ে দিতে আপত্তি নেই, তবে পণ লাগবে একশো-এক টাকা। ঐ রকম নাকি দর উঠছে।

একশো-এক—জানো তো কাকে বলে? পাঁচ কুড়ির উপরেও এক বেশি। বোঝ। যে টাকায় স্বচ্ছন্দে এক জোড়া হালের বলদ কিনতে পাওয়া যায়, কায়দায় পেয়ে দিগম্বর তাই হেঁকে বসল তার রোগা-ডিগডিগে বারো-বছুরে মেয়ের জন্য। অর্থাৎ কেতুচরণের আরও প্রায় চার কুড়ি টাকার জোগাড় দেখতে হবে।

আবার ছুটোছুটি। ঘর সে বাঁধবেই। এক কাঠুরে-নৌকোয় কাজ জুটিয়ে নিল। একশো টাকা জমানো—সোজা ব্যাপার! ক'জনের আছে? নবাব সিরাজদ্দৌলার ছিল। অযোধ্যার রাম-রাজার ছিল। মধুসূদনবাবুরও থাকতে পারে। তোমার আমার পক্ষে একশো টাকা এক ঠাঁই করা বাপরে, বাপরে, বাপ!

তা বলে কেতু পিছপাও নয়। পর পর পাঁচ মরশুম বাদাবনে কাঠ কেটে বেড়ায়। মরশুম অন্তে ফিরে এসে মাটি খুঁড়ে ঘটি তুলে নতুন এক-এক দফা টাকা পোরে। বউ চাই, ঘর-সংসার চাই। টাকা না হলে কিছুই হয় না, টাকার দরকার।

পাঁচটা বছর কাটল এমনি। এখনো বাকি আছে। শেষ বারে এসে দিগম্বরের বাড়ি খোঁজ নিতে গেছে—টুনি এক দেড়-মাসের মেয়ে কাঁকালে নিয়ে বাঁকা হয়ে এসে দাঁড়াল। মেটে সিঁদুরের টানা রেখা সিঁথির মাঝ বরাবর—সিঁথি ও কপালের উপর তিন-নরী রুপোর সিঁথিপাটা। কদিন হল টুনি বাপের বাড়ি এসেছে, এই মেয়ে হয়েছে। কেমন হয়েছে দেখ দিকি! কোলের মেয়েটা কেড়ে নিয়ে কেতু যে তখন আছাড় মারে নি—সেটা টুনি ও মেয়ের বাপের ভাগ্যি।

কত দিন হয়েছে, হিসাব করে দেখ তাহলে।

উমেশের সঙ্গে ইদানীং খুব দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে। গুণী লোক উমেশ, বিদ্যার জাহাজ—সেই মানুষ কী রকম হয়ে গেছে! কথাবার্তা পণ্ডিতজনের মতোই বটে। বলে, বিয়েথাওয়ার নাম করবি তো

বনবে না আমার সঙ্গে। বেশ তো আছিস—খাচ্ছিস-দাচ্ছিস, তা নয়, শালকে আহ্বান করা—শালগাছ, বনে থাকো কেন বাপু? শূল হয়ে এসে দিল-কলজে এফোঁড়-ওফোঁড় করো। মেয়েমানুষ হল শূল—অম্লশূল, পিত্তশূল, কোথায় লাগে? তাই চক্ষুশূল আমার কাছে।

হা-হা করে উমেশ হাসতে থাকে। কথাগুলো কেতুচরণের পছন্দসই নয়, কিন্তু পদ্মর বৃত্তান্ত জানে বলে তর্কাতর্কি করে না। আহা, বড্ড দাগা দিয়ে গেছে পদ্ম। পদার সঙ্গে চলে গিয়েছিল—কিন্তু তারও চেয়ে বড় দুঃখ, পদ্মর ঘরকন্না সুখের হয় নি। পদ্মকে উমেশ দেখে নি তার পরে। আর দেখবেও না। পাঁচুর (এখন আর-এক পাঁচু জুটেছে বলে পদ্মর ভাই পাঁচুকে গোল-পাঁচু বলে সকলে) মুখে শোনা, ওলাওঠায় মরেছে সে। যারা পদাকে ভালরকম জানে, তারা কিন্তু বলে, মিথ্যে কথা—পদাই হয়তো গলা টিপে মেরে গাঙের জলে ফেলে দিয়ে পরে ঐ রকম রটনা করেছে। যেমন কর্ম তেমন ফল! ভায়ের সংসারে দিব্যি তো ছিল—সাঙা করতে গেল কেন ভিনদেশি গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষটাকে?

উমেশের কিন্তু রাগ নেই। চোখে জল আসে পদ্মর কথা ভাবলে। মোহমুগ্ধ পদ্ম—সে তো পাগল তখন! মতিচ্ছন্ন মানুষের উপর রাগ করা চলে না। গলা টিপে তাকে মেরে ফেলেছে। পদা বাঘের মতন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, সেই অবস্থাটা উমেশ ভাববার চেষ্টা করে। কী ভাব মনে হয়েছিল তখন পদ্মর? চকিতে একবার মনে এসেছিল কি উমেশের কথা—পদা এসে পড়বার পর থেকে যাকে কেবলই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে, মানুষ বলে মনে করে নি?

উমেশ গান-বাজনা নিয়ে আছে। সবাই হেনস্তা করে, কিন্তু তাতে তার দৃক্‌পাত নেই। পদ্ম ও পদার কাছে লাঞ্ছনা পাবার পর এ সমস্ত একেবারে গা-সওয়া হয়ে গেছে। একটু যদি দৃষ্টিসুখ দাও, আনন্দে শতখান হবে। বিরক্ত হয়ে গালমন্দ করো যদি—মুখ শুকনো হবে হয়তো, কিন্তু রাগ করবে না। রকমারি বাজনা

গিয়ে চ্যাবচেবে এক ঢোলে এসে ঠেকেছে! মাস্তধর মারা গেছে, ঘরবাড়ি জমাজমি প্রায় সমস্তই গেছে—কোনো রকমে ভাতটা জোটে। তার উপরে বাদ্যযন্ত্র কিনবে কি দিয়ে? তা হয়েছে ভাল। ভাল বাজনার সঙ্গে উমেশের ও-গলার গান আরও উদ্ভট শোনাত।

উমেশ ছাড়াও গোল-পাঁচু, গুলি-পাঁচু, ঋষিবর, খুশাল—একসঙ্গে অনেকে জুটেছে। আছে মন্দ নয়, সন্ধ্যার পর জমজমাট আড্ডা। যদি জিজ্ঞাসা করো, এত লোকের খাওয়া-পরা চলে কিসে? গায়ে জোর আর মাথায় একটু ঘিলু থাকলে বাদা অঞ্চলে কিসের দুঃখ! কোন অভাব নেই ওদের।

॥ পনের ॥

বনবিবিতলায় প্রায় মুখোমুখি মধুসূদনের নূতন হাটের পত্তন হচ্ছে। এই বছর দশেক আগেও কশাড় জঙ্গল ছিল—হাসিল হতে হতে আবাদ এতদূর অবধি পৌঁছেছে। বনবিবিতলাই বাদার সীমানা। খালপারের যাবতীয় এলাকা বনবিবির করচ্যুত হয়ে এখন রায়বাবুর দখলে।

মেলা বসেছে হাটের মুখবন্ধ স্বরূপ। পৌষ-সংক্রান্তি পর্যন্ত চলবে এই মেলা। খুব নাম ছড়িয়েছে, বিস্তর লোক যাতায়াত করছে, দোকানও বসেছে হরেক জিনিসের। লোকপরম্পরা শোনা যাচ্ছে, মেলার শেষ মুখে মানিক-যাত্রা ও জারিগান হবে। বায়স্কোপ এসে এক রাত্রি চলন্ত ছবির খেলা দেখিয়ে যাবে, সে চেষ্টাতেও আছেন রায়বাবু। কিন্তু এত দূর বলে কোন কোম্পানি রাজি হচ্ছে না। এসব ছাড়াও আমোদ-ফুর্তির ব্যবস্থা আছে। ভবিষ্যতে আরও হবে। মেলা শেষ হয়ে গেলে পৌষ-সংক্রান্তির পর সাপ্তাহিক হাট বসবে মেলারই জের হিসাবে। এ মচ্ছব জুড়িয়ে যেতে দেওয়া হবে না।

হাট বসানো সোজা নয়—বিশেষ এই বাদা অঞ্চলে। রকমারি

জিনিসের দোকানপাট থাকবে, প্রচুর তরিতরকারি ও মাছ-শাক উঠবে হাটের দিনে—তবেই না মানুষ গাঙ-খাল ঝাঁপিয়ে এসে জড়ো হবে। বাড়তি আকর্ষণের আরও যত ব্যবস্থা করতে পারা যায়, ততই ভাল। আমদানি মালপত্র প্রথমটা খরিদ্দারের অভাবে সম্পূর্ণ বিক্রি হবে না। কিন্তু মাল ফেরত নিয়ে গিয়ে পাইকার যদি ক্ষতি-গ্রস্ত হয়, দ্বিতীয়বার সে এমুখো হবে না। তাই বেচাকেনার পরে অবশিষ্ট যা-কিছু থাকবে, কিনে নিতে হবে এস্টেটের তরফ থেকে। সেগুলো লোকজনের মধ্যে বিলি-বিতরণ করো, অথবা গাঙের জলে ঢেলে দাও। গাঙে ঢেলে দেওয়াই সমীচীন—কলিকালের ছ্যাচড়া মানুষ একবার মাংনা পেয়ে গেলে অতঃপর আর পয়সা দিয়ে কিনতে চাইবে না, হাট ভাঙা অবধি অপেক্ষা কববে যদি আবার বিনি-পয়সায় পাওয়া যায়।

গোড়ায় গোড়ায় এমনি করতে হয়। হাট একবাব জমে গেলে তখন মজা—দু-হাতে দেদার তোলার পয়সা কুড়িয়ে বেড়াও। বড়দলের ঐ যে অত বড় হাট—যার এক আনা অংশের মালিকেরও মাস গেলে কোন্ না হাজার দেড়হাজার পাওনা হয়—সে হাটেরও গোড়ার ইতিহাস এই। বনবিবি মুখ তুলে চান তো রায়হাটেরও একদিন সেই অবস্থা হবে। আর তা হবেই। মধুসূদন কর্মবীর—অসাধ্যসাধনের ক্ষমতা তিনি রাখেন। খাটছেনও খুব। যখন-তখন সেই যে জঙ্গলে গিয়ে পড়তেন—সে সব বন্ধ এখন। নীলরঙের এক শৌখিন পানসি বানিয়ে নিয়েছেন—মৌভোগ ও বায়গাঁর মধ্যে সেই পানসি আনাগোনা করে। এ পথে যত ধানকর-জলকর পড়ে, বড় গাঙগুলো ছাড়া সমস্তই প্রায় মধুসূদনের সম্পত্তি। ছিটেচক যা দু-একটা বাকি আছে—তা-ও বেশি দিন অন্যের থাকবে না। পড়তেই হবে তাঁর কবলে। লক্ষ্মী ঝাঁপি উজাড় করে ঢালছেন—রায়গাঁর সদর-উঠানে ফি বছর একটা-দুটো করে গোলা বাড়ছে। এবারেরটা দিয়ে মোট পনেরো হল।

একটা বড় অসুবিধা, মিঠা জলের বন্দোবস্ত হচ্ছে না। অজস্র অর্থব্যয়ে মধুসূদন টিউবওয়েল বসিয়েছিলেন। গভীর ভূগর্ভ থেকে

যে জল আহৃত হল, তা খাওয়া চলে, ডালও সিদ্ধ হয় অনেকক্ষণ জ্বালানোর পর। কিন্তু মুশকিল—একটা-দুটো টিউকলে (লোকের মুখে মুখে এই নামকরণ হয়েছে) হাটুরে লোকের দায় মেটে না। তা ছাড়া দারুণ নোনায় বছর খানেকের বেশি কর্মক্ষমও রাখা যাবে না—উপরের লোহায় মরিচা ধরে অব্যবহার্য হয়ে পড়বে। নদী থেকে যথাসম্ভব দূরে পুকুর কেটে পরীক্ষা করা হবে, তারই ব্যবস্থা হচ্ছে। আপাতত রায়গাঁ থেকে জল আসে—ডিঙি বোঝাই করে রোজ দু-তিন ক্ষেপ আনা হয়। রায়বাবু যখন আসেন, নীল পানসিতে দশ-বারো কলসি তিনিও সঙ্গে আনেন।

খুশাল একদিন মধুসূদনের কাছে এলো। মধুসূদন রায়গ্রামে আছেন—খোঁজ নিয়ে সেই সময়টায় এলো, সৌভাগে মেলার মানুষের মধ্যে এত আগে জানাজানি হতে দিতে চায় না। দলের মধ্যে খুশাল ভারি হিসেবি। বেঁটে খাটো রোগা মানুষটি—দেহ হাড়মাংসে নয়, যেন ইস্পাতে গড়া। ইস্পাতের মতোই গায়ের রং।

এক নূতন প্রস্তাব নিয়ে এসেছে—রায়হাটের প্রান্তে তারা মাছের সায়ের করবে। গাঙে খালে মাছ পড়ে। আবার চকদারের পত্তনি-নেওয়া ধানকর জলকর থেকেও চুরি করে মাছ ধরে অনেকে। মাছের খরিদ্দারও আছে, কিন্তু ঠিক সময়ে বেপারির নাগাল না পাওয়ায় বিস্তর মাছ নষ্ট হয়ে যায়। সায়েব হলে সেখানে বেপারিরা ওঠা-বসা করবে, মাছের নৌকো এসে ভিড়বে। এরা দস্তুরি পাবে। বুদ্ধিটা করেছে ভাল। উঠতি হাট—জমিয়ে তুলতে পারলে, খুশাল হিসাব করে দেখিয়েছে, ঝুড়িপিছু দুটো করে পয়সা রাখলেও দৈনিক দু-টাকা আড়াই টাকা হওয়া বিচিত্র নয়।

মধুসূদন চমৎকৃত হলেন মনে মনে। করিৎকর্মা লোক এরা—মুখে যা বলছে, কাজেও ঠিক তাই করবে। এস্টেটের পক্ষে বিশেষ লাভের ব্যাপার—এখন যা দেয় দিক, দু-পাঁচ বছর পরে সায়েরের ইজারা নিলামে চড়িয়ে বেশ মোটা সেলামি আদায় হবে।

বাদার জঙ্গলে মধুসূদন একরকম, এখানে একেবারে আলাদা

আর-এক লোক। আবার যখন কলকাতায় ছিলেন, শোনা যায়, সেই ছিমছাম শৌখিন যুবকটির সঙ্গে কিছুমাত্র মিল নেই এখানকার রায়বাবুর। ভূসম্পত্তির ব্যাপারে তিনি গভীর জলের মাছ—সহজে ধরা দেবার পাত্র নন। খুশালের প্রস্তাব শুনে নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন, বেশ তো—ভাল কথা। গ্রাহক আরও দু-দশজন হাঁটা-হাঁটি লাগিয়েছে—

খুশাল স্তম্ভিত হল। বাদার এই দুর্গম সীমান্তে তার আগেও এ-ফন্দি এসে গেছে অন্য লোকের মাথায়!

বলে, দু-জন না দশজন বাবু?

রায়বাবু হেসে বললেন, গুণে কে রেখেছে! আর তাতে এলো-গেলো কি! কারো সঙ্গে এখনো পাকা কথা বলি নি। লম্বা সেলামির লোভ দেখাচ্ছে—পাঁচ-শ অবধি উঠেছে। উঠবে না কেন, লাভটা কি রকম হবে আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে তো! এ-বাজারে বোকা কে আছে বলো।

পাঁচ-শ অঙ্কের উল্লেখ করে মধুসূদন সতর্কভাবে খুশালের মুখ-ভাব লক্ষ্য করেন। নিরাশাব্যঞ্জক। গলা নামিয়ে সদয়কণ্ঠে তখন বলতে লাগলেন, কিন্তু আমার তো শুধু টাকা দেখলে হবে না। নতুন হাট বসাচ্ছি—জিনিসটা ভাল ভাবে গড়ে উঠুক, সেইটে চাই সকলের আগে। তা তোমায় দেখে ভরসা হচ্ছে। বাদাবনে চলাচল করে বেড়াও—বলতে গেলে, জঙ্গলের মানুষ—তোমাদেরই হবে। বাইরে থেকে এসে হঠাৎ কেউ সুবিধে করতে পারবে না। মাংনাই দিয়ে দিচ্ছি—দেড়শ-টি টাকা দিও এ বছরের মতো। ওর থেকে আমি সিকি পয়সাও খাচ্ছি নে, মায়ের পুজোর খাতে পুরোপুরি জমা থাকবে।

খুশাল বেকুবের মতো তাকিয়ে থাকে। বিনি-পুঁজির ব্যবসা বলেই এত দূর এগিয়েছে। অবাক করে দেবে বলে দলের সকলের অজান্তে একাকী সে এসেছে। কিন্তু টাকা কোথায়? যে রকমটা দেখা যাচ্ছে—আর দশজনার মতো একটা কোন বৃত্তি ধরে স্থির হয়ে বসা তাদের ভাগ্যে নেই।

মধুসূদন লোক চরিয়ে বেড়াচ্ছেন এত বছর। অবস্থা বুঝতে পেরে আরও সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন, আপাতত পঞ্চাশ টাকা জমা দিয়ে জুতমতো জায়গা বেছে ঘর বাঁধোগে। বাকি টাকা কাজকর্ম শুরু হয়ে গেলে তারপর—

বলে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। অর্থাৎ এর উপরে আর কোন কথা শুনতে তিনি নারাজ।

মনের দুঃখে খুশাল ফিরে এল। এয়ার-বন্ধুদের বলল সমস্ত। নবাব খাঞ্জে খাঁ তো সকলে—পঞ্চাশটা পয়সা চাঁদা করে ওঠে কিনা সন্দেহ। কেতুচরণের ছিল—কিন্তু টুনির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত ফুঁকে দিয়েছে। এমন কি খুলনা শহরে গিয়ে সেই সময়ে পনেরোটা দিন হোটেলে খেয়ে টহল দিয়ে বেড়াত, যাতে টাকাপয়সা খরচ করে তাড়াতাড়ি ভারমুক্ত হতে পারে।

হঠাৎ অভিনব ভাবে সুরাহা হয়ে গেল। ধন্য মাতা বনবিবি! বনবিবির করুণার অন্ত নেই।

॥ ষোল ॥

গার্ড হরিপদ মর্জাল স্টেশনে ফিরছে সদলবলে। একটা জঙ্গল জরিপ হচ্ছে—সেই ব্যাপারে যেতে হয়েছিল। বাবুরা গিয়েছিলেন লঞ্চে। রেঞ্জার সাহেবের লঞ্চ—ওখানকার কাজ শেষ করে আরও নাবালে সুপতি স্টেশনের দিকে তাঁরা চলে গেছেন। এরা ডিঙিতে আসছে। মাঝিমাল্লা ইত্যাদিতে সাকুল্যে আটজন। ভাঁটার খরস্রোতে দুলে দুলে ডিঙি চলেছে। আর ডিঙির গলুইতে বসে, বাবুরা উপস্থিত থাকায়, হরিপদই হুকুম-হাকাম দিচ্ছে। যেন বাদারাজ্যের রাজচক্রবর্তী।

তিনখানা বোঠে পড়ছে। সহসা হরিপদ হাতের ইঙ্গিতে থামতে বলে। তামাক খাচ্ছিল, হুঁকো নামিয়ে মাঝিকে ফিসফিস করে বলল হালটা আলগোছে ছুঁয়ে রাখতে জলের উপর—যাতে কোন

রকম শব্দ-সাড়া না হয়। কূল ঘেঁষে আস্তে আস্তে ডিঙি এগুচ্ছে। বিপজ্জনক এভাবে চলা। জানোয়ারের আক্রমণের ভয় তো আছেই, তা ছাড়া চড়ায় আটকে নৌকো বানচাল হতেও পারে। কিন্তু যতই হোক সরকারি মানুষ বসে থেকে হুকুম করছে—এ তো খোদ লাট সাহেবের হুকুমেরই সামিল। তা ছাড়া হরিপদ বাদা-অঞ্চলে আছেও কম দিন নয়—সমস্ত জেনে শুনে যখন বলছে, ব্যাপার নিশ্চয় গুরুতর।

পাড়ের মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। মাটি আর কোথায়—বলা-ঝোপ, গোলবনের শিকড়, গুলো। দোয়ানিয়ার মুখে এল। হরিপদ বাঁ-দিকে আঙুল বাড়ায়। অর্থাৎ ঢুকতে হবে ঐ দোয়ানিয়ার ভিতরে।

মাঝি অশ্বিনীনাথ ঘাড় নাড়ে। সে-ও পুরানো লোক—অনেক অভিজ্ঞতা। এত উজান কেটে নৌকো তোলা দুষ্কর তো বটেই—তা ছাড়া দোয়ানিয়ার দু-মুখ দিয়ে অতি দ্রুত জল নামছে, নৌকোর তলি একটু পরেই বসে যাবে নোনা কাদায়। তখন জোয়ারের অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। গরম বাদা—জনমানবহীন—পারতপক্ষে কেউ এদিকে আসে না। হরিপদর হাতে সড়কি, এবং নৌকোর ভিতরে গাদা-বন্দুকও আছে একটা। তবু এই জিনিসের উপর ভরসা করে বিপজ্জনক স্থানে এতক্ষণ নিশ্চল হয়ে থাকা উচিত হবে না।

হরিপদও বুঝে দেখল। ভেবে-চিন্তে ঐখানে খালের মুখে ডিঙি রাখতে বলে। একটু দূর হল, কিন্তু কী করা যাবে? অশ্বিনীকে প্রশ্ন করে, শুনতে পাও?

অশ্বিনী কান খাড়া করল। এক ধরনের মৃদু আওয়াজ আসছে এপার-ওপার দু-দিক থেকে। বলে, বাঁদর—

ঠিক বলেছ। থেমে আবার একটু শুনে নিয়ে হরিপদ বলে, হুঁ, বাঁদরই।

ক্ষণকাল চুপ করে রইল। তারপর বলে উঠল, এই—এইবার?

বাঁদরের ডাক। বাঁদর ছাড়া আবার কি।

হরিপদ মুখ খিঁচিয়ে ওঠে। কান দিয়ে শুনছ—না কি ? আসল বাঁদর আর নকল বাঁদরে তফাত ধরতে পার না—এদ্দিন বাদায় ঘুরছ তবে কোন্ কর্মে ?

বাদাবনে হাতকাটা-হরি নামে সে পরিচিত। মুখের বাঁদিকটা অতি বীভৎস দেখতে। বাঘে ধরেছিল সেবার। সঙ্গীদের চেঁচামেচিতে বাঘ গ্রাস ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রাণে বাঁচল হরিপদ।

বাঘের কামড়ের চিকিৎসা জানো—কোন্ মলম লাগাতে হয় সর্বাঙ্গে ? জ্যান্ত অবস্থায় নরক-ভোগ। বরঞ্চ মরে যাওয়াই ভাল ঐ বস্তু মালিশ করে পড়ে থাকার চেয়ে। কিন্তু টোটকা চিকিৎসায় হরিপদর ঘা সারল না, শেষ পর্যন্ত তাকে হাসপাতালে যেতে হল। সেখানে অনেক দিন থাকতে হয়েছিল—বাঁ-হাতের কনুই অবধি কেটে ফেলতে হল, বাঁ চোখটাও গেল।

কিন্তু বাকি চোখ ও কানের শক্তি আশ্চর্য রকম তীক্ষ্ণ হয়েছে সেই থেকে। অশ্বিনী ও আর-সকলের কাছে সাধারণ বানরের ডাক—হরিপদ কিন্তু নিঃসংশয় রূপে বুঝেছে, মানুষই বানরের মতো ডাকছে। গাছাল দিচ্ছে মানুষ। যে রীতির গাছাল—এই সব শিকারি বড় একটা পাশ নিয়ে বাদায় ঢোকে না। আর শিকারের মরশুমও এটা নয়—এখন পাশ বন্ধ। দিন দুপুরে ডাক ধরেছে, দুঃসাহস কী রকম তাহলে বোঝ। রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বালা করে। মাদারকে বলে, নেমে গিয়ে দেখে আয় তো চুপি-চুপি ক-জন আছে, কি বৃত্তান্ত।

গুলোবন ও কাদা ভেঙে বনে ঢোকা সহজ নয়। হয়তো সবটাই হরিপদর মনের কল্পনা। বাঘের কামড় খেয়ে সাহেবের নজরে পড়ায় সে বড় বেশি মাতব্বর হয়ে উঠেছে। কিন্তু মনের ভিতর যাই-থাক, হুকুম না শুনে উপায় নেই। আরও দু-জনকে সঙ্গে নিয়ে মুখ বেজার করে মাদার নেমে গেল।

ক্ষণপরে ফিরে এসে পরমোৎসাহে বলে, ঠিক ধরেছ। মানুষ—গাছের মাথায় গুঁটিসুটি হয়ে আছে।

সকলের চোখ টাটায় তো আমার উন্নতি দেখে! হেঁ—হেঁ, বোঝ তাহলে। সাধে কি সকলকে ডিঙিয়ে হেড-গার্ড করে দিয়েছে!

আত্মপ্রসাদে হরিপদ যেন ফেটে পড়ছে। আবার বলে, ক-জন দেখে এলি?

একটা দেখেই খবর দিতে এলাম। আরো আছে নিশ্চয়—একা-দোকা ওরা বাদার ঢোকে না। আর হরিণ মারতে এসেছে যখন, নিতান্ত খালি হাতেও আসে নি।

হরিপদ বলে, সুড়-সুড় করে তাই পালিয়ে এলি? একনম্বর মেয়েমানুষ। মিছেই কেবল দৈত্যের মতো গতর দুলিয়ে বেড়াস।

যাই হোক, এবারে উপযুক্ত সতর্কতার সঙ্গে সকলে বাদায় নামল। পবন আর মাখনলাল ডিঙি আগলে রইল শুধু। বলে গেল, ফিরতে দেরি দেখলে রান্নাবান্না সেরে রাখে যেন। ভাটার টানে জল যদি অত্যধিক সরে যায়, নৌকো নাবালে সরিয়ে রাখতে বলল।

জঙ্গলে হরিণের সঙ্গে বানরের বড় মিতালি বানরে কেওড়া-গাছের ডালে লাফায়, ফল-পাতা ছিঁড়ে ফেলে, আর আওয়াজ করে নিমন্ত্রণ জানায়। ডাক শুনে হরিণের দল গাছতলায় আছে। শিকারিরাও অবিকল বানরের মতো করে ডাকে—খাওয়ার লোভে হরিণ এলে গুলি করে গাছের উপর থেকে।

বাদায় ঢুকে পড়ে হরিপদ হেন ব্যক্তিও দিশেহারা হচ্ছে আজকে। চারিদিক থেকে বানরের ডাক। কোন্‌টা খাঁটি, আর কোন্‌টা নকল—ঠিক করবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। অনেক জলকাদা ভেঙে ও শুলোর গুঁতো খেয়ে আন্দাজ মতো একটা জায়গায় চলে এল। কা কস্য পরিবেদনা! নির্জন, নিঃশব্দ। অথচ এই এতক্ষণ একটানা ডাক শোনা যাচ্ছিল এখান থেকে—হ্যাঁ—এই জায়গাতেই বটে! তাকিয়ে তাকিয়ে গাছের অন্ধিসন্ধি দেখছে—হঠাৎ পিছনে ধ্বনি ওঠে, যে দিকটা অতিক্রম করে এসেছে।

নোনা রাজ্য—পৌষ মাস হলেও শীত প্রখর নয়। ঘোরাঘুরিতে ঘাম ঝরছে, ফতুয়া ভিজে জবজবে হয়ে গেছে গায়ের ঘামে এবং অসাবধান চলাচলের দরুন জলকাদা ছিটকে উঠে। পা রক্তাক্ত হয়েছে কাঁটার খোঁচায়, কিন্তু অপরাধী ধরবার তাড়ায় এমন মশগুল যে আঘাত টেরই পায় নি। আড়াই প্রহর অতীত হল, সঙ্গের লোকেরা অধীর হয়েছে ফিরবার জন্য। কিন্তু হরিপদ ঘুরে ঘুরে যত নাজেহাল হচ্ছে, জেদ বাড়ছে ততই।

একটা মানুষ তো চোখে দেখেছিস মাদার। সেটাই বা গেল কোথায় ?

এ দলের মধ্যে একজন গুণীন আছে—জলধর। সড়কি বন্দুক ইত্যাদি যতই থাক গুণীন সঙ্গে না নিয়ে কেউ বাদায় ঢোকে না, বা ঢোকা উচিত নয়। গুণীন বলেই জলধরকে ডেকে বনকরের চাকরি দিয়েছে। বাদায় নামবার সময় সে সঙ্গে থাকবেই। ঘাড় নেড়ে মৃদু কণ্ঠে জলধর বলে, মানুষ হলে ঠিক পাওয়া যেত। পাখনা নেই যে উড়ে পালাবে। মানুষ নয়—বুঝলে হরিপদ ? ওনাদেরই কেউ হবেন।

সকলেরই মনে ঐরকম সন্দেহ। বাদাবনে হিংস্র প্রাণী অনেক—কিন্তু ওসবের উপরে আছেন, তাঁরাই বেশি সাংঘাতিক। নানাবিধ মূর্তিতে উদয় হন—বাঘের মূর্তি, সাপের মূর্তি। অব্যর্থ বাঘবন্ধন মন্ত্রেও সে বাঘের আক্রমণ ঠেকানো যায় না, সে সাপের বিষ নামাতে পারে এমন ওঝা ত্রিভুবনে নেই। মানুষের চেহারা নিয়েও দেখা দিয়েছেন এমনধারা শোনা যায়। কখনো অবিশ্বাস্য রকমের বিশালাকৃতি পুরুষ, যাঁর এক-একটা পায়ের ছাপ মেপে দেখলে দেড়হাত পৌনে-দুহাত গিয়ে দাঁড়াবে। কখনো-বা অতি-সাধারণ একজন—এই আজকের ব্যাপারে মাদার যেমন দেখে এসেছে। দেড় প্রহর বেলা থেকে এরা সন্ধান করে বেড়াচ্ছে—এখন এই প্রত্যাসন্ন সন্ধ্যাবেলাও এদিক-ওদিক থেকে ডাক এসে বিভ্রান্ত করছে। মানুষের কাজ বলে ভরসা করা যায় কি করে ?

জলধর বলে, ফেরা যাক এবার—

ভাষাটা অনুরোধের মতো, কিন্তু আদেশের আমেজ কণ্ঠস্বরে। বাদাবনের অশরীরী অধিবাসীদের মুলুক-সন্ধান একমাত্র তারই নখদর্পণে। তার কথা কেউ অবহেলা করতে পারে না।

যাবার সময় কাদায় পা বসে বসে গিয়েছিল, চিহ্নস্বরূপ গোলপাতাতেও গেরো দিয়ে গিয়েছিল মাঝে মাঝে। সেই সব লক্ষ্য করে অনেক দুঃখে অনেকবার পথ হারিয়ে অবশেষে তারা দোয়ানিয়ার মুখে ফিরে এল। কোথায় ডিঙি? জোয়ার এসেছে—জঙ্গলের অনেক দূর অবধি জল উঠে ছলছল করছে। শেষ-ভাঁটায় নৌকো যদি দূরে নিয়ে বেঁধে থাকে, এখন তো আবার যথাস্থানে এসে পৌঁছবার কথা। হু-হু করে বাতাস বইছে, ভরসন্ধ্যায় জল বেশ কনকনে হয়েছে। তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে দারুণ উদ্বেগে সতৃষ্ণ চোখে এরা দূরের দিকে চেয়ে আছে। কু দিচ্ছে, বাঁশিব আওয়াজ করছে, কিন্তু জবাব পাওয়া যায় না। হল কি? মুখ শুকনো সকলের।

ডিঙি নয়—পবন ও মাখনলালকে পাওয়া গেল অবশেষে। গাছে উঠে বসেছিল, সাড়া পেয়ে নেমে এসেছে। হবিপদ রাগে চেঁচিয়ে ওঠে: এক পহর খোঁজাখুঁজি করছি—ঘাপটি মেরে তোরা কোথায় ছিলি বল্?

ভয়ে তারা জবাব দিতে পারে না। তাদেরই দোষ। ভাঁটা সরে যাওয়ার পর অল্প জলে পাশখালিতে মাছ ধরাব ভারি সুবিধা। ভাত চাপিয়ে দিয়ে দু-জনে ওরা জাল নিয়ে বেরিয়েছিল। এমন হল, মাছের ভারে জাল টেনে তোলা দায়। বাছাই মাছ গোটা কয়েক করে খালুইতে ফেলে বাদ বাকি জলে ছেড়ে দিচ্ছে। কত নেবে, কি হবে অত মাছ দিয়ে? মনের আনন্দে জাল ফেলতে ফেলতে এমনি অনেকটা দূর এগিয়েছে—তারপর খেয়াল হল, ভাত এতক্ষণে ফুটে গেছে—নামাবার প্রয়োজন। ফিরে এসে মাথায় হাত দিয়ে পড়ল। কোথায় কি—গোটা ডিঙিটাই অদৃশ্য। নোঙর ফেলা ছিল—তা ছাড়া কাছি দিয়ে নৌকা বাঁধা ছিল গাছের সঙ্গে। জলের টানে ভেসে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। খুলে নিয়ে গেছে কারা।

কী সর্বনাশ, বন্দুকও ছিল যে!

বন্দুক হাতে করে নিয়ে জাল ফেলবে কি করে—বাঁশি বন্দুক সমস্ত নৌকোয় ছিল। সব গেছে। এমনটা হতে পারে, স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। কত এরকম রেখে দূরদূরান্তরে যায়, কখনো তো কিছু হয় না।

হরিপদ চোখ পাকাল পবনের দিকে। স্টেশনে গিয়ে পৌঁছতে পারলে বাবুকে সমস্ত তো বলবেই—বাড়িয়ে এবং প্রচুর রং দিয়ে বলবে। বাবু—আজকে আব নয়—কাল রেঞ্জারের সঙ্গে স্টেশনে ফিরবেন। আসা মাত্রই একটা বিষম কাণ্ড ঘটবে, সন্দেহ নেই। হরিপদ লোকটা সোজা নয়।

অশ্বিনীনাথ চাব বছর একাদিক্রমে এই নৌকোয় মাঝিগিরি করছে—নৌকোর উপর কতকটা অপত্যস্নেহ জন্মে গেছে। সে তো ক্ষেপে ওদের মারতে যায়।

কোন্ আক্কেলে নৌকো ছেড়ে যাস্ তোরা? খা—খালুই-ভরা কাঁচা মাছ চিবিয়ে চিবিয়ে খা এখন। উঃ—সবসুদ্ধ প্রাণে মাবলি রাত্তিরবেলা বাদাবনের ভিতর!

জলধর ধীরকণ্ঠে বলল, ওসব যাক। ফিববাব উপায় ভাবো সকলেব আগে।

ক্ষিধেয় নাড়িসুদ্ধ হজম হয়ে যাবার জোগাড়। কিন্তু স্টেশনে কি করে ফিরবে, সেইটেই সকলের চেয়ে বড় ভবনা এখন। নদী-খালে পায়ে হেঁটে যাওয়া চলে না। বিশেষ এই রাত্রিবেলা।

হবিপদ সহসা সচকিত হয়।

দেওড় শুনতে পাচ্ছ?

কই?

সত্যি সত্যি বন্দুকের দেওড় হলে এতগুলো লোকের মধ্যে হরিপদ ছাড়া আর কারো কানে গেল না, এমন হতে পারে না। কিন্তু শুনতে পেয়েছে হরিপদ—হ্যাঁ, ঠিক শুনেছে। কেবল কানে শোনা নয়। চোখের উপরও যেন দেখতে পাচ্ছে, সরকারি ডিঙি নিয়ে সরকারি গাদা-বন্দুকে দেওড় করতে করতে বে-আইনি

শিকারিরা জয়যাত্রায় চলেছে, বিষম স্ফূর্তিতে তাদেরই রাঁধা গরম-গরম ভাত খাচ্ছে, আর হরিপদর দল বন-প্রান্তে পৌষের শীতে দুর্ভাবনায় হি-হি করে কাঁপছে—নিজেদের হাত কামড়ানো ছাড়া আর কিছু করবার নেই।

হরিপদ চেঁচিয়ে ওঠে : ঐ যে—শুনতে পেয়েছ এবার ?

অনতিদূরে হা-হা-হা হাসির শব্দ। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি। এই তো—একেবারে কাছে। ক্ষিপ্ত দলবল জলকাদা ভেঙে ছুটল।

অশ্বিনী দেখিয়ে দেয়, মানুষ নয়—ভীমরাজ পাখি। মানুষের কলরবে পাখিটা ডালের উপর থেকে উড়ে গেল।

ভীমরাজ এক আশ্চর্য পাখি—নির্জন অরণ্য মধ্যে মাঝে মাঝে বয়স্ক মানুষের মতো গম্ভীর উচ্চহাসি হাসে, কঠিন কণ্ঠে কাকে যেন কী আদেশ দেয়। জলধর কিন্তু পাখি বলে এদের স্বীকার করে না। বিড়-বিড় করে অবোধ্য ভাবে কী বলে সেই কাদাজলের মধ্যে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সে প্রণাম করল।

॥ সতেরো ॥

ডিঙি ও বন্দুক জোটানোর পর কেতুদের আর পায় কে! কাউকে পরোয়া করে না তারা—বনবিবি, তুমি মা শুধু প্রসন্ন থেকো।

সরাসরি মেলার মধ্যে মানুষের সামনে ডিঙি নিয়ে এল না, দু-বাঁক দূরে খাঁড়ির ভিতর রেখে দিল। ছই ভেঙে দিল ডিঙির, বড়দল থেকে আলকাতরা কিনে এনে রাতারাতি মাখিয়ে নূতন রং ধরাল। আগেকার চেহারা আর নেই। বনকরের লোকগুলোই যদি এ ডিঙির সওয়ার হয়ে বসে যায়, তবু চিনতে পারবে না কোনক্রমে।

চকচকে ডিঙি ঘাটে বেঁধে সগর্বে কেতুচরণ বলে, কি বলো খুশাল, রোজগার হবে না ? কত পঞ্চাশ হয়ে যাবে এই মেলার মওকায়!

ডাঙার নয়—ডিঙির মানুষ কেতুচরণ। অত বড় জোয়ান দু-পা হাঁটতে হিমসিম হয়ে যায়, কিন্তু বৈঠা হাতে ডিঙিতে বসিয়ে দাও—সারাক্ষণ বেয়েও হাতে সাড় হবে না। গাঙ-খালের খুশিখেয়াল ও অন্ধিসন্ধি তার নখদর্পণে।

পরম উল্লাসে কেতুচরণ কাড়ালে বসে বৈঠা ধরল। আর ঘাটে নেমে দাঁড়িয়ে ঋষিবর হাঁক পাড়ছে :

শামুকপোতা—বয়রা—খলষেমারি—এসো, চলে এসো চড়ন্দার—না ছাড়ে-এ-এ—

মেলায় আগন্তুক মেয়েপুরুষে বোঝাই হয়ে যায় ডিঙি। এ বড় ভাল হয়েছে, লোকের ভারি সুবিধা। দু-আনা তিন আনায় মৌভোগের মেলায় যাতায়াত চলবে, পুরো একখানা নৌকো ভাড়া করতে হবে না।

দিনমানে মেলায় মানুষ আসা-যাওয়া করে। প্রহরখানেক রাত্রি হতে না হতে মানুষজন পৌঁছে দিয়ে ডিঙি ফিরে আসে, সকল কাজকর্ম সারা হয়ে যায়। তারপর এন্তাব ছুটি। বাদা অঞ্চলে লোকজন রাত্রিবেলা সহজে নদীখালে বেরোয় না। অসংখ্য রকম বিপদের আশঙ্কা। ডিঙির আলো নিভিয়ে দিয়ে কেতুচরণ ঐ সময়ে চুপিসারে বেরোয় সারাদিনের খাটনির পর অবসর সময়ে কিছু উপরি রোজগারের ব্যবস্থায়। হাটখোলায় অনেক চালা বাঁধা হচ্ছে—তার জন্য গরানকাঠ, বেত ও গোলপা''র প্রয়োজন। কেতুরা কিছু কিছু সরবরাহ করবে। একেবারে বিনা পুঁজির কারবার—তাদের মতো এত সস্তায় কে মাল দিতে পারবে ?

কোন পথে কি ভাবে বনকরের লোকের চোখ এড়িয়ে যাতায়াত করতে হয়, সমস্ত কেতুচরণের জানা। এত বছর কাঠুরে নৌকোয় কাটিয়ে পাকা হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া সাঁইতলা মোড়লবাড়িতে ছিল—তাদের কাজকর্মের কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছে। অনেক দেখে শুনে ঘাত-ঘোত বুঝে বাদায় ঢুকতে হয়। বিপদের অবধি নেই—জলের বিপদ, ডাঙার বিপদ। গার্ডদের নজর এড়িয়ে কখনো পাশখালি দিয়ে যেতে হয়; খাঁড়ির মধ্যে

ঢুকে পড়ে বোঠে তুলে চুপচাপ থাকতে হয় কখনো। গোলবন বা বলা-ঝোপের মধ্যেও ডিঙি ঢুকিয়ে দিতে হয় বেকায়দা বুঝলে। পাঁকালমাছের মতো কেতুচরণ কতবার ছিটকে বেরিয়ে এসেছে জলপুলিশের কবল থেকে। এমনও ঘটেছে, প্রহর ধরে বেয়ে বেয়ে তারপর বিপদ বুঝে অকস্মাৎ ডিঙিব মুখ ঘুরিয়ে তীরবেগে পালিয়ে এসেছে। এর উপর আছে ঝড়-বাতাস, চোরাদহ এবং মোহানার কাছে উল্টোপাল্টা ঢেউ ও জলের টান। একটু অসাবধান হলেই নৌকো তলিয়ে গিয়ে কুমিরের মুখে যাওয়া নিশ্চিত। ডাঙায় সাপ-বাঘ-দাঁতাল কোনখানে ওত পেতে আছে, এক হাত তফাতে থেকেও বুঝবার জো নেই। এ একরকম বাতবিরেতে যমদূতের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে বেড়ানো। তার চেয়ে বাপু নৌকোর মাপ অনুযায়ী সরকারি পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে একখানা পাশ করে নিয়ে বাদায় ঢোক, শব্দ-সাড়া করে কুড়ুল মারো গাছে, বেলাবেলি ফিরে এসো কিম্বা ভাল জায়গা দেখে চাপান দেও, আগে পাছে পাঁচ-সাতখানা নৌকোর বহর সাজিয়ে যাতায়াত করো—বিপদের ভয় থাকবে না। কিন্তু কেতুচরণ বুঝবে না কিছুতেই। আর দশটা বাওয়ালির মতো আফিসের ঘাটে নৌকো বেঁধে নৌকোর মাপ দিতে ওদের যেন মাথা-কাটা যায়। সারাদিনের খাটনির পর যে সময়টা হাত-পা মেলে জিরোবার কথা, বাদায় ঢুকে সেই সময় এই চৌর্য-বৃত্তি। সকল রকম শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে বনের মধ্যে দুঃসাহসিক বিচরণ—টাকার অঙ্কে লাভের চেয়ে এইটাই পরম লাভ বোধহয় মনে করে এরা।

ডাঙার শত্রু, জলের শত্রু—এরা তবু যা হোক একরকম—চোখে দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিবোধেরও নানা পন্থা আছে। যাঁরা অন্তরীক্ষে দৃষ্টির অগোচরে থেকে শত্রুতা সাধেন, ভয়ের বস্তু তাঁরা অনেক বেশি। বাদাবনের আদিকাল থেকে কত যে অপঘাত হয়েছে, তার সীমাসংখ্যা নেই। এত সাবধানতা সত্ত্বেও এখনও ফি বছর বিশ-পঞ্চাশটা ভাল হয় (বাদা সম্পর্কে 'মৃত্যুর' উল্লেখ করতে নেই—ভাল হয়েছে, এই কথা বোলো), অনেকেরই তাদের মধ্যে

গতি হয় না—কে যাচ্ছে বলো কাঠুরে-মাঝিমাল্লার জন্য গয়ায় পিণ্ড দিতে, কার দরদ উথলে উঠছে! লোকালয়-সীমার বাইরে আরণ্য রাজ্যে তাঁরাই সব স্বচ্ছন্দ-বিহার করেন। নানা প্রকৃতির লোক ছিল তো জীবিত কালে—বিদেহী অবস্থায় কার কি ধরনের গতিবিধি, কে কোন মূর্তিতে উদয় হবেন, আগে থাকতে বলবার জো নেই।

রয়্যাল-বেঙ্গল টাইগার ভয়ানক—কিন্তু তার গ্রাস থেকে বেঁচে আসবার কায়দা গুণীনেরা জানে। বাঘবন্ধন পড়ে নৌকো চাপান দাও—বাঘের বাপের সাধ্য নেই সে নৌকো স্পর্শ করবার। এক রকম আছে খিলমন্ত্র—বাঘের দাঁতে দাঁতে খিল এঁটে যায় মন্ত্রের গুণে, হাঁ করে কামড়ানোর শক্তি থাকে না। খিল খুলে না দেওয়া পর্যন্ত খেতেই পারবে না কোন-কিছু—না খেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে। কিন্তু অকারণে জীবের কষ্ট দেওয়া গুণীনদের বিধি নয়, গুরুর নিষেধ—মন্ত্র অসিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও আছে এতে। বিপত্তারণের জন্যই মন্ত্র, অন্যকে বিপদে ফেলবার জন্য নয়। তাই বিপদ অপগত হবার সঙ্গে সঙ্গে খিল খুলে দেয় গুণীনরা। শুধু মন্ত্রতন্ত্র নয়, গাছগাছড়াও জানা আছে নানা রকম। বাঘের ঘায়ের বীভৎস মলমের কথা জানে তো সকলেই—তা ছাড়া একরকম শিকড় আছে, বেটে লাগলে সপ্তাহের মধ্যে কামড়ের চিহ্ন পর্যন্ত বেমালুম হয়ে যাবে।

বিষধর সাপই বা কত! দুধরাজ-বঙ্করাজ, শঙ্খাবতী-শাখমুটি, কালনাগিনী-উদয়কাল-নগরবাসী, নাম শুনেছ এসবের? কাল-নাগিনীর নিকষকালো গায়ে রাঙা রাঙা ফুল আঁকা। একবার এক বঙ্করাজের মুখোমুখি পড়েছিল কেতুচরণ। সাপ ক্রুদ্ধ হয়ে ফোঁস-ফোঁস করে আক্রমণ করতে ছোটে, সারাদেহ ভাঁজে ভাঁজে ভেঙে গিয়ে কি অপরূপ শোভা হয়েছিল সেইসময়! দশনাগ্রে সুনিশ্চিত মৃত্যু—কিন্তু মরেও সুখ আছে এমন সাপের ছোবলে। দেখ, ক্ষণে ক্ষণে কেমন রং বদলাচ্ছে উদয়কালের! যেন বহুরূপীর সাদা পোশাকে এই নারদ-মুনি হয়ে-এলেন, তারপর এই দেখ—টুকটুকে

শাড়ি পরে রাজনন্দিনী। আবার ওঝারাও যেমনি! মরা মানুষে প্রাণ দিতে পারে। নীলবর্ণ হয়ে গেছে, গাঙে ভাসিয়ে দিতে যাচ্ছে—কাকপক্ষীর মুখে খবর পেয়ে জল-জাঙাল ভেঙে ছুটতে ছুটতে এসে ওরা বিষহরির দোহাই পাড়ে—রাখো রাখো মা, প্রাণ নিও না। বিষ নামতে দেরি হলে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে—কানে আঙুল দিতে হয় মন্ত্রের বচন শুনে। ঝাঁটার বাড়ি মারে—রোগির গায়ে যদিচ, কিন্তু রোগিকে নয়—সেই অলক্ষ্য আততায়ীকে, শয়তানি করে যে বিষ নামাতে দিচ্ছে না।

সাপের মাথায় মণি থাকে, আবার শিংও থাকে—শুনেছ কখনো? আমার নয়—ছকড়ির গল্প। ছকড়ি হল ওস্তাদ মাঝি—কেতুর শিক্ষাদীক্ষা তারই কাছে, কাঠুরে-নৌকোয় কেতু তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াত। বুড়ো বয়স অবধি বাদায় বাদায় ঘুরে ছকড়ি বিস্তর আজব জিনিস স্বচক্ষে দেখেছে, মৌজ করে হুঁকো টানতে টানতে সেই সমস্ত গল্প করে। কোন্ ধোন্দল-তলায় বিশাল এক হরিণবোড়া পড়ে আছে, তার মাথায় মনোরম একজোড়া শিং। বিশ্বাস করলে? গাঁজায় দম দিয়ে বলছে না ছকড়ি, সত্যি সে দেখেছে। যে দিব্যি করতে বলো তাই সে করবে।

তারপর উচ্চ হাসি হেসে ছকড়ি রহস্যোদ্ভেদ করে। আস্ত এক হরিণ গিলে ফেলেছিল সাপে—সর্বদেহ পেটের মধ্যে, শিং শুধু বাইরে। শিং গিলতে পারে নি। তাই দেখাচ্ছিল, সাপের যেন শিং বেরিয়েছে। নিশ্চল নিশ্চুপ মেজাজি জীব ওরা—আমাদের মধুবাবুর বাপ স্থূল-বপু স্বর্গীয় চৌধুরি-কর্তা ছিলেন যেমনটি। নড়াচড়া ভাল লাগে না—শক্তিরও অভাব। গতিক দেখে বুঝবার জো নেই যে, জীবন্ত প্রাণী অথবা গাছের গুঁড়ি। অসন্দিগ্ধ হরিণ চরতে চরতে যেমন মুখের কাছে আসে, গাছের গুঁড়ি অমনি টপাস করে মুখে পুরে ফেলে। হরিণ যখন গেলে, মানুষও যে পারে না—এমন নয়। এটা কিন্তু শোনা যায় না। মানুষ জঙ্গলে ওঠে কুড়াল বা বন্দুক হাতে নিয়ে—মানুষ হজম হলেও হাতিয়ার বেকায়দা ঘটাবে, এই ভয়ে মানুষকে রেহাই দেয় সম্ভবত।

ঝড়ে ও বানে পড়ে-যাওয়া গাছের গুঁড়ি জঙ্গলে বিস্তর। এর মধ্যে কোথায় অতিকায় ময়াল রয়েছে—গুঁড়ি বলে মানুষেরও ভুল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। একবার নাকি হয়েছিল এমনি। বাদাবনে এটা বহুপ্রচলিত গল্প। ক-জনে তামাক খাচ্ছিল গুঁড়ির উপর বসে, এক কুচি আগুন কেমন করে পড়েছিল—একটু পরে মড়ি-পোড়ার গন্ধ বেরুল, আর গুঁড়ি মোচড় দিয়ে উঠল। বাপ রে—বলে মানুষগুলো তখন দে ছুট।

বাবা দক্ষিণরায়ের গতিবিধি অনেকটা জানা আছে, মা মনসাকে নিয়েই সামাল সামাল! ক'টা চোখ আছে তোমার—কত দিকে তাকাবে! ডালে লেজ গুটিয়ে মাথা ঝুলিয়ে বাতাসে কোথায় দোল খাচ্ছেন—নাগালের মধ্যে পেলেই টুক করে অতি-সংক্ষেপে আদর করে বসবেন। একেবারে মোক্ষম জায়গায় চুম্বন—তাগা বেঁধে যে ওঝাবদ্যি ডাকবে, তার ফুরসত পাবে না। নিচে গুলো, জলকাদা, হরেকরকম কাঁটাঝোপ—দুটো মাত্র চোখ সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে, উপরে-নিচে সকল দিক ঘোরাতে ঘোরাতে বনের মধ্যে এগুতে হয়।

॥ আঠারো ॥

মর্জাল স্টেশন। বাদাবনের উত্তর-দ্বার। বনবিবিতলার পর বাওয়ালিরা দ্বিতীয় বার নৌকো বাঁধে এই আফিসের নিচে। মাপ নেয় এখানে, লোকগুনতি হয়, সরকারি হার অনুযায়ী টাকা-পয়সা নিয়ে নৌকো ও বন্দুকের পাশ করে দেয়। এই সমস্ত এবং বাবু-চৌকিদার প্রভৃতির প্রণামী-পার্বণী চুকিয়ে ঢুকে পড়ো বাদার ভিতর, আর কোন বাধা নেই। নিঃশঙ্কে সুঁদুর-পশুর গেঁয়ো-গরানে কোপ মারো, গুলি করো কাঠশিঙেল তাক করে। একটুখানি গোলমাল রইল পিটেলবাবু অর্থাৎ পেট্রোল-পুলিশ নিয়ে। তাদের সঙ্গে পূর্বাহ্নে পাকা বন্দোবস্ত সম্ভব নয়—কে কখন শনিচরের মতো

উদয় হবেন, ঠিকঠিকানা নেই কিছু। তবে টং করে টাকা বাজলে কাঠের পুতুল হাঁ করে ওঠে—এরা তবু মানুষ। দেখা হলে 'আজ্ঞে' 'হুজুর' বলে সম্বর্ধনা জানিয়ে টাকাটা সিকেটা এবং মধু, হরিণের মাংস ইত্যাদি উপঢৌকন দিয়ে ভাব জমিয়ে ফেলবে সঙ্গে সঙ্গে। আইনসম্মত সাচ্চা কাজ করছি, কে আমার কি করবে—এরকম সাহস ও আত্মম্ভরিতা বিপজ্জনক। নিরীহ নিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড উড়ে গিয়েছিল, এটা খেয়াল থাকে যেন। বনবিবির বরঞ্চ পুরুত-পাণ্ডা নেই, পূজো না পেলে কেউ তেড়ে ধরতে আসে না। কিন্তু বনকরের লোক অহরহ বাদায় ঘুরছে—জবরদস্তি করে পূজো আদায় করে এরা। এ পূজোর ফলাফল অতি প্রত্যক্ষ। মাপের হেরফেরে বড় নৌকো ছোট হচ্ছে, আবার ছোট নৌকো বড় হয়ে যাচ্ছে দেবতাদের সন্তোষ বা রোষের অনুপাতে।

কিন্তু কেতুচরণদের ধরন আলাদা। দুই রীতি তাদের—কখনো সাপ, কখনো বাঘ। সাপের মতো ঝোপঝাড়ের অন্তরালে অসংখ্য খাল-খাঁড়ি ঘুরে তার ডিঙি বনকরের লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে বাদায় ঢোকে। পিটেল-পুলিশের সাড়া পেলে ডিঙির মাথা বলা-বনের ভিতর ঢুকিয়ে চুপচাপ থাকে প্রায় নিরুদ্ধশ্বাস হয়ে। এমনি অবস্থায় সত্যি সত্যি একবার সাপের মুখে পড়ে গিয়েছিল সে—বিষধর এক কালাজ সাপ। সাপটা আস্তে আস্তে সরে গেল—কিন্তু সরে না গিয়ে কামড়াতও যদি, কিছুতে সে টুঁ-শব্দ করত না শত্রুকবলিত হওয়ার আশঙ্কায়।

আবার অমাবস্যা-পূর্ণিমায় গাঙের জল বেড়ে ঢেউ উত্তাল হয়, মর্জালের করাল স্রোতে কুটাগাছটি ফেললে ভেঙে দু-খান হয়ে যায়। কেতুচরণ তখন বাঘ। বাঘের মতো বিক্রম তার—প্রয়োজন হলে দিনের আলোতেও বড় গাঙে বনকর-স্টেশনের সামনে দিয়ে ডিঙি নিয়ে আসে। নিঃসাড়ে চলে যাওয়ায় সুখ হয় না, চেঁচিয়ে ওঠে স্টেশনের ঠিক সামনাসামনি হয়ে। একদিন তো গুড়ুম করে দেওড়ুই করল সেই চোরাই বন্দুকে। ধরবি তো ধর, কলা দেখিয়ে

এই চলে যাচ্ছি—মনোভাব এইরকম। আওয়াজ করেই দ্রুত বোঠে বেয়ে স্রোত যেখানটায় সব চেয়ে তীব্র, তার উপর ডিঙি নিয়ে ফেলল। চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল বিদ্যুতের ঝিলিক দেওয়ার মতো। ঋষিবর বা গোল-পাঁচু প্রায়ই সঙ্গে যায়। তারা হিসাবি লোক—যাচ্ছেতাই করে গালিগালাজ করে, কী দরকার সরকারি মানুষদের এমন খোঁচা মেরে ক্ষেপিয়ে তোলবার? কেতুচরণ হা-হা করে হাসে। সে কল্পনার চোখে দেখে, বন্দুকের শব্দে স্টেশনে হৈ-হৈ লেগেছে, সাজ-সাজ পড়ে গেছে অপরাধী ধরবার জন্য। ততক্ষণে কাঁহা-কাঁহা মুলুক চলে গেছে কেতুচরণের ডিঙি! কে ধরবে তাদের?

এক রাত্রে যাচ্ছে অমনি। কেতুচরণ দৃঢ় হাতে বোঠে ধরে আছে তীব্র স্রোতে ডিঙির মুখ যাতে ঘুরে না যায়। বাইছে না, বোঠে বাইবার প্রয়োজন নেই এত বড় টানের মুখে। ডিঙি এমনিতেই ছুটেছে।

মর্জাল স্টেশনের ঠিক বিপরীত কূল ধরে যাচ্ছিল। কোটালের খরস্রোতে তীরের বেগে ডিঙি ছুটেছে—কিসের পরোয়া? এমনি সময় তাজ্জব দেখল। চোখ রগড়াল একবার। না, ভুল নয়—ঠিকই দেখছে। সরকারি মানুষ কেউ নয়—ধবধবে কাপড়-পরা বউ একটি। তুকড়ি মাঝি গল্পে যেমন বলে থাকে, অবিকল তাই।

এপারে-ওপারে নিঃসীম অরণ্যভূমি ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন—জলের কুমির ডাঙার বাঘ অবধি ঘুমিয়ে পড়েছে, এমনি মনে হয়। স্টেশনে টিমটিমে এক কেরোসিনের আলো—সদাসতর্ক সরকারি চোখের প্রতীক। ঐ লণ্ঠনটি মাত্র জাগ্রত রেখে স্টেশনের লোকজন অকাতরে ঘুমোচ্ছে—কতক ডাঙার উপর ঘরের মধ্যে, কতক বা স্টেশনের ঘাটে বোটের পাটাতনে। চাঁদ ডুবু-ডুবু। ক্ষীণ জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে পড়েছে—চরের উপর মাচা তৈরি করে স্টেশনের যে উঠান হয়েছে, তার উপর। জ্যোৎস্নার আলোয় সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। সত্যি মেয়েমানুষ হওয়া সম্ভব নয়—মেয়েমানুষ কি করতে আসবে বাদারাজ্যের বনকর-আফিসে? দৈবাৎ এসে

পড়লেও এমনি সময়ে তো ডবল খিল এঁটে ঘরের মধ্যে ঘুমোবার কথা। গরম বাদা—সেবার ঐ স্টেশনের উপরই এক ভোঁদড় (বাদার এলাকায় মধ্যে বাঘের নাম উচ্চারণ কোরো না কেউ, খবরদার !) এসে পড়ে একজনকে মুখে করে নিয়ে গেল। আর জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে ঢের বেশি প্রতাপ যাঁদের—তাঁরাও পরিব্রজন করেন এমনি সময়ে। ছুকড়ির গল্প বানানো নয়—সর্বনাশীই বিমুগ্ধ চোখে অস্তায়মান চাঁদ, কোটালের জলোচ্ছ্বাস কিম্বা জোনাকির সমারোহ দেখছে রাত্রির মধ্যযামে চুপি-চুপি ফরেস্ট-আফিসের নিষুপ্ত প্রাঙ্গণে এসে।

॥ উনিশ ॥

ও ভাই, ও পাঁচু !

সাড়া নেই, ঘুমিয়ে পড়েছে এরই মধ্যে। ঘুম যেন সাধা থাকে এদের—চোখ বুজবার সুবিধা পেলেই হল। নৌকোর গুরোর উপরে বসে আছে তলিতে জলের মধ্যে পা রেখে। একটু পিঠ-ঠেশান দেবে, সে জো নেই। ঐ রকম বসে থেকেই ঘুমুচ্ছে। দাঁড়িয়েও এরা ঘুমুতে পারে। হাঁটতে হাঁটতেও পারে বোধ হয়।

কেতুচরণ ভ্রূকুটি করে। রাগের সীমা-পরিসীমা নেই। কিন্তু গালিগালাজের সময় নয় এটা। আর লাভই বা কি পাঁচুকে ডেকে তুলে ? তাড়াতাড়ি এখন সরে পড়ার দরকার।

বড় দীর্ঘ বাঁক। অনেকদূর এগিয়ে এসে কেতুচরণ পিছনে তাকিয়ে একবার দেখে। তেমনি দাঁড়িয়ে আছে সেই মূর্তি—নিশ্চল, কুমোরের হাতে-গড়া এক প্রতিমা যেন।

বাঁকের অন্তরালবর্তী হয়ে অবশেষে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে। হাঁক দিয়ে উঠল, ওরে পাঁচু—

পরনের কাপড়ের অর্ধেকটা এবং তদুপরি গামছা গায়ে জড়িয়ে প্রায় গোলাকার হয়ে অঘোর ঘুম ঘুমুচ্ছে। ডাকাডাকিতে গোল-পাঁচু

সেই অবস্থায় একটুখানি ছুলে উঠল মাত্র। ধৈর্য হারিয়ে কেতুচরণ দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে: পেঁচো হারামজাদা!

অ্যাঁ—

সে চোখ খুলল এবার।

বজ্ড তো বাদাবনে চরে বেড়াবার শখ। নজর পড়ে নি তাই বাঁচোয়া—নইলে উঠে বসে আর 'অ্যাঁ'—করতে হত না।

বিষম উদ্বেগে গোল-পাঁচু খাড়া হয়ে বসে: হয়েছে কি?

এর পরে আমি একা-একা আসব। দায়ে-বেদায়ে যদি সাড়া না পাওয়া যায়, কি হবে এক কাঠের-কুঁদো নৌকোয় বয়ে বেড়িয়ে?

লজ্জিত গোল-পাঁচু বলে, ঘাট মানছি রে ভাই, নাক-কান মলছি। খালি গালমন্দ করবি—বলবি নে কি হয়েছে?

ঘটনা বলল কেতুচরণ। বিরক্ত মুখে বলল, যাত্রাটা আজ ভাল নয়।

গোল-পাঁচু একরকম উড়িয়ে দেবার ভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, কী দেখতে কি দেখেছিস। মেয়েলোক আসবে কোত্থেকে? বাদাবনে মেয়েছেলে? এই যা কেবল মেলার মধ্যে দেখা যাচ্ছে রায়বাবুর বন্দোবস্তে।

কেতুচরণ বলে, বোঝ তাহলে। সত্যিকার মেয়েলোক নয়—এসেছেন সর্বনাশী ঠাকরুন। আজকালকার মানুষ সব ভয়তরাসে—রাত-বিরেতে দূর-দূরন্তর যায় না। কাঁচপাতার মুখ পড়ে ঠাকরুন তাই মানসেলার ধারে ধারে ধাওয়া করেছেন। দেখাব বলেই তো ডাকছিলাম। তা যেন মরে ঘুমুতে লাগলে তুমি।

কৈফিয়তের ভাবে গোল-পাঁচু বলে, জুতমতো একটু বসেই সঙ্গে সঙ্গে কেমন ঘুম এসে গেল। কাল-পরশু দুটো রাত্তির দু-চোখ মোটে এক করতে পারি নি।

কেতুচরণ বলে, বাসায় ছিলে—কোথাও বেরোও নি তো?

মর্জাল স্টেশনের পর দু-তিনটা বাঁক অতিক্রম করে জঙ্গলে এসে পড়েছে। আবাদের চেয়ে বাদাবনে এসে কেতুচরণ বেশি আরাম পায়। রাতও শেষ হয়ে এল—পাখি ডাকছে। আতঙ্ক গিয়ে

কথাবার্তা সহজ হয়েছে এতক্ষণে। বক্র হাসি হেসে কেতুচরণ বলে, বাসায় ছিলে, না কি বল? মধুবাবু পাড়া বসিয়েছে, সেইখানে চকোর দিয়ে বেড়িয়েছ বুঝি?

গোল-পাঁচুও হাসে।

দূর! সেই যে কবির দলে গেয়েছিল না—'উনুনমুখীর খোঁপার ছাঁদে হেঁসেলঘরে বেড়াল কাঁদে—' এ-ও হল সেই বিত্তান্ত। বিকালে দেখবে দাওয়ায় বসে খোঁপা বাঁধছে মাগীরা—বাঁধছে তো বাঁধছেই। বেড়ালও কাঁদে সারা রাত্তির ধরে···সত্যি দাদা, বড্ড জ্বালাতন করছে হুলোবেড়াল একটা। রাত দুপুরে কানাচে এসে গজরায়। ঘুম ভেঙে যায়—তারপরে আর কিছুতে ঘুম হয় না। আজ ক' রাত্তির বিষম বাড়াবাড়ি লাগিয়েছে।

কেতুচরণ বলে, ধরে বস্তায় পুরে আনলে নে কেন? বাদাবনে ফেলে দিয়ে যেতাম, আর উৎপাত করত না।

বস্তায় পুরব কি করে?

কিছু খাবার-টাবার দিতে হয়। খেতে লাগবে আর অমনি ধরে ফেলবে। আচ্ছা, আবার যখন করবে, নৌকো থেকে আমায় ডেকে নিয়ে যেও। ঠিক ধরে দেবো।

॥ কুড়ি ॥

হুকুড়ি মাঝিকে তোমরা দেখ নি। বুড়ো অথব—হাঁপানি রোগ আছে, দাওয়ায় বেড়া ঠেশ দিয়ে পড়ে পড়ে হাঁপায়। মানুষ পেলে এবং হাঁপানির প্রকোপ কিছু কম থাকলে গল্প করে। করছে তো করছেই—গল্পের আর অন্ত নেই। শ্রোতার কাজকর্ম ভণ্ডুল হয়ে যায়, অথচ হাত এড়াবার জো নেই। জোঁকের মতো—লোক পেলে সহজে ছেড়ে দেবে না।

কেতুচরণের হাতে-খড়ি—উঁহু হাতে-বোঠে এই হুকড়ির কাছে। বয়সকালে প্রতি বছর শীতকালে হুকড়ি বাদায় যেত বড় পলোয়ার

নৌকো নিয়ে। একবার এমনি গিয়েছে। রাত্রিবেলা নোঙর করে তারা শুয়ে আছে। পালা করে পাহারা দেবার বিধি। কিন্তু সেদিন সকলের কী কাল ঘুম পেয়ে গেল—যে লোকের জেগে থাকবার কথা, ঢুলতে ঢুলতে সে-ও এক সময় গড়িয়ে পড়েছে। ধোঁয়ায় কালিতে আচ্ছন্ন লণ্ঠনটা শুধু মিটমিট করছে একদিকে। ভাঁটা সরে গেছে—মরা গোন, জল সরে গিয়ে গাঙের প্রায় মাঝখানেই ডাঙা দেখা দিয়েছে।

ছকড়ি কাড়ালে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ উষ্ণ নিশ্বাস মুখের উপর। ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমটা বুঝতে পারে নি, কোথায় সে আছে। তারপর চোখ মেলে সে স্তম্ভিত। নৌকোর পাশে বাঘ—তার গায়ের-উপর বললে হয়। চোখ দুটো চকচক করছে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

ঝাঁপিয়ে পড়ছে না কেন বলো দিকি? বাঘবন্ধন পড়ে চাপান সারা আছে। ছকড়িব পাশেই কেষ্ট কচু। ঘুম ভেঙেছে তারও। সে ভুল করল। বাঘ দেখে 'বাবারে—' বলে ছইয়ের খোলে পালাতে যায়। বাঘ অমনি টপ কবে তাকে মুখে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকল। ছকড়ি কাছে, একেবারে মুখের উপব—কিন্তু তাকে টপকে কেষ্টকে ধরে নিয়ে গেল।

চেঁচাল কেন কেষ্ট কচু? মন্ত্রে বিশ্বাস না থাকলে কখনো কাজ হয়? 'নেই' বললে সাপের বিষ অবধি থাকে না। পালাল বলেই তো বোঝা গেল, লোকটা একেবারে আনাড়ি—না জানে কোনরকম গুণজ্ঞান, না আছে মনে বল-ভরসা।

আব কি ধরনের বাঘ—তা-ও বিবেচনা করো। সত্যিকার বাঘ হলে বাঘ-বন্ধন ভেদ করে নৌকো ছোঁয় কি করে? বাঘ সেজে তবে এসেছিলেন কেউ। এমনি আসেন ওঁরা। বাদাবনে যারা ঘোরাফেরা করে সবাই তো ছকড়ি-কেতুচরণের মতো ভুখড় লোক—ফেলনার ধরনের আর ক'জন! মরে গিয়েও শয়তানি ছাড়েন না তাঁরা।

গল্পের আতঙ্কে কেউ পারতপক্ষে ছকড়ির কাছ ঘেঁসে না। কিন্তু

সম্প্রতি তার নসিব ফিরেছে। গল্পের এক ভক্ত জুটেছে—যে সে ব্যক্তি নয়, মধুসূদন রায়। যৌতোগে এসে কাজকর্মের ভিতর ফাঁক পেলেই তিনি ছকড়িকে ডেকে পাঠান। শরীরগতিকের জন্য একদিন সে যেতে পারে নি বলে মধুসূদন নিজেই এসে উঠেছিলেন তার বাড়ি। সে এক বিষম বিপদ। ভাঙা চালের নড়বড়ে এক বাংলাঘর—তার মধ্যে অত বড় মানুষটাকে কোথায় বসাবে, কি করবে, কিছুই ভেবে পায় না। তারপর থেকে রায়বাবুর ডাক এলে তিলার্ধ সে দেরি করে না, যে অবস্থায় থাকুক বেরিয়ে পড়বে। হাঁপানি রোগি - দশ পা গিয়ে ধপ করে যেখানে হোক বসে পড়ে খুব খানিকটা হাঁপায়। সামলে নিয়ে আবার উঠে পড়ে। এত কষ্টের পথ চলা—তবু সমস্ত পাড়াটা বেড় দিয়ে, ইচ্ছে করে প্রায় দুনো পথ অতিবাহন করে, অবশেষে মধুসূদনের কাছারিবাড়ি গিয়ে ওঠে। বিশ নম্বর সুতোর বুনন ছেঁড়া ময়লা কাচা পরনে, খালি গা—কেবল বিশেষ সজ্জা হিসাবে অতীত সমৃদ্ধির সময়ে কেনা চটি-জুতাজোড়া পায়ে পরেছে। পরা বললে ঠিক হয় না—বারো মাস চালের বাতায় গোঁজা থাকার দরুন সে জুতো বেঁকে দুমড়ে নৌকোর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে—সরষের তেলে ভিজিয়ে এবং রাত্রিবেলা শিশিরে রেখে দিয়েও জুতসই করা যায় নি। কোন গতিকে পায়ের ক'টা আঙুল মাত্র ঢোকে। তাই পায়ে দিয়ে ফটফট আওয়াজ তুলে ছকড়ি পাড়ার মধ্য দিয়ে চলেছে। অর্থাৎ সর্বজনে তাকিয়ে দেখুক, সে বিশিষ্ট স্থানের নিমন্ত্রণে চলেছে। এবং বুঝুক, শরীর অশক্ত হয়ে পড়লেও তাকে খাতির করবার মানুষ আছে এখনো।

তা খাতির আছে বটে মধুসূদনের কাছে। মাটির পাঁচিলে ঘেরা কাছারি-বাড়ি। তারই লাগোয়া অসমতল প্রশস্ত উঠানে জলচৌকির উপর মধুসূদন বসে গড়গড়া টানছেন। আর হাত-পা নেড়ে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে ছকড়ি গল্প জমিয়েছে মাটিতে উবু হয়ে বসে।

জঙ্গলের ভিতর মানুষ নেই—কে বলেছে? অবশ্য সে এক ধরনের ভয়াবহ মানুষ—আমাদের সঙ্গে রীত-প্রকৃতি কিছুই মেলে

না। একটা খাল আছে পূবে—অনেক পূবে। ঠিক কোন্ জায়গায় ছকড়িও সঠিক বাতলাতে পারবে না। অত দূর-অঞ্চলে নৌকো কদাচিৎ যায়। ছকড়ি একবার গিয়ে পড়েছিল তার স্বভাবটা নিতান্ত বিদঘুটে ভবঘুরে গোছের বলেই। কেউ যদি নিয়ে যায়, নির্ঘাৎ সে চিনিয়ে দিতে পারবে খালটা। মিথ্যে প্রমাণ হয় তো যে শাস্তি হুকুম হবে, তাই সে মাথা পেতে নিতে রাজি আছে।

বলতে বলতে নিশ্বাস ফেলে হঠাৎ ছকড়ি চুপ করে যায়। বয়স ও রোগে দেহ জখম করে ফেলেছে। যে হাতে হাল বেয়ে সাগর-মোহানায় বড় বড় ঢেউয়ের মাথার উপর দিয়ে নৌকো নিয়ে অবহেলায় খেলা করে বেড়িয়েছে, সে হাত এখন এমনিতেই থরথর কাঁপে, একখানা লাঠি মুঠো করে ধরবার মুরোদটুকুও নেই। এমন কে আছে, ঠাকুর-স্থাপনার মতো তাকে নৌকোর উপর বসিয়ে সেই দূর দুর্গম স্থানের মধ্যে নিয়ে যাবে!

মধুসূদন গড়গড়া থেকে কলকে নামিয়ে দিলেন। দু-হাতের চেটো একত্র করে তার মধ্যে কলকে বসিয়ে ছকড়ি গোটা দুই-তিন টান দিয়েছে—সে কী কাশির দমক! কাশি আর থামে না। সারা দেহ আকুঞ্চিত হচ্ছে। রক্তাক্ত চোখ দুটো কোটর থেকে ছিটকে পড়ে বুঝি-বা! তবু কলকে এঁটে ধরে আছে এই অবস্থায়।

মধুসূদন কলকে কেড়ে নিলেন।

দিয়ে দে। মারা পড়বি যে দম আটকে। আর কক্ষনো টানতে যাবি নে।

ছকড়ি হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে: রোগ আরাম হবে না বাবুমশায়? কি বলেন? পাঁচুকালীর তাগা পরে অনেকেরই তো সেরে যাচ্ছে। তাগার জন্য মোহান্তবাবার কাছে যাব—তা সেখানে পূজোর খরচই সকলের আগে সাত সিকি। তার উপর যাতায়াতের নৌকো-ভাড়া আছে। মবলক টাকার ব্যাপার—কোত্থেকে জুটাই বলুন। হাঁপটা সেরে গেলে আমি বাবু নিজে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতাম। বাদার নাম করে সবাই তো ক্ষপচে বেড়ায়—আসল বাদায় গেছে ক'জনে? ছিটে-জঙ্গলে

ছু-একবার পাক দিয়ে এসে মানবেলার মধ্যে ভাঁক করে বেড়ায়।

মধুসূদন হেসে আশ্বাস দেন: সেরে যাবে রোগ—আমি বলছি, নিশ্চয় সারবে। সারাতেই হবে। সাগর অবধি যত বাদা আছে, সব আমি চোখে দেখতে চাই। তুমি সঙ্গে থেকে চিনিয়ে দেবে ছুকড়ি—তুমি না থাকলে তো হবে না!

ছুকড়ি ভাবে হাঁপানি তার সত্যিই সেরে যাবে। ফিরে পাবে আগেকার মতো গায়ের শক্তি ও দুরন্ত যৌবন। তার অবস্থা হয়েছে—যে লোক স্বজনদের কাছ থেকে সুদূরবর্তী হয়ে আছে, তারই মতো। রোগমুক্তির পর অরণ্যচারী আবার স্বস্থানে ঘুরে ফিরে বেড়াবে, পঙ্গু হয়ে এই রকম জনালয়ে পড়ে থাকবে না।

শুনুন বাবুমশায়, পুবে এক খাল আছে—বাগদা গাঙ থেকে বেরিয়েছে। কেউ যায় না সেদিকে, সরকারি মানুষদেরও পা পড়ে নি। আমি দৈবাৎ ঢুকে পড়েছিলাম সেই খালে। দুপুরবেলা—কিন্তু হলে কি হবে, রাত দুপুরের অবস্থা হয়ে উঠেছে···

শান্ত আকাশে তারা ঝিলমিল করছে। সেইদিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে ছুকড়ি বহুকাল আগেকার এক দুর্যোগ-দিনের ছবি মনে আনছে। পুঞ্জিত মেঘ চারিদিক অন্ধকার করে তুলেছে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাতাস বন্ধ, অসহ্য গুমোট। জলের রং কালি-গোলার মতো। স্থল-জল-আকাশের এ মূর্তি ছুকড়ি খুব চেনে—বড়-গাঙে থাকা অতঃপর কোনক্রমে উচিত নয়। খালের মধ্যেও একেবারে নিরাপদ নয়—গাছপালা ভেঙে পড়ে সবসুদ্ধ সলিল-সমাধি ঘটিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু উপায় কি—ঘরের মতো নিশ্চিন্ত আশ্রয় কোথায় মিলবে বনের ভিতর? কোন এক পাশখালি বা খাঁড়ির মধ্যে নৌকোর মাথা ঢুকিয়ে ঝড়-বাতাস না থামা পর্যন্ত চুপচাপ অপেক্ষা করবে, এই মতলবে সে খালে ঢুকে পড়ল।

খানিকটা দূর গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, এমন সময় দেখল—খাল বা খাঁড়ি নয়—মহাব্যস্ত কতকগুলো মানুষ। কালো-কালো

চেহারা, লম্বায় আমাদের দুনো তে-দুনো হবে। মানুষ বলা উচিত নয়, মানুষ তারা নয়ও—পাথর কুঁদে কে বুঝি জীবন্ত দানব বানিয়েছে। খাল-ধারে কিসের প্রয়োজনে আনাগোনা করছে, কী করছে—জঙ্গলের আড়ালে থাকায় ঠাহর করা যাচ্ছে না। আসন্ন ঝড়ের মুখে এরা একদল নৌকো নিয়ে এসেছে—তা চোখ তুলে কেউ তাকাল না। টেরই পায় নি, এই রকম ভাব।

নৌকোয় আর যারা আছে, সাহায্য চেয়ে হাঁকডাক করতে যাচ্ছিল। বহুদর্শী দুকড়ি বুঝতে পেরেছে—হাত তুলে তাদের নিষেধ করল। যেমন করছে ওরা করুকগে, ঘাঁটা দিয়ে কাজ নেই।

আকাশের ঘনঘটায় খুব ভয় হয়েছিল, কিন্তু সামান্য একটু বাতাস হয়ে মেঘ উড়ে গেল। আকাশ পরিষ্কার। দুকড়ি এগুচ্ছে তবু খাল দিয়ে। জোয়ারবেগে তরতর করে জল ঢুকছে—নৌকো আপনি ছুটেছে, বাইতে হচ্ছে না। খালপথে, দেখাই যাক না, কোথায় গিয়ে ওঠা যায়! মনে হচ্ছে, খুব এক সংক্ষিপ্ত পথে আগুন-জ্বালায় পৌঁছনো যাবে। আগুন-জ্বালার নতুন পথের আন্দাজ পেয়ে দুকড়ি মেতে গিয়েছে।

কিন্তু ঝড় নেই, বাদলা নেই—ব্যাপারটা কি বলো তো? গাছপালা নুইয়ে এনে জলের উপর ধরছে, পথ আটকাচ্ছে। পিছন ফিরবার জো নেই—সেদিকেও ঠিক ঐ অবস্থা। ডাল ঠেসে ধরছে নৌকোর উপরে। দুকড়ি অবস্থা বুঝেছে। ভয় পেয়ে নৌকো থামালে ঐখানেই দফা শেষ করবে। অবিরত বাইছে প্রাণপণ শক্তিতে, আর দমাদম লগজির বাড়ি মারছে ডালপালায়।

খাল শেষ হলে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলল। সেই সময় এক তাজ্জব জিনিস দেখতে পেল—নরম চরের উপর বড় বড় পদচিহ্ন। দুকড়ি নেমে গিয়ে মেপে এসেছে, সওয়া-হাত দেড়-হাতের কম নয়। পা থেকেই পুরোপুরি মানুষটার আয়তন আন্দাজ করে নাও। শুধু কানেই শুনে থাকো বনবাসী অতি-মানুষদের কথা—দুকড়ি তাদের চোখে দেখেছে।

আর শুধু এমনি নির্বাক দুশমনের দল নয়, কথাও বলে

অনেকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সাগরের কাছাকাছি ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ পড়ে। উপরের মাছের মতো তেমন স্বাদ নেই, তবু জাত্যাংশে ইলিশ তো! তুকড়ির দল সেবারে শিকারে গিয়েছিল। জেলেরা জাল তুলছে—গরানের কষে ভিজানো বাঙা জাল রুপালি ইলিশের প্রাচুর্যে ঝিকমিক করছে। নৌকো বেয়ে এগিয়ে গিয়ে তুকড়ি বলে, খাবার মাছ দাও—

জেলেরা তাকিয়ে দেখল, সত্যি সত্যি শিকারি নৌকো কিনা। দিয়ে দিল পাঁচ-ছ'টা মাছ। শিকারিরা মাছ চাইলে বিনা তর্কে দিয়ে দিতে হবে, বাদাবনের এই অলিখিত আইন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাত্রে আজ জবর খাওয়া-দাওয়া হবে। মাছ কোটা-ধোওয়া হতে লাগল। মনের আনন্দে একটু ভাল জায়গা দেখে নৌকো বাঁধল তারা। জেলেরা কাছাকাছি মাছ ধরে বেড়াচ্ছে, শঙ্কার কিছু নেই।

কিন্তু পাড়ের জঙ্গলের মধ্য থেকে অনতিপরে খোনা গলায় বলে ওঠে, মাছ দাও না খানকয়েক—

কে তুই?

কাঠুরে। ওপারে আর সবাই কাঠ কাটতে গেছে, আমি একলা বসে আছি ওদের জন্যে।

তুকড়ি খুব জোরে হাঁক দিয়ে উঠল, আ মরি আমার বাপের ঠাকুর! মাছ খাবি—তা হাত-পা রয়েছে কি করতে? ধরে খাগে—

তবু সেই করুণ আকুতি: মাছ দাও—

যা-যা-যা—কাঙালামির জায়গা পাস নি!

তুকড়ি বুঝতে পেরেছে। এত চিৎকার করল—কিন্তু ক্ষীণতম প্রতিধ্বনিও উঠছে না। এমন হয়, ওঁরা যখন আবির্ভূত হন শুধু সেই সময়ে। আরও দু-একবার হাঁকডাক করে সে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হল

তখন বলে, আচ্ছা—তাই হবে। কাঁচা-মাছ খাবি কি রে! ভেজে দিচ্ছি।

উনুন টেনে ছইয়ের নিচে নিয়েছে। কড়াইয়ে তেল চাপিয়ে

মাছ ছেড়ে দিতে কলকল করে উঠল। বনভূমি ভরে গেল ভাজা-ইলিশের সুবাসে।

ছকড়ি বলে, হাত পাত—

ভয়ে কাঁটা হয়ে আর সকলে সোয়ারিখোপে ঢুকে পড়েছে, ছকড়ির কাণ্ডকারখানা দেখছে। ছকড়ি দেখল, নদী-জলের উপর আলগোছে কুলোর মতো একজোড়া হাত পাতা। মন্ত্র পড়ে চাপান-দেওয়া নৌকো—স্পর্শ করবার জো নেই, সে জানে।

নে, ধর—

উ-হু-হু, পুড়ে গেল—জ্বলে গেল—

ভয়াল আর্তনাদ দূর থেকে দূরবর্তী হয়ে অবশেষে বনান্তরালে মিলিয়ে গেল। ছকড়ি খলখল করে হাসে। হাসি চারিদিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। উচিত শাস্তি পেয়ে পালিয়ে গেছে মৎস্যপ্রত্যাশী। করেছে কি—মাছ দেবার নাম করে এক হাতা গরম তেল ঢেলে দিয়েছে হাতের উপর। সাহস বোঝ। অতি-সাবধানী পুরুষ ছকড়ি—তার মতো বহরদার অঞ্চলের মধ্যে নেই। আট প্রহরের অষ্টবন্ধন সেরে, তাগা ও শিকড়বাকড়ের পোঁটলা নিয়ে তবে সে বাদায় বেড়ায়। সে ভয় করতে যাবে কেন?

শোন, হিতার্থে বলছি, সদুপদেশ কয়েকটা শুনে রাখো। স্রোত কাটান দিতে কূলে কূলে চলেছ—চাঁদাকাঁটার আড়াল থেকে ফিসফিসিয়ে হয়তো কে কথা বলে উঠবে। আলাপ-পরিচয় করতে চাইবে, শুধাবে ছেড়ে-আসা অনেক দূরের পাড়াপড়শি আত্মীয়জনের কথা: কোন দেশের লোক তুমি গো? যশোরে মণিরামপুরের হাটে গুড় উঠছে এবার কেমন? কোষ্টার দর কি?… প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবে। কোন জবাব দিও না। নৌকো বেয়ে যেমন যাচ্ছিলে চলে যাবে।

বলবে, বেলকাটির জমির দপ্তারের খবর জান? নৈমদ্দি কবিরাজ বেঁচে আছে না মরেছে? জানা থাকলেও জবাব দিতে যেও না।…অথবা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলতে পারে, রাতে পথের

দিশা পাচ্ছি নে, দোহাই তোমাদের, একটুখানি তুলে নাও। বাঘে খেয়েছে মনে করে সঙ্গীসাথীরা নৌকো ভাসিয়ে সরে পড়েছে—এই দেখ, গাছের মাথায় উঠে বসে আছি, সেখান থেকে কথা বলছি। অতি-বড় দিব্যি—নিয়ে যাও নৌকোটা একটু কিনারে লাগিয়ে, নয়তো এবারে সত্যি সত্যি জানোয়ারের পেটে যাবো।

হয়তো সত্যিই বনের মধ্যে হারিয়ে-যাওয়া কোন মানুষ। ব্যাকুল হয়ে ডাকাডাকি করছে। কিন্তু সে রকম কদাচিৎ ঘটে।

দরদও দেখান ওঁরা সময়ে অসময়ে। তোমার নৌকো একলা পড়ে গেছে উদ্দাম নদীর মাঝখানে—গা ছমছম করছে—বাঁকের মুখে এসে দেখবে, ভরা-পালে আরও খান পাঁচ-সাত চলেছে। আগে পিছে চলল তারা নিঃশব্দে—যেই কোনো বনকর-অফিস কি জনালয়ের কাছাকাছি এসেছ, চকিতে বহর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তোমার ভরসা দিতে এসেছিল ঐ সব মায়াতরী। বাওনে যাচ্ছ সরু খাঁড়ির মধ্য দিয়ে। কিম্বা গুলোবন ভেঙে চলেছ মৌমাছির ঝাঁক লক্ষ্য করে। দেখবে, তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে এক প্রান্তে গাছগাছালির ভিতর—অথচ দশটা হাত দূরে একেবারে শান্ত। এ সমস্ত কৌতুক ওঁদের—তোমাকে ভয় দেখিয়ে একটুখানি মজা করলেন।

মোটের উপর তোমার কোনদিকে চোখ-কান দেবার গরজ নেই—কিছুই দেখ নি, কিছু শুনতে পাও নি, এইভাবে টেনে বেরিয়ে যাও। জঙ্গলরাজ্যে কেবা কার? সমাজ-সামাজিকতার দায় নেই এখানে। মানুষ এখানে এসেই জন্তু হয়ে যায়। দয়াধর্ম লোকালয়ে ফিরে গিয়ে আবার দেখিও।

॥ একুশ ॥

আর একবারের বৃত্তান্ত বলি। এত অভিজ্ঞতা ও গুণজ্ঞান সত্ত্বেও সর্বনাশ ঘটাচ্ছিল ফুকড়ি নিজেই। অল্পের জন্য বেঁচে গেল। তাই তো বলি—বাদার কথা কিছু বলবার জো নেই, কার কপালে

কখন কি ঘটে! মানুষ সেখানে গেলে আর একরকম হয়ে যায়, মাথা পরিষ্কার রাখা শক্ত।

রাত দুপুর। পাশখালির মুখে নৌকো বেঁধে আছে। সবাই ঘুমুচ্ছে—দুকড়ি নিজে পাহারায় আছে হুঁকো-কলকে ও আগুনের মালসা দিয়ে। ঘন ঘন তামাক খাচ্ছে ঘুম তাড়ানোর জন্য···

সেদিন এক ফুটফুটে ভদ্রলোক এসেছেন মৌভোগের কাছারি-বাড়ি। সুকুমার নাম। এসেছিলেন রায়গ্রামে—মধুসূদন সঙ্গে করে এখানে এনেছেন। সুকুমার টিপিটিপি হাসছিলেন দুকড়ির গল্প শুনে। তারপর ছোট্ট একটু প্রশ্ন করলেন: বড়-তামাক খাচ্ছিলে বুঝি বুড়ো? এমনি সাধারণ তামাকে নজর এত খোলতাই হয় না তো!

ভ্রূকুটি করে দুকড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল সুকুমারের দিক থেকে। নগরবাসী কি বুঝতে পাবে বাদার ব্যাপার? এ হল আলাদা এক জগৎ—তোমাদের বাঁধা ছকের জীবন থৈ পাবে না জঙ্গলে ঢুকলে। গল্প যেমন চলছিল, চলতে লাগল—

দা-কাটা তামাক—বিষম তলোক। যা বলছেন নতুন-বাবু—বড়-তামাকের কাছাকাছিই বটে! তার দু-একটান টানলে নির্ঘাৎ তোমরা মাথা ঘুরে পড়বে। সেই বিষ নাকে-মুখে ··· উদ্গীরণ করছে, দুকড়ির তবু ঝিমুনি আসছে। এক-একবার ঢলে পড়ার অবস্থা হয়। সেটা মধু ও মোম-আহরণের মরশুম। সারাদিন মৌমাছির ঝাঁকের পিছনে ছুটোছুটি করে অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়েছে। এখন ঝিরঝিরে জোলো-হাওয়ায় ঘুম ঠেকানো মুশকিল।

হৈ-হৈ শুনল যেন হঠাৎ অনেক দূরে—অনেক লোক বুঝি তেড়ে আসছে। কী প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড বেধেছে ওদিকে! ঘুম ছুটে গেল, চোখ রগড়ে সে খাড়া হয়ে বসল। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।—না, কোন-কিছু নয়। চাঁদ উঠেছে ধূসর জ্যোৎস্নায় বাদাবন পরিপ্লাবিত করে। তখন হাসি পেল দুকড়ির। দুর্গম জঙ্গলে আক্রমণ করতে আসবে কারা, আর শয়লা-পথে দুটো মানুষই পাশাপাশি যেতে

পারে না—বড় দল নিয়ে হুল্লোড় করে আসার পথই বা কোথায়! স্বপ্ন দেখছিল সে নিশ্চয়।

কিন্তু এখন নিঃসন্দেহ পূর্ণ জাগ্রত অবস্থা—কান্না আসছে যেন কোন দিক থেকে। কে কাঁদে? কান পেতে একাগ্র হয়ে শোনে ছকড়ি। হরিণ বা আর কোন পশু-পাখির ডাক এ নয়। অনতিস্পষ্ট—কিন্তু এ যে কান্নার আওয়াজ, তাতে সন্দেহ নেই। নিশিরাত্রে মহারণ্য গুমরে গুমরে কাঁদছে বুঝি! কিন্তু মানুষের গলা যে! মেয়েমানুষের।

নতুন রকমের কোন-কিছু দেখলেই সকলকে ডেকে তোলবার বিধি। বাদাবনের নিয়ম-কানুন কিছুই ছকড়ির অজানা নয়। কিন্তু সেই আধ-ঘুম আধ-জাগরণের মধ্যে কী মোহ তাকে পেয়ে বসল—দুরন্ত লোভ হল, এগিয়ে ব্যাপারটা চাক্ষুষ দেখে আসবার জন্য। দুর্নিবার আকর্ষণে তাকে টানছে, যেতে হবে—যাবেই সে। লোকজন ডেকে তুললে রাত্রিবেলা এখানে-সেখানে কখনো যেতে দেবে না, সে-ই বা কেমন করে এই অসঙ্গত প্রস্তাব তুলবে! সবাই অবাক হয়ে যাবে তার কথা শুনে, সে পাগল হয়ে গেছে মনে করবে।

কাউকে কিছু না বলে ছকড়ি নিঃসাড়ে কাছি খুলে দিল।

গাঙটা ছোট সে জায়গায়—প্রায় নিস্তরঙ্গ। জ্যোৎস্না ঝিকমিক করছে জলের উপর। ছকড়ি বৈঠা বেয়ে চলেছে। অতি সন্তর্পণে বাইছে, জলে নাড়া না লাগে। এতটুকু দুলছে না নৌকো। নৌকোর লোক জেগে না ওঠে, সেজন্য তো বটেই—তা ছাড়া, ওপারের রোরুদ্যমানা বোঠের আওয়াজে সচকিত হয়ে বনান্তরালে না পালায়, সেইটেই এখনকার সব চেয়ে বড় ভাবনা।

একটা বাঁক এইভাবে এগিয়ে গিয়ে আড়াআড়ি পাড়ি ধরেছে। কূল ঘেঁষে চলেছে এবার। এমনিভাবে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক—চড়ায় আটকে যেতে পারে, জন্তু-জানোয়ারের ভয় আছে, জঙ্গল থেকে সাপ উঠতে পারে নৌকোর পাটাতনে। বাদাবনের বহুদর্শী মাঝি—সবই সে জানে। কিন্তু জেনেশুনেও

দ্বিধা করল না এতটুকু। এমনি এক-একটা ক্ষণ আসে, প্রাণের তখন কানাকড়ি দাম থাকে না—মাটির ঢেলার মতো হাতের মুঠোয় নিয়ে ছুঁড়ে ফেলা যায়।

কিন্তু কই—বুনো-ঝিঁঝির আওয়াজ শুধু। কান্না থেমে গেল, কিম্বা ঝিঁঝিরাই কৌতুক করে নারীকণ্ঠে কাঁদছিল আরণ্য-রাত্রে। চাঁদাকাঁটার ঝোপের আড়ালে পড়ে গেছে এখন। ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে। দু-চোখের সকল দৃষ্টিশক্তি পুঞ্জিত করে তাকিয়ে আছে। ভাল দেখতে পাবে বলে নরম কাদায় বৈঠা বসিয়ে স্থির হয়ে রইল অনেকক্ষণ। তবু হয় না—টিপিটিপি নামল তখন ডাঙায়। চাঁদাকাঁটায় পা ছড়ে গেল, ভ্রূক্ষেপ নেই।

দেখতে পেল—হ্যাঁ, স্পষ্ট চোখে দেখছে সে—

গল্প থামিয়ে হঠাৎ দুকড়ি মধুসূদনের পায়ে হাত দেয়।

পা ছুঁয়ে বলছি বাবুমশায়, যে দিব্যি করতে বলেন রাজি আছি—দেখলাম, ঝোপের আবডালে সোনার-প্রতিমা এক মেয়ে হলুদ-গেলের মতো রং—অমন রূপসী কেউ কোনদিন আপনারা দেখেন নি।

টিপিটিপি পা ফেলে দুকড়ি তখন একেবারে কাছে এসে গেছে। হেঁতালঝাড়টা পার হয়েই চাঁদের আলোয় মুখোমুখি হবে। ঢিব-ঢিব করছে বুকের মধ্যে—সামলাতে পারে না। আর একটু—সামান্য হাত কুড়ির মধ্যেই—

কিন্তু টের পেয়ে গেল এত সতর্কতা সত্ত্বেও। পালিয়েছে। হাউইবাজির মতো আলো ছিটকে সাঁ করে ছুটে গেল। বনজঙ্গল তার গায়ে বাধে না—অবহেলায় যেন হাওয়ায় ভেসে ছুটেছে। পালিয়ে গিয়ে খালের ধারে ধারে—ঐ, ঐ তো—অনেকটা দূরে ফাঁকার মধ্যে একটা বেঁটে বাইনগাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে। হাসছে কি তার দিকে চেয়ে চেয়ে—চোখের ইশারায় ডাক দিচ্ছে? দুকড়ি তো ছুটতে পারবে না কাঁটা-জঙ্গলের মধ্যে—লাফিয়ে এসে উঠল নৌকোয়। খালের জল মৃদু কল্লোলে গাঙে এসে পড়ছে। মোহানায় স্রোত প্রখর—একটা মাত্র বোঠের সাহায্যে এগুনো

ছুকড়ি। জোয়ান বয়স তখন, গায়ে অসুরের বল—সে কি কোন বাধা গ্রাহ্য করে! নেমে পড়ল কাদার মধ্যে। গায়ে যত জোর আছে, নৌকো ঠেলছে। ঠেলে ঠেলে খালে ঢুকিয়েছে, উজোন কেটে চলেছে অত্যন্ত ধীরে ধীরে···

হঠাৎ একজন মউলের ঘুম ভাঙল। ভাগ্যিস ভেঙেছিল। লোকটা মনে করেছে, জলের টানে কেমন করে বাঁধন খুলে নৌকো ভেসে চলেছে। মানুষে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখে সে লাফিয়ে উঠে বসল। পিছন থেকে ছুকড়িকে চিনতে পারে নি। বুড়োমানুষ সে—বাদায় অনেক ঘোরাফেরা আছে। কাজেকর্মে যারা বনে আসে, তাদের মধ্যেও বদলোকের অন্ত নেই। কী মতলবে কে কোথায় দলসুদ্ধ নিয়ে যাচ্ছে—আতঙ্কে সে চেঁচিয়ে ওঠে: কে রে?

চুপ, চুপ!

ফিসফিস করে অতি কাতরতার সঙ্গে ছুকড়ি বুড়োকে থামতে বলে। এত কষ্ট করে, জীবন পণ করে এই যে নৌকো টেনে আনছে—সকল কষ্ট নিরর্থক হবে, আবার পালিয়ে যাবে এদিক দিয়ে যদি শব্দসাড়া পায়।

চুপ! তোমার পায়ে পড়ি দাদা, একটাও কথা কোয়ো না—

লোকটা আশ্চর্য হয়ে বলে, হল কি তোমার ছুকড়ি? উঠে এসো।

হাত ধরে ফেলে একরকম জোর করে সে ছুকড়িকে টেনে তুলল তেয়াজিখোপে। পাড়ের একগোছা কাশ মুঠো করে টেনে রেখেছে, নৌকা যাতে ভেসে না যায়। মুহূর্তকাল লোকটা ছুকড়ির দিকে নিষ্পলক চেয়ে রইল। তারপর বলে, হয়েছে কি?

মাটি করে দিলে। কে-একজন কাঁদছিল ইদিক পানে। আর তো দেখতে পাই নে।

এদিক-ওদিক ঠাহর করে দেখে বুড়ো শিউরে ওঠে। বলে, ওরে বাবা! চিনতে পারছ না কোনখানে চলে এসেছ? খালটুকু শেষ হলেই তো সর্বনাশীর মুখ।

সর্বনাশীতে এনে ফেলেছে রে! ওঠ—উঠে পড় সবাই—

চেঁচামেচিতে সকলে জেগে উঠল। চোখ মুছতে মুছতে চারিদিক তাকিয়ে ঠাহর করবার চেষ্টা করে। তাই তো—আর একটু হলেই সর্বনাশ হত। সবসুদ্ধ গাঙের নিচে যেতে হত। ঝড়-তুফান না-ই থাক, নৌকোর পরিত্রাণ ছিল না সর্বনাশীর চোরাদেহে পড়লে। নিঃশব্দে এরা নিদ্রিত ছিল—গভীর রাত্রে সেই সময়ে দুকড়ি নিয়ে চলেছিল সুনিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। যে দুকড়িকে কাণ্ডারী করে তারই ভরসায় ঘববাড়ি ছেড়ে এতগুলো মানুষ দুর্গম জলজঙ্গলে এসেছে।

ডাইনে বাঁয়ে দু-জনে দুকড়িকে জাপটে ধরে বসে আছে। দুকড়ি আর নয়—এবারে হালে গিয়ে বসল এদেরই একজন।

জোরে বাও মরদের বেটারা। সাবাস, সাবাস! উড়িয়ে নিয়ে চলো। বিষখালিতে উঠে তবে জিরান পাবে—

এক সঙ্গে ছ'খানা বোঠে পড়ছে, বাইচের মতো নৌকো তীরগতিতে ছুটছে। দুকড়ি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে অপরাধ। কী হয়েছিল যেন তার—কী মোহে পেয়ে বসেছিল। এখন দু-হাঁটুতে মুখ গুঁজে সে বসে অছে।

সর্বনাশী থেকে যত দূরে আসছে, একটা দুটো করে ততই কথা ফুটছে সকলেব মুখে। দুকড়িকে যাচ্ছে-তাই করে বলছে। আর সেই বুড়োই তর্ক করছে দুকড়ির হয়ে।

হুঁশজ্ঞান ছিল কি ওর? সর্বনাশী বেটী মাথা ঘুলিয়ে দেয়। সর্বনাশীর চোলে যে-কেউ তোমরা পড়তে, ঠিক এমনি দশাই হত। বকাঝকা ছাড়ান দাও, বাপের ভাগ্যি যে প্রাণে ফিরে চলেছ। চাপান দেওয়া যাক এই জায়গায়—কী বলো? ঐ যে, আরও ক'খানা বেঁধে আছে। আর ঘুমানো নয়—রাতটুকু জাগতে হবে সকলে মিলে গল্পগুজব করে। কি জানি, বলা যায় না—সর্বনাশী আশেপাশে আছে হয়তো ওত পেতে। কটা আলো আছে? সবগুলো জ্বেলে দাও—

॥ বাইশ ॥

কাচিপাতা নদীর একটা মুখ সর্বনাশী। এর দহে পড়ে কত যে ভরাডুবি হয়েছে, তার সীমাসংখ্যা নেই। বাদাবনে নবীন আগন্তুক নদীর এই অদ্ভুত নামে অবাক হয়। পণ্ডিতজনে ঘাড় নেড়ে মন্তব্য করবেন, পাড় ভেঙে তছনছ করত বোধহয়—তাই কীর্তিনাশার সমগোত্রীয় এই নাম।

সর্বনাশীর কাহিনী শুনবার পর তুকড়িই আবার কতজনের সঙ্গে সেই কথা বলেছে। বাদাবনের অন্ধি-সন্ধি নিয়ে এমনি কত গল্প মাঝিদের মুখে মুখে চলে। আগে যে তুকড়ি কেন শোনে নি, সেইটে আশ্চর্য।

একদা বসতি ছিল এই সমস্ত নদীর কূল ঘিরে—জঙ্গলের তুবে থাকত না এখনকার মতো। লোকের পেটে অন্ন মনে সুখ ছিল। পালপার্বণ ফুরাতো না বছরের মধ্যে কোন সময়।

তারপর লুঠেরার দল এসে পড়ল। এখনকার এই ধূমাকল নয়—পালের জাহাজ ভাসিয়ে তারা আসত। হার্মাদ বলত তাদের—পুরাপুরি মানুষ নয়, তামাটে গায়ের রং, তামাটে চুল-দাড়ি, দৈত্য-দানবের মতো চেহারা, বিচিত্র পোশাক, অবোধ্য কথাবার্তা। ঘাটে জাহাজ লাগিয়েই গুড়ুম-গুড়ুম বন্দুক ছুঁড়ত, আগুন বেরুত নলের মুখ দিয়ে। গরু-ছাগলের মতো মনে করত তারা মানুষকে, অকারণে কষ্ট দিত, মানুষ মেরে ফেলে হো-হো করে হাসত।

বাসিন্দারা যে ভীরু ছিল, তা নয়। কিন্তু ঢাল-সড়কি-লাঠির নাগালের মধ্যে না পেলে তারা কী করতে পারে। নিরাপদ ব্যবধানে থেকে কলের সাহায্যে মানুষ মারা—কাপুরুষতা ছাড়া আর কি! সেই সেকালে ইন্দ্রজিতের লড়াইয়ের মতো। মরদ-জোয়ান হলে সামনাসামনি এসে দাঁড়াও—বোঝা যাবে তখন ক্ষমতা।

বছর বছর আসে হার্মাদরা। শেষাশেষি কামান নিয়ে আসতে লাগল। একবার এমনি হানা দিয়েছে কাচিপাতার তটবর্তী বিশাল এক গ্রামে। যেন সবুজ ভরা-ক্ষেতে দাঁতালের দল ঢুকে পড়েছে। বিকালবেলা থেকে তাণ্ডব চলছে—দেড় প্রহর রাত্রি, এখনো তাদের কাজকর্ম সারা হল না। জাহাজ নিশ্চল অবস্থায় ঘাটে বাঁধা—রাতের মধ্যে ভাসানো সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। মাল-পত্র কিছু কিছু পাওয়া গেছে—সোনাদানা এবং দামী দামী জিনিস-গুলো জাহাজে তুলছে, ভেঙে তছনছ করে ছড়িয়ে দিয়েছে বাকি সমস্ত। কিন্তু মানুষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না—পূর্বাহ্নে টের পেয়ে যেন কর্পূর হয়ে উবে গেছে। যা দু-একজন পাওয়া যায়, নিতান্ত অকেজো। অতি-বৃদ্ধ বা অত্যন্ত শিশু। এ আবর্জনা জাহাজ বোম্বাই দিয়ে নিয়ে যাবে কোন লাভের আশায়? রাত বাড়ছে আর ব্যর্থতার অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে লুঠেরারা। ঘর-কানাচ, গোয়াল, বাগবাগিচা—সর্বত্র হানা দিয়ে ফিরছে। মানুষ চাই—শক্ত সমর্থ জোয়ান মানুষ। মেয়েমানুষ কমবয়সি।

এক বাড়ির চার-ভাইকে পাওয়া গেল দৈবক্রমে। খাঁড়ির মধ্যে বহুদূরব্যাপী হোগলাবন—তারই মধ্যে নৌকো ঢুকিয়ে চুপচাপ তারা বসে ছিল। শেষরাত্রির দিকে ক্লান্তিতে হার্মাদদের আক্রোশ ঝিমিয়ে পড়বে, সেই সময়ে বোধকরি নিঃশব্দে সরে পড়'ব মতলব। ধরা পড়ার কথা নয়—কিন্তু নড়াচড়ার দরুন সেই জায়গায় হোগলার মাথা অল্প-একটু নড়েছিল বুঝি—একজনের নজরে পড়ে গেল। তখন লম্বা তলতাবাঁশ এনে সেইখানে ঢুকিয়ে দিতে নৌকোয় ঠোক্কর লাগল।

ধরা পড়ল চার ভাই। বিস্তর জিনিসপত্র বেঁধে-ছেঁদে সঙ্গে নিয়েছিল, নামিয়ে আনল সমস্ত। বেটাছেলেদের তো পাওয়া গেল, বউগুলো গেল কোথায়?

আরও রাত হল।

সহসা কাচিপাতার কূলে আপনি এসে হাজির হল ছোট বউটি। যে জায়গাটায় জাহাজ বেঁধেছে সেখানে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল।

বিস্রস্ত চুল, কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা। মুখের অপরূপ গৌর আভা উত্তেজনায় রক্তবর্ণ হয়েছে। বলে, তোমাদের কাপ্তেনের কাছে যাব।

লোকজন যেতে দিচ্ছে না। পাগল বলে ভেবেছে। তা ছাড়া নিগূঢ় মতলবও আছে। কাপ্তেন সকল দিকে ভাগ্যবান—তা হলেও এমন ভালো জিনিসটা অত উঁচু অবধি যেতে দেবে না, নিচে থেকে বাঁটোয়ারা করে নেবে। একঘেয়ে সমুদ্রচর জীবনে নারীসঙ্গের জন্য লোলুপ সকলেই। উত্তাল সমুদ্র পেরিয়ে দুঃসাহসিক লুঠতরাজে আসে নারী ও সোনার লোভে। ক্ষুধা-পরিতৃপ্তির পর নারী সোনার দামেই বিক্রি করে দেয় বিদেশের বাজারে। পুরুষলোকও বিক্রি হয়, কিন্তু ভাল যুবতী নারীর দামের সঙ্গে তার তুলনা হয় না।

বউ হুমকি দিয়ে ওঠে, পথ ছাড়ো বলছি—

কামরায় বিশ্রাম করছেন। দেখা হবে না।

কথা মিথ্যা নয়। আলো নিভিয়ে দিয়ে কেবিনের মধ্যে সাহেব অনেকক্ষণ চুপচাপ আছে। নারীকণ্ঠ শুনতে পেয়ে স্খলিত পায়ে সে ডেকের উপর বেরিয়ে এল।

ক্রোধে ফেটে পড়ে বউটি।

বর্বর ইতরগুলো আমার স্বামী-ভাসুরদের বেদম মারছে। তোমার কাছে নালিশ জানাতে এলাম সাহেব। তোমার লোকজন ফিরিয়ে আনো—এনে চাবকাও আচ্ছা করে। চাবকে পিঠের ছাল তুলে দাও।

সাহেব পায়ে পায়ে অনেকটা কাছাকাছি এসেছে। অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। এই নোনা অঞ্চলে গোলাপ ফুটবার জায়গা নয়—মেয়েটি এদিককার নয়ও, ভূষণা থেকে তাকে বিয়ে করে এনেছে বছর চার-পাঁচ। চালচলন ও কথাবার্তায় যেন বিদ্যুতের ঝিলিক হানে মেয়েটা।

টলতে টলতে কাপ্তেন দ্রুত নেমে আসছে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে। তখন সম্বিৎ হল বউটার। এ কি করেছে—হিতাহিত না ভেবে

স্বামী-ভাসুরদের বাঁচাবার আগ্রহে এ কোন মাতাল ক্ষুধার্ত জানোয়ারের সামনে এসে পড়েছে?

পালাল বউটা। ভারী বুটের আওয়াজ তুলে সাহেবও ছুটেছে পিছু পিছু। পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি—দড়াম করে সদর-দরজা খুলে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বউটা বারাণ্ডায় উঠল। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল মুহূর্তকাল। দেখছে। দরদর রক্ত পড়ছে চার ভাইয়ের হাতের আঙুল বেয়ে। আহা-হা, করেছে কি দেখ! বাঁ-হাতের পাতা ছেঁদা করেছে চার জনেরই—বেতের ছোটা হাতের ছিদ্রে ঢুকিয়ে দিয়ে চারখানা হাত একসঙ্গে বেঁধেছে। আপাতত থাকুক এমনি। পালাবার সম্ভাবনা নেই এই রকম হালি-বাঁধা অবস্থায়। এ অঞ্চলের লোকে ভেটকি-ভাঙান মাছ মেরে কানকোর ভিতর দিয়ে দড়ি পরিয়ে এই রকম একত্র ফেলে রেখে দেয়।

ওরা থাকুকগে পড়ে, বউটির দিকে সকলের একাগ্র নজর। কিন্তু কাপ্তেন পিঠ-পিঠ উঠানে এসে ভেস্তে দিল। বউ সুড়ুত করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল অমনি।

দশ-বারো জনে তন্ন-তন্ন করে খুঁজছে। পাত্তা পায় না। কাপ্তেন হুকুম দেয়, বেরোবার যতগুলো দরজা আছে, সমস্ত আগলে থাকো। কত ঘন্টা অথবা ক'দিন পালিয়ে থাকতে পারে দেখা যাক।

বেশি দেরি হল না, বউ নিজেই বেরিয়ে এল। ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই মুখে—সামলে নিয়েছে ইতিমধ্যে। সরু বেত্তির চিকন কাজ-করা শীতলপাটি এনে সযত্নে সে পেতে দিল।

বসুন—

গল্পের মধ্যে বউটার নাম কেউ উল্লেখ করে না। নাম আন্দাজ করতে পারো নগরবাসী ভাই? মধুসূদনের—কেন জানি না, একটা নাম দিতে ইচ্ছে করে—দামিনী। অথবা বিজলীলতা। স্বামী ও ভাসুররা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, বিজলীলতা সে দিকে তাকাল না একবার। মধুর মাদক হাসি হেসে লীলায়িত ভঙ্গিতে আহ্বান করে, আসুন—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আপনারা বসুন এসে পাটির উপর।

কথা হয়তো বুঝছে না—তাই হাতের ইশারায় দেখিয়ে দেয়। কাপ্তেন ও সেই দশ-বারো জন এক-পা দু-পা করে এগিয়ে এলো অলক্ষ্য আকর্ষণে। অপ্রতিভ ভাব লোকগুলোর—এতক্ষণ এখানে যে ব্যবহার করছিল, তার জন্য লজ্জা বোধ করেছে বিজলীলতার সামনে। তারা কি করেছে—আর তার বদলে মেয়েটার কী রকম ব্যবহার! আগের সমস্ত ব্যাপার চাপা পড়ে গেলে যেন তারা বেঁচে যায়।

বিজলীলতাও যেন কিছু জানে না, সে দেখেও দেখছে না। কতক মুখে কতক বা আকারে-ইঙ্গিতে জানাল: পরম বাধিত হয়েছে সে এই সব মহামান্য বিদেশি অতিথিদের বাড়ির উপর পেয়ে।

কাপ্তেন লোকজনদের বাইরে যাবার হুকুম দিল। ঘাড় নেড়ে বিজলীলতা প্রতিবাদ করে: না-না—যাবে কেন? সবাই এ-বাড়ির অতিথি। কত হাঙ্গামা-হুজ্জুত করে বেড়াচ্ছ তোমরা এই রাত দুপুর অবধি, কত কষ্ট হয়েছে। ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয় খুব। পরমান্ন খাবে সাহেব? খেতেই হবে। নতুন খেজুর-গুড় দিয়ে রান্না করব, কী রকম বাস বেরুবে দেখতে পাবে।

সাহেব আর পারে না—ধৈর্য হারিয়ে খপ করে তার হাত এঁটে ধরল। হাসতে হাসতে হাত ছাড়িয়ে বিজলীলতা লঘুপক্ষ পাখির মতো রান্নাঘরে ঢুকল। বারাণ্ডার প্রান্ত থেকে স্বামী ও ভাসুররা রক্তচক্ষে তার রকম-সকম দেখছে। হাত বাঁধা—কি করবে? নইলে মেলতুক ধরে এক কোপে বলি দিত স্বৈরিণী বউকে। প্রাণটাই কি এমন বড় হল ওর কাছে?

রান্নাঘরের ভিতর এতক্ষণ ধরে কী রাঁধছে, কে জানে? সাহেব ইতিমধ্যে আরও কিছু রসদ আনিয়ে নিয়েছে জাহাজ থেকে। টইটম্বুর অবস্থা। আর সবুর সইছে না। চোখ লাল, মুখে বীভৎস উগ্র গন্ধ—চলল সে রান্নাঘরের দিকে। আগে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখল। চুপ করে আছে বিজলীলতা। চুল্লি দাউ-দাউ করে জ্বলছে। পরমান্ন ফুটছে টগবগ করে, সুগন্ধ বেরিয়েছে।

পাঁজাকোলা করে তুলে রান্নাঘর থেকে তাকে সাহেব বড়-ঘরে নিয়ে আসে।

হাত-পা ছুঁড়ছে বিজলীলতা।

আঃ, কি করো? দেখতে পাচ্ছ না ঐ যে—

ইশারায় দেখিয়ে দেয়। সাহেবের হুঁশ হল, বারাণ্ডায় চার ভাই ওরা দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে। একবার দুরন্ত ইচ্ছাও জাগে, দেখুক ওরা—স্বামী ও ভাসুরদের চোখের উপরেই যা ঘটবার ঘটুক সমস্ত। কিন্তু বিজলীলতার দিকে তাকিয়ে মুষড়ে পড়ে। সাহস হয় না বেশি পশুত্ব-প্রকাশের।

উঠানের পাশে গাঁদা-দোপাটি-জুঁই ফুলের বাগান। আজকের এত বুটজুতোর দাপাদাপিতে ফুল-বাগান বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। চার ভাইকে টেনে তুলে সাহেব একরকম ছুঁড়েই দিল উঠানে। ঘড়াং করে ঘরের দরজা দিতে যায়।

বিজলীলতা হেসে বলে, আগে খেয়ে নাও—তারপর। এত কষ্ট করে বাঁধাবাড়া করলাম।

কাপ্তেন খেলো না। খাবার অবস্থা ছিল না তার। তা ছাড়া বিষ-টিস দিতে পারে, এ সন্দেহও আছে। নেশা হলেও আখেরের বুদ্ধিটুকু লোপ পায় নি। আর সবাই গোগ্রাসে গিলছে সারবন্দি পাতা পেতে বসে। এমন চমৎকার খাওয়া অনেককাল ভাগ্যে জোটে নি।

এবারে এসো বিবি—

আর একটু। একটুখানি ছুটি দাও—

পরনের কাপড় দেখিয়ে বউটি বুঝিয়ে দেয়, রান্নাঘরের কালিঝুলি মেখে গেছে—সরম লাগছে সাহেব, কাপড়টা বদলে আসি।

সবুর সহ্য হচ্ছে না কাপ্তেনের। উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—পথ কিছুতে ছাড়বে না। কিন্তু ছোট্ট পাখির মতো সাহেবের আটকানো হাতের নিচে দিয়ে হাসতে হাসতে পালাল বিজলীলতা। সাহেব গিয়ে দেখল, দাওয়ার পাশে ছোট খোপটায় ঢুকে পড়ে সত্যিই সে কাপড় বদলাচ্ছে। সে দিকে মুখ বাড়াতে বিজলীলতা লাবণ্যময় ছুটো আঙুল তুলে বলে, এই…এইও—

ঢুকতে পারে না সাহেব। বাইরে দাঁড়িয়ে লোলুপ চোখে অসম্বৃত-বেশার রূপ দেখছে।

বিজলীলতা দেখে খিল-খিল করে হেসে তাড়া দেয় ঃ সরে যাও বলছি—

বেশ কিছুক্ষণ কাটল। সাহেব আবার উঁকি দিয়ে দেখে। নেই তো! কী সবনাশ, পালিয়ে গেছে ওদিককার দরজা দিয়ে। কিন্তু যাবে কোথায়? রাগে রাগে এদিকে-ওদিক তাকাচ্ছে— বিজলীলতা পিছন দিক দিয়ে এসে কাঁধে হাত রাখল।

কী ব্যস্ত মানুষ গো! সিঁদুর পরতে গিয়েছিলাম। আর দেরি নয়, ঘরে চলো।

অপরূপ সেজেছে। লাল টকটকে শাড়ি পরনে, সমস্ত কপাল ভরে বিশাল গোলাকার সিঁদুরের ফোঁটা। কাপ্তেনের হাত ধরে টেনে অধীর কণ্ঠে সে-ই বলে, চলো—

খিল এঁটে দিল দরজায়। বর ও ভাসুরেরা উঠান থেকে দেখে দাঁত কড়মড় করছে। আর ও-ঘরে হৈ-হল্লা করে ভোজ খাচ্ছে লুঠেরা অতিথির দল। কালামুখী সকলের চোখের উপর দরজা এঁটে দিল দলপতিকে নিয়ে। দরজা বন্ধ করল তবু রক্ষা। খোলা থাকলে দেখা যেত,-সাহেবের কণ্ঠলগ্ন হয়েছে বউটা। আনন্দে কিংবা বেদনায় আঃ-আঃ—করছে সাহেব। জাপটে ধরেছে বিজলীলতা।

দেরি হয়ে গেছে—না? আর দেরি নেই।

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। না, দেরি নেই আর। ধোঁয়াচ্ছে। কাপ্তেন তখন শয্যার উপর। বিজলীলতার নিজের হাতে রচিত কত সাধ আর কত স্বপ্নে মণ্ডিত শয্যা! সুরামত্ত সাহেব আবেশে চোখ বুঁজেছে।

দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল শুকনো ঘরের চালে বাঁশের বেড়ায়। আগুনের তাপে সাহেবের নেশা কাটল।

এ কি!

চারিদিকে একসঙ্গে আগুন লেগেছে—পালাবার ফাঁক নেই। জলন্ত চালের খানিকটা ভেঙে পড়ল সামনে। কঠিন বন্ধনে বাঁধা

পড়ে আছে সাহেব। সাধ্য কি, বিজলীলতার বাহুবেষ্টন ছাড়িয়ে বেরুবে! সোনার বরন এক নাগিনী শত পাকে বেঁধেছে যেন তাকে।

আগুন দেখতে দেখতে গ্রামব্যাপ্ত হল। এ আগুন বিজলী-লতার—হার্মাদরা দেয় নি। পুড়ে মরল কাপ্তেন। ভোজের আসরেও মারা পড়েছিল প্রায় সবাই। উঠানের চার ভাইয়ের খবর কেউ বলতে পারে না। হয়তো মারা গিয়েছিল তারাও আগুনে পুড়ে। কিংবা পালিয়েছিল এই সুযোগে। এমনও হতে পারে, জাহাজ বোঝাই করে দূর দেশে নিয়ে তাদের বেচে দিয়েছিল হার্মাদরা।

বাসুকী ক্ষেপে উঠলেন এর পর। এত অন্যায়ের ভার সইতে পারেন তিনি? শোনা যায়, ঘন ঘন কাঁপতে লাগল সারা অঞ্চল, কামান-নির্ঘোষ হতে লাগল জলতলে। কাচিপাতা উচ্ছ্বসিত হয়ে সমৃদ্ধিবান্ আনন্দোচ্ছল বিশাল জনপদের জল-সমাধি রচনা করল।

গুম-গুম-গুম—বর্ষায় এখনো কামানের মতো আওয়াজ পাওয়া যায় সাগর-তলে। লোকে বলাবলি করে, দূর লঙ্কাদ্বীপে ঘড়াং-ঘড়াং করে রাবণ রাজার প্রাসাদ-তোরণ বন্ধ করছে। আওয়াজের বিলাতি নাম বরিশাল-গান। তুকড়ি সাবধান করে দেয় মধুসূদনকে: জঙ্গল হয়ে আছে বাবুমশায়—সর্বরক্ষে! তাই আর নতুন করে তেমন-কিছু প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটছে না। কিন্তু আপনি যে রকম বলেন—সব জঙ্গল শেষ করে যদি আবাদ বসাতে যান, আবার ওঁরা ক্ষেপে উঠবেন। রাগ পড়ে নি এত কালের পরেও। আর, সেই সর্বনাশী বউটা আজও বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে—নানান অবস্থায় নানাজনের কাছে দেখা দেয়।

রাতবিরেতে বাদাবনের নদীপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অবোধ আগন্তুক-দের সর্বনাশী মোহগ্রস্ত করে—যেমন একদা জাহাজ থেকে টেনে নামিয়েছিল ফিরিঙ্গি কাপ্তেনকে। কপালে তেমনি ডগমগে লাল সিঁদুরের কৌটা, লেলিহ আগুনের রঙের শাড়ি পরনে। সেকালের

খোড়োঘরের গ্রামের মতো কাঁচা বাইন-খলসি-গরান-গর্জনের জঙ্গলে আগুন ধরানো যায় না তো—তাই ধাঁধা লাগিয়ে নৌকো-ডিঙি সর্বনাশীর চোয়াদহে এনে ফেলে। নিতান্ত বাপ-পিতামহের পুণ্যবল ছিল—সেবারে তাই ছকড়িরা কোন গতিকে বেঁচে এসেছিল তার কবল থেকে।

ছোকরা মাঝিদের এবং কেতুচরণকেও ছকড়ি কতবার সামাল করে দিয়েছে, রাত্রিবেলা কদাপি যেন নৌকো না ছাড়ে। বেলাবেলি ভাল জায়গা দেখে চাপান দেবে, যেখানে আর দু-দশখানা নৌকো বেঁধে আছে তারই মাঝখানে নোঙর ফেলবে। আর বাওয়ালিদের কাছে আগেভাগে ভাল করে জেনে নেবে, জায়গাটা গরম অর্থাৎ ব্যাঘ্রসঙ্কুল কিনা।

আগে পিছে নৌকো—নিরাপদ মনে করে সেই সঙ্গে তোমার নৌকোও যাচ্ছে। চলতে চলতে রাত্রি হয়ে গেছে, খেয়াল করতে পারো নি—হঠাৎ এক সময় হয়তো দেখবে একটা নৌকোও নেই কোন দিকে, তুমি একা। মায়া-নৌকোর বহর সাজিয়ে ওঁরা ফাঁকি দিয়ে এমনি এনে ফেলেন খপ্পরের মধ্যে। সামাল ভাই, খুব সামাল! হয়তো-বা শুনতে পাবে, বনান্তরাল হতে অতি-পরিচিত কণ্ঠে কে তোমার নাম ধরে ডাকছে, কিংবা পরমাসুন্দরী কেউ নদীকূলে দাঁড়িয়ে আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদছে। তুমি ভান কোরো, ঘুমিয়ে আছ—কোন-কিছুই দেখছ না, কিছুই কানে যাচ্ছে না তোমার। চোখের সামনে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যাক না—ভয়ে বা করুণায় নৌকো ছাড়বে না রাত্রিবেলা। উঁহু—কদাপি নয়।

॥ তেইশ ॥

ছকড়ির মহামূল্য উপদেশ, কেতুচরণ বলে নয়—জোয়ান ছেলে কেউ বড়-একটা কানে নেয় না। বয়সের ধর্ম। ছেলেছোকরারা ক'জনে নিয়মনীতি মানে? হাসিরহস্য করে হিতকথা নিয়ে।

দুকড়ির নিজের ব্যাপারেই দেখ না—সেই একরাত্রে জোয়ান বয়সে কী সর্বনাশ ঘটাচ্ছিল বলো দিকি।

কিন্তু এবারে কেতুচরণ কি বলবে—সর্বনাশীকে চাক্ষুষ দেখবার পর? সর্বনাশী গাঙটা অনেক দূর মর্জাল বনকর-স্টেশন থেকে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, সাহস বাড়তে বাড়তে বাদার প্রান্তে প্রায় জনপদ-সীমান্ত অবধি ধাওয়া করে এসেছে বউটা। গভীর জঙ্গলে শিকার মেলে না বুঝি আজকাল? বুড়ো দুকড়িদের উপদেশক্রমে মাঝিমাল্লা কাঠুরে-বাওয়ালি—যত জোয়ান-পুরুষ সাবধানী কাপুরুষ হয়ে গেছে?

টপ্পায় গেয়ে থাকে ঃ .

পরালি প্রেমের ফাঁসি, সর্বনাশী,
বারে বারে ঘুরে ফিরে তাই তো তোরে
দেখতে আসি—

কেতুচরণের তাই হয়েছে। নৌকোয় শোয় সে। অস্থায়ী এক কুঁজি বেঁধে নিয়েছে, সেখানে আর সকলে থাকে। মেলায় রকম-বেরকমের মানুষ আসছে—ওরা যেমন জুটিয়েছে, আবার ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে ঠিক ঐ প্রণালীতে আর কেউ এ ডিঙি সরিয়ে নিতে পারে তো! নৌকোয় শুয়ে কেতুচরণ পাহারায় থাকে।

রাত দুপুরে এক-একদিন যেন সে পাগল হয়ে ওঠে। ঘুম হয় না, পাটার উপর শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে। ঘাটে-বাঁধা নৌকোর খোপে চুপচাপ পড়ে থাকতে কিছুতে মন লয় না। পুরন্দরের উদ্দাম ঢেউ কূলের উপর আছড়াচ্ছে! বিনিদ্র আচ্ছন্ন চেতনায় সে যেন দুরন্ত ঘোড়ার পদ-দাপ শোনে। তরঙ্গের পিঠে তুড়ুক-সওয়ার হয়ে ছুটে যেতে চায় মর্জাল-স্টেশনে—নিশিরাত্রে সর্বনাশী অতুল রূপে বনভূমি যেখানে আলো-আলোময় করে রেখেছে। মৃত্যু সুন্দরী বউ হয়ে ডাকছে—এসো গো, চলে এসো। এ ডাক উপেক্ষা করে সদাসতর্ক জীবন বাঁচিয়ে রাখবার কোন মানে হয় না।

নদী ও খালের মোহনায় দুধের মতো সাদা চর। এক কণিকা মাটি মুখে দিয়ে দেখ—নোনতা, বিস্বাদ। নুন ফুটে আছে ধরিত্রীর গায়ে। কোটালের সময় চর ডুবে যায়, জলতরঙ্গ বাঁধের গায়ে ধাক্কা মারে। পর পর দুটো এই রকম বাঁধ—একটা যদিই-বা দৈবাৎ জলের তোড়ে ভেঙে যায়, অন্যটা রইল। বাঁধ মেরামতের জন্য ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে দিনরাত্রি এস্টেটের মাইনে-করা লোক ঘুরছে। বিশেষ করে বৃষ্টিবাদলার সময়।

বাঁধের ঠিক ওপারে মেলার জায়গা। দোকানঘরগুলো মেলা অন্তে হাটের চালা হিসাবে থাকবে। পাকাপাকি দোকান খুলে কেউ যদি থাকতে চায়, মধুসূদন সর্বতোভাবে তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় পয়সা খরচ করে মালপত্র সাজিয়ে বসতে সহসা কেউ রাজি হচ্ছে না। কোন্ লাভে থাকবে? তবে মাছের সায়েরটা জমবে সুনিশ্চিত। এত মাছ পড়ে এ দিকে—মাছ কেনাবেচার একটা পাকা বন্দোবস্ত হওয়া অতিমাত্রায় জরুরি। সায়ের বসলে সেই সূত্রেও অনেক লোকের ওঠা-বসা হবে। মানুষ হল লক্ষ্মী—মানুষের যাতায়াতে সুবিধা হবে হাট জমানোর।

মেলার বাইরে একটা উঁচু জায়গা খুশাল সায়েরের জন্য পছন্দ করেছে। গোলপাতার দোচালা বেঁধে আপাতত কাজ চালাবে। দু-খানা চাই অন্তত। সায়েরের বেচাকেনা ফাঁকা চরের উপরেই চলবে, তবে বৃষ্টিবাদলার সময় অথবা শীতের রাত্রে মাথার উপর একটা আচ্ছাদনের দরকার। একটা ঘর থাকবে এইজন্য। আর একটায় খুশালের দলের বাসা। রান্নাবান্না ও তহ্‌বিল ইত্যাদি রাখার জন্য আলাদা একটুকু বাসার প্রয়োজন।

সমস্তটা দিন নৌকোয় মেলার মানুষজন বওয়াবয়ি চলে, রাত্রিবেলা সায়ের-ঘরের সরঞ্জাম তৈরি হয়। বাঁশ দুষ্প্রাপ্য এদিকে—কয়েকটা তবু অনেক কষ্টে জোগাড় হয়েছে। বাঁশ ফেড়ে ফেড়ে চালের বাখারি হচ্ছে। চরের উপর তিন-চারজনে পাশাপাশি বসে বাখারি চাঁচে ও গল্পগুজব করে। গরানের ছিটের রুয়ো—ছাল তুলে স্তূপাকার করে ফেলেছে। এই ছালও ফেলার বস্তু

নয়—জলে ভিজিয়ে রাখলে ক্রমশ রক্তাভ হবে জল, তাই দিয়ে খেপলাজালের কষ ধরাবে। গোলপাতা বাছাই করে পগুর-ছায়ায় সাজিয়ে রাখছে—ছায়ায় আস্তে আস্তে শুকোবে, রোদে থাকলে পাতা খারাপ হয়ে যায়। কেতুচরণ লেগে আছে এই সব কাজকর্মে—মন উতলা হলেও বেরুবে কোন্ সময়? আবার দ্বিধাও আসে। যাক গে, কী হবে আর বাউণ্ডুলে ঘুরে বেড়িয়ে! টুনিকে নিয়ে ঘরসংসার করতে চেয়েছিল—সংসার না হলেও ঘর হতে যাচ্ছে তো বটে! ধরণীর পিঠের উপর কায়েমি বসবাসের একটুখানি ঘর। অনেক তো হয়েছে—চালের নিচে মাথা গুঁজে থাকা যাক এবার সুস্থির হয়ে।

ভারি নিরিবিলি জায়গা। এমনটা থাকবে না অবশ্য। গাঙে খালে মাছের ভরা বেয়ে মাছ এনে এনে ঢালবে শুধুই নয়—অকারণে আড্ডা দিতেও অনেকে আসবে। সায়েরটা জমিয়ে নিতে পারলে যে হয়!

ঋষিবর হেসে চোখ বড়-বড় করে বলে, আসবে কি বলো—আসছে এখনও। রাতদুপুরে চাদরে মুখ ঢেকে আসে, তাই জানতে পারো না। একজন দু-জন করে চুপিসারে পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে। সাঁজ না লাগতে মাগিগুলো ঘুরঘুর করে বেড়ায়, সে কি এমনি-এমনি?

হি-হি করে হাসতে হাসতে কাটারি দিয়ে সজোরে সে চেরা-বাঁশের গেরো কাটে।

মেলায় কয়েকটি দেহজীবিনীর আমদানি হয়েছে, ছোটখাটো একটা পাড়া বসেছে তাদের। মেলা জমাতে যাত্রা-জারিগানের মতো এরাও অত্যাবশ্যক। খবর রাখে, কখন কোন জায়গায় জাঁকালো রকমের মেলা বসেছে—সঙ্গে সঙ্গে এরাও গিয়ে গোল-পাতার ছাউনি, গোলের বেড়া, বাঁশের ঝাঁপ দিয়ে রাতারাতি ঘর তুলে ফেলে। মেলা ভাঙলে তল্পিতল্পা নৌকো বোঝাই করে চলে যায় আবার যে অঞ্চলে নূতন মেলা বসাচ্ছে—নব নব খরিদ্দারের সন্ধানে।

সায়েরের জায়গা এই পাড়ার প্রান্তে নদী ও খালের মোহানায় উপর। ইতিমধ্যে খুশাল একদিন রায়-এস্টেটে টাকা জমা দিয়ে যথারীতি মোহর-মারা রসিদ নিয়ে এসেছে। খোঁটা পুঁতে সায়ের-ঘরের নিশানা হল। বেচাকেনা শুরু হতে আর দেরি নেই।

এক রাত্রে কেতুচরণ অমনি শুয়ে আছে, গোল-পাঁচু দ্রুত এসে গলুইতে লাফিয়ে উঠল। দুলে উঠল ডিঙি। ঘুমের আবিল কেটে গিয়ে কেতু মুহূর্তে খাড়া হয়ে বসেছে।

কে রে?

গোল-পাঁচু বলে, চুপ, চুপ! শুনতে পাচ্ছ না? থির হয়ে কান পাতো।···কেমন, এইবার?

অ র্ র্—অ-অ-অ—

বিড়ালের ডাকই বটে! এমন জোর আওয়াজ, যে এতদূর থেকেও কানে আসে। বিড়াল বাঘের মাসী—আর এটা হল সুন্দরবন জায়গা তো—অতএব রয়্যাল-বেঙ্গলের মাসী, ডাক শুনে নিঃসংশয় হওয়া যাচ্ছে। ওরা যে কুঁজি বেঁধেছে তার পাশেই। কানের কাছে এই কাণ্ড হতে থাকলে মরা মানুষ পর্যন্ত লাফিয়ে ওঠে—পাঁচুদের অপরাধ কি, ঘুমাবে তারা কেমন করে?

কেতুচরণ ফিস-ফিস করে বলে, একটা বস্তা নিয়ে আয় তো শিগগির।

বস্তা কোথায় পাবো? মাছের ঝুড়ি আছে।

নিয়ে আয় তাই। ঝুড়ি চাপা দিয়ে তো রাখা যাক। দিনমানে যখন চড়ন্দার নিয়ে বেরুব, বস্তা সেই সময় চেয়েচিন্তে নিতে হবে কারো কাছ থেকে।

গোল-পাঁচু কুঁজির দিকে যাচ্ছিল ঝুড়ি-সংগ্রহের জন্য। কেতুচরণ ডেকে বলল, মাছ আছে ঘরে? কিম্বা দুধ হলেও হবে।

পাঁচু ঘাড় নাড়েঃ পান্তা-ভাত আছে সকালের জন্য। আর নুন-লঙ্কা।

তাই সই। নিয়ে আয়।

নারিকেল-মালায় করে পান্তা-ভাত নিয়ে এল পাঁচু। আর একটা চাঁপাকলা—খোসা ছাড়িয়ে ভাতের উপর দিয়েছে।

কেতুচরণ ঠাহর করে দেখে হেসে উঠল।

কলা কি হবে রে?

পাঁচু বলে, ছিল—তাই নিয়ে এলাম। শুধু পান্তার চেয়ে কলা দেখতে পেলে লোভ বেশি হবে।

বেড়াল ধরতে যাচ্ছি। বানর নয় যে কলা দেখলে হাত বাড়াবে।

চাঁদ ডুবে গেছে। তার উপরে মেঘ জমেছে কিছুক্ষণ ধরে আকাশে। অন্ধকার—ভাবুকজনে স্বচ্ছন্দে সূচীভেদ্য বিশেষণে অভিহিত করতে পারেন। মনে অনুভূতি জাগে, এ অন্ধকার বুঝি রীতিমতো একটি ঘন পদার্থ—হাতে পায় ঠেলে ঠেলে এগুতে হয়। সুঁচ চালিয়ে অন্ধকার ছেঁদা করা চলে—এ কল্পনা নিতান্ত অলীক বলে মনে হয় না।

এদের কুঁড়ি ও আতরবালার বাসার মধ্যবর্তী জায়গায় কয়েকটা দীর্ঘ কেওড়াগাছ ও গিলেলতার ঝোপ। ঘর-কানাচের জঙ্গল সাফ করবার প্রয়োজন নেই—তাই পড়ে রয়েছে অমনি। হুলোবেড়ালটা ঐখানে এসে জুটেছে। আওয়াজ অতি প্রখর—কিন্তু গাছের ছায়ান্ধকারে বিড়ালটা নজরে আসছে না।

মালাসুদ্ধ ভাত মাটিতে রাখল, রেখে ওষ্ঠ ও জিভে শব্দ করছে: চুঃ-চুঃ-চুঃ—। বিড়ালের যাতে মনোযোগ পড়ে এদিকে, ভাত খেতে চলে আসে! গোল-পাঁচু শব্দ করছে, আর কেতুচরণ একটু পিছনে ঝুড়ি তুলে তৈরি হয়ে আছে। খেতে শুরু করলেই ঝুড়ি ঢাকা দেবে। আপাতত এখন ঝুড়ির উপর ভারি একটা কিছু চাপিয়ে রেখে দেবে।

কিন্তু ক্ষণপরেই বোঝা গেল, আহার-দ্রব্য দিয়ে আকর্ষণ করা অসম্ভব—মনোযোগ তার অপর দিকে।

পিছনদিককার ঝাঁপ খুলস আতরবালা। হেরিকেন উঁচু করে ধরে আহ্বান করে: আসেন বাবু—

বিড়ালের ডাক বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ছাচতলায় জুতো

খুলে রেখে ঘরে উঠল বিড়াল নয়—একটি লোক, ভদ্রলোক—গলায় মাথায় চাদর জড়িয়ে যথাসম্ভব পরিচয় গোপন রেখেছে।

কৌতূহল উদগ্র হল কেতুচরণের। দেখতে হবে তো লোকটাকে। কালিঝুলি-মাখা হেরিকেনের ক্ষীণ আলোয় এত দূর থেকে ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। ভাল করে দেখবার জন্য কাছাকাছি চলে গেল। দেখে, আতরকে জড়িয়ে ধরেছে লোকটা।

সন্ত্রস্ত হয়ে আতরবালা বলে, আঃ, ঝাঁপ খোলা—করেন কি বাবু?

ফিক করে হেসে তারপর সোহাগ করে, আরে আরে ছাড়্, করিস কি মুখপোড়া?

আলিঙ্গন-মুক্ত হয়ে আতরবালা তাড়াতাড়ি ঝাঁপ বন্ধ করল। কেতু তখন গিয়ে দাঁড়াল একেবারে বেড়ার ধারে। বেড়া ফাঁক করে দেখবার চেষ্টা করছে। চেনা মানুষ যেন। একবারও মুখ ফেরায় না এদিকে—তা হলে নিঃসন্দেহ হওয়া যেত।

হেরিকেন নিভিয়ে দিল এই সময়ে।

॥ চব্বিশ ॥

তারপরে কি হল কেতুচরণের—ঘাটে ফিরে এসে ডিঙি খুলে দিল তখনই। কাউকে কিছু বলল না, গোল-পাঁচুকে শুধু সঙ্গে নিয়ে চলল।

গোল-পাঁচু দাঁড়ে বসেছে—নৌকো ছুটেছে বাদার দিকে। দূরের লোক আনবার প্রয়োজন হলে এরকম রাত্রেও তারা বেরোয় কখনো-সখনো।

পাঁচু বলে, জঙ্গলমুখো চললে যে? মানুষ কোথা ওদিকে?

কেতুচরণ জবাব দেয়: আছে—

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে আবার বলে, কষে টান্ দিকি ভাই। মানুষ আছে বলেই সন্দ করি। চেনা-মানুষ। কপালে থাকে তো দেখতে পাবি।

পাঁচু বলে, সে কথা হচ্ছে না। মেলার মানুষ ধরতে হবে না? আমি বলি কি—পাতালবাড়ির দিকে পাড়ি ধরা যাক। কদিন যাওয়া হয় নি, বিস্তর সোয়ারি পাওয়া যাবে।

কেতু সংক্ষেপে বলে, আজ সোয়ারি ধরব না।

পাঁচু প্রতিবাদ করে, সাত সকালে বাদাবনে গিয়ে উঠবে—সাহস দিনকে-দিন বড্ড বেড়েছে। এত বাড় ভাল নয় কিন্তু। পিটেল বাবুরা তক্কে-তক্কে আছে সেই নৌকো-বন্দুক সরানোর পর থেকে। বাগে পেলে আস্ত রাখবে না।

কেতুচরণ কথা কানে নিল না। তর্কাতর্কিও করল না। তর-তর করে নৌকো যেমন যাচ্ছিল, তেমনি চলতে লাগল। এয়ার-বন্ধুরা তার এই রকম স্থিরগম্ভীর ভাব আগেও দেখেছে। সবাই সমীহ করে এই অবস্থা দেখলে। অকস্মাৎ সে যেন বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী হয়ে পড়ে সকলের থেকে।

খরস্রোতে দেখতে দেখতে তারা মর্জাল-স্টেশনে পৌঁছল। অন্ধকার আছে তখনো, আকাশে পোহাতি-তারা জ্বলজ্বল করছে। মর্জাল পার হয়ে আরও এগিয়ে যারা বাদায় ঢুকবে, তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু কেবলমাত্র মর্জাল অবধি যাদের গতি, তারা বিষখালির মুখে নৌকো বেঁধে বাঁধের ধারে ধারে পায়ে হেঁটে যায়। হাঁটা-পথে আধক্রোশটাক পথ—অথচ জলপথে পুরো তিনখানা বাঁক ঘুরতে হয় এইটুকুর জন্য। কেতুচরণ কিন্তু বিষখালিতে নৌকো রাখে নি—স্টেশনের ঘাটে পাশাপাশি খান তিনেক তক্তা জুড়ে যে-প্লাটফরমের মতো হয়েছে, তারই পাশে এনে লাগাল।

ঘুমুচ্ছে স্টেশনের লোকজন। ঝুলানো লণ্ঠনটা তেল শেষ হয়ে নিভে রয়েছে। কনকনে হাওয়া বইছে—হাড়ের ভিতর অবধি কাঁপিয়ে তোলে। মনের মধ্যে ভয়-ভয় করছে এতক্ষণে—কেতুচরণ তাই একটু প্রক্রিয়া করে নিল। ডিঙি থেকে নেমেই মাটিচালক দিল সর্বাগ্রে। মন্ত্রটা হুকড়ির কাছে শেখা। মাটি গরম হয়ে ওঠে মন্ত্রের তেজে। গুণীন নিজে কিম্বা অপর মানুষ বুঝতে পারবে না—কিন্তু মানুষ ছাড়া আর সকলের পক্ষে এই মাটিতে পা রাখা অসহ্য

হয়। ছুটে পালায় তারা উষ্ণ অঞ্চল ছেড়ে। তবে শয়তান জন্তুও আছে—মাটি-চালার আঁচ পেলে তারা জঙ্গলের কাটা-গাছপালার উপর উঠে পড়ে, পালায় না। মাটি ঠাণ্ডা হলে তখন আবার চরে ফিরে বেড়ায়।

তা জন্তু-জানোয়ারেই যখন এত চালাকি জানে, ওঁদের আর কতটুকু মুশকিলে ফেলা যাবে মাটিচালক দিয়ে? মাটির জীব নন ওঁরা—শখ করে একটু-আধটু কখনো-বা মাটিতে পা ঠেকান। সেই যে কেতুচরণ সেদিন এক জায়গায় দেখেছিল—সত্যি সত্যি যদি সর্বনাশী হন, কঠিন মাটির উপরে কখনো তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন না। দেখাচ্ছিল ঐরকম। বাতাসে ভেসেছিলেন ভূমির অত্যন্ত কাছাকাছি। মন বোঝে না—রাত্রির এই নিঃশব্দ শেষ-যামে সেদিনের দেখা সেই পরমাশ্চর্য মূর্তির কথা ভেবে প্রাণ বড় চঞ্চল হয়েছে—মন্ত্র পড়ে কেতুচরণ রীত রক্ষা করল। একটুখানি ভরসা পাবার চেষ্টা—আর কিছু নয়।

সকাল হয়ে একে একে সবাই জাগল। হরিপদ বাবলার ডাল ভেঙে দাঁতন করতে করতে আসছে। নৌকো দেখে প্লাটফরমে নেমে এলো।

পাশ করতে হবে? তা এইটুকু এক ডিঙি নিয়ে বেরিয়েছ কোন কর্মে? ক'টা মাল ধরবে এতে?

কেতু চমকে উঠল হাতকাটা-হরির বীভৎস চেহারা দেখে। কোথায় যেন দেখেছে একে! কোথায়···কোথায়? গলা শুনে আরও সন্দেহ হয়। কিন্তু গোল-পাঁচুর তাহলে তো বেশি করে চিনবার কথা। সে যখন চিনছে না, হরিপদও না—তখন কেতুচরণেরই ভুল সুনিশ্চিত।

গোল-পাঁচু সহজভাবে কথা বলছে হরিপদর সঙ্গে। চালাকি করে বলল, না রে দাদা, বাদায় যাচ্ছিনে। কাছেপিঠে থাকি আমরা—মৌভোগের মেলায় সোয়ারি বওয়াবয়ি করি। ফাঁক পেলাম এট্টু—শখ করে তোমাদের আপিস দেখতে বেরিয়েছি।

হরিপদ বলে, যাত্রা হবে নাকি শুনলাম মেলায়?

হুঁ, তবুও দিন—

জবাব দিচ্ছে আর কেতুচরণের নজর ঘুরছে এদিক-সেদিক। স্টেশনের পিছনটায় কসাড় জঙ্গল। জানোয়ারের উৎপাতের ভয়ে পত্তর ও গরানের বাত্তির দু-সারি বেড়া ওদিকে, তার পিছনে মাটির উঁচু বাঁধ। এত সাবধানতা সত্ত্বেও এই বছর তিনেক আগে একবার বাঘে হানা দেয়। সেই থেকে আর-এক নূতন ব্যবস্থা হয়েছে। মাটি থেকে হাত আষ্টেক উঁচুতে প্রশস্ত মাচা—সেই মাচার উপরেই সরকারি আফিস, ঘেরিবাবু ও অপর লোকজনের শোবার ঘর, রান্নাঘর, উঠান। কারও মাটিতে পা ঠেকাবার আবশ্যক হয় না। মোহানার দিকটায়—পুরাপুরি নয়, খানিকটা অংশমাত্র খোলা। প্ল্যাটফরমে এবং নদীর খোলে নামবার জন্য মই লাগানো আছে ঐ খোলা জায়গা থেকে। কোথাও যেতে হলে নৌকো সম্বল। পদব্রজে খানিকটা বাঁধ ধরে খানিকটা বা নদীর কূল বেয়ে যাওয়া যে যায় না, তা নয়। কিন্তু বিপজ্জনক এই ভাবে যাওয়া। যাতায়াতের বড় একটা দরকারও হয় না—জায়গা কোথায় যাবার ? বড়দলের হাট অন্ততপক্ষে বিশ ক্রোশ। আর ক্রোশ চার-পাঁচের মধ্যে মোড়োগে ঐ নতুন হাটের পত্তন হচ্ছে। হাট কায়েমি হলে তখন অবশ্য বেড়াতে যাবার একটা জায়গা হবে কাছাকাছি।

কেতুচরণ কথা বলছে, তার দৃষ্টি ঐ উপরের মাচার দিকে। উঁচু গলায় কথা হচ্ছিল। যাত্রার কথা উঠতেই লক্ষ্য করল, বেড়া শেষ হয়ে যে জায়গা থেকে মই নেমেছে—সেখানটায় সহসা হাতের একটুখানি বেরিয়ে এল। বেড়া এঁটে ধরে কেউ তাদের দেখছে আড়াল থেকে। সুগৌর নিটোল হাতটুকু—কেতু ধরেছে ঠিকই তবে! আঙুলের আংটি প্রভাত-আলোয় ঝিকমিক করছে। আহা, অমনি আঙুলেই তো আংটি পরাতে হয়!

কেতুচরণ তখন আরও ফলাও করে বলে, ভট্ট কোম্পানির নাম শুনেছ—তারাই। ঢোল-ডুগি নয়—ইংরাজি বাজনা বাজিয়ে তারা পালা গায়। শহর-বাজারের লোক বলে কত সাধ্য-সাধনায় দেখতে পায় না—সেই যাত্রা রায়বাবু বাদাবনে নিয়ে আসছেন।

তরশুদিন হবে—পরশুর পরদিন। যেও গার্ডমশায়, চোখ-কান সার্থক হবে।

হরিপদ নিশ্বাস ফেলে বলে, আমাদের যাওয়া হবে না, আমরা যাব কেমন করে? মাসের গোড়া—বাবু খুলনেয় চলে যাবেন। আমার উপরে ভার থাকবে, আপিস কার উপর রেখে যাব?

তারপরে সরকারি লোকের যথাযোগ্য ভারিক্কি চালে বলল, খুলনেয় গিয়ে বায়োস্কোপ দেখে আসি। যাত্রাগান তার কাছে লাগে! আমি যাত্রা শুনি নে।

বললাম তো, যেমন-তেমন যাত্রা নয়—

সহসা কেতুচরণের তেষ্টা পেয়ে গেল বিষম। বলে, একঢোক জল খেয়ে যাব। হেঁকে বলে দাও তো গার্ডমশায়, খাবার জল দিতে।

যাত্রা শোনার সুযোগ হবে না, সেজন্য এমনই মনটা খারাপ লাগছিল—তার উপর কেতুর এই অভিনব ও আশ্চর্য প্রস্তাবে হরিপদর মেজাজ বিগড়ে গেল। সে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে: না। জলসত্র বসানো হয়েছে নাকি, উঁ? চার দিন জলের বোটের দেখা নেই—নিজেদেরই শুকিয়ে মরতে না হয়। কোন আক্কেলে জল না নিয়ে বেরিয়েছ তোমরা শুনি?

এক লহমা বিদ্যুৎ চমকে গেল উঠানে—মইয়ের মাথায় অবারিত জায়গাটুকুর উপর। আন্দাজে তবে ঠিকই ধরেছে—এলোকেশী। নিশিরাত্রের বউটি হুকড়ির গল্পের সর্বনাশী নয়—মতিরাম সাধুর মেয়ে। সর্বনাশী এলোকেশীও। বিপজ্জনক অরণ্য-ভূমে রাতদুপুরে একাকী বেরিয়ে অমন করে দাঁড়াবার মেয়ে এলোকেশীই বটে! এলোকেশী কেতুদের দৃষ্টির সামনে দিয়ে উঠান পার হয়ে বোধকরি ঘরের ভিতর ঢুকল।

অতি কাতর কণ্ঠে কেতুচরণ বলে, দেখি ঠাকরুনকে বলে-কয়ে। ছাতি ফেটে যায়—উনি যদি দয়া করেন। মুখ থুবড়ে গাঙের মধ্যে পড়ে যাব, এমনিধারা মনে নিচ্ছে।

পাঁচু আশ্চর্য হয়ে গেছে। কেতুচরণ যেমনই হোক, সে অতি-

সতর্ক এসব বিষয়ে। খাবার জল এখনো আধ-কলসির উপর নৌকার খোলে। বাদা-রাজ্যে মিঠা জল নিয়ে দুর্ভাবনা—তাই নৌকায় চড়ন্দার নিয়ে ওরা যখন মানবেলায় যায়, ভাল জলের খবর পেলে গোল-পাঁচু কলসি ভরতি করে আনবেই। অথচ কেতুচরণ, দেখ, শখ করে চৌকিদারের কথা শুনছে। কী মজা পাচ্ছে, কেতুই বলতে পারে। কোন রকম মতলব আছে কিনা সঠিক না জেনে সে-ও জল রয়েছে সে কথা চেঁচিয়ে বলতে পারে না।

মই বেয়ে কেতুচরণ উপর-উঠানে গিয়ে উঠল। আছে ভাল সত্যিই এরা—মাটি পায়ে লাগে না।

খাবার জল দেবে ঠাকরুন ?

একপাঁজা বাসন নিয়ে এলোকেশী বেরিয়ে এল। চোখাচোখি হল। কত দিন—ওঃ, কত বছর পরে দেখা! আজকে দৈবাৎ এলোকেশীর ঘরকন্নার মাঝখানে এসে পড়েছে একেবারে।

কেতুচরণ নিচু গলায় বলল, এখানে এত কাছে রয়েছ, যে তো জানতাম না।

এলোকেশীর দ্বিধা হয় এক মুহূর্ত। তারপর সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে উঠানের প্রান্তে কেতুচরণের সামনেই বাসন মাজতে বসে গেল।

ভাল আছ ? খবরবাদ ভাল ? আমায় চিনতে পারছ না বুঝি ?

এলোকেশী মুখ তুলে তার দিকে তাকাল। ন্যাকড়ায় বাঁধা কী একটা জিনিস নিয়ে এসেছে। এলোকেশী বলে, ওটা কি ?

বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তা বাদাবনের পীর-পয়গম্বর তো এঁরা—মনে ভাবলাম, কিছু হাতে করে আসা উচিত।

খড় ও ছাইয়ের মাজনি দিয়ে সজোরে ঘষে ঘষে এলোকেশী কড়াইয়ের কালি তুলছে, আপন মনে কাজ করে যাচ্ছে—কেতুচরণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

তারপর প্রশ্ন করে, হালদার মশায়ের সঙ্গে বনছে কেমন ? যত্ন-আত্তি করে ?

হু—

কেতুচরণ হি-হি করে হাসে।

এলোকেশী রাগ করে বলে, হাসছ যে ?

যন্ত্র-আত্তির একটা নমুনা এই চোখে দেখছি কি না !

কেতুর কণ্ঠস্বর বেদনার্ত হয়ে উঠল। বলে, শহরে-বাজারে সোনাদানায় মুড়ে খাট-পালঙ্কে বসিয়ে রাখলে যাকে মানত, বাসন মাজিয়ে কী হাল করেছে তার ! তোমার দশা একই রকম রয়ে গেল এলোকেশী। যেমন বাপের বাড়ি, তেমনি এখানে।

এলোকেশী বলে, নিজের সংসারের কাজ আর কে করে দেবে ? বাদাবনে লোক আসতে চায় না। খোরাক-পোশাক আর আট টাকা কবুল করে খুলনা থেকে এক ঝি আনা হয়েছে, বাতের ব্যথা বলে সে ঠাকরুন বিছানা নিয়েছেন। এখন তারই সেবা করতে হচ্ছে। লোক মেলে না—কী করা যাবে বলো ?

তা তুমিই বা বাদাবনে কেন ? খুলনায় থাকতে পারতে। অঢেল তো উপরি-আয়—খুলনায় বাসা করে রেখে দিতে পারল না ?

তা হলেই হয়েছে। চোখে হারায় যে ! কাজকর্মের মধ্যে ঘড়ি-ঘড়ি এসে দেখে গিয়ে তবে সোয়াস্তি পায়।

ফিক করে হেসে ফেলল এলোকেশী। বলে, হল কদ্দিন ? তা কম দিন তো নয় ! যত দিন যাচ্ছে, ততই আরো ক্ষেপে যাচ্ছে আমায় নিয়ে।

কথাবার্তা শুনে কেতুচরণের মনে সন্দেহ জাগে। ভুল দেখল তবে নাকি সে ? লোকটি দুর্লভ নয় ? চশমা চোখে থাকলেই দুর্লভ হালদার হবে—এই বা কেমন কথা। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল এলোকেশীর দিকে। পরম আন্তরিকতার সঙ্গেই সে দুর্লভের ভালবাসার কথা বলছে। বলতে বলতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কেতুচরণ।

আচ্ছা, চলি। ম্লান মুখে কেতুচরণ বলতে লাগল, ভারি খুশি হলাম সুখে স্বচ্ছন্দে আছ দেখে। চললাম।

এলোকেশী বলে, জল না খেয়ে যাবে কেন ? এই হয়ে গেল

আমার—রোসো, হাত ধুয়ে জল দিচ্ছি। দাঁড়িয়ে কেন? বোসো ঐখানটায়।

কিন্তু বসল না কেতু, তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

বাসন ধুতে ধুতে এলোকেশী বলে, তোমার কথা তো কিছু বললে না কেতুচরণ। কেমন আছ, কি করছ?

আমি? একশ'খানা করে কেতুচরণ নিজের কথা বলে। আমি মন্দ থাকতে যাব কেন? তোফা আছি। গয়নার নৌকো চালাচ্ছি। নৌকো বোঝাই করে মেয়ে-মদ্দ একপাল চড়ন্দার রোজ মৌভোগের মেলায় নিয়ে যাই। চার আনা ভাড়া ফি-জনের। মুনাফাটা কি রকম, তাহলে আন্দাজ করো।

এলোকেশী আবদারের ভঙ্গিতে বলে, আমায় একদিন নিয়ে চলো না মেলায়। আমি দেখি নি।

কেতুচরণ আরও প্রলুব্ধ করে, বরিশালের ভারি এক যাত্রার দল আসছে! খুব ভাল গায় তারা।

নিয়ে যাবে?

কেতু সবেগে ঘাড় নাড়ল।

না, তোমার মতো ফাঁকিবাজ চড়ন্দার আর নৌকোয় তুলব না। কত মেহনত করে জল-কাদা মেখে চিতেবাঘের মতো হয়ে সেই একদিন হালদারের কাছে পৌঁছে দিলাম: দিব্যি ঘর-সংসার জমিয়ে বসে আছে—তা বখশিস-টখশিস কিছু দিয়েছ?

এলোকেশী প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নেয়। পাল্টা সে জিজ্ঞাসা করে, তুমি ঘর-সংসার করেছ?

কেতুচরণ অবাধে মিথ্যা কথা বলে যায়।

একটা নয়—দু-দুটো। শেষের পরিবারটা বড় সুন্দর হয়েছে। টুনি নাম—ছোটখাটো দেখতে, যেন টুনটুনি পাখিটি!

বাদার মেয়ে?

তা ছাড়া কি! তোমাদের মতো শহর থেকে ক'জন আর আসে এদিকে। বাদা থেকেই বরঞ্চ ছিটকে চলে যায় শহরের পানে।

কৌতূহলী এলোকেশী জিজ্ঞাসা করে, কী রকম সুন্দর তোমার বউ? সবাই তো এখানে মা-কালীর চেলা-চামুণ্ডা। সুন্দর আমার মতো?

কেতুচরণ তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলে, তুমি আর তেমন সুন্দর কোথায়? সেকালের সেই দেখনহাসি আছে কি আর তুমি? বুড়িয়ে গেছ। নোনা রাজ্যে রংও কালচে মেরে গেছে।

কিন্তু এমন কথাগুলো এলোকেশীর কানে গেল কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। বাসন নিয়ে সে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। ক্ষণ পরে বেরিয়ে এল—রেকাবিতে দু'খানা তাল-পাটালি আর এক গেলাস জল।

কেতু বলে, আবার মিষ্টি আনতে গেলে কি জন্যে?

শুধু জল দেয় নাকি গেরস্তবাড়ি?

কেতুচরণের মনের মধ্যে পুরানো ব্যথা কাঁটার মতো খচখচ করে ওঠে। এলোকেশী আর দুর্লভ গৃহস্থালী পেতেছে। বেড়ার ওধারে ঘন জঙ্গলে বাঘ বিচরণ করে, কুমির ভেসে বেড়ায় সামনের দিগ্‌ব্যাপ্ত নদীজলে—মাঝখানে এদের লক্ষ্মীমন্ত সুচারু ঘর-সংসার। পিঠালি-গোলায় তুলোটেপারির ছাপ দিয়েছে চৌকাঠে, অজস্র ছোট ফুলের মতো দেখাচ্ছে। বড় পদ্ম আর কল্কাও এঁকেছে কপাটের উপর। ভারি শৌখিন মেয়ে এলোকেশী—আলপনায় তার চমৎকার হাত।

মিষ্টি খেয়ে গেলাসের জল ঢকঢক করে মুখে ঢেলে কেতুচরণ বলে, চলি এবার। কিন্তু বখশিস শুধু এই পাটালিতে শোধ না যায়।

আবার এসো। একা-একা থাকি, পুরানো চেনা একটা মানুষ—

কেতুচরণ দরজার কাছে ন্যাকড়ার পোঁটলাটা নিয়ে রাখল। এলোকেশী তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে সেটা খুলছে।

কি ভেট নিয়ে এসেছ, দেখি—

কেতুচরণ হেসে বলে, সন্দেশ। খুলনার গোলোক ময়রার দোকানের।

হ্যাঁ—সন্দেশ না আরো-কিছু! এ কি, জুতো এমনি করে জড়িয়ে নিয়ে এসেছ—কার জুতো?

কেতুচরণ বলে, দেখ তো—চিনতে পার কিনা ?

ভারি চাপা মেয়ে এলোকেশী। কে কি মতলবে ঘুরছে, ভাল করে না বুঝে ধরা দেবে না। মহকুমা-শহরে সেই বেণী দুলিয়ে ইস্কুলে যাবার ফল হয়তো। মুখের উপর এতটুকু ভাববিকৃতি লক্ষ্য করা যায় না।

কোত্থেকে কুড়িয়ে আনলে পুরানো জুতো ?

কেতু বলে, চিনতে পারো কার ?

না—

তবে আর শুনে কি হবে ? সে আমলে দুর্লভ ম্যানেজার কিন্তু লপেটা জুতো পরত এইরকম।

এখন সংসারি মানুষ—এত বড় আপিসের খেরিবাবু। এখন পরেন বুটজুতো আর সাহেবি প্যান্টালুন। তুমি শখ করে কিনেছ বুঝি ? না—এ তোমার পায়ে হবে না তো !

কেতুচরণ বলে, একজনের ছাঁচতলায় পেয়েছি। রেখে দাও এলোকেশী, হালদার মশায়ের পায়ে যদি খেটে যায়। আমি রেখে দিতাম লোহার তৈরি হলে। এ চামড়ার জুতো—আমাদের পায়ে ঢুকতে গেলেই ফেটে যাবে।

হি-হি করে কেতুচরণ হাসতে লাগল। বলে, আমাদের বাসার ঠিক পাশে পাড়া বসেছে। হরেক মজা চোখে দেখি, হরেক সোহাগ কানে আসে। চশমা-পরা একজন এসেছিল কাল। প্রায়ই নাকি আসে, সকলে বলল। মাগীটার নাম আতর হবে বোধহয়—তা শুধু আতরে মানুষটার সুখ হয় না—কখনো ডাকছে আতরবালা, কখনো আতরবাসিনী। ঘুমোবার জো নেই ওদের ভালবাসার গুঁতোয়।

খড়মের খটখটি শোনা গেল আফিস-ঘরের দিকে। কেতুচরণ জিজ্ঞাসা করে, কে ?

উনি—আবার কে ?

কেতু বলে, বাসায় আছেন হালদার মশায় ?

যাবেন কোথা ? স্টেশনের সমস্ত ঝক্কি ওঁর মাথায়—এক-পা নড়বার জো আছে !

রাত্তিরেও ছিলেন ?

ছিলেন বই কি !

সহসা কঠোর কণ্ঠে এলোকেশী বলে ওঠে, চলে যাও তুমি কেতু—

কেতুচরণও দুর্লভের মুখোমুখি পড়তে চায় না। বিশেষ করে এলোকেশী যখন থাকে, সেই সময়ে। এলোকেশীর ফাঁকিতে পড়ে নৌকো বেয়ে মরেছিল—সেই একদিনের কথা মনে পড়ছে। লাঠি-খাওয়া কুকুরের মতো কেতুচরণ পালিয়েছিল সেদিন দুজনের সামনে থেকে। ভাবতে গেলে গা রি-রি করে ওঠে। দ্রুত সে নেমে গিয়ে ডিঙিতে উঠল।

গোল-পাঁচুকেও দেখা গেল অতি-গম্ভীর—সে একটি কথা বলল না। কথা বলতে মন নেই কেতুচরণেরও। নিঃশব্দে তারা নৌকো ছেড়ে দিল।

কেতুচরণেব আড়ালে এলোকেশীব মুখ ভ্রূকুটিমলিন হল।

হরিপদ !

খড়মের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল—সে মানুষ দুর্লভ হালদাব নয়, হরিপদ।

বাবু কাল কোথায় গেছেন—ঠিক করে বলো তো হরিপদ।

হরিপদ বলে, স্থপতি-স্টেশনে রেঞ্জার সাহেবের কাছে। খুব হরিণ মারছে ওদিকে—মাংস-টাংস খেয়ে রাত হয়ে গেল, তাই বোধ-হয় এসে পৌঁছতে পারেন নি।

হুঁ—

এক্ষুনি এসে যাবেন। না এসে উপায় আছে। কালকে রিপোর্ট ছাড়তে হবে, এখনো তার কিছু হয় নি।

॥ পঁচিশ ॥

দুর্লভ ফিরে এলে পরম শান্তভাবে জুতোজোড়া এনে এলোকেশী তার সামনে রাখল।

দেখ তো পায়ে হবে কিনা?

দুর্লভ স্তম্ভিত।

ফিক করে হেসে এলোকেশী বলে, কোথায় পেলাম জিজ্ঞাসা করলে না তো?

শুষ্ক গলায় দুর্লভ তার কথারই পুনরাবৃত্তি করে: কোথায় পেলে?

ফেলে গিয়েছিলে বাসায়। খালি-পায়ে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলে। তোমার মনে নেই।

বলে দ্রুত সে শোবার ঘরে গিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিল।

পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। আর তো সন্দেহমাত্র নেই। দুর্লভ খালি-পায়ে ফিরেছে। মৌভোগের মেলায় জুতোর দোকান নেই—তাহলে নতুন একজোড়া নিশ্চয় কিনে আনত।

অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে তারপর আয়না পেড়ে নিয়ে এল দেয়াল থেকে। দেখছে নিজেকে—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ পরীক্ষা করে দেখছে। ডাক্তারি ছাত্র ছুরি দিয়ে চামড়া চিরে চিরে অস্থি-সন্ধি দেখে—শাণিত দৃষ্টি দিয়ে তেমনি করে দেখছে। রোজ মুখ দেখে থাকে—আজকেই উপলব্ধি হল, সেই কিশোর বয়স থেকে আলাদা হয়ে গেছে কতখানি! কান্না পাচ্ছে না তার, ভয় করছে। ভয়ে চোখের জল শুকিয়ে গেছে। খোলা চুলের রাশি কাঁধের উপর দিয়ে সামনে এনে দু-হাতের আঙুলে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেখে। বুক টিপ-টিপ করে—সাদা চুল বেরিয়ে পড়বে না তো? সন্দেহ বশে ছিঁড়েও ফেলল দু-একগাছি। জানলায় রোদের দিকে নিয়ে দেখে। চিকচিক করেছিল বটে—কিন্তু না, শাদা নয়—কালোই।

চোখ…দুর্লভ একদিন বলেছিল, চোখে তোমার ঝিলিক দেয় এলোকেশী। এমনি কত আজব কথা বলত মানুষটা। চোখের সে আলো স্তিমিত এখন। দু-ঠোঁটে হাসি লেগে থাকত—স্থির-গম্ভীর সেই ঠোঁট দুখানি আঁটা থাকে এখন প্রতিনিয়ত। হাসো এলোকেশী দেখনহাসি, চেষ্টা করে হাসোই না! হাসো দিকি—

আয়নার তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করে এলোকেশী। হাসতে পারে সে—কেন পারবে না? কি হয়েছে তার? বয়ে গেছে—সাত-পাকের বউ তো নয়—পাল্টা শোধ নিতে সে-ও জানে।

ময়লা হয়ে গেছে গায়ের রং। সে চিক্কণতা আর নেই নোনা রাজ্যে এসেছে বলে। বয়স হয়েছে—সেজন্যও বটে। কপালে সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ে যাচ্ছে—ছবির মতো তার যে নিটোল মুখখানি, রাগ করে কে চিরে চিরে দিয়েছে সেই মুখ। কিশোরকালের কোরক-উন্মেষ—কত কৌতুক, কত কৌতূহল, মনে মনে কত অনুরাগ! একটা তুলনা মনে আসে এলোকেশীর। দিনান্তে কাল-কপাটি যেমন পাতা বন্ধ করে, তার সর্বদেহের রূপ তেমনি মুদিত হয়ে আসছে একসঙ্গে।

সাজতে বড় সাধ হল অকস্মাৎ। শুধু সাধ নয়—প্রয়োজন। পিতলের রেকাবে সকাল বেলাকার ফুল রয়েছে। বেড়ার কাছে নদীর কূলে অজানা গাছে লতায় নানা রঙের ফুল ফোটে। ফুল বড় ভালবাসে এলোকেশী। হরিপদকে বলা আছে, ঝি কালিদাসীও জানে—সুবিধা পেলেই তারা ফুল এনে দেয়। এখন এই পড়ন্ত বেলায় খিল-আঁটা ঘরে আয়না নিয়ে একটা-একটা করে সমস্ত ফুল সে খোঁপার চারিধারে গুঁজল। পাউডার মাখতে গেল—মুখের উপর জালের মতো রেখাগুলো ঢেকে দেবে গোলাপি পাউডারে। আগে যে লাবণ্য ছিল—দেখা যাক, তার কতকটা আনা যায় প্রসাধন-নৈপুণ্যে। কিন্তু খালি কৌটা—পাউডার ফুরিয়েছে, এক কণিকা অবশিষ্ট নেই। কোন-একবার খুলনা যাবার মুখে বলে দিলে দুর্লভ নিশ্চয় এনে দিত—এ বিষয়ে তার

রূপণতা নেই। কিন্তু খেয়াল ছিল না এলোকেশীরই। সাজসজ্জা সে বড় একটা করে না ইদানীং। জঙ্গলপুরীতে রয়েছে, শহরে তো নয়—সেজেগুজে দেখাবে সে কাকে ? এমনি ধরনের এক অবহেলার ভাব ছিল মনে মনে। দুর্দিন যে এমনি ঘনিয়ে এসেছে, তা কি সে স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে ?

পোর্টম্যান্টো খুলে রঙিন বোম্বাই-শাড়িখানা পরল সে ফেরতা দিয়ে। ওরই জুড়িদার রঙিন ব্লাউজ চড়াল একটা গায়ে। জুত হল না, বড় ঢিলেঢালা—আয়নায় দেখে পছন্দ হয় না। খুলে ফেলল। সারা বাক্স হাতুল-পাতুল করে অবশেষে বের করল আর-একটা। সাধারণ ছিটের ব্লাউস, কিন্তু আঁটোসাঁটো। এই সে চাচ্ছিল। অনেকদিন আগেকার—যৌবন যখন বিকচোন্মুখ—সেই সময়কার জিনিস এটা। সেদিনের মাদকতার ছোঁয়াচ যেন লেগে আছে এর সঙ্গে। আয়না এপাশ-ওপাশ করে দেখে। সেদিনের নিটোল অঙ্গশোভারও যেন আদল আসে ব্লাউসটা পরে।

অনেকক্ষণ পরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দুর্লভ ও হরিপদ ফুসফুস-গুজগুজ করছিল। হরিপদ সরে গেল। দুর্লভ রক্তদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে। ভেবেছিল, প্রসাধনে হতবাক্ হয়ে যাবে দুর্লভ—সুড়ুত করে পাশে এসে বসবে। আর এলোকেশীই সরিয়ে দেবে বাঁ-হাতের ধাক্কা মেরে। ধাক্কা খেয়েও আবার ঘনিয়ে আসবে পোষা-কুকুরের মতো। এমন কতবার হয়েছে। শাস্তি দেওয়ার এই তার এক কঠোর প্রক্রিয়া। দুর্লভ ক্ষেপে যায় যেন এই প্রৌঢ় বয়সেও।

কিন্তু আজকে গতিক উল্টা। দুর্লভ জিজ্ঞাসা করে, জুতো পেলে কোথায় ?

বলব না—

চোখ পাকিয়ে দুর্লভ হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, বলো—

যেখানে ফেলে এসেছিলে, সেইখানে।

তবে রে !

ছুটে এলো সেই জুতোর এক পাটি উদ্যত করে। এলোকেশী কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল।

রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে জুতোর পাটি কুড়িয়ে দুর্লভ পটাপট মারছে।

নষ্ট মেয়েমানুষ, জানি তোর চরিত্তির। মেলার মানুষ আসা-যাওয়া করে আমি যখন না থাকি। হারামজাদা রায়বাবু দূত পাঠায়। কী করে খবর পেয়ে গেছে। বেটা রাঘব-বোয়াল—ভাল মাল দেখলেই নোলায় জল আসে। সেটা হচ্ছে না। আবাদ তার এলাকা—বাদাবনে কারো এক্তাজারির ধার ধারি নে। দরজায় ডবল তালা দিয়ে আটকে রেখে যাবো, আমি এসে তবে তালা খুলব। ঘর-সংসার তোকে দিয়ে কিচ্ছু করাব না নচ্ছার মাগী। রাত-দিন চৌপহর আটকে রেখে সায়েস্তা করব—হ্যাঁ।

এবং মুখের কথা মাত্র নয়—টেনে হিঁচড়ে নিয়ে ফেলল ঘরের ভিতর। মেঝেয় ফেলে লাথি কষিয়ে দিল একটা। গৌর অঙ্গে জুতার দাগ কেটে কেটে বসেছে। পরনের পুরানো বোম্বাই-শাড়ি শতছিন্ন হয়ে গেছে—ব্লাউসটাই রয়েছে শুধু আঁটা। এলোকেশীও চুপ করে নেই, মুখে যাচ্ছেতাই করে বলছে।

লাথি মেরে দুর্লভ চলে যাচ্ছিল—গালির জবাব দিতে ফিরে দাঁড়াল। সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। এলোকেশী কিল মারছে তার মুখে-বুকে গুমগুম করে। পা ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। কিন্তু শক্ত বাঁধনে এঁটেছে দুর্লভ। বয়সে দেহ নুয়ে এসেছে, কিন্তু দৈত্যের বল যেন গায়ে।

গলার স্বর এখন একেবারে আর একরকম।

কাল খুলনেয় যাচ্ছি মাইনেপত্তোর আনতে। ভাল জর্জেট শাড়ি কিনে আনব তোমার জন্যে। আর কোন-কিছুর দরকার থাকে তো বলে দিও।

এবং দরজায় তালা দেবার কথা—কিন্তু দিল না চলে যাবার সময়। মনে ছিল, কিন্তু তালা আটকাবার ইচ্ছে হল না এর পর।

॥ ছাব্বিশ ॥

মিথ্যা স্তোক কিংবা আদরের মুহূর্তের প্রলাপোক্তি মাত্র নয়। খুলনায় যাবার সময় দুর্লভ জিজ্ঞাসা করে, কি চাই তোমার বলো ?

মারে এবং বাহির-ফটকা দোষও আছে। তা সত্ত্বেও ভালবাসে সে এলোকেশীকে। ভালবাসে বলেই মারে। মেদলেশহীন শির-ভেসে-ওঠা চেহারা ও প্রৌঢ়ত্বে-পৌঁছে-যাওয়া বয়স—কোনটার উপর দুর্লভ ভরসা রাখতে পারে না। পাখি কখন উড়ে পালায়—তাই জবরদস্তি করে খাঁচায় আটকে রাখছে। রওনা হবার মুখে হরিপদকে সতর্ক করে যায়ঃ দুটো দিন বাসায় থাকব না—বুঝলি রে, কেউ যেন বাসায় না ঢোকে। হোন না তিনি গুরুঠাকুর—অফিস থেকেই ধূলো-পায়ে বিদেয় করে দিবি।

আবার একবার ঘরের মধ্যে ঢুকে মোলায়েম কণ্ঠে এলোকেশীকে জিজ্ঞাসা করে, কাগজে ফর্দ করে দাও, বুঝলে, কি-কি আনতে হবে। লিখে না দিলে কোনটা আনতে কোনটা আনব না—তুমি দুঃখ করবে শেষটা।

মধুসূদন রায় অঘটন ঘটিয়েছেন। যাত্রার আসর কে বলবে—বাদাবনের মধ্যে ইন্দ্রলোক বসেছে। এমন আলো-বাজনা, গান-একটো, রাজা-রানী-রাজকন্যার সাজসজ্জা মানমেলার মধ্যেই বা ক'জনে দেখে থাকে ? মধুনগরে আবাদ করতে গিয়ে বিস্তর লোকসান দিয়েছেন—সেই দুঃখ ঢাকবার জন্যই কি এত বাড়াবাড়ি ? জনপদ এগিয়ে এসে তবু তো এতদূর—এই লা-ভাঙার মোহানা অবধি বনভূমি দখল করে নিয়েছে, তারই যেন বিজয়োৎসব। জয়ের কথাটাই শুধু উজ্জল হয়ে থাকুক লোকের মনে, মধুনগরে তাঁর ব্যর্থতা ভুলে যাক। খালপারে বনবিবিতলার দিকে রাত-

বিরেভে এখনো বাঘে হামলা দেয়, গাছে গাছে বানর নাচে। আজ রাত্রে উৎসব-কোলাহলে ওপারের সেই-আদি-বাসিন্দারা ভয়ে সরে পড়েছে—ভয়ে এবং পরাজয়ের অপমানে।

যাত্রার আসরে মধুসূদন নেই। আগে যে-কোন অনুষ্ঠানে তিনি সকলের সঙ্গে মিশতেন। ইদানীং ব্যবধান গড়ে তুলেছেন, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বেরোন না তিনি। নানা রকম রটনা এই নিয়ে। সন্ধ্যার পরে নাকি খাড়া হয়ে দাঁড়াবার অবস্থাই থাকে না—বেরোবেন তিনি কি করে? কেউ বলে, জমাজমির ব্যাপারে মন-কষাকষি আছে ভালমন্দ নানা মানুষের সঙ্গে—ঠিকই করেছেন—ভাল করে বুঝে-সমঝে তবে বাইরে ঘোরা উচিত। আবার এমনও বলাবলি হয়—মধুনগরের ব্যাপারে অত টাকা গচ্চা দেওয়ার পর কিছুই ভাল লাগে না—চুপচাপ থাকেন তিনি কাছারির চৌহদ্দির মধ্যে।

সত্যি, এই তাঁর সুবৃহৎ পরাজয়। কিছু দক্ষিণে মধুসূদন নতুন এক আবাদের পত্তন করছিলেন, তার নামকরণ অবধি হয়েছিল—মধুনগর। যথানিয়মে কাজ হচ্ছিল। বাঁধবন্দি করে জঙ্গল কাটা হল—তিন বছর পর পর জঙ্গল কেটে ধান ছড়িয়ে দিলেন। কিন্তু একটি ধানের অঙ্কুর উঠল না—জঙ্গলই জেঁকে উঠল আবার। পরের বছর কোদালি দিয়ে একটা একটা করে সকল গাছের গোড়া তুলে দিলেন, মাটি তুলে আবার নতুন এক ঘেরি দিলেন পুরানো বাঁধের উপর আস্থা রাখতে না পেরে। ফলের কিন্তু ইতরবিশেষ হল না। ধানের কোন চিহ্ন নেই, জঙ্গলে ভরে গেল আবাদের খোল।

মুষড়ে গেলেন মধুসূদন, সুকুমারকে চিঠি দিলেন আসবার জন্য। বাল্যবন্ধু সুকুমার—কৃষি ও ভূতত্ত্ব নিয়ে নানারকম গবেষণা করে, টাকাওয়ালা মানুষ। কিন্তু মধুনগরের এ ব্যাপার একজন সামান্য চাষাও বুঝিয়ে দিতে পারে। চাষাভুষোর কথা মধুসূদন বিশ্বাস করেন নি, কিন্তু সুকুমার এসেও ঠিক সেই কথা বলল। আবাদ করা অসম্ভব এ জায়গায়। মাটি এখনো সুদীর্ঘকাল লোনা থাকবে।

বাঁধ এবং নতুন ঘেরি বরঞ্চ কেটে দেওয়াই উচিত—নদীজলের অঙ্গ অবাধে খেলা করে বেড়াক। কোথাও জলে ডুবে থাকবে, চর জাগবে কোথাও। আরও অনেককাল পরে পলি পড়ে পড়ে নদীর কুক্ষিমুক্ত হবে জায়গাটা, মাটির নুন ধুয়ে ধুয়ে নদীস্রোতের সঙ্গে চলে যাবে। মানুষের শক্তি ও বুদ্ধি খাটবে সেই সময় থেকে। তার অনেক দেরি—কত দিন কত বৎসর হিসাব করবার জো নেই। সবই গাঙের মরজির উপর নির্ভর করছে।

মধুসূদনের দম্ভ ভেঙেছে। সেই তিনি সঙ্কল্প করেছিলেন, বঙ্গোপসাগরের প্রান্ত অবধি গাছের একটি সবুজ রেখা খাড়া থাকতে দেবেন না—কিন্তু মানুষের ইচ্ছার সর্বময়ত্ব কোথায়? নদী-সমুদ্র কবে অবহেলায় উচ্ছিষ্ট ত্যাগ করে যাবে, সেই দিন অবধি অপেক্ষা না করে উপায় নেই। পোকামাকড়ের বাড়বৃদ্ধি হয় উচ্ছিষ্ট আবর্জনায়—মানুষের বেলাতেও অবিকল তাই। এতই অসহায় ও অকর্মণ্য তাঁরা জল-জঙ্গলের কাছে! যত ভাবছেন, মধুসূদনের মন রি-রি করে অপমানের বিষে।

রায়গ্রামে বহু জনে সহানুভূতি দেখাতে আসত। মধুসূদন আবিষ্কার করলেন—মুখে তারা দরদের কথা বলে, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে হাসাহাসি করে তাঁর আহাম্মুকির জন্য। রায়গাঁয়ে থাকা অসহ্য হয়ে উঠল—সেই থেকে মৌভোগে পড়ে থাকেন অধিকাংশ সময়। এখানে প্রায় সবাই প্রজাপাটক—সমশ্রেণীর কেউ নেই। দরকারের সময় হাত কচলে মাথা নিচু করে এসে দাঁড়ায়, দরদ দেখাবার দুঃসাহস করে না। শুধু এই কারণেই কাছারিবাড়িতে তিনি একরকম পাকাপাকি এসে উঠেছেন।

পনের-বিশ বিঘা জমি মাটির পাঁচিলে ঘেরা—বিচালি-ছাওয়া সরু চাল বরাবর চলে গেছে পাঁচিলের উপর দিয়ে, বৃষ্টির জলে মাটির গাঁথনি যাতে ধ্বসে না পড়ে। পাঁচিলের ভিতরে মূল-কাছারি, শোবার ঘর, রান্নাঘর, গোয়াল, ঢেঁকিশাল ইত্যাদি মিলে খান আষ্টেক ঘর। ধান তোলবার তিনটে বড় খোলাট—খোলাটের ধারে ধারে সারবন্দী গোলা। ধান কেটে এনে গাদা

ঘিরে রেখেছে চতুর্দিকে—মদন-ডলনের পর ধান গোলায় তুলবে। লোনা জায়গায় বিচালি অয়ে খারাপ হয়ে যায়—বিচালির ভরা তাই অগৌণে রওনা হয়ে যাবে দূর-অঞ্চলে বেচে দিয়ে আসবার জন্ম।

কী নেই রায়বাবুর কাছারিবাড়ি? সবজি-ক্ষেতে লাউ-কুমড়ো, মূলো-পালং, আলু-পেঁয়াজ, এমন কি কপি-টম্যাটোরও চাষ হচ্ছে। পুকুর আছে, এবং খালের খানিকটা বেঁধে ফেলে ঝিল তৈরি করা হয়েছে। মাছ যেন জিয়ানো রয়েছে সেখানে—যখন যে জায়গায় খুশি এক ক্ষেপ জাল ফেলে খাবার মাছ তুলে নাও।

মধুসূদনের একটা আলাদা ঘর। তিনি যখন না থাকেন, এ ঘর তালাবন্ধ থাকে। মাটির দেয়াল খড়ের চাল এ ঘরেরও বটে, তবে দেয়ালে গিরিমাটি গুলে রং করা। মাটির মেজে যদিচ—মেঝের সর্বত্র সরু-কাঠির সপ বিছানো গালিচার কায়দায়। নানা আসবাব—খাট, ইজিচেয়ার, আলমারি, আয়রনসেফ। বেলোয়ারি-ঝাড় ঝোলে আড়া থেকে। কিন্তু বিশেষ উৎসব-সমারোহ ভিন্ন ঝাড়ের আলো জ্বালা হয় না।

সেই ঘরের মধ্যে একলা মধুসূদন। রেড়ির তেলের বড় একটা প্রদীপ মাথার দিকে—ইজিচেয়ারে শুয়ে তিনি একটা ইংরেজি বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছেন। আর টিপয়ের উপরের কাচের গ্লাস থেকে চুমুক দিচ্ছেন মাঝে মাঝে।

দরজা ভেজানো ছিল—মৃদু করাঘাতে খুলে গেল। ঘাড় না তুলেই মধুসূদন ডাকলেন: আয়। এর মধ্যে হয়ে গেল?

টিকে সর্দার পাখির মাংস কড়া-ঝালে রেঁধে আনবার জন্য বাড়ি গিয়েছিল। মধুসূদন বললেন, সুকুমার ঘুমুলো কিনা দেখ্। তাকে ডেকে নিয়ে আয় এখানে।

চুড়ির আওয়াজে এমনি সময় চকিত হয়ে তিনি মুখ ফেরালেন। টিকে নয়—এলোকেশী। রূপ-বিভায় যেন জ্বলছে। চিনি-চিনি করছেন মধুসূদন—ঠিক ধরতে পারেন না। প্রশ্ন করলেন, কে তুমি?

আস্তে কথা বলুন রায়বাবু। পাইক-পেয়াদারা রয়েছে দেউড়িতে।

কেউ নেই। সবাই যাত্রা শুনতে গেছে। শুধু মাত্র দুটো দরোয়ান! আর আমাদের সুকুমার এসেছে কলকাতা থেকে—খাজাঞ্চি-ঘরে পড়ে ঘুমুচ্ছে।

মধুসূদন মৃদু হাসলেন এলোকেশীর দিকে চেয়ে। আবার বলেন, দরোয়ানরা দেখেছে তোমায়। মেয়েমানুষ বলেই ঢোকবার সময় বাধা দেয় নি। মেলার মচ্ছবে, ভেবেছে, বাবুর ফরমায়েসি কেউ হবে। কিন্তু কে তুমি, চিনতে পারছে নে তো।

এলোকেশী বলে, কাঁচা বয়স ছিল তখন—তা এখনো একেবারে বুড়িয়ে যাই নি। দেখুন না।

মাথায় কাপড় ফেলে দিল।

বলে, পারেন এবার চিনতে? বদলে গেছি, মোটা হয়ে গেছি একটু—না? আপনার বাবু সামনের কয়েকটা চুল পেকেছে—তা ছাড়া কিন্তু তেমনি একহারা চেহারা আছে।

প্রদীপের কাছে এগিয়ে এলো এলোকেশী।

সলতে পুড়ে গেছে বাবু—পিদ্‌দিম নিভে যাবে এক্ষুনি। ছেঁড়া কাপড় দিন না, সলতে পাকিয়ে দিই।

মধুসূদন শুধুই চেয়ে চেয়ে দেখছেন। লঘুপক্ষ পাখির মতো এলোকেশী যেন উড়ে বেরিয়ে গেল। নিজেই খুঁজেপেতে এক ফালি ন্যাকড়া নিয়ে এল। মেজেয় বসে পড়ে হাঁটুর কাপড় তুলে এবারে সে সলতে পাকাচ্ছে।

মধুসূদন নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দেখলেন। সহসা কঠিন কণ্ঠে বললেন, কী মতলব তোমার বলো।

আপনার গয়নাগুলো ফিরিয়ে দিতে এসেছি রায়বাবু। সেই তখনই দিয়ে দিতাম। কিন্তু জানেন তো, চলে গেলাম তারপরেই—গয়না দেবার ফুরসত হল না।

তোমায় একেবারে দিয়েছি—গয়না আর ফেরত চাই নে।

সত্যি সত্যি তো দেন নি। আমিই কেঁদে-কেটে ভিখারির

বেহুঁশ হয়ে নিয়ে নিয়েছিলাম। আমার কান্নায় আপনি দয়া করে সায় দিয়েছিলেন পুলিশের কাছে। ঐ রকম যদি না বলতেন, পুলিশ আমাদের কি সহজে ছাড়ত?

একটা নতুন খবর মধুসূদন ব্যক্ত করলেন।

শুধু মুখের কথায় ছাড়ে নি, নগদ টাকাও খসাতে হয়েছিল।

বলেন কি!

মেজে খুঁড়ে দশের মুকাবেলা মাল বের করল—নিতান্ত দু-পাঁচ টাকায় এত বড় কেস ফাঁসানো যায় না, সেটাও মনে রেখো।

এলোকেশী বলে, তবেই দেখুন। আপনি এত করলেন আমার জন্য, তার উপর ফাঁকি দিয়ে গয়না নিতে পারি? বাবাকে জানেন তো—ঐ মানুষের হাতে না পড়ে সেজন্য গয়নাসুদ্ধ পালিয়েছিলাম। কিন্তু ইচ্ছে করে মনের সঙ্গে আপনি দেন নি, আমিও নিই নি।

মধুসূদন ব্যঙ্গের সুরে বলেন, ফিরিয়ে দেবার ধর্মজ্ঞানটা এলো এত বছর পরে?

জলে-জঙ্গলে কাঁহা-কাঁহা মল্লুক করে বেরিয়েছি, কাছে-পিঠে কোথায় পেলাম আপনাকে রায়বাবু? এতকাল পরে এক মাঝির কাছে আপনার খবর শুনলাম—শুনতে পেলাম, জাঁকজমক করে হাট বসাচ্ছেন। ফাঁক বুঝে অমনি এসেছি। নৌকো নেই—তা বাঁধ ধরেই হাঁটলাম। কত কষ্ট হয়েছে ভাবুন দিকি! দুর্লভ খুলনা চলে গেছে, তাই সুবিধা হয়ে গেল।

ফিরে এসে কিছু বলবে না?

বলবে না আবার! তেমনি পাত্রই বটে আপনার ম্যানেজার। কিন্তু এ ছাড়া পথও আর-কিছু চোখে পড়ল না।

এলোকেশী বিরক্ত হয়ে উঠেছে এইসব মন্থর সাংসারিক কথাবার্তায়। বোতলের পাশে গয়নার পুঁটলি রেখে দিল। বলে, গুছিয়ে রাখুন।

গলায় আঁচল বেড় দিয়ে দূর থেকে সে প্রণাম করল। মধুসূদনের মন কেমন করে উঠল এতক্ষণে।

সত্যিই ফেরত দিলে এলোকেশী?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আসরে যাচ্ছি আমি—গান ভারি জমেছে।

দুর্লভ অনেক গয়না দিয়েছে তোমায়—আর দরকার নেই?

হ্যাঁ, অনেক—

ফিক করে হাসল এলোকেশী। হেসে ফিরে দাঁড়াল।

দেখবেন? এই—এই দেখুন না, গলায় পিঠে বুকে রাঙা-রাঙা কত সব গয়না—

নিদারুণ মার মেরেছে পশুটা—নিটোল অঙ্গে কেটে কেটে দাগ হয়ে আছে। প্রণাম করে সে চলে যাচ্ছে—মধুসূদনের বুকের মধ্যে অনেক কালের এক অবসন্ন ক্ষুধা জেগে ওঠে। বাঘ যেমন শিকারের উপর ঝাঁপ দেয়—না ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন না প্রবীণ মধুসূদন রায়—ব্যাকুল আগ্রহে ডাক দিলেন: শোন—

এলোকেশী ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, কি হল?

গয়নাগুলো একটা-একটা করে আমি গায়ে পরিয়ে দেবো। দেখি, তাতে কী রকম বাহার খোলে। দেওয়া-জিনিস আমি ফেরত নিই নে।

তবে আমাকে শুদ্ধ নিয়ে নেন না বাবু—

খিল-খিল করে এলোকেশী হেসে উঠল। মধুসূদন তাকিয়ে রইলেন। হাসছে কেবলই। হাসতে হাসতে চোখে জল এসে যায়।

আপনার ম্যানেজার ভাঁওতা মেরেছিল। মিথ্যে বলে ঠকিয়েছে আমায়। কি চেয়েছিলাম, আর এ কি হল! টাকাকড়ি তালুক-মুলুক সোনাদানার লোভ দেখিয়েছিল। কিছু পেলাম না রায়বাবু, তার মনটাও পাই নি।

মধুসূদন পুঁটলি খুলে নিঃশব্দে গয়না হাতে দিচ্ছেন, এলোকেশী পরছে। পরা শেষ হলে দরজায় ঠেশান দিয়ে একটু বাঁকা হয়ে সে মধুসূদনের মুখোমুখি দাঁড়াল। বলে, আপনার সামনে ভয় করে—বুঝি চোখ দিয়ে টেনে বের করে নেন মনের তলায় খবরাখবর। তা গোপন আমার কিছু নেই। মা অনেক ঘাটের জল খেয়ে শেষটা বাবার কাঁধে জুটেছিল। সেখানেও সুখ ছিল না—মরে বেঁচে

গিয়েছে। আমার অদৃষ্টেও সেইরকম। সুখ চেয়েছিলাম, মানুষজন ঘর-সংসার আমোদ-ফূর্তি চেয়েছিলাম—কপাল এমনি, জঙ্গলের মধ্যে কয়েদি হয়ে আছি। কোথায় যাব, কি করব ভেবে পাই নে। কে আশ্রয় দেবে আমাকে?

আর যে পারে দিকগে—আমি নই কিন্তু। আমারও ভিতর ফোঁপরা। রাত্রিবেলা হঠাৎ এসে পড়েছ—সামলাবার সময় পাই নি—তাই ক-গাছা চুল দেখতে পেলে। দিনমানে কলপ দিয়ে সেরে সামলে বেড়াই। দাঁতের পাটি, দেখতে পাচ্ছ, ঝিকমিক করছে—বিলকুল বাঁধানো। তেমনি উঠোনে ঐ যে গোলার সারি—কোনটার ভিতরে বস্তু নেই। যা-কিছু ছিল, আট বছর ধরে মধুনগরে ঢেলেছি। সমস্ত গেছে। মধুসূদনবাবুও যাবেন এবার।

খাড়া হয়ে বসে ম্লান হেসে মধুসূদন গ্লাসে চুমুক দিলেন একবার। বললেন, না গিয়ে উপায় নেই। তুমি অনেক ঠকেছ—আবার তোমায় আমি ঠকাতে যাব কিসের লোভে? সুকুমারকে অনেক বলেকয়ে খোশামুদি করে নিয়ে এসেছি, দেনাপত্তোরের ভার নেয় তো সে-ই এখানকার মালিক হয়ে বসবে। কাগজপত্র দেখছে। সে না নেয় তো অপর কেউ আসবে। আমি আর বেশি দিন নেই মোটের উপর। কিছু নেই আমার। একেবারে কিছু নেই তা-ই বা বলি কেন, ঐ যে শুনলে—একরাশ দেনা আছে। গয়না ক'খানা তোমার কাছে ছিল, তাই বজায় আছে—আমার কাছে থাকলে কবে এদ্দিনে বন-কাটায় খতম হয়ে যেত!

এ ধরনের কথা কেউ কখনো শোনে নি মধুসূদনের মুখে। এলোকেশী স্তম্ভিত হল। মধুসূদন তার দিকে পলক মাত্র না চেয়ে বইটা অবার খুলে নিলেন। পড়ায় মুহূর্তের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেছেন, এমনি ভাব। কী আছে বইয়ের ভিতর—এলোকেশীর যেটুকু বিদ্যা, তাতে বুঝবার শক্তি নেই! মলাটের ছবিটা দেখছে—ঘন জঙ্গল, তার মধ্য দিয়ে এক-পেয়ে সরু পথ পড়েছে। মনে হল, মধুসূদন সমস্ত বিপদ ও ব্যর্থতা ভুলে গিয়ে ঐ পথ বেয়ে অনেক দূর চলে

গেছেন। সে দাঁড়িয়ে আছে, তার দিকে একটিবার তাকিয়েও দেখলেন না।

আরও খানিক দাঁড়িয়ে এলোকেশী বাইরে এল। ধীরে ধীরে চলেছে দীর্ঘ দাওয়া অতিক্রম করে। ক্ষীণ চাঁদের আলো চালে আটকে পৌঁছতে পারে নি—আবছা অন্ধকার সেখানটায়।

এ কি ?

সবাই যাত্রার আসরে, সেই ফাঁকে—চোর-ডাকাত নাকি রে তুই ? কি মতলবে এসেছিলি ?

হাত ছাড়ুন।

বেশ—

হাত ছেড়ে দিয়ে সেই হাতে এলোকেশীর পিঠ বেড় দিয়ে ধরল।

এলোকেশী রাগ করে ওঠে : দাওয়ায় পেয়ে এ সমস্ত কি বাবু ?

দাওয়া বলে দোষ হচ্ছে ? ঘরে চল্‌ তবে।

সেই কলকাতার ভদ্রলোক—সুকুমার। স্নিগ্ধার কলকাতায় বিয়ে হয়েছে—এদেরই কারো বউ সে এখন। পায়ে ধুলোর কণিকা লাগে না, পালঙ্কে বসে হুকুম-হাকাম দিয়ে কাল কাটায়, সুকুমার হেন কন্দর্পকান্তি স্বামী দাসানুদাসের মতো ফাইফরমাস জোগায়। কত সুখ-শান্তি, আরাম-অবসর ! সৌভাগ্যবতী স্নিগ্ধা।

গুনগুন করতে করতে লঘু-পায়ে এলোকেশী কাছারিবাড়ি থেকে বেরুল। বাতাসে আঁচল উড়ছে। নিজেও সে যেন উড়ে চলেছে। সুকুমার পাঁচিলের দরজা অবধি তার সঙ্গে এগিয়ে এলো।

কামরূপ-কামাখ্যায়, শোনা যায়, যোগিনীরা মানুষকে কুকুর বানিয়ে রাখে। এলোকেশীও পারত। এবং এখনো পারে, দেখা গেল। জঙ্গলের মধ্যে এই ক-বছরে একেবারে ভুলে গিয়েছিল নিজেকে। কার উপরে প্রয়োগ করবে মোহিনী-মন্ত্র ? তাই ভেবেছিল, প্রথম বয়সের সে শক্তি হারিয়ে গেছে। কত কেঁদেছে সে জন্য ! আজকে জানল, বেঁচে রয়েছে নাগরের মিষ্টি-ডাকের সেই এলোকেশী দেখনহাসি।

॥ সাতাশ ॥

এলোকেশী যাত্রার আসরে ফিরে গেল না। গাঙের ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর গুনগুন করছে। গান সে জানে না—তবু আজকের এই নদী-মাঠ-আকাশের মধ্যে চেঁচিয়ে গান গাইবার ভারি ইচ্ছে হচ্ছে।

ঋষিবর, খুশাল, দুই পাঁচু—সবাই আসরে গিয়ে জমেছে। কেতুচরণের গান শুনলে ঘুম এসে যায়—তাই সে ডিঙির মধ্যে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে দূরাগত গান-একটো শুনতে শুনতে। নৌকো আরও চার-পাঁচখানা আছে—কেতুচরণদের দেখাদেখি এই মওকায় রোজগারের জন্য এসে জুটেছে মেলায়। আজকে যাত্রার ব্যাপারে নানা রাজ্যের উড়ো-লোক জড় হয়েছে—কে কোথায় নৌকা বাইতে বাইতে সরে পড়বে, তাই সব নৌকোয় পাহারাদার আছে একজন দু-জন করে। অভ্যাস বশে হাঁকও দিচ্ছে—

যাবে গো শামুকপোতা—খলষেমারি—বয়রা-আ-আ! দু-আনা ফি চড়নদার। যাবে-এ-এ—

নিয়ম-রক্ষার মতো এক-একবার হাঁক দিয়ে গল্পগুজব করছে। নৌকোর খোলে রান্নাও চেপেছে কারো কারো। লোক জমবার দেরি আছে। জমজমাট আসর—এখন কি ঘরবাড়ির কথা মনে আছে কারো? গান ভাঙবার পর তখন মিলবে সোয়ারি। তার এখনো অনেক দেরি।

এলোকেশী কেতুচরণের ডিঙিতে লাফিয়ে উঠল। রাত্রি হলেও ঠিক চিনেছে—কেতুরই ডিঙি এটা। উল্লাসে ডগমগ এলোকেশী—বেপরোয়া, কাণ্ডজ্ঞানহীন। এমন লাফ দিয়েছে—ডিঙি যে কাত হয়ে ডুবে যায় নি, সেইটে আশ্চর্য।

কেতুচরণ তড়াক করে উঠে বসে এলোকেশীকে দেখতে পেল।

এখন ছাড়বে?

ছ-দশ জন আসুক চড়নদার—

কোন তিথি হল? ষষ্ঠী। বারো দণ্ড জোছ্না আছে।

হিসাব করছে, আর স্রোতের জলে দুই পা ডুবিয়ে রগড়াচ্ছে। বলে, চড়নদার আসুক না আসুক, চাঁদ ডুববার আগেই আমায় পৌঁছে দিতে হবে। গিয়ে তবে রান্না চড়াব।

যেন কেতুচরণ নিয়ে এসেছিল তাকে এখানে, ফেরত পৌঁছে দেবার তারই দায়িত্ব। গা জ্বালা করে লাট সাহেবের ধরনের এই রকম হুকুম শুনলে। হুকুম ঝেড়ে এলোকেশী বোঁচকার গামছা খুলল। হাত বাড়িয়ে গামছাটা গাঙের জলে ভিজিয়ে নিচ্ছে। এরই মধ্যে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে অন্তরঙ্গ সুরে বলল, বাবু খুলনেয় গেছে। চুরি করে যাত্রা শুনতে এসেছি। সে কিছু জানে না।

ছই-এর ভিতর ঢুকে গেল। মুখ ও হাতের এখানে-ওখানে ঘষছে। বাবা রে বাবা! এই রাত্রিবেলা কে এখন খুঁটিয়ে রূপ দেখতে যাচ্ছে—একটু কাদার ছিটে লেগেছে বা না লেগেছে, সর্বাগ্রে তার কাদা তুলে ফেলবার দরকার পড়ল।

আবার বলে—হঠাৎ কি কারণে ক্ষেপে উঠেছে—বলল, গ্রাহ্য করি নে। আসব যাব, যাত্রা শুনব, যা খুশি তাই করে বেড়াব। জানতে পারল তো বয়ে গেল! কড়ি দিয়ে কিনে রেখেছে নাকি?

এমনি সময় খেয়াল হল, কেতুচরণ ডিঙি ছেড়ে দিয়েছে—প্রায় মাঝ-গাঙে এসে গেছে তারা। এলোকেশী গোড়ায় ভেবেছিল, জোয়ার এসে পড়ায় সরিয়ে ডাঙার ধারে নিয়ে যাচ্ছে। তা নয়—একমাত্র তাকে নিয়েই ছেড়ে দিয়েছে।

চললে যে? আর সোয়ারি কই?

চাঁদ না ডুবতে তোমায় পৌঁছে দিতে হবে, বললে।

আর একটা মানুষও পেলে না?

কেতুচরণ বলে, যাত্রা ছেড়ে কে যাবে এখন? তোমার মতো ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসে না তো সবাই।

দ্বিধান্বিত ভাবে এলোকেশী বলে, এ কেমনটা হল—শুধু আমি আর তুমি।

বোঠে জলের উপর তুলে ধরে তার মুখে তাকিয়ে কেতুচরণ কৌতুককণ্ঠে বলল, ভয় করছে?

ভয়? তোমাকে?

বোঁচকায় চাট্টি মুড়ি নিয়ে এসেছে। মেলায় কিনেছে। সেই মুড়ি এলোকেশী কোশ-কোশ গালে ফেলতে লাগল। অবহেলায় কেতুচরণের দিকে তাকিয়ে দেখে না একটিবার।

খাওয়া দেখে কেতুও ক্ষুধা বোধ করে। ডিঙি খরবেগে ছুটেছে। বোঠে কেবলমাত্র ছুঁয়ে রেখেছে জলে। অলস দৃষ্টি মেলে কেতুচরণ আহারপর্ব দেখছে।

যেখানটায় বসেছ, পাটার কাঠখানা তুলে ফেল দিকি।

ভ্রূকুঞ্চিত করে এলোকেশী বলে, কেন?

তোলই না। তোমাদের মেয়েমানুষের এই এক বড় দোষ—সব তাতে কেন, কি বিত্তান্ত—

মুখ টিপে হেসে এলোকেশী বলে, সত্যি কথা বলো দিকি। ক'টা মেয়েমানুষের সংসার তোমার? দেখে দেখে একেবারে হয়রান হয়ে পড়েছ! .

পাটার কাঠ তুলে দেখল জলের কলসি। ফেরোয় জল ঢেলে ঢকঢক করে মুখে ঢালল খানিকটা। জল-তৃষ্ণা পেয়েছিল সত্যি। গাঙের নোনা জল মুখে দেওয়া যায় না, কি করবে, শুকনো মুড়ি চিবোচ্ছিল এতক্ষণ। জল খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা হল।

কেতুচরণ বলে, শুধু মুড়ি খাচ্ছ—মালসায় পাটালি দেখতে পেলে না? তোমার চোখ কানা।

এলোকেশী খিল-খিল করে হাসে।

গাঁজার নেশায় ঢুলছ। মনের মধ্যে তোমার ধুকপুকানি হচ্ছে আর এক নেশায়। সব দেখতে পাচ্ছি গো! কানা যদি হব, এত সমস্ত দেখলাম কি করে?

গাঁজার কথায় রাগ হল কেতুচরণের। খামোকা এক হাড়-

জ্বালানো কথা বলল। জলের উপর থাকতে হলে সময় বিশেষে দু-এক টান না টানলে চলে না। সবাই তা জানে। কিন্তু আজকের এই আচ্ছন্ন ভাব সমস্তটা দিন ধরে কড়া রোদে নৌকো বাওয়ার দরুন।

তবু প্রতিবাদে একটি কথাও বলল না কেতু। লাভ কি? জগতে কেউ নেই তাকে দরদ দেখাবার। না দেখাল তো বয়েই গেল! সে কি খেতে পরতে পাচ্ছে না? জীবনে কী প্রয়োজন মেয়েমানুষের দরদে!

আরও জোর দিয়ে কেতু বলল, আলবত কানা তুমি। আচ্ছা, দুর্লভ হালদারের মধ্যে কী দেখে তুমি মজে রয়েছ?

এলোকেশী শুনতে পাচ্ছে না যেন। মুঠো মুঠো মুড়ি মুখগহ্বরে ফেলছে। তার কত ক্ষিধে পেয়েছে, খাওয়া দেখে বোঝা যায়।

তখন কোমল স্বরে কেতুচরণ বলে, পাটালি খাও।

তোমার পয়সার পাটালি আমি খাব কেন?

তা বটে! সাধুর মেয়ে, ঘেরিবাবুর ঘরণী—আর আমরা গরিবগুরো মানুষ, হাল বেয়ে বেড়াই—

গলা বুঁজে আসছে দেখে কেতু চুপ করল। সামলে নিয়ে একটু পরে বলে, ও পাটালি পয়সা দিয়ে কেনা নয়—এমনি।

চুরি করেছ?

অর্থাৎ কেতুচরণ চোর, কেতুচরণ গেঁজেল—যত গুণের নিধি হল দুর্লভচন্দ্র। মেজাজ ঠিক রাখা দায়, তবু সে শান্তভাবে বলল, কতই মানুষ উঠানামা করে—

ভালবেসে তারা দিয়ে গেছে,—কেমন?

জবাব ঠোঁটের কাছে এসে পড়ে, এই যেমন তুমি এলোকেশী ভালবাসার বস্তা খুলে বসেছিলে। একবার নয়—দু-দুবার। কুস্তিতে বিজয়ী হয়েছিল, আর চোর ধরেছিল—সেই দুই রাত্রে। সংসারের সকল মানুষ তোমারই ধাঁচের এলোকেশী—কাজ আদায়ের গোঁসাই, গরজের বাইরে একটা মিষ্টি কথাও কারো

কাছে প্রত্যাশা করবার জো নেই। শরীর কি মনমেজাজ খারাপ হওয়ার দরুন কোনদিন যদি পৌঁছে দিতে দেরি হয়ে যায়, সোয়ারিরা বাপ তুলে গালি দেয় ডিঙির উপর বসেই। শুধু পয়সার খাতিরে এবং গোল-পাঁচু ঋষিবব প্রভৃতিব পবামর্শে প্রাণপণে ঠোঁট দুটো চেপে চুপ করে বসে থাকে সোয়াবিরা যখন বকাবকি কবে। ভালবেসে সেই সব মানুষ পাটালি খেতে দিয়ে যাবে!

কিন্তু এসব কিছুই বলল না কেতুচবণ। বলে, একজনেব ঝুনকে থেকে পড়ে গিয়েছিল। পবে দেখতে পেলাম, তখন সে-মানুষ চলে গেছে। তা পড়ে-পাওয়া জিনিস খাও না দু-খানা। শুধু মুড়ি কত আব চিবোবে?

এলোকেশী সবেগে ঘাড নাড়ে।

তোমাব নৌকোয় যাচ্ছি—নগদ পয়সা গুণে দিয়ে নামব। এই মাত্তোর। খাতির-উপলোধেব ধাব ধাবি নে।

তুমি কেন খাতিব করেছিলে সেদিন আমায় খাবাব জলেব সঙ্গে মিষ্টি দিয়ে?

রাগ কবে কেতুচবণ হাতেব বোঠে কাড়ালে বেখে দিল।

থাকল এই তবে। ভাবি তো দু-আনা দেবে একটা চড়নদাব - বাইব না নৌকো। বয়ে গেছে।

পাড়ে লাগাও—নেমে চলে যাই। হেঁটেই যাব—আসবাব সময় যে রকম এসেছিলাম। এই যে মেলায় নিয়ে আসতে বলেছিলাম—আনলে না। তা বলে আটকে থাকল নাকি?

কিন্তু কলহেব অবসর কোথা? মোচাব খোলাব মতো ডিঙি ঘোলাব মধ্যে পাক খাচ্ছে। এলোকেশী বেবিয়ে আসে কেতুচরণের দিকে।

নৌকো যে গেল! দাও, বোঠে দাও আমার কাছে—

উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে, বুক উঠানামা করছে। বলে, ইচ্ছে হয় তুমি মরো। আমায় সুদ্ধ টানবে কেন?

তা বটে। হালদার হাপুস-নয়নে কাঁদবে। চোখের জলে সমুদ্দুর বয়ে যাবে।

হুড়োহুড়ি। বোঠে কেতুচরণ দেবে না কিছুতে। এলোকেশীর হাত দুটো এঁটে ধরল। চোখে ধ্বক করে আগুন জলে ওঠে বুঝি। কোনদিকে কেউ নেই—করাল জলস্রোত খলখল হাসছে শুধু। বাঘিনীর মতো এলোকেশী তার হাত কামড়ে ধরল।

পায়ের ধাক্কায় কেতুচরণ তখন বোঠে ফেলে দিল জলে। এলোকেশীও জলে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে—বোঠে ধরতে গিয়েছিল, টাল সামলাতে পারে নি। বোঠে কি ভেসে থাকে? জলতলে ডুবে গেছে চোখের পলকে।

অবস্থা বুঝেছে কেতুচরণ। রাগের বশে বোঠে ফেলে বেকুব হয়েছে। নৌকা বানচাল হবার উপক্রম। ছইয়ের উপর আর একটা ছিল এক-পাশ ভাঙা—তাই নিয়ে প্রাণপণে বাইছে। পাকা হাত—সামলে নিল। দ্রুত বেয়ে গেল এলোকেশীর কাছে।

উঠে এসো—

এলোকেশী আগুন হয়ে বলে, কখনো না। শিয়াল-কুকুরের শামিল—তোমার সঙ্গে এক নৌকোয় বসব? থুঃ থুঃ—

বড্ড টান আজকে। কুমির-কামট খুব এই সব জায়গায়।

ধরে ধরবে কুমিরে। তারা সোজাসুজি কামড়ায়। এক কামড়ে টুক করে জলের নিচে নিয়ে যাবে—শরীর জুড়োবে।

কেতুচরণ মরমে মরে গেছে। অথই গাঙের উপর কেন সে ঝগড়া বাধাতে গেল পাগল মেয়েটার সঙ্গে? জানে তো তাকে। বলবার মতো কথা জোগায় না আর তার। ডিঙি বেয়ে যাচ্ছে এলোকেশীর সঙ্গে সঙ্গে। যত কাছে আসে, ততই সরে সরে যায় এলোকেশী।

কালো-মতো কি-একটা দূরে। চর উঠেছে বুঝি—মাঝ-গাঙে মাটি দেখা দিয়েছে? আনাড়ি লোকে তাই ভাববে। কিন্তু কেতুচরণ জানে। কুমির পিঠ ভাসিয়ে আছে। ভেসে থেকে লক্ষ্য করছে। ডুব দিল কুমির—এলোকেশী যে রকম জল-দাপাদাপি করছে, লক্ষ্য এড়াবার কোন সম্ভাবনা নেই। অব্যর্থ ওদের তাক—জলের নিচে দিয়ে তীরবেগে গিয়ে ভেসে উঠবে যথাস্থানে। আর এলোকেশী যেমন বলল—একটুখানি আলোড়ন জাগিয়ে চক্ষের

নিমেষে জলতলে শিকার নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। শুধু পলকের জন্য রাঙা হবে স্রোতের খানিকটা।

কেতুচরণ পাগলের মতো হয়ে যায়। মিনতি করে : উঠে এসো এলোকেশী, আর কক্ষনো কিছু বলতে যাব না। এই শেষ একটা বার আমার কথায় পেত্যয় করে দেখ।

এলোকেশীও নরম হয়েছে, জল টেনে টেনে পারছে না আর। ডিঙি কাছে এলে ছিটকে গেল না এবার। কেতুচরণ তার কাছে একেবারে পাশটিতে চলে এসেছে—সেখান থেকে বোঠে এগিয়ে দিল। এঁটে ধরল এলোকেশী—ধরে জিরিয়ে নিচ্ছে। বড় ক্লান্ত হয়েছে স্রোতের সঙ্গে এতক্ষণ লড়াই করে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে।

বোঠেয় হয় না—কেতুচরণ হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। একটা হাতের বলে অত বড় মেয়েকে টেনে তোলা সহজ নয়। নিজে আবার হুমড়ি খেয়ে না পড়ে!

যাই হোক—তুলে ফেলল অবশেষে। এলোকেশী এলিয়ে পড়েছে। কেতুচরণ নিঃশব্দে শান্তভাবে বেয়ে চলেছে। হঠাৎ এলোকেশী চমকে উঠে বসল।

ওকি, রক্ত কিসের?

সাপে কেটেছে।

দেখি, দেখি—

না, দেখতে হবে না। শিয়াল-কুকুরের গায়ের একটু রক্ত পড়লে কী আর ক্ষতি হয়?

রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে—কী সর্বনাশ? কিনারে লাগাও বলছি।

না—

আমার দোষ। যেখানে যাই একখানা কাণ্ড ঘটিয়ে বসি।

ঠাস-ঠাস করে নিজের গালে চড় মারছে এলোকেশী। কেতুচরণ হাঁ-হাঁ করে ওঠে।

আরে, দোষ তো আমারই। আমি এক-নম্বরের গাধা। হাত ধরা ঠিক হয় নি—আমারই দোষ।

এলোকেশী বলে, আমিই বা কোন আক্কেলে খাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলাম। ছি-ছি, মানুষ নাকি আমি! সরো, আমি বেয়ে দিচ্ছি খানিক।

তখন কেতুচরণ সঙ্কির ভাবে বলে, এখানে নয়। শিবশার মুখ এটা—এ জায়গায় পেরে উঠবে না। বরঞ্চ খালে খালে যাব এর পর—খালে ঢুকে তারপরে তুমি ধ্বজি মেরো।

এলোকেশী খুব খুশি হল।

সেই ভাল! খালে টান কম—ধীরে সুস্থে বেশ আরামে যাওয়া যাবে।

বিষম দূর-পথ কিন্তু। তোমায় যে আবার গয়ে রান্না চাপাতে হবে।

অধীর কণ্ঠে এলোকেশী বলে, তোমার ঐ জখমি হাতে, তা বলে, নৌকো বাইয়ে মেরে ফেলব নাকি?

তবে আর কি! বড়-গাঙ ছেড়ে ঢুকে পড়ো সামনে ঐ যেটা দেখা যাচ্ছে। ধরণীর শিরা-উপশিরার মতো সংখ্যাতীত খাল অঞ্চলটা জুড়ে। সমস্ত কেতুচরণের নখদর্পণে। রাত্রি এক প্রহর হয়ে গেছে—এখনো চলেছে তারা। জাহাজ-ডুবির খাল বলে, এখন যেখানটা দিয়ে যাচ্ছে। কোন যুগে হয়তো জাহাজ ডুবেছিল, ইদানীং ভাঁটার সময় ডিঙি ডুববার মতো জলও থাকে না। স্রোত ভিন্ন পথ ধরেছে।

এলোকেশী একলাই লগি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ভিজে শাড়ি কাঁধ ঘুরিয়ে ফেরতা দিয়ে মাজায় বেঁধে নিয়েছে। কেতুচরণ কাত হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। শাড়ি একেবারে এঁটে আছে গায়ের সঙ্গে—বাহুল্য এতটুকু কোন দিকে নেই। সেই আর একদিন এলোকেশী নৌকোর কাঁড়ালে বসে বোঠে ধরেছিল—দুর্লভের কাছে তাকে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল কেতুচরণ। আজকেও যাচ্ছে আবার দুর্লভের বাসায়।

ছিটে-জঙ্গল এধারে ওধারে—জনবসতি নেই, গাছে গাছে বানরের পাল, সাপ চরে বেড়ায় হেতালবন ও দিগ্‌ব্যাপ্ত উলুঘাসের

ভিতর দিয়ে। জ্যোৎস্নায় চারিদিক ডুবে আছে। এমন সুন্দর জ্যোৎস্না কেতুচরণ জীবনে আর দেখল না। দিনমানের মতো জ্যোৎস্না কেওড়া-পশুরের পত্রপুঞ্জের ফাঁকে তেরছা হয়ে ডিঙিতে পড়েছে। জায়গাটার নাম বেনেপোতা। সেকেলে পাতলা পাতলা ইটের টুকরো ছড়ানো আছে ইতস্তত। বনকরের এক বাবু বলেছিলেন, খুঁড়লে দালান-কোঠা নাকি বেরুবে এই অঞ্চলে। ঐশ্বর্যবান কোন বণিকেরা খাঁড়ির মুখে একটা আস্তানা গড়েছিল, দেশ-দেশান্তর ঘুরে এসে জাহাজগুলো পাল নামিয়ে বিশ্রাম নিত কি শান্ত নিস্তরঙ্গ এই খালের উপর ?

গুন-গুন-গুন—কাছারিবাড়িতে পেয়ে-বসা সেই গানের গুঞ্জনে এখনো বুঝি মজে রয়েছে এলোকেশী! বলে, ও কেতু, গীত গাও একখানা, শুনি।

কেতুচরণ ঘাড় নাড়ে।

উঁহু, দাঁড়-টানা কুড়ুল-মারা মরদ জোয়ান—গান-টান আমার আসে না। কক্ষনো আমি গাই নি।

অভিমান-ভরা কণ্ঠে এলোকেশী বলে, মিথ্যে বলো কেন ? গান গায় না সে মানুষ পিরথিমে নেই।

কেতুচরণ হেসে ওঠে।

তা বলছ বটে ঠিক! রাতনিরেতে ভয়তরাস লাগলে গেয়ে উঠি কখনো-সখনো।

আজকে ভয় করছে না ?

করছেই তো—

হঠাৎ এক ভাবের কথা বেরিয়ে এল কেতুচরণের মুখ দিয়ে। স্বপ্নেও জানত না, এ সব সে বলতে পারে। বলে, দুটো বাঁক ছাড়ালেই মর্জালের আফিস। পথ ফুরিয়ে গেল, আমার সেই ভয় করছে এলোকেশী।

॥ আঠাশ ॥

চাঁদ ডুববার আগেই স্টেশনে পৌঁছবার তাগিদ ছিল—ফিরে এসে রান্না চাপাবে। কিন্তু কোথায় কি! চাঁদের দিকে নজর দেবার ফুরসত কোথায়? সকালবেলা দুর্লভ ফিরবে—তার আগে ফিরতে পেরেছে, সেই ঢের। রাত থাকতে থাকতেই তারা ফিরে এসেছে।

বাদাবনে শিয়াল নেই—প্রহরে প্রহরে শিয়াল ডাকে না। ঠিকমতো তাই রাতের আন্দাজ করা শক্ত। হরিণের ডাক আসছে ক্ষণে ক্ষণে, আর বুনো ঝিঁঝির একটানা ক্ষীণ আওয়াজ। দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারের মধ্যে আফিস-ঘরের সামনে ঝুলানো লণ্ঠনটা জ্বলছে শুধু। স্টেশন এমনই অনেক উঁচু নদীগর্ভ থেকে—আলোটা আরও উপরের খুঁটির গায়ে ঝুলানো থাকায় আকাশ-প্রদীপের মতো দেখাচ্ছে।

ডিঙি প্লাটফরম অবধি নিয়ে গেল না। ওখানে আরও নৌকো থাকতে পারে—এলোকেশী নেমে যাবার সময় যদি কারো চোখে পড়ে, সে বড় বিশ্রী হবে। খানিকটা দূরে গোলপাড়ের নিচে আঁধার মতো একটা জায়গা—কেতুচরণ বিবেচনা করে ডিঙি সেখানে লাগাল। নোনা কাদায় এলোকেশীর পা বসে যাচ্ছে, কাদার মধ্য থেকে টেনে তোলা দায়। তুলতে গেলে পটকা-ফোটার আওয়াজ হয়। শব্দ বাঁচিয়ে দেখেশুনে সন্তর্পণে এগুতে হচ্ছে। এরই মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে এক নজর সে দেখে দিল কেতুচরণকে। পাটার উপর পা ছড়িয়ে বসে বৈঠা আলগোছে জলের উপর ছুঁয়ে কেতুচরণ দু-চোখ মেলে চেয়ে আছে। তারার ক্ষীণ আলোয় অজানা কোন্ জগতের একটি মাত্র অধিবাসী সে যেন। মই বেয়ে ধীরে ধীরে উঠে স্টেশনের উঠানে এলোকেশী অদৃশ্য হল, কেতুচরণ ডিঙির মুখ ঘুরাল তখন।

ঘুরেই দেখতে পেল, ঠিক-সামনে এক কাঠের ভরা। আসবার সময় দেখে এসেছে, দোখালার মুখে নোঙর করা ছিল নৌকোটা। বোঝাই নৌকো আফিসের মুখ পার হয়ে একবার বেরিয়ে গেছে—সে নৌকো ঘুরে ফিরে আবার বনকর-আফিসে আসে কি জন্য? সন্দেহের ব্যাপার। কেতুচরণ পাশ কাটিয়ে বেরুতে গেল, কাঠের নৌকোও অমনি দ্রুত সরে এসে পথ আটকায়। অবস্থা বোঝা গেল। এই এক বিষম চালাকি। সরকারি বোট দেখে বাদার বেআইনি আগন্তুক সামাল হয়ে যায়, পিটেলের (পেট্রোলিং) লোকজন তাই অনেক সময় নৌকোয় কাঠ সাজিয়ে যেন কাঠুরের দল কাঠ কেটে বেড়াচ্ছে এমনিভাবে ফেরাফেরা করে। কাঠের আড়ালে সরকারি মানুষ আত্মগোপন করে থাকে। কেতুচরণের নামে, আজকের না হোক, পুরানো কাজকর্মের দরুন ভারি ভারি ফিরিস্তি আছে। আপোসে ধরা দেওয়াটা কিছু নয়।

বোঠে দু-হাতে উঁচিয়ে ধরে তড়াক করে সে উঠে দাঁড়াল। খাঁড়া তুলে কামার পূজাস্থানে মহিষ বলি দেয়—ঠিক সেই অবস্থা। বোঠের বাড়িতে দুটো-পাঁচটা সরকারি মাথা দু-ফাঁক করে দেবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বেকায়দা ঘটল ডাঙার দিক থেকে—আঁধার গোলবন থেকে জন পাঁচ-সাত একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ল নৌকোয়। কেউ মাজা এঁটে ধরেছে, কেউ পা, কেউ বা গলা—

জলে কাদায় ঝুটোপুটি। একা মানুষ কতক্ষণ যুঝবে? অবশেষে কায়দা করে ফেলল তাকে। হরিপদ কোমরের গামছা খুলে পিছমোড়া দিয়ে হাত বেঁধে ফেলল। বড্ড কষে বাঁধছে। হাত বেঁধেছে—পা ছুঁড়তে না পারে, পা দুটোও বেঁধে ফেলল ঝোপের লতা ছিঁড়ে এনে।

তাকিয়ে তাকিয়ে সহসা হা-হা করে কেতুচরণ দুরন্ত হাসি হেসে উঠল।

নে দাদারা, কোথায় নিয়ে যাবি—এবারে চল্। পা বেঁধে ফেললি—তা চতুর্দোলা আনবি না কাঁধে করে নিয়ে যাবি?

ধরাধরি করে কেতুচরণকে আফিসঘরের বারাণ্ডায় বসিয়ে দিল।

পুবে ফরসা দিচ্ছে। এতক্ষণে এইবার সুস্থির হয়ে বসে হরিপদ তামাক ধরাল।

কেতু বলে, দোষঘাঁট কী হয়েছে—বুঝলাম না তো দাদা। বুঝিয়ে বুঝিয়ে দে দেখি ঠাণ্ডা মাথায়।

রায়বাবুর চর তুই।

জিভ কেটে কেতুচরণ বলে, ছি-ছি! মিথ্যে কলঙ্ক দিস নে দাদা। ধর্মে সইবে না। সোয়ারি বওয়া আমাদের কাজ। ফেলো কড়ি, মাখো তেল। কড়ি ফেলে যদি যমালয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলে, তাই দিতে হবে। যাত্রা-টাত্রা শুনে মর্জ্জাল অবধি ঠাকরুন নৌকো ভাড়া করলেন, তাই নিয়ে এসেছি। এর মধ্যে বেআইনি কি হল?

হয়েছে বই কি!

বলে আয়েশে আধেক চোখ বুঁজে হরিপদ হুঁকো টানতে লাগল।

আজামৌজা বললে হবে না। নাম করো, কি অন্যায় করেছি—

হুঁকো থেকে মুখ তুলে হরিপদ হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, বিনা পাশে তুই গোলপাতা কাটছিলি।

আমি? তা ভেবেচিন্তে একটা বের করেছ মন্দ নয়।

কেতুচরণ হি-হি করে হাসে। হাসি দেখে হরিপদ আরও জ্বলে যায়।

বাবু ফিরে আসুন—হিড়-হিড় করে থানায় টেনে নিয়ে যাবে, হাসি বেরুবে সেই সময়। হাসি সমেত দাঁতের পাটি উপড়ে ফেলে দেবে।

গোলপাতা কাটলে দাঁত উপড়াও তোমরা?

হরিপদ বলে, শুধু গোলপাতা কেন—খাস-বাদার সুঁদুর-পশুর কেটে পয়মাল করেছিস, চাক ভেঙেছিস মাদি-হরিণ মেরেছিস। আর কি কি করেছিস—বাবু এসে পড়লে সমস্ত ঠিকঠাক হবে।

এত সমস্ত সত্ত্বেও কেতুচরণ নির্বিকার। বলে, যা করবার করিস

রে ভাই। শীতে জমে গেলাম—কলকেটা এগিয়ে দে আগে। আর হাত ছুটো খুলে দে—তামাক খেয়ে নি, তারপরে আবার বাঁধিস।

আবদার শোন! হাত নয় তো তোর—হাতুড়ি। যা কিল ঝেড়েছিস, ঘাড়ের উপর বাতাবিলেবু হয়ে ফুলেছে। হাত খুলে দেবো বই কি—নইলে জুত হবে কেন?

কিন্তু কেতুচরণের সতৃষ্ণ চোখের দিকে চেয়ে হরিপদর মনে মনে দয়া হয়েছে। নিজে নেশা করে, দুঃখ বোঝে সে নেশাখোরের। হাতের বাঁধন খুলল না—গোটা কয়েক সুখ-টান দিয়ে ছেঁদার জায়গাটা মুছে হুঁকো কেতুর মুখের উপর ধরে রইল। কেতু ভুড়ুক ভুড়ুক করে টানছে।

দুর্লভের স্টেশনে ফিরতে অনেক দেরি হল—দুপুর গড়িয়ে গেল। কেতুচরণ সেই অবস্থায় তেমনি ভাবে আছে। রাগে হোক বা লজ্জায় হোক, এলোকেশী বাইরের এদিকে আসে নি একবারও। এক হাঁড়ি ফ্যানসা-ভাত রেঁধে তারই দু-দলা মুখে দিয়ে শুয়ে পড়েছে। দুর্লভের খাওয়া-দাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত হরিদাসী হেঁসেল ছুঁতে পারে না—কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ছিল সে। তারপর হরিপদর পরামর্শক্রমে মুড়ির চাল নিয়ে বাইরের উনুনে খোলা-হাঁড়িতে মুড়ি ভেজে নিজেরা খেয়েছে, কেতুচরণকে দিয়েছে। তামাক খাইয়েছে বলে মুড়ি অবশ্য মুখে তুলে খাইয়ে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া এতক্ষণ ধরে শাস্তি-ভোগের পর বিতৃষ্ণাও কমেছে কেতুচরণের সম্পর্কে। হরিপদ অনেক ইতস্তত করে কেতুচরণের ডান-হাতটা মাত্র খুলে দিয়েছিল মুড়ি খাওয়ার জন্য। খাওয়ার পরে যথাপূর্ব বেঁধে ফেলেছে।

ঝিমিয়ে পড়েছে কেতুচরণ। আধ-মালসা মুড়িতে ঐ লোকের কি হবে? বড়-নেশার কোন বস্তু কাল থেকে ছুঁতে পারে নি—ঝিমিয়ে পড়বার তা-ও একটা কারণ বটে!

দুর্লভ উঠানে উঠে থমকে দাঁড়াল। কাঁধের উপর এক ঘুমন্ত শিশু মসীমলিন ন্যাকড়ার মতো। হাতে ক্যাম্বিসের সাদা ব্যাগ। কেতুচরণ আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে রক্তাভ দু-চোখের দৃষ্টি মেলে

তাকাল তার দিকে! দুর্লভের বুকের মধ্যে গুর-গুর করে ওঠে। বেড়ার ওধারের জঙ্গলে বাঘ বিচরণ করে, এই কিছুকাল আগেও হামেশা বাঘের হামলা শোনা যেত। তেমনি একটা বাঘের হাত-পা বেঁধে যেন বারাণ্ডার উপর ফেলে রেখেছে।

কেতুচরণ হাঁ করে বলে, জল খাবো—

মুড়ি খাওয়ার পর জল আরও কয়েক বার খেয়েছে। ঘটি পাশেই ছিল। হরিপদ আলগোছে দাঁড়িয়ে ঘটির জল মুখ-গহ্বরে ঢেলে দিতে লাগল। ঢক-ঢক করে পুরো ঘটি প্রায় শেষ করে ফেলল কেতুচরণ।

দুর্লভ দেখছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বলে, হাতে বল নেই তোর হরিপদ? হাত নড়ে গিয়ে মুখে-চোখে জল পড়ছে।

হাতের দোষ কি বাবু? দেখেন অবস্থা!

হাতখানা বাড়াল সে দুর্লভের দিকে। দুর্লভ শিউরে ওঠে।

ইস—এ কি?

কোন অঙ্গ আস্ত রাখে নি। এই দেখেন। যা বোঠে তুলেছিল, মাথাটাও ফুঁ-ফাঁক করে দিত। আমরা পাঁচ-সাত জন ছিলাম, তাই রক্ষে। বেটা অসুর।

রান্নাঘরের পাশ দিয়ে দুর্লভ ভিতর দিকে চলল। সবিস্তারে ঘটনা বলতে বলতে হরিপদও চলেছে। কেতুচরণ ক'কাল পরে মুখোমুখি সুস্পষ্ট দেখল দুর্লভকে। এই ক'দিনে তার সম্বন্ধে খবরাখবর অনেক সংগ্রহ করেছে। এলোকেশীকে মনে মনে এই চেহারার পাশে দাঁড় করিয়ে তুলনা করে দেখছে। বুড়িয়ে এসেছে দুর্লভ—ঐ যে একটুখানি দাঁড়িয়েছিল, তারই মধ্যে কয়েকবার কাশল খক-খক করে। মেদ-মাংসহীন দীর্ঘ দেহ। নিকষকালো মুখের উপর বসন্তের চিহ্ন গর্ত-গর্ত হয়ে আছে। মধু রায়ের সেই জঙ্গল-কাটা ম্যানেজার সরকারি ঘেরিবাবু হয়ে ক-বছরের মধ্যেই রীতিমতো গুছিয়ে নিয়েছে। বাদা অঞ্চলে পশার-প্রতিপত্তির সীমা নেই। আর দেশেও শোনা যায়, চকমিলানো বাড়ি ও বিস্তর জমাজমি করেছে। বাদার শুঁদুর-পণ্ডর দিয়ে শুধুমাত্র দেশের

বাড়ির দরজা-জানলা তৈরি নয়, বাগবাগিচা অবধি ঘিরে ফেলেছে।

ব্যাগ ও শিশুটা নামিয়ে রেখে গায়ের জামা-গেঞ্জি ছেড়ে দুর্লভ আবার বাইরে এল একপলা তেল মাথায় থাবড়ে দিয়ে। স্নান করবে এবং কেতুচরণের সম্বন্ধে যা-হোক একটা ব্যবস্থাও করে ফেলবে। কুমিরের ভয়ে গাঙে নামা চলে না—মাচার প্রান্তে দাঁড়িয়ে একজনে বালতিতে করে জল তুলে দেয়। স্নান হয়ে গেলে তারপর মিঠা জলে মাথাটা ধুয়ে ফেলে।

কেতুচরণ দরবার জানায়ঃ হুজুর দয়াময়—কি জন্যে আমার হেনস্তা করেছে, বিবেচনা করেন দিকি। ঠাকরুন যাত্রা শুনতে গেছেন—কখন গিয়ে উঠেছেন কি বিত্তান্ত, কিছু জানি নে। ভালমানুষের মেয়ে ফিরবার মুখে গিয়ে বড্ড ধরাধরি করতে লাগলেন—আর ভেবে দেখলাম, অনেক নুন খেয়েছি তো ওঁর বাপের—মেয়েমানুষ একলা রাতবিরেতে পথের উপর ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। নৌকোয় তুলে বাসায় এনে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি—সেইটে আমার দোষ হল?

দুর্লভ প্রশ্ন করে, কোথায় আছিস? কি করিস আজকাল তুই? মধু রায়ের সঙ্গে নাকি জুটেছিস—তার চর হয়ে খবরাখবর নিয়ে বেড়াস শুনতে পাই?

জিভ কেটে কেতুচরণ বলে, না হুজুর, শত্রুতা করে বদ্‌লোকে মিথ্যে রটিয়েছে। নৌকো বেয়ে খাই—স্বাধীন বিত্তি আমাদের। নতুন সায়ের জমা নিয়েছি। রায়বাবুর সঙ্গে এ ছাড়া কোন সম্পর্ক নেই।

দুর্লভ বলে, তাই হয় তো ভাল। মধু রায়কে বাইরে থেকে তোরা তালেবর দেখিস—সে তালগাছে আর রস নেই, শুধু জটার বোঝা।

কেতু করুণ কণ্ঠে বলতে লাগল, বিবেচনা করুন, আমার কাজই হচ্ছে তো এই—ঠাকরুনকে হুজুরের বরাবর পৌঁছে দেওয়া। সেই একবার দিয়েছিলাম—হুজুর আমায় কত ভাল বললেন, বখশিশ

দিতে গেলেন। এবারে আপনি বাসায় ছিলেন না—তাই দেখেন, হাত পা বেঁধে চোর-ডাকাতের হাল করেছে।

স্নান সমাধা হয়ে গেছে দুর্লভের। এটুকু খোশামুদিতে মন গলে না—গামছা দিয়ে গা মুছতে মুছতে সে মুখ খিঁচিয়ে উঠল।

হাত-পা বাঁধবে না তো গলায় মালা দিয়ে তক্তানামায় বর সাজিয়ে নিয়ে আসবে? গার্ড হলেও হরিপদ রাজ-কর্মচারী—তার গায়ে হাত তুলেছিস, মানেটা কদ্দর অবধি উঠেছে বুঝিস রে হারামজাদা? এ যেন হল খোদ রাজামশায়কেই ধরে পিটানো। বুঝবি ঠেলা! ফাটকে গিয়ে ঘানি ঘোরাতে হবে নিদেন পক্ষে দশটি বচ্ছর।

বলে দুর্লভ রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, আর্তনাদ শুনে ফিরে দাঁড়াল। এ যে নিতান্ত অভাবিত। হাত জোড় করে কেতুচরণ বলছে, ছেড়ে দিন দীনদয়াল, আর মারামারির তালে যাব না। কখনো না—কোন দিনও না। পিটিয়ে তক্তা করে ফেললেও ঘাড় তুলে তাকাব না। এই নৌকোর কাজেও আর থাকছি নে। মাছের সায়ের হচ্ছে, যা দুটো-একটা পয়সা আসে—ধর্মভাবে তাতেই চালিয়ে নেবো।

দুর্লভের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নেই। দুশমনের আকৃতি এই কেতুচরণের মুখ দিয়ে অনর্গল কাতর উচ্ছ্বাস বেরুচ্ছে, স্বকর্ণে শুনেও বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু আজকের ব্যাপারে যাই হোক—গাঙে খালে এরাই যে নৌকো মেরে বেড়ায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জলপুলিশ সদাসতর্ক, তবু তাদেরই চোখের উপরে যেন জাদুমন্ত্রে বাদায় ঢুকে যায়, পলকের মধ্যে কাজ গুছিয়ে সরে পড়ে। কি কারণে লোকটার হঠাৎ ধর্মে মতি হয়ে গেল, কিম্বা এ-ও নতুনতরো চালাকি কিনা, দুর্লভ ভেবে ঠিক করতে পারে না।

ছেড়ে দিন দেবতা। মারধোর আর যাচ্ছেতাই গালমন্দ করছিল—মাথাটা তাই কেমন বিগড়ে গিয়েছিল। ঘাট মানছি। বাঁধন খুলতে আজ্ঞা করেন—চোদ্দ পো মেপে নাকে খত দিয়ে যাচ্ছি দশজনার সামনে।

এলোকেশী বেরিয়ে এল এতক্ষণে। দু-জনকে কেতু পাশাপাশি দেখল কত বছর পরে। দেখে চর্মচক্ষু সার্থক হল। হাসবে কি কাঁদবে সে ভেবে পাচ্ছে না।

এলোকেশী বলে, ছেড়ে দাও ওকে। আমারই দোষ—যা করবে, আমায় করো। ও তো কোন দোষ করে নি—

দুর্লভ এক নজর এলোকেশীর দিকে তাকিয়ে বলে, আজকে না-ও যদি করে থাকে—এদিগরের যত চুরি-ছ্যাচড়ামি, সকলের মূলে এরাই।

এলোকেশী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, খাঁচা থেকে পালিয়ে ঐ যে আমি একটু গান শুনতে গিয়েছিলাম—গাঙে খালে না ডুবে বাঘের পেটে না গিয়ে সুভালাভালি নৌকোয় চড়ে ফিরে এসেছি—সেই রাগে সবশুদ্ধ তোমরা জ্বলে-পুড়ে মরছ। গোলমাল হয়েছে সেইখানটায়—জানি গো জানি—

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সে দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

দুর্লভ একটু ভেবে কেতুকে বলল, ছেড়ে দিতে পারি এক কড়ারে। বাদা-অঞ্চল ছেড়ে একদম তোকে চলে যেতে হবে।

কেতুচরণ এক কথায় রাজি হয়ে যায়।

আজ্ঞে—

সায়ের-টায়ের করা চলবে না।

আজ্ঞে না। চলেই যাবো।

॥ ঊনত্রিশ ॥

দুর্লভ ব্যাগ খুলছে। এলোকেশী আড়চোখে তাকিয়ে—চৌকাঠে বাঁ-হাত রেখে একটু কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মন ভারী, তাই এমনি উদাস ভাব। অন্য সময় হলে পৌঁছানো মাত্রই ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে নিজে খুলতে বসে যেত। জিনিসপত্রে—বিশেষ করে শৌখিন জিনিসে তার বড় রোখ। মার খাবার পরেও সে ভেবে-

চিন্তে ডজনখানেক জিনিসের ফর্দ করে দিয়েছিল। ফর্দটাই সান্ত্বনা হয়েছিল সেদিনকার নিদারুণ অপমানের।

মুখ তুলে বুড়ো-আঙুল নেড়ে দুর্লভ বলে, দেখ কি—টন-টন। একেবারে কিচ্ছু না। সব টাকা ফুঁকে গেল—জিনিস কিনব কি দিয়ে?

এলোকেশী বিশ্বাস করে নি—ভেবেছিল ঠাট্টা। কিন্তু সত্যি তাই। ব্যাগের মধ্যে সরকারি কাগজপত্র এবং দুর্লভের ময়লা ধুতি-জামা। এই মাত্র—আর কিছু নেই। খুলনায় প্রতি মাসে অন্ততপক্ষে একবার সে যাবেই—কিন্তু এমনটা হয়নি আর কখনো।

দুর্লভ বিরক্তভাবে গজর-গজর করছে, তিন কালের কাকভুষণ্ডী কিনা—সমস্ত খবর রাখে। মাসের গোড়ায় এই সময়টা মাইনেপত্তোর নিতে যাই, এটা-সেটা কেনাকাটা করে নিয়ে আসি। জমাখরচের হিসেব নিয়ে আগে থাকতে তাই ঘাঁটি আগলে ছিল। আর ক'টা দিন যেতে দেরি হলে শালার বেটা ঠিক জঙ্গল অবধি ধাওয়া করত।

এলোকেশী ক্ষীণ হাসি হেসে এইবা'র বলে, হলেন শ্বশুর—শালার বেটা কি—শালার বাবা বলো।

শয্যায় শোয়ানো ছেলেটার দিকে একবার সে তাকাল। পিলে-রোগা পেটমোটা উলঙ্গ—কোমরে কালো ঘুনসিতে এক রাশ মাদুলি। ঘুম ভেঙে গিয়ে পিট-পিট করে তাকাচ্ছে। এলোকেশী ব্যঙ্গের সুরে বলে, এইটি হলেন বুঝি জ্যোৎস্নাভূষণ? মরি মরি! কাচা-চাদর কালো দেখাচ্ছে—বলি, ঘামের সঙ্গে তোমার ছেলের গা দিয়ে কালি-গোলা বেরোয় নাকি।

দুর্লভ আশ্চর্য হল।

নাম-ধাম এত সমস্ত জানলে তুমি কি করে?

আরও অবাক করে দিয়ে এলোকেশী বলে চলেছে, ছেলে কার মতন হল? বাপ কালো—তা বলে এমন হতকুচ্ছিৎ তো নয়। মা'টি তা হলে সাক্ষাৎ অপ্সরী ছিল, বোঝা যাচ্ছে। তোমার সেই হৃৎপিণ্ডেশ্বরী সরসীবালা গো!

সে কি আজকের কথা!' নতুন বিয়ের পরে বউকে সকলেই প্রাণেশ্বরী হৃদয়েশ্বরী বলে চিঠি লেখে—দুর্লভ ঐ হৃদয়েশ্বরী সম্বোধনটাই আরো কিছু ফলাও করে হৃৎপিণ্ডেশ্বরী লিখেছিল। সরসীবালা স্বল্প বিদ্যায় ঐ বৃহৎ শব্দের মানে বুঝতে পারে নি—ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল। এলোকেশী বাক্স খুলে অতি-প্রাচীন সেই চিঠিখানাও পড়ে ফেলেছে।

অজ্ঞতার ভান করে দুর্লভ বলে, এত সব পাও কোথায় তুমি, বলো তো ?

হাত গণতে পারি।

এলোকেশী হি-হি করে হেসে উঠল। উৎকট হাসি। হিংসার জ্বলুনি হাসির মধ্যে। বলে, গলায় দড়ি দিয়ে মরলেন সেই হৃৎপিণ্ডেশ্বরী। কেন—হয়েছিল কি ?

দুর্লভ বিরক্তস্বরে বলে, সেটাও গণে বলো।

তোমার গুণে—

এরকম স্পষ্ট অভিযোগ দুর্লভ প্রত্যাশা করে নি। কৈফিয়তের ভাবে সে বলতে লাগল, আমি তো ছিলাম জঙ্গলে পড়ে- আমি কি জানি! সোনা বলে এক জোচ্চোরের কাছ থেকে পিতলের গয়না কিনেছিল পাঁচ শ' টাকার। কাউকে কিছু জানায় নি। ভয় পেয়ে শেষটা আত্মহত্যা করল।

তুমি গিয়ে পিটুনি দেবে, সেই ভয়ে।

গাঁয়ের মধ্যে সমাজ-সামাজিকতা রয়েছে—মেয়েলোকের গায়ে হাত তোলা যায় সেখানে ?

এলোকেশী বলে, বাদাবনে শুধু যায় ?

এ প্রসঙ্গ দুর্লভ আর চলতে দিতে চায় না। কাগজপত্র নিয়ে সুড়ুত করে বেরিয়ে আফিসঘরে ঢুকে পড়ল। অতি-সাবধানী মানুষ—স্ত্রীর প্রসঙ্গ কোনদিন ফাঁস করে নি এলোকেশীর কাছে। বাদাবাজ্যের বাইরে যে তার ঘরবাড়ি ও আপন-জন আছে—এলোকেশী বলে নয়, এ অঞ্চলের কাউকে জানতে দিতে চায় না। সে আর-এক জীবন—এ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক নেই সেখানকার।

টাকা পাঠায়—ব্যস, এই অবধি। এবং কালেভদ্রে যখন বাড়ি যেত, খুলনা ছাড়বার সময় কালীবাড়ির ঘাটে স্নান করে যা-কিছু ক্লেদ-কালিমা নদীজলে ধুয়ে মুছে গ্রামের গৃহাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়াত।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, এদিকের সমস্ত খবর দেশে-ঘরে ছড়িয়ে গেছে—আবার ওদিককার বৃত্তান্তও কিছু অজানা নেই এলোকেশীর কাছে। পুরানো নির্দোষ চিঠি দুর্লভ ইচ্ছে করে দু-একটা বাক্সে রেখে দিয়েছে।···আর ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবতে ভাবতে মনে হল, শ্বশুরের শেষ চিঠিটা ছেঁড়া হয় নি সম্ভবত। সেইটে হাতে পড়ল নাকি? তাই, নিশ্চয় তাই। ঐ এক চিঠিতে অনেক কথা ছিল। সোয়াস্তিও পেল সে এই ব্যাপারে। পড়েছে তো পড়েছে, ভালই হয়েছে—মুখে কিছু বলতে হল না। এলোকেশীর কাছে ছেলের প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে অনেক রকম ভূমিকা করতে হত। নিজেই জেনে নিয়েছে, আর কোন হাঙ্গামা রইল না। মেয়েমানুষ পড়তে লিখতে জানলে এই এক বিপদ। এইজন্যই দুর্লভের এত সতর্কতা।

সরকারি চিঠি ছাড়া সমস্তই সে পাঠমাত্র ছিঁড়ে ফেলে। দু-একবার কদাচিৎ ভুলভ্রান্তিও যে না হয়, এমন নয়। যেমন এই এবার। ক'খানা সরকারি জরুরি চিঠির সঙ্গে বেমালুম মিশে গিয়েছিল—হাতবাক্সে সরকারি কাগজপত্রের সঙ্গে সে রেখে দিয়েছিল। দুর্লভ বাসায় না থাকলে এলোকেশী এটা-সেটা হাতড়ায়। এটা স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে—মানুষজনের দেখা পায় না, কাজকর্মও এমন-কিছু নেই। কি করবে একা একা? দুর্লভ টাকাপয়সা যদি অসাবধানে রেখে যায়, এলোকেশী গাপ করে। সৌভাগের মেলায় তার নতুন কীর্তি জানবার পর এলোকেশীর কৌতূহল আরও বেড়েছে—আতর-সম্পর্কীয় বা ঐ ধরনের আর কোন তথ্য জানা যায় যদি! হাতবাক্স বন্ধ করে দুর্লভ নিশ্চিন্ত হয়ে বেরোয়, কিন্তু এলোকেশীর ট্রাঙ্কের একটা চাবিতে বাক্স খোলা যায়, দুর্লভ তা জানে না। বাক্স খুলে খুঁজতে খুঁজতে এলোকেশী দুর্লভের শ্বশুর বৈকুণ্ঠ ধরের চিঠিটা পেয়ে গেল।

ঝাঁপায় দুর্লভের শ্বশুরবাড়ি—সেখান থেকে বৈকুণ্ঠ লিখেছেন। খুব কড়া কড়া বচন। চিঠি পড়ে এলোকেশী সেই প্রথম জানল, দুর্লভের ছেলে আছে, এবং তার অতি শৌখিন নাম—জোৎস্না-ভূষণ। দুর্লভের যে বিয়ে হয়েছিল, সেটা একদিন কথায় কথায় বেরিয়ে পড়েছিল। তা সতীলক্ষ্মী স্বর্গে গিয়েছে, আপদ চুকে গেছে--এলোকেশী মাথা ঘামায় নি ঐ নিয়ে। কিন্তু বৈকুণ্ঠর চিঠিতে জানতে পারল, গলায় দড়ি দিয়ে সে স্বর্গের পথ সংক্ষেপ করে নিয়েছিল দুর্লভের জীবনপথে কাঁটার মতো ন-মাসের একটি শিশু নিক্ষেপ করে। বৈকুণ্ঠ এতদিন তাকে প্রতিপালন করে এসেছেন—দুর্লভ কিছু কিছু খরচ পাঠিয়েছে এইমাত্র। ইদানীং মাস আষ্টেক আর ফুরসত পায়নি খবরাখবর নেবার। টাকা পাঠানো চুলোয় যাক, পোস্টকার্ডে দুটো ছত্র লিখেও খবর নেয় নি। বিস্মৃতির কারণ অবশেষে অবগত হয়ে ক্ষেপে গেছেন শ্বশুরমশায়। বাদাবনের ক্রিয়াকাণ্ড লোকের মুখে মুখে জনালয়ে পৌঁচেছে—রীতিমতো পল্লবিত হয়েই পৌঁচেছে--চিঠির মারফতে জামাই-সম্ভাষণের বহর দেখে সেটা বোঝা যায়। বিশেষণগুলো এক। দুর্লভ সম্পর্কে নয়—এলোকেশীকে সুদ্ধ জড়িয়ে। জ্যোৎস্নাভূষণের বোঝা আর বইবেন না—সাফ জবাব দিয়েছেন। অবিলম্বে ব্যবস্থা না করলে নিজে এসে ছেলে রেখে যাবেন, শাসিয়েছেন চিঠিতে।

সরকারি বোট সাত দিন অন্তর জলে দিতে আসে। চিঠিপত্র থাকলে দিয়ে যায় ঐ সময়ে। জঙ্গলের বাইরে গতিমান জগতের সঙ্গে একটুকু মাত্র সংযোগ। কিন্তু ডাকের জন্য দুর্লভের মাথাব্যথা নেই। আগে একটা সাপ্তাহিক খবরের-কাগজ আসত, অনাবশ্যক বলে তা-ও ছেড়ে দিয়েছে বহু দিন। চিঠি দু-এক মাস না এলেও সে দৃকপাত করে না। এমন অনেক দিন হয়েছে, জল নামিয়ে দিয়ে তখনই ফিরতি-গোন পেয়ে বোট চলে গেছে; চিঠি এসেছে—ব্যস্ততার জন্য চিঠি দিয়ে যেতে ভুল হয়ে গেছে মাঝির। পরের ক্ষেপে সেই চিঠি এনে দিল। দুর্লভ তা নিয়ে এতটুকু অনুযোগ করে না। ভুলে গেছে তার আর কি হবে? বরঞ্চ হো-হো করে

হেসে রসিকতা করে : ভুলেছিলি—তবে আবার মনে পড়ল কেন রে ? বলি, নৌকোয় রান্নাবান্না করিস তো—উনুনে দিতে পারলি নে ? অনেক ঝঞ্ঝাট চুকে যেত।

চিঠিপত্র সমস্ত প্রায় এক ধরনের—না পড়েই দুর্লভ মর্ম বুঝতে পারে। দেশের বাড়ির বৈমাত্রেয় ভাইরা এবং ঝাঁপার শ্বশুর-মশায়—এঁরাই সব চিঠি লিখে থাকেন। প্রথম অংশে থাকে দুর্লভের শারীরিক মঙ্গলের জন্য অশেষ ব্যাকুলতা ও আশীর্বাদ—সেটা আসল বস্তু নয়, চিঠির বাহার শুধু—লিখতে হয়, তাই লেখেন। শেষাংশে পত্র-লেখকের দায়-বেদায়ের বিস্তারিত সংবাদ। নির্গলিতার্থ, টাকা পাঠাও। অতএব চিঠির অভাবে দুর্লভ উদ্বেগ বোধ করে না। বরঞ্চ মনে মনে আরাম পায়।

দুর্লভ খুলনায় যাবার পর এবারই এলোকেশী আবিষ্কার করেছে বৈকুণ্ঠের চিঠিটা। পড়ার পর থেকে রাগে গরগর করছে।

ছেলেটা ট্যা-ট্যা করে কাঁদছে—ক্ষিধে পেয়েছে। এলোকেশী তাকিয়ে দেখে না। যার ছেলে সে গিয়ে দেখুক, দুধ খাওয়াক, আদর-সোহাগ করুক। এলোকেশী পোর উঠবে না।

দুম-দুম পা ফেলে সে উঠানে নামল। চিঠির প্রসঙ্গ উঠে মনের ভিতরটা জ্বলছে যেন। পেতো একবার বৈকুণ্ঠ-বুড়োকে—তার সঙ্গে কোন্দল করে বুঝত। এলোকেশীর কতটুকু দোষ, গুণধর জামাইয়ের সঙ্গে তার নাম কেন জড়ানো ? বাদাবন অবধি আসতে চেয়েছিল, তাই যদি আসত—ভাল হত, চমৎকার হত। শুধু এলোকেশী নয়, এখন নতুন আর এক আতরবালা জুটেছে—সমস্ত জেনে বুঝে, একদিন বরঞ্চ মৌভোগ অবধি গিয়ে চর্মচক্ষে দেখে কৃতকৃতার্থ হয়ে যেতো বুড়ো। আর কী আশ্চর্য দেখ, দিন কুড়িক এই চিঠি এসেছে—দুর্লভের ভাব-ভঙ্গিতে কোন লক্ষণ নেই যে সে তিলমাত্র বিচলিত হয়েছে। এলোকেশী মনে মনে আরও একটা হিসাব করল। বউ গলায় দড়ি দিয়েছিল প্রায় দু'বছর আগে—তখনও তিলেকের তরে সে দুর্লভের মুখ শুকনো দেখে নি। হাঁ—খুব ভেবে দেখেছে—রোজ যেমন সে কাজকর্ম করে, রাগ করে আবার হঠাৎ এলোকেশীকে আদর করে—তখনও অবিকল সেইরকম।

॥ তিরিশ ॥

বাদাবনে নিশিরাত্রে নৌকোর চলাচল বড়-একটা নেই। পুরন্দর ও লা-ভাঙার মোহানার কাছাকাছি ইদানীং যাদের নৌকো বাঁধা থাকে, ঘুম ভেঙে হঠাৎ খাড়া হয়ে বসবে তারা। ঢোলের আওয়াজ। আর বিশ্রী বেতালা গান। আমি শুনেছিলাম একবার। শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে-সব কিছু নয়, দানো-পোড়ো নয়—গয়নার-নৌকার আর পাঁচটা সোয়ারি আমায় বুঝিয়ে দিয়েছিল, মানুষই গাইছে। সাঁইতলার উমেশ মোড়ল—ওমশা।

ওমশা একেবারে বুড়িয়ে গেছে। পাকা চুল, খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাড়ি, তোবড়ানো মুখ, আলকাতরার মতো গায়ের রং। খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত দুপুরে অত পথ ভেঙে সে খুশালদের নতুন সায়েরে আসে। এইখানে তার গানের আড্ডা। কলুইমারি পার হয়েও ক্রোশখানেক হাঁটতে হয়। ওদিকটা পুরোপুরি আবাদ জায়গা এখন—কিন্তু রাস্তাঘাট তৈরি করে শ্রমের অপব্যয় কেউ করে না। দুই জমির সীমানা ঠিক করবার জন্য সরু আ'ল—সেই আ'লপথে পথিকজন যাতায়াত করে। উমেশের চোখে তেমন নিরিখ নেই, দিনমানেও সে আ'লের উপর দিয়ে হাঁটে না—একটু এদিক-ওদিক হলে পড়ে গিয়ে পা ভাঙার সম্ভাবনা। তার পথ তাই মাঠের উপর দিয়ে। খালে বাঁশের সাঁকো আছে। বাঁশ দুষ্প্রাপ্য এসব দিকে। বাঁশের ভরা আসে অবশ্য মাঝে মাঝে—সে বাঁশের দাম অত্যন্ত বেশি। আর এক রকমে বাঁশ সংগ্রহ করে—দশ ক্রোশ পনের ক্রোশ অবধি হাঁটতে হাঁটতে চলে যায়। সস্তা-গণ্ডায় বাঁশ কিনে নদী বা খালের জলে ভাসায়। সুবিধা পেলে কেনেও না। বাঁশ কেটে কঞ্চির ছোটা দিয়ে বেঁধে জলে ভাসাতে পারলেই হল। সেই বাঁশের আঁটি ভাঁটার স্রোতে ভেসে ভেসে চলে, কুড়াল ইত্যাদি নিয়ে মানুষ চুপচাপ বসে থাকে আঁটির উপর। জোয়ারের সময় তীরের

কাছে চাপান দেয়। এমনি করে অবশেষে বাঁশ নিয়ে পৌঁছয়। এ বাঁশ খুব হিসাব করে খরচ করতে হয়। ঘরের খুঁটি-চাল গরানের ছিটের তৈরি, ছাউনি গোলপাতার—বাখারির জন্যই কেবল ছটো-পাঁচটা বাঁশ অত্যাবশ্যক।

এই মহামূল্যবান বাঁশে তৈরি খালের সাঁকো। ছটো লম্বা বাঁশ এপার-ওপার ফেলা। ধরবার জন্য গরানের ছিটে—তা-ও নেই এখন, নৌকোর গতি দ্রুততর করবার জন্য লগি ঠেলার কাজে লাগিয়েছে তার এক একখানা খুলে নিয়ে।

সাঁকোটুকু পার হতে উমেশের ভারি কষ্ট হয়। বাঁশের উপর দিয়ে পায়ের আন্দাজে চলে। এর উপর ধরবার কিছু না থাকায়, বাজিকরে যেমন দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে খেলা দেখায়, তেমনি অবস্থায় পড়ে যায় সে। ভয় করে। একদিন পা কেঁপে সত্যিই পড়ে যাবার দাখিল হয়েছিল।

এই ছুর্গম পথে প্রতি রাত্রে ঢোলক কাঁধে উমেশ যাবেই সায়েরে। ছটো ঘর বাঁধা হয়েছে পাশাপাশি। একটায় গোলপাতার বেড়াও ছিল খানিকটা উঁচু অবধি। এইটে দলের আস্তানা। ফঙ্গবেনে বেড়া—মরদ-মানুষের দাপাদাপিতে এরই মধ্যে ভেঙে প্রায় নিশ্চিহ্ন। বাসাঘরের কিছুমাত্র অবরোধ নেই কোনদিকে। ছাউনিও পুরোপুরি হয়ে ওঠে নি। যারা আসে সবাই এয়ার-বন্ধু লোক, তাই নতুন বেড়া বাঁধা বা ছাউনি শেষ করার প্রয়োজন বোধ করে না তারা।

সন্ধ্যারাত্রে সকলে মিলে তাড়ি খায়, ফড় খেলে। ঝনাঝন পয়সা সিকি-ছুয়ানি বাজি ধরে কাপড়ে-ছাপা ইস্কাপন-রুইতন-হরতন-চিড়িতনের উপর। টেমি জ্বলে। ফাঁকার মধ্যে হাওয়ায় আলো নিভে যায় বলে চৌখুপিও কিনেছে একটা। পয়সাকড়ি লেনদেনের ব্যাপার আছে, তাই খেলার সমস্ত সময়টা আলোর প্রয়োজন। খেলার শেষে টেমি নিভিয়ে দেয়—অকারণ কেরোসিন পোড়ায় না। হয়তো বা মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে চারিদিক থমথমে হয়ে আছে, পাড়ের উপর জলতরঙ্গ কলধ্বনি করছে। আলো নিভিয়ে জন পাঁচ-সাত গোল হয়ে বসেছে ছরন্ত পুরন্দরের কূলে নিঃশব্দ প্রেত-মূর্তির

মতো। গাঁজার কলকে ফিরছে হাতে-হাতে। টানের চোটে দপ করে হঠাৎ জ্বলে ওঠে কলকের মাথা। উগ্র কটু গন্ধে চারিদিকে ভরে যায়। কলকে শেষ করে সকলে উঠে পড়ে। নৌকো নিয়ে মাছ মারতে বেরুবে কেউ কেউ, আর সরকারি রিজার্ভ-জঙ্গলে ঢুকবার প্রয়োজন হয়তো আছে কেতুচরণ এবং গোল-পাঁচু বা ঋবিবরের।

আর যদি না বেরুনো হল তো কেতুচরণ শুয়ে পড়বে এবার। ঘুমুবে। নৌকো-সংগ্রহের পর থেকে শোওয়ার বড় জুত হয়েছে—নৌকোয় সে থাকে ভাল। মশা কম জলের উপর।

আর সকলে ডাঙায় শোয়—শীতকাল বলে এখন ঘরের মধ্যে। অন্য সময় দুধের মতো শাদা কোমল চরের উপর পড়ে থাকবে, এই ঠিক করেছে। মাঝে অকাল-বর্ষা নামল ক'দিন - রাতে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি আসত। সেই সময়টা কিছু বিব্রত হয়ে পড়ে। সঙ্কল্প করে, বাসাঘরের অন্তত একটা পাশে গোলপাতা বা হোগলার বেড়া দিয়ে নেবে কালই। কিন্তু দিনমানে মনে থাকে না। ঘুম এদের নিতান্তই যেন পোষ-মানা। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাসাগর্জন। যখন পাশ ফেরে, শব্দ শুনে মনে হয়—পর্বত ধ্বসে পড়ল বুঝি কোনখানে। জঙ্গল-রাজ্যে মশার উৎপাত খুব। মশা নয়, ভীমরুলের বাচ্চা—খুশাল রসিকতা করে বলে। আকারে তো বটে, হুলের জ্বলুনিতেও। ঘুমের মধ্যে মরদ-জোয়ানরা মশা মারার চেষ্টায় চটাপট গায়ে চাপড় মারে। মনে হবে, গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ চলেছে। আর ওদিকে চপাচপ ঢোলক বাজাতে থাকে উমেশ। ঢোলক বাজায় আর গান গায়।

গান-বাজনা লহমার জন্য যদি বন্ধ হয়ে যায়, ঘুম ভেঙে কেতুচরণ ডিঙি থেকে হাঁক দিয়ে উঠবে: হল কি মোড়ল?

উমেশ সচকিত হয়ে বলে, গলা ভেঙে গেছে ভাই কাঁচা-তেঁতুলের ঝোল খেয়ে।

কেতু আদেশ করে, হাও ভাঙে নি তো—হাতে বাজাও।

বাজনা শুরু হয়। দু'হাতের প্রচণ্ড পিটুনি। পরম আরামে কেতুচরণ আবার চোখ বোজে।

ভাঁটার জল নেমে যায় খাল দিয়ে। রাত শেষ হয়ে আসে। বাছড়ের ঝাঁক দূর অঞ্চল থেকে জঙ্গলের দিকে ফেরে। হরিণের ডাক শোনা যায় নদীর ওপার থেকে। বুনোহাঁসের কলধ্বনি। উমেশের গান-বাজনা একটানা চলেছে। গাইতে গাইতে এক সময় অবশেষে লা-ভাঙার কিনারে এসে দাঁড়ায়।

রাত শেষ হয়ে আসে। একটা-দুটো করে মেছো-নৌকো ফিরতে থাকে। এসে মোহানার ঘাটে লাগে। সায়ের জমবে, বেচাকেনা শুরু হবে এইবার। আসরের শেষ—উমেশের আর এখানে ঠাঁই নেই। ধীরে ধীরে চলে যায় লা-ভাঙার তট বেয়ে। ওপারে ঘন অরণ্য—নিরবচ্ছিন্ন। এপারে আবাদ। ঢোলক বাজাতে বাজাতে এই আঁকাবাঁকা ঘুরপথ বেয়ে সে বাড়ি ফেরে।

বাদাবন মানষেলার মতো নয়—মানুষের বাঁধা হিসাব সব সময় খাটে না এখানে। পদ্ম বা আর কেউ মরে গেছে—অমনি যে সঙ্গে সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকে যাবে, এ-রীতি এখানকার নয়। জালের দড়ির মতো নদী-খালের শত পাকে-বাঁধা বনের মধ্যে অগণ্য জন্তু-জানোয়ার—ভয়ের আছে, আদর করে পোষ মানাবারও আছে। এসব ছাড়া আরও তো আছেন—মৃত্যুর অতীত হয়ে নির্জন বন-অঞ্চল জুড়ে রয়েছেন যাঁরা। শুধু আমি, উমেশ বা দুকড়ি নয়—যে কেউ বাদাবনে যায়, জিজ্ঞাসা করে দেখো তাকে।

কেউ শুনতে চায় না উমেশের গান—একমাত্র কেতুচরণ ছাড়া। আর সেকালে সেই একজন ফরমায়েস করত—পদ্ম, যতদিন না পদা এসে পড়েছিল তাদের মধ্যে। আর সবাই হাসে, ঠাট্টা করে—কেতুচরণ উপস্থিত না থাকলে খুশাল তাকে এমন কি মারতেও গিয়েছে গান গেয়ে বিরক্তি-উৎপাদনের জন্যে। উমেশের দু-চোখ জলে ভরে আসে। চিরটা কাল একই ভাবে গেল। পারের খেয়ায় হরি ঠাকুর, যেদিন তোমার কাছে গিয়ে পড়ব, তুমিও হাসবে কি এই রকম? ঠাট্টা করবে? পদতলে ঠাঁই দেবে না?

চারিদিক নিঃশব্দ। আরও পাঁচ-সাতটা নৌকো এসে জমবার পর চোরাই মাছের ঝাঁকা একে একে নিয়ে তুলবে সায়েরঘরে,

দরদাম হাঁকেডাকে সায়ের সরগরম হবে। এরই ফাঁকে উমেশ হরি ঠাকুরকে ডেকে নেয়।

বাজাতে বাজাতে সে চলে এগিয়ে—আরও এগিয়ে। রোজই যায় এমনি। মানুষে তাচ্ছিল্য করে, কিন্তু অরণ্য করে না। অরণ্য তাল দেয় তার বাজনার সঙ্গে। অরণ্যের অন্ধকারে অদৃশ্য বিমুগ্ধ শ্রোতার দল বুঝি উৎকর্ণ হয়ে শোনে। স্রোতের একেবারে কিনারে হঠাৎ এক সময় উমেশ থমকে দাঁড়িয়ে যায়। বেশ খানিকটা দূরে এসে গেছে সায়ের থেকে। ওপারের দিকে চেয়ে গান ধরে সে আবার। জীর্ণ শরীর, কিন্তু গলায় জোর আছে। কনকনে শীতের হাওয়ায় প্রায় খালি-গায়ে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে সে গাইছে। পদ্ম যেটা শুনে যাচ্ছেতাই নিন্দে করেছিল, এতদিন রপ্ত করে ফেলেছে সে গান :

জল আনিবার করে ছলা
কদমতলায় দেখিস কালা,
কালার পীরিতি লেগে হইল বড় জ্বালা রে—

হইল বড় জ্বালা রে—নানা তান-কর্তবে গানের শেষটুকু বারম্বার গায়। ঘনঘোর আরণ্য রাত্রে ইহলোক-পরলোকের বাধা বিলীন হয়ে গেছে। এপারে-ওপারে মিলিত আসর—এ আসরে গেয়ে গেয়ে তার আশ মেটে না। একই পদ বারম্বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেন পাগল হয়ে গাইছে।

নিস্তব্ধ শেষ-যামে সেই গান চলে যায় সায়েরের ঘাট অবধি। ঘাটের লোকজন বলাবলি করে, পাগলটা গাইছে। চলতি মেছো-নৌকা থেকে কেউ বা রসিকতা করে—ঝপ্ ঝপ্ করে একবার দাঁড় ফেলে সেই তালে চেঁচিয়ে ওঠে, বাহবা!

অরণ্যের দিক থেকে সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি আসে, বাহবা!

উমেশ সচকিত হয়ে তাকায়—সত্যি কেউ তারিফ করে উঠল নাকি ওপার থেকে?

সেই যে হঠাৎ অকাল-বর্ষা নেমেছিল পৌষ মাসের দিনে। বৃষ্টি, বৃষ্টি—এমন আর দু-চার দিন চললে খোলাটের ধান পচে

গোবর হবে। কারো মনে সুখ নেই। মেলা খা-খা করছে—ঘর থেকে বেরুচ্ছে না কেউ।

কিন্তু উমেশের কামাই নেই—যথারীতি এসে জুটেছে। এখন ভাবছে, না এলেই হত ভাল। আড্ডা জমল না—জেলে-ব্যাপারি কেউ আসে নি, শুধু এরা নিজেদের এই কয়েক জন। পথঘাট বিষম পিছল—উমেশ অন্ধকারে ঠাহর করতে পারে নি, নালার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে পা মচকে গেছে। এতখানি পথ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসেছে। আবার অনতিপরেই ফিরতে হল সকাল-সকাল। এমন অন্ধকার যে গলায় ঝোলানো ঢোলকটাই ঠাহর করা দায়। বাতাস বইছে হু-হু করে—বাদাবনের বাসিন্দা পোড়ো-দানোর দল যেন অরণ্য-সীমার বাইরে এসে তোলপাড় লাগিয়েছে। শীতের শীর্ণ গা-ভাঙা সহসা জলোচ্ছ্বাসের আনন্দে ছলাত-ছলাত করে ঘা দিচ্ছে বাঁধের গায়ে। উমেশ শুকনো ডাল হাতে নিয়েছে লাঠির মতো করে—সেই ডাল ঠুকে ঠুকে পথের আন্দাজ নিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে এগুচ্ছে। এত কষ্টের ভিতর মুখে গান আসে না। আর ঢোলক বাজাবে—তারও এক হাত লাঠির দরুন আটকা। শুধু বাঁ-হাতে বাজনা জমবে কেন?

হঠাৎ সর্বদেহ কেঁপে উঠল। নিশিরাত্রের স্তব্ধতা চূর্ণিত করে পরিত্রাহি আর্তনাদ। মেয়েলোকে চেঁচাচ্ছে—অনেকগুলো গলা। পুরুষের গলাও পাওয়া যাচ্ছে। হাঙ্গামা বেধে গেছে রীতিমতো।

কান খাড়া করে শুনল উমেশ। দূর আছে, তা বলে কি করা যাবে, খোঁড়া পায়ে দৌড়চ্ছে। গিয়ে হাঁ-হাঁ করে পড়ল।

কি করছ তোমরা? নারী হলেন লক্ষ্মী-ভগবতী—জিহ্বাগ্রে অকথা-কুকথা আনছ ওঁদের সম্পর্কে? ছি-ছি-ছি—

একটি মেয়ে কর-কর করে ওঠে: দেখ—তাই দেখ। শুধু বুঝি মুখের কথা? কিল-ঘুসি ঝাড়ছে। উঃ, শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে ঘুসি মেরে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি নে।

লজ্জা যেন উমেশেরই। সে মরমে মরে গেছে। গলা শুনে একজনকে চিনেছে—টিকে সর্দার। তারই নাম ধরে উমেশ বলে,

অমন রায়বাবুর সংসর্গে থেকেও তোমার হীন প্রবৃত্তি গেল না টিকে ? অবলা মেয়েছেলের গায়ে হাত তুললে—রায়বাবুর কানে গেলে কি বলবেন ?

টিকে রাগে জ্বলছে। উমেশের অনুকৃতি করে বলে, তোমার অবলা মেয়েছেলেরা এক-এক পোর্টম্যান্টো ঘাড়ে করে রাত দুপুরে সরে পড়ছিল। মেয়েছেলে বলো কাদের ওমশা, সবাই এরা মাগী আর বেটি। আর দলের সেরা শয়তানী হল এই হারামজাদী—আতর পেশাকার।

অন্ধকার হলেও আন্দাজ করা গেল, কথার সঙ্গে সে আবার এক ঝাঁকুনি দিল আতরবালাকে ধরে।

হাঁপাচ্ছে এখনো। আধ ক্রোশ ছুটে এসে তবে এদের ধরেছে—রাগের কারণ আছে সত্যি। মেলার খানিকটা অংশ টিকে সর্দার ইজারা নিয়েছে। রায়-এস্টেটে একটা থোক টাকা দিতে হবে, সেই টাকা মিটিয়ে তার উপর যা পাবে সে তার নিজের। যত খাতিরই থাক, মধুসূদন এস্টেটের প্রাপ্য একটি পয়সাও ছাড়বার মানুষ নন। পৌষ মাস শেষ হয়ে যায়—মেলা ভাঙবে এইবার। মেয়েগুলো খোঁজ রাখে আবার মেলা বসছে কোন অঞ্চলে। সেখানে গিয়ে ছাপড়া তুলবে নতুন প্রেমিকাদের সন্ধানে। তা যাক না—চিরকাল থাকতে আসে নি, কে তাদের ধরে রাখছে ? সুখের পায়রা—যেখানে লোকের সমারোহ, সেইখানে গিয়ে চলানি করবে, এ আর নতুন কথা কি! কিন্তু জায়গার ভাড়া মিটিয়ে সকল দায়-দেনা চুকিয়ে দিয়ে দিনমানে সকলের চোখের উপর দিয়ে হাসিমুখে পান চিবোতে চিবোতে গেলেই তো হয়।

তা নয়—ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছিল টিকে সর্দারকে একটা পয়সা না ঠেকিয়ে। ভেবেছিল টের পাবে না। সাঁকো পার হতে পারলেই ভিন্ন এলাকা—তখন এই কলা! কী সর্বনাশ হত, আন্দাজ করো দিকি! ভিটে-মাটি বেচেও তো টিকে মধুসূদনের দেনা শুধতে পারবে না। এ অবস্থায় রাগ সামলাতে পারে নি—

স্বীকারই করছে, এক-আধটা চড়-চাপড় দিয়েছে। তা-ই বা কেন—দিয়েছে কিল-ঘুসিও। কার গায়ে লাগল আর কে বেঁচে গেল—অন্ধকারে ঠাহর করে দেখে নি। পোর্টম্যাণ্টোগুলো টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে নিয়েছে, যার মধ্যে যাবতীয় সৃষ্টি-সংসার পুরে মাথায় তুলে অবলা নারীদল ভীম-বেগে ছুটছিল।

উমেশ জিভ কেটে বলে, তা যা-ই বলো—পশুর ব্যবহার করেছ বাপধন টিকে। এমন কাজ মানুষে করে না।

দরদের কথায় আতরবালা হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে।

তোমার দশ টাকা খাজনা কোত্থেকে দেবো বলো? বুনো বাদায় খদ্দেরপত্তোর আসে নাকি?

টিকে বলে, বাদার দোষ কি! তুই মাগী উড়নচণ্ডী, হাজার টাকা পেলেও নেশা-ভাঙ করে এক রাত্রে সাবাড় করে দিস। তোর জুত হবে কেমন করে? তোর দুঃখ কখনো ঘুচবে না।

হুঁ, ভারি সব খদ্দের! একজনে একদিন আট গণ্ডা পয়সা দিল তো অষ্ট প্রহরে আর কোন শালার পাত্তা নেই। রায়বাবুর নাম শুনে নতুন জায়গায় এসে শুক্‌খুরি করেছি। ঘটিবাটি বেচে পেট চালিয়েছি। সর্বস্ব গেছে—এখন আর কোন সম্বল নেই।

কী আছে না আছে, খুলে দেখা যাবে কাল দশের মুকাবেলা—

টিকে ও তার সঙ্গে যারা এসেছে—এক একটা পোর্টম্যাণ্টো মাথায় নিয়ে ফিরে চলল মেলার দিকে। মেয়েগুলো আর্তনাদ করে ওঠে, মাইরি, মা বনবিবির দিব্যি, কিচ্ছু নেই ওতে—একেবারে খালি।

এত ভার কিসের, ইটপাটকেল পুরে রেখেছিস নাকি? তা চেঁচাচ্ছিস কেন এত? কিছু না থাকে, তোরা বেঁচে গেলি। কী আর নেবো? ও কি, ফিরছিস কেন রে? কিচ্ছু যখন নেই—চলে যা যেমন যাচ্ছিলি।

মেয়েগুলোও ছুটছে এদের পিছু পিছু। আর উমেশও, দেখা গেল, বাড়ির দিকে গেল না—ঐসঙ্গে চলেছে। ডাকছে: শোন ও টিকে সর্দার, নারীর হেনস্থা কোরো না—অমঙ্গল হবে। কত

আর তোমার পাওনা হবে। আচ্ছা, আমি দায়িক রইলাম—ওরা না দেয় আমি দেবো। খোরাকি ধান আছে—ধান বেচে তোমার ঋণ শুধব। আমার ঢোলক বিক্রি করব। মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলো না, তাদের অকথা-কুকথা বোলো না।

॥ একত্রিশ ॥

দুর্লভের হাত এড়িয়ে কেতুচরণের ফিরে আসতে সেদিন অনেকটা রাত্রি হয়ে গেল। সায়ের-ঘরে ফড়খেলা চলছে তখনো। তিনটে রসের ভাঁড় গড়াচ্ছে এক দিকে। তিন-তিনটে যখন, আসর আজ জমজমাট। কেতু ছিল না, তা বলে কারো দৃক্‌পাত নেই। আগের দিন সেই রাত দুপুর থেকে কত ঝড়ঝাপটা গেল তার উপর দিয়ে—কেউ এরা খবরই রাখে না। সোয়ারি নিয়ে একা একা কোন দিকে বেরিয়ে পড়েছে—এমনি একটা কিছু ভেবে নিয়েছে। আগেও সে বেরিয়েছে এমনধারা।

ফড়ের আড্ডায় নিঃশব্দে কেতু বসে পড়ল। একটা সিকি বের করে পুরোটাই রাখল রুইতনের উপর। সিকি গাচ্চা গেল। তবু সে একটি কথা বলল না। পথের সম্বল সিকিটা। অনেকদিন ধরে গাঁটে আছে বিড়িটা-আসটা কিনবে বলে। কিন্তু প্রয়োজন ঘটে নি, এর তার কাছে চেয়ে-চিন্তে স্বচ্ছন্দে চলে গেছে। সিকি হেরে যেন আপদ চুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তভাবে সে ডিঙিতে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

একটু পরেই খুশাল ঋষিবর আর গোল-পাঁচু আড্ডা ভেঙে চলে এল তার কাছে।

ঋষিবর বলে, কী যেন একখানা কাণ্ড হয়েছে মুরুব্বি?

খুশালও উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় ডুব দিয়েছিলে? গতিকখানা কি বলো দিকি তোমার?

সে কথা কানে না নিয়ে কেতুচরণ বলে, ওমশা কই? মবলগ রাত হয়েছে—ফৌত হয়ে গেল নাকি বুড়ো?

ঋষিবর বলে, সেই যে পড়ে গিয়ে পায়ে দরদ হয়েছিল—তারপর থেকে আসে না বড়-একটা। খোঁড়া হয়ে পড়ে আছে বোধহয় বিছানায়।

খোঁড়া না আরো-কিছু!

বিড়-বিড় করে প্রায় আত্মগত ভাবে বলল গোল-পাঁচু—আর কারো কানে গেল না।

খুশাল কেতুচরণের একেবারে শিয়রের উপর চেপে বসে বলল, কি হয়েছে খুলে বল্ ভাই। না শুনে নড়ছি নে। সমস্ত রাত্রি বসে থাকতে হয়, সে-ও স্বীকার।

কেতুচরণের বলতে যে আপত্তি আছে, তা নয়। কিন্তু বকবক করতে এ সময়টা ভাল লাগছে না। এক বিচিত্র দোলায় দুলছে তার মন। এলোকেশীকে সেই অনেক বছর আগে এক রাত্রে দুর্লভের বাসায় তুলে দিয়ে এসেছিল—কাল এক নৌকোয় যাবার সময় স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে,আবার সে আপনি মুঠোর মধ্যে চলে আসছে। খুশালকে তার কি বোঝাবে, আর সে বুঝবেই বা কি ছাই-ভস্ম?

তবু বলতে হল দু-এক কথা। দু-এক কথায় শেষ করে কেতুচরণ বলল, তুই সায়ের নিয়ে থাক খুশাল ভাই। আমি থাকব না। এ তল্লাট ছেড়ে আমায় চলে যেতে হবে।

গোল-পাঁচুর বিষম উৎসাহ।

সেই ভাল। শান্তিনগরে যাই চলো। নতুন এক আবাদের পত্তন করছে সেখানে। মাংনা জমি দিচ্ছে—তার উপরে পাঁচ বছরের খাজনা মকুব। আমার মামা চলে গেছে, আমরাও যাই চলো দল বেঁধে। বেবাক বড়লোক হয়ে যাবো। এ ঘোড়ার-ডিম সায়ের চালিয়ে কিছু হবে না। রায়বাবুর খাজনা আর তহরি-পরবি মিটিয়ে দিয়ে পেটের ভাতটা জোটানো যায় যদি বড় জোর। আর ক-দিন পরে মেলা অন্তে ডিঙিটা ঘাটে বসে থাকবে, সোয়ারি জুটবে না।

এমনি সময়—ক্ষীণ যদিচ—ঢোলের আওয়াজ এল। অসহিষ্ণু কণ্ঠে কেতুচরণ চেঁচিয়ে ওঠে: থাম্—

তাড়া না খেলে গোল-পাঁচুর উচ্ছ্বাস সহজে থামত না। মাথা তুলে কেতুচরণ একটুখানি কান পেতে শুনল।

হ্যাঁ, আসছে—ওমশা আসছে ঐ শোন—

গোল-পাঁচু বলে ওঠে, সে গুড়ে বালি। এখানে আসবে না। যেখানে যাবার, গিয়ে উঠেছে সেখানে অনেকক্ষণ।

ঋষিবর বলে, মাগীপাড়ার দিক দিয়ে বাজনা এলো যেন?

গোল-পাঁচু ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলে, তাই। খোঁড়া হয়েছে বলেছিলে—খোঁড়া না গুষ্টির পিণ্ডি! রোজই আসে। এসে ইদিকে নয়—সোজা পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে।

সন্দেহ প্রকাশ করে খুশাল বলে, নাঃ—কী বলিস! গান-টান শুনতে পাইনে তো! ওমশা এসে চুপচাপ থাকবে—কেউ জানতে পারবে না, তাই কি হয় কখনো?

হয়েছে আজকাল। বাকি্য হরে গেছে বুড়োবয়সে ধেড়েরোগে ধরবার পর থেকে। আজকেই কেবল ঐ ঢোলের একটু যা সাড়া পাওয়া গেল।

কেতু হুকুম দেয়: চলে যাও পাঁচু তুমি—বুড়োটাকে ধরে নিয়ে এসো পাঁজাকোলা করে।

আমি পারব-না। আর যে পারে যাক।

ভ্রূকুঞ্চিত করে কেতু বলে, কেন?

আমি ও-পাড়ায় ঢুকি নে। গা ঘিন-ঘিন করে।

ওরে আমার ধম্মপুত্তুর!

হঠাৎ রুক্ষ কণ্ঠে কেতু চেঁচিয়ে ওঠে: না পারবি তো চলে যা এখান থেকে। সবাই চলে যা। ভারি কষ্ট গেছে—আমি ঘুমোবো।

ঘুমোতে কিন্তু চায় না সে। উমেশের সম্পর্কেও তেমন আগ্রহ নেই। নিরিবিলি ভাববে এলোকেশীকে। না ঘুমিয়ে সারা রাত্রি ধরে ভাববে।

গতিক বুঝে এরা উঠে পড়ল। না উঠলে লাঠি-পেটা করাও বিচিত্র নয় কেতুচরণের পক্ষে। মেজাজ জানা আছে, রোখের মাথায় বন্ধুজন বলে সে রেহাত করে না।

যাবার মুখে খুশাল আপত্তি জানিয়ে যায়—ঘোরতর আপত্তি। গোল-পাঁচুর উদ্দেশে হুমকি দিয়ে বলে, বদ মতলব দিস নে বলছি পেঁচো। ভাল হবে না। শান্তিনগরে মন টেনে থাকে, একা-একা তুই চলে যা। দল জোটাচ্ছিস কেন?

গোল-পাঁচু বলে, গিয়ে যদি দেখতে একবার! মামা গিয়েছে, মামাতো-ভাইরা গিয়েছে—

খুশাল বলে, দূর—দূর! জলের তোড়ে ক'দিন টি'কবে নতুন আবাদের বালির বাঁধ? শান্তিনগর জলের নিচে চলে যাবে। মধু রায়ের এত তোড়জোড়—তিনি বলে নাকানি-চোবানি খেয়ে এলেন মধুনগরে আবাদ করতে গিয়ে! কোথাও তোমার যেতে হবে না কেতু—আমি বলছি, কোন ভয় নেই। কচু করবে দুর্লভ হালদার। রায়বাবুর রায়ত—আমরা কি দুর্লভের এলাকায় থাকি? মোটে যাবে না মর্জাল-অফিসের দিকে—কি করতে পারে সে দেখি। রায়বাবুকেও না-হয় শুনিয়ে রাখব কথাটা।

টপ-টপ টপা-টপ—

বাজনায় জোর দিয়েছে। উমেশ বাজাচ্ছে আতরবালার ঘরের মধ্যে বসে। আতর আজ গান শুনতে চাচ্ছে।

মর্জালের ওদিকে যেতে খুশাল এবং সঙ্গীসাথী সকলে মানা করে দিয়েছে। মানা শুনল না কেতুচরণ—দিন দুয়েক পরে গিয়ে উঠল সেখানে। পাছে এদের মধ্যে জানাজানি হয়ে যায়—ডিঙি নেয় নি, পায়ে হেঁটে একাকী চলে গেছে। ভক্তিযুক্ত ভাবে সে দুর্লভকে প্রণাম করল।

আবার কি রে? চলে যাস নি মৌতোগ ছেড়ে?

আজ্ঞে, যাবো। কাল-পরশুর মধ্যে চলে যাবো। পাদপদ্মে ক-টা মাছ নিয়ে এলাম। সায়েরের ঝড়তি-পড়তি সামান্য দু-চারটে। আজ্ঞে করুন—ঢেলে নিয়ে ঝুড়িটা ত'মায় দিয়ে দিক।

মাছের ঝুড়ি ডালা দিয়ে ঢাকা। ডালা সরিয়ে দুর্লভের মুখ হাসিতে ভরে গেল। পছন্দসই মাছ বটে! প্রকাণ্ড এক ভেটকি—

আর পারসে-ভাঙান-পায়রাচাঁদার গোনাগুনতি নেই। এমন সাইজের মাছ কদাচিৎ মেলে। নিয়েও এসেছে ঝুড়ির গলায় গলায়।

মেছো-নৌকো একের পর এক এসে সায়েরের ঘাটে লাগছিল, কেনাবেচার সোরগোল পড়ে গেল, ঝুড়িগুলো সায়ের-ঘরে নিয়ে তুলছিল একটা একটা করে—তারই এক ফাঁকে কেতুচরণ এই ঝুড়িটা সরিয়ে ফেলে। কাঁধে বয়ে আঁধারে আঁধারে পোয়াটাক পথ গিয়ে হেঁতালঝাড়ের ভিতর লুকিয়ে রাখে। ফিরে এসে যথাপূর্ব আবার ডিঙিতে পড়ে ঘুমোয়। নাক ডেকে ঘুমুচ্ছিল। মাছের ঝুড়ির জন্য খোঁজাখুঁজি পড়ে গেল ওদিকে। তবে মাছ এ অঞ্চলে সুলভ বস্তু বলে ভবিষ্যতে সতর্ক হবার সঙ্কল্প নিয়ে ব্যাপারটা একটু পরে চাপা পড়ে যায়। সেই ঝুড়ি কেতুচরণ সকালবেলা চুপিসাড়ে নিয়ে চলে এসেছে।

দুর্লভ উদার কণ্ঠে কেতুচরণকে নিমন্ত্রণ করে : খেয়ে যাস এখান থেকে—বুঝলি ?

আজ্ঞে—বলে দন্তপংক্তি বিকশিত করে কেতুচরণ ঘাড় নাড়ল। এলোকেশী এসে দাঁড়িয়েছে। বিস্রস্ত চুলের বোঝা—কালি-ঝুলি-মাখা কাপড়। রাগ করে সে দুর্লভকে বলল, মাছ পচবে—উপোস যাবে এবেলা। হাত-পা জ্বালিয়ে বাঁধাবাড়া করব নাকি ?

দুর্লভ বলে, সকালবেলাই যে হরিপদ কাঠ এনে দিল ?

এলোকেশী বলে, যেমন তুমি, তেমনি তোমার হাত-কাটা হরিপদ। বেগার-ঠেলা কাজ—আমি মরলাম কি থাকলাম সেজন্য কারো মাথাব্যথা নেই। যা সামনে পেয়েছে, কেটেকুটে এনে দায় সেরেছে। দেখ তো, কী দশা হয়েছে আমার !

কেতুচরণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে এলোকেশীর এই নূতন শ্রী। সাতমহলার উপর সিংহাসনে বসিয়ে রাখলে যাকে মানায়, সেই মেয়ে বাদারাজ্যে বাঁশের মাচার উপর রান্নাঘরে ভিজে কাঠে ফুঁ পাড়তে পাড়তে দু-চোখ রাঙা করে এসে দাঁড়িয়েছে।

একটা কুড়ুল নিয়ে কেতুচরণ তখনই রওনা হয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে ফিরল প্রকাণ্ড একবোঝা শুকনো কাউয়ের ডাল নিয়ে। সশব্দে সেই কাঠের বোঝা উঠানে ফেলল।

কিন্তু আবার এক গোলযোগ ঘটেছে, নিমন্ত্রণের স্ফূর্তি মাথায় উঠবার উপক্রম। অনবধানতায় জলের হাঁড়া ভেঙে চৌচির। দোষ দুর্লভের—অত আহ্লাদের এই পরিণাম। বড় ভেটকিটা ওজনে কত দাঁড়াবে, এই নিয়ে তর্কাতর্কি হচ্ছিল হরিপদর সঙ্গে। হরিপদর আঁচ আড়াই সের। আর দুর্লভ বলে, চার সেরের এক কাচ্চা কম হবে না। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—পাল্লা ও বাটখারা আফিসেই রয়েছে যখন, ওজন করে দেখা যাক। আবশ্যক হয় না বলে চালের কয়োর সঙ্গে তক্তা ঝুলিয়ে আর দশটা আজেবাজে জিনিসের সঙ্গে সেগুলো তোলা ছিল—পাড়তে গিয়ে হাত ফসকে সেরটা পড়ল মেটে-হাঁড়ার উপর। কত দূর থেকে কত কষ্ট করে বয়ে-আনা মিঠা জল স্রোত হয়ে মাচার ফাঁক দিয়ে নদীর নোনা জলে মিশেছে।

জলের নাম জীবন—বাদাবনে সেটা বোঝা যায়। জল নষ্ট করে দুর্লভ এতটুকু হয়ে গেছে, এলোকেশী গর্জে বেড়াচ্ছে সেই থেকে। আর কলহে হার-জিতের ব্যাপারই তো নয়—মাত্র একটি কলসি জল কর্পূর সহযোগে পানের জন্য আলাদা করা আছে, তাতে ক'টা দিন চলতে পারে?

জলের এখন কি উপায় করা যাবে, দুর্লভ ও হরিপদ শলাপরামর্শ করছিল। কাঠ নামিয়ে কেতু এসে দাঁড়ালে ব্যাকুল দুর্লভ তাকে সব বলল।

ভারি বিপদে পড়ে গেলাম রে! হপ্তার এখনো চারদিন বাকি। বাওয়ালির নৌকোও আসছে না যে, চেয়ে-চিন্তে চালিয়ে দোবা।

কেতু নিশ্চিন্ত কণ্ঠে অভয় দেয়: সে হয়ে যাবে হুজুর।

এলোকেশী ফরফর করে চলে যাচ্ছিল—থমকে দাঁড়িয়ে বলল, কি হয়ে যাবে? হওয়া অত সোজা নয়। কেন ভাওতা দিচ্ছ? কী দরকার ছিল পাল্লা-টানাটানির? জল বিনে এখন শুকিয়ে মরো—একে ওকে খোশামুদি করে কি হবে?

কেতুচরণ হেসে বলে, শুকিয়ে মরতে হবে না—মেজাজ খারাপ

কোরো না ঠাকরুন। খারাপ মেজাজে রান্নার জুত হবে না— খাওয়া বরবাদ হবে। কাঠ ছিল না—এই তো, কাঠের অভাব থাকল কি? কিছু আটকাবে না—একবার হুকুম ঝেড়ে দাও, ভূতে যোগাড় করে আনবে।

বোঝা থেকে কয়েকটা বড় ডাল খুলে নিয়ে সে বাঁধে চলে গেল। কাটারি দিয়ে টুকরো টুকরো করে রান্নাঘরে এলোকেশীর পিছন দিকে এনে রাখল কাঠগুলো।

কেতুর আশ্বাস পেয়ে খাবার জলের কলসি প্রায় কাবার করে এলোকেশী রান্না করেছে। রেঁধেছে অনেক রকম তরকারি— শেষ হতে বিকাল হয়ে গেল। দুর্লভকে খাইয়ে দিয়ে তারপর কেতু ও হরিপদর পাশাপাশি ঠাঁই করে দিল। কেতুচরণ ভাতটা কিছু বেশি খায়—আজকে তার উপর এমন তরকারি পেয়ে কত যে খেল, তার মাপজোপ নেই। দোষ এলোকেশীর—বসে থেকে খাওয়াচ্ছে। সব মেয়েমানুষের এই এক রীত—হাতের রান্না খাইয়ে তাদের আনন্দ।

জ্যোৎস্নাভূষণের খুব ক্ষিধে পেয়েছে বোধকরি—ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে ঘরের মধ্যে। এমন পরিপাটি ভোজনের ভিতর ছেলের কান্না কেতুচরণের বিশ্রী লাগে। খচখচ করে কাঁটার মতো বিঁধছে— মর্মের উপর। কিন্তু এলোকেশী কান্না শুনতে পায় না যেন— সামনে বসে মিষ্টি কথায় খেতে বলছে, হুমকি দিয়ে উঠছে কথা না শুনলে। খেয়ে তারপরে আর নড়বার জো রইল না— অফিসঘরের সামনে কেতু গড়িয়ে পড়ল খালি মাচার উপর। সেই একবার পদ্মদের বাড়ি খেয়েছিল—তেমনি অবস্থা।

দুর্লভ সেইখানে এসে তাগিদ দেয়: কি করবি, কর্‌ রে বাপু। তেষ্টার জল ঢোক হিসেব করে খেতে হচ্ছে। কাল থেকে তা-ও জুটবে না।

কেতুচরণ একটু ঠোক্কর দিতে ছাড়ে না।

করতে তো পারি দেবতা—কিন্তু মুশকিল হল, কালকেই একেবারে চলে যাবার মনন করেছি। বোঁচকা-বিড়ে বাঁধা সারা।

তবে বললি কেন? তোর ভরসা পেয়ে তবেই তো রকমারি রাঁধাবাড়া হল।

রুখতে গিয়ে দুর্লভ সঙ্গে সঙ্গে আবার নরম হয়ে যায়। রাগের কি ধার ধারে কেতুচরণ, যখন সে তল্লাট ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যাচ্ছে? সুর নরম করে কণ্ঠে বেশ খানিকটা খাদ মিশিয়ে বলল, যেতে বলেছি বলে একেবারে কালকেই চলে যেতে হবে, তার মানে কি! খাবার জলের ব্যবস্থা করে দিয়ে তারপর ধীরে সুস্থে দিনক্ষণ দেখে যাস। গুষ্টিসুদ্ধ নির্জলা শুকিয়ে মরব, তার একটা বিহিত করবি নে? আমার আবার এই সময়টা রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে ঘুরতে হচ্ছে। কোথায় লোকজন, কাকেই বা বলি—

এলোকেশীকে শুনিয়ে শুনিয়ে উচ্চকণ্ঠে কেতুচরণ দেমাক করে: ও। লোকজনকে দেখুন না বলে। তারা এক থানার-পুকুর চিনে রেখেছে—সেইখানে যাবে তো? নিদেনপক্ষে চারটি দিনের ধাক্কা। তার আগেই সরকারি বোট পৌঁছে যাবে। অথচ, হেঁ হেঁ, একটা গোনের মধ্যেই বনের ভিতর মিঠা জল আছে—বলুন দিকি কোথায়?

দুর্লভ বলে, সে তো জানিই রে বাপু। সেইজন্যে তোকে মুরুব্বি ধরেছি। তা এত খেলাচ্ছিস কেন? রাত্তিরের ভাটায় বেরিয়ে পড়্। হরিপদ সঙ্গে যাবে, হাল ধরতে পারবে।

হরিপদর উপর রাগ আছে, বিশেষ করে মারধোরের পর থেকে। এলোকেশীর দিকে তাকিয়ে কেতুচরণ অনুযোগের সুরে বলে, যাবে তো—কিন্তু বড্ড খিচখিচ করে হাত-কাটা। সরকারি লোক বলে দেমাক দেখায়। মাঝ-গাঙে একটা হুটোপুটি বেধে না যায় আমার সঙ্গে।

এলোকেশীও সায় দিল: শুধু মুখে টঙ্ক তোমার হরিপদ—হেনো করেঙ্গা, তেনো করেঙ্গা। কাঠকুটো চেয়েছিলাম, তা দেখলে তো ক'টা কাঁচা বা'নগাছ এনে দিল। আর দেখ, এর কাজ দেখ দিকি—

কলকেয় আগুন নিতে হরিপদ রান্নাঘরে ঢুকেছিল। কান খাড়া করল তার কথা উঠেছে শুনে। কেতু যে কাঠ এনে দিয়েছে, ঠাহর করে দেখে এল।

দুর্লভের হুঁকোর মাথায় কলকে বসিয়ে দিয়ে কেতুচরণকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেঃ শুকনো ঝাউ পেলি কোথা? এদিগরে তো দেখতে পাই নে?

খোঁজে খোঁজে উই বাইশের লাটে গিয়ে উঠেছিলাম।

বাইশের লাট জায়গাটা বিষম গরম। সেদিনও একটা মানুষ ভালো হয়েছে ওখানে। দুর্লভ অবধি শিউরে ওঠে।

সে কি রে? কী করে গেলি?

কতকটা সাঁতরে, কতক দুর খালের কাদা ভেঙে।

হাসতে হাসতে কেতু আবার বলে, ঠাকরুন বললেন যে! ওঁর হুকুম হলে কাঠ তো সামান্য বিস্তান্ত, বাঘের দুধ দুয়ে আনতে পারি।

কিন্তু এলোকেশী শোনে নি এ চাটুবাক্য। জ্যোৎস্নাভূষণ, দেখা গেল, উঠানের উপর নেমে পড়েছে। সেখানে থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বাইরের দিকে চলল। জ্বালাতন, জ্বালাতন! মাচার উপর থেকে গাঙে পড়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। হলে তো হাঙ্গামা চুকে যায়, কিন্তু এ বিচ্ছু অত সহজে কি রেহাই দেবে? এলোকেশী দৌড়ে তাকে ধরতে গেল।

ছেলে বুকে করে আবার এসে দাঁড়িয়েছে। কেতুচরণের মনে হচ্ছে, নির্মল পদ্মফুলের উপর একটা গুবরে-পোকা লেপটে আছে। কুৎসিত ছেলেটাকে ছিনিয়ে নিয়ে মাটিতে আছড়ে মারতে ইচ্ছে করে। এলোকেশীর অঙ্কের কলঙ্ক।

দুর্লভ হেসে উঠে রসিকতা করেঃ মুখ দিয়ে একটু বলে দাও গো—তোমার হুকুমের অপেক্ষা, রাতের ভাটায় যাতে বেরিয়ে পড়ে।

দুর্লভকে গড় হয়ে প্রণাম করে কেতুচরণ বলল, তাই ঠিক থাকল, আজ্ঞে। বাসায় বলে কয়ে আসিগে। নৌকোর ব্যবস্থা

এখান থেকে করে রাখবেন দেবতা। আমাদের যেটা আছে, সে হল সোয়ারি-বওয়া নৌকো। সে নৌকো আটকানো যাবে না।

দুর্লভ বলে, সরকারি নতুন ডিঙিটা তবে নিয়ে যাস। সাহেবের কাছে ওদের একটা খালি ট্যাঙ্ক চেয়ে রেখেছি, লঞ্চ থেকে এনে রাখব। এবার থেকে ট্যাঙ্কে জল থাকবে, ভেঙে যাবার ভয় থাকবে না।

॥ বত্রিশ ॥

ঋষিবর আর গোল-পাঁচু যেন সোয়ারি ধরতে বেরোয়, তার ভরসায় না বসে থাকে—এই কথা জানান দিয়ে কেতুচরণ মর্জাল-স্টেশনে ফিরে এল। রাত্রি এক প্রহর হয়ে গেছে। আসার পথে দেখল, নতুন সরকারি ডিঙিখানা বড়-গাঙ দিয়ে চলেছে। অতএব জলের ট্যাঙ্ক আনতে যাচ্ছে ওরা রেঞ্জার্সের লঞ্চ থেকে। সে লঞ্চ কোন্ জায়গায় রয়েছে, কে জানে! ফিরে আসতে দেরি হবে, বোঝা যাচ্ছে। গোনের আগে ফিরে এলে যে হয়!

অফিসঘরে ঘুমুচ্ছে গোটা দুই লোক। স্টেশন একেবারে চুপ-চাপ। লণ্ঠনটা জ্বলছে, কিন্তু আলো হচ্ছে না। গল-গল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। চিমনি এতক্ষণে যে ফেটে যায়নি, তা-ই আশ্চর্য। চারিদিকে বিষম অন্ধকার।

কেতুচরণ হাঁক দিয়ে সাড়া নেয়ঃ দেবতা আছেন? দয়াময়?

এলোকেশীর তন্দ্রার ভাব এসেছিল। ঘুম ভেঙে উঃ-আঃ—করে উঠল। কাতর কণ্ঠে বলল, বেরিয়ে গেছে। মারা যাচ্ছি আমি ইদিকে। ভাটা এসে গেল নাকি?

দরজার ভিতর দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে কেতু বলে, উঁহু—ভাটার দেরি আছে। এখন আধ-জোয়ার। আগেভাগে এলাম—হাতের নৌকো তো নয়, দেখেশুনে গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে হবে।

ফুলের মিষ্টি গন্ধ আসছে ঘরের মধ্যে থেকে। এলোকেশীর শখ আছে, একে তাকে ধরে জঙ্গলের অজস্র ফুল আনায়। শিয়রে

রকমারি ফুলের গাদা। তক্তাপোশের উপর চিত হয়ে এলোকেশী পড়ে আছে। কেতুর সঙ্গে কথা বলছে, তা উঠে বসল না। নড়াচড়া অবধি নেই।

হল কি তোমার?

এলোকেশী কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, মাচানের কাঠ সরে তার মধ্যে পা ঢুকে গিয়েছিল। হাড়-টাড় ভাঙল কিনা, কে জানে! এমন গেরো, হরিপদটাকে সুদ্ধ নিয়ে গেছে। সকলে বেরিয়ে যাবার পর কাণ্ডটা হল।

বলতে বলতে জল গড়িয়ে পড়ল দু-চোখ বেয়ে। বলে, কী আর বলব—বলবার মুখ আছে কি কেতু? সুখে আছি সেদিন বলেছিলাম। কী সুখে রয়েছি, তোমার তো অজানা নেই! মরে পড়ে থাকলেও চোখ মেলে দেখবার কেউ নেই। কবে যে যেতে পারব এখান থেকে! ঘর-বাড়ি-গ্রাম দেখব, মানুষের মুখ দেখব! মরণের আগে ছাড় নেই, বেশ বুঝতে পারছি।

থেমে গেল এলোকেশী। কার কাছে এসব কি বলছে! কেতুচরণ টিপে টিপে হাসছে। মানুষ নাকি ওটা—পশু, জঙ্গলের বাঘ। কেতুকে হাতে-পায়ে বেঁধে যখন ফেলে রেখেছিল, খাঁচায়-পোরা বাঘের তুলনাই মনে এসেছিল। তার এত দুঃখের কাহিনী শুনেও কেতু নির্বিকার। হাসিমুখে সহজ কণ্ঠে সে বলল, মন খারাপ হচ্ছে বুঝি? সব ঠিক হয়ে যাবে। দুর্লভ ফিরে এসে যখন সোহাগ করবে, আবার ডগমগ হয়ে যাবে সেই সময়।

এ লোকের মুখোমুখি থাকবে না এলোকেশী, এর মুখ দেখবে না। না, কিছুতে নয়। রাগ করে পাশ ফিরতে গিয়ে সে আর্তনাদ করে উঠল। নাড়া লেগে পায়ে মর্মান্তিক যন্ত্রণা হচ্ছে।

কেতুচরণ ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর চলে এসেছে। ঠাহর করে দেখছে এলোকেশীর পায়ের দিকে। একবার একটু হাত বুলিয়েও দেখল। এলোকেশী হাত সরিয়ে দিল, তা কেতুচরণ আমলেই আনল না।

অষুধপত্তোর কিছু দিয়েছ নাকি ?

এলোকেশীর ভালমন্দ জবাব নেই।

নত হয়ে ভাল করে দেখে কেতু বলে, কী যেন দিয়েছ—চুন-হলুদ ?

এবারে এলোকেশী ঘাড় নাড়ল।

উঁহু, ওর কর্ম নয়। যা ভেবেছ, অতখানি হেলাফেলা চলবে না—

তীক্ষ্ণ চোখে এলোকেশীর দিকে তাকিয়ে বলে, ঝেড়ে দেবো ? তুকড়ি আমায় দিয়েছে, তাজ্জব মন্তোর—ডেকে কথা কয়। হাড় সরে গেছে, আবার কাপে কাপে বসিয়ে দেবো। একটুখানি তেল এনে দাও দেখি। সর্ষের তেল, পলা দুই-তিন লাগবে।

এলোকেশীর আড়ষ্ট ভাব। ওঠে না—এত কথা, তার একটা জবাব পর্যন্ত দেয় না।

কী রকমটা হয়, দেখই না। খেতে বলছি নে কিছু, যে মনের আক্রোশে বিষ-টিষ খাইয়ে দেবো। উঠতে হবে না—তেল কোথায় আছে বলে দাও, আমি আনছি।

চাঁদ উঠে গেছে কখন, শান্ত আরণ্য জ্যোৎস্না লুটিয়ে পড়েছে ঘরের মধ্যে। এলোকেশী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে কেতুচরণের পেশীবদ্ধ ইস্পাত-কঠিন শরীর। বাঘই এই রাত্রে ঘরে ঢুকে পড়েছে বুঝি—শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম। অনেক দিনের সম্পর্কহীনতার ব্যবধানে ভয় করছে এলোকেশীর, বুকের মধ্যে ঢিব-ঢিব করছে। কালীদাসী ছিল, সময়কালে এখন কোথা সে ? ঘুম মারছে নিশ্চয় সেই হতচ্ছাড়ী রান্নাঘরে পড়ে পড়ে। ডাক ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠবে—আফিসের ওদিকে না-ই যদি কেউ থাকে, গাঙের ঘাটে বাওয়ালির নৌকোয় মানুষ আছে তো বটে !

কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না। তেলের জায়গা দেখাবার জন্য ভিতর দিকে সে আঙুল নির্দেশ করল। কেতু চলে গেল সেই দিককার দরজা দিয়ে নেমে। এই ফাঁকে ছুটে এলোকেশী বাইরে যেতে পারত। কিন্তু পায়ের ব্যথা তো

আছেই—তা ছাড়া সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেছে, হাতের কড়েআঙুলটা উঁচু করে তুলবারও বল যেন হারিয়ে ফেলেছে।

কেতুচরণ খুঁজে-পেতে তেলের ভাঁড়সুদ্ধ নিয়ে এল। আলো জ্বেলে দিল প্রদীপে তেল ঢেলে। পায়ের গিরার উপর খানিকটা তেল দিয়ে সবলে এমন চাপ দিল যে, কটাত করে শব্দ হল—এলোকেশীর মনে হল, এক দৈত্য পায়ের ঐখানটা মুচড়ে একেবারে আলাদা করে দিয়েছে দেহ থেকে।

চোখে তার জল এসে গেল। বুঝি অচেতন হয়ে পড়বে, এমনি অবস্থা। এরই মধ্যে যেন স্বপ্নের ঘোরে দেখল, কঠিন ক্রূর হাসি কেতুচরণের মুখে। বিড়-বিড় করে সে মন্ত্র পড়ছে, আর জানুদেশ অবধি টেনে দিচ্ছে। আর তাকাচ্ছে এলোকেশীর দিকে খরদৃষ্টিতে। দৃষ্টি যেন চুম্বক। সবল বাহুর চাপে গায়ের কোমল মাংস কাদার মতো কেতুচরণ ছানছে। শুধু মাংসই বা কেন, যেন তার বুদ্ধি-বিবেচনা অপছন্দ নিয়ে ডেলা পাকাচ্ছে।

ছেলেটা পাশে পড়ে ঘুমুচ্ছিল, কেতুর হাত লেগে গেল তার গায়ে। কেন্নোয় হাত পড়লে যেমন হয়—ঘৃণায় সর্বদেহ শিরশির করে উঠল। মনের মধ্যে হিংস্র দুর্বার ইচ্ছা জাগে, ঠ্যাং ধরে নদীগর্ভে ছুঁড়ে দেবে আবর্জনাটাকে। শূন্যে গোল হয়ে পাকাতে পাকাতে ঝপ্‌পাস করে জলের মধ্যে গিয়ে পড়বে। বাপ-বেটা দুটোকে একসঙ্গে ফেলতে পারলেই সব চেয়ে ভাল হয়।

ক্ষণপরে কেতুচরণ প্রশ্ন করে: কেমন—কষ্ট লাগছে এখন?

দুকড়ির মন্ত্রের জোর আছে—ভয় গিয়ে এখন সত্যি আরাম লাগছে এলোকেশীর। আবেশে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। সবল হাতের আরও নিপীড়ন কামনা করছে মনে মনে। হঠাৎ জোরে এক ঝাপটা বাতাস এল। প্রদীপ নিভে গিয়ে ঘর অন্ধকার।

দুর্লভরা ফিরল। ঘাটে এসে ডাকছে, কই গো! আলো-টালো নেই কেন রে? কোথায় তোরা সব?

কেতুচরণ ওপাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে জঙ্গল আর স্টেশনের

মাঝে যে বেড়া, সেই বেড়ার খুঁটির মাথায় উঠে ওদিকে লাফিয়ে পড়ল। তারপর গুইসাপের মতো জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে কখনো শুয়ে কখনো বা বসে বাঁধের উপর পৌঁছে গেঁয়ো-বনের পাশে নিঃসাড়ে বসে রইল।

দুর্লভ হাঁক দিচ্ছেঃ ও কালীদাসী, মরেছিস নাকি তোরা? কোথায় গেলি?

এলোকেশী কাতরাতে কাতরাতে বলে, এসো। দোর খোলা আছে। কালীদাসী, দেখগে, কোনখানে পড়ে নাক ডাকছে। আমি কিচ্ছু বলতে পারব না। পড়ে পা মচকে গেছে—যন্ত্রণায় কাটা-কতুরের মতো ছটফট করছিলাম। তারপর কোন সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছি।

আলো নেই কেন?

উঠ.. পারছি নে, কে জ্বালে? এই যে দেশলাই বালিশের তলে। কোণে পিদ্দিম আছে। আলো জ্বেলে দেখ, কি হয়েছে আমার। আর আমি বাঁচব না।

প্রতিটি কথা কেতুচরণের কানে যাচ্ছে। নিরুদ্বেগে তার এখন গলা ছেড়ে সখীসোনার গান ধরতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সেটা উচিত হবে না। আরও অনেকক্ষণ কাটল। তারপর ধীরে ধীরে বাঁধের পথ ঘুরে সে ঘাটের প্লাটফরমে এসে উঠল।

ভালমানুষ হয়ে কেতুচরণ ডাকেঃ দেবতা আ..হন নাকি? কাঙালের ঠাকুর? কই, জলের কি পাত্তোর আনবেন সাহেবের কাছ থেকে—আনা হয়েছে?

॥ তেত্রিশ ॥

বাদাবনের বাইরে বেগুনবেড়ে বলে জায়গা—সেখানকার থানার পুকুরের জল ভাল। রোজ দু-চার শ কলসি জল ওঠে পুকুর থেকে। জলের কলসিগুলো দূর থেকে দেখায় যেন পেট-মোটা বামনের দল। নৌকো-ডিঙির উপর তারা সারি সারি বসে

আছে। জলের ভরা দাঁড় বোঠে বেয়ে জঙ্গলের এদিক-সেদিক অন্তরালবর্তী হয়ে যায় চক্ষের পলকে।

বেগুনবেড়ের জল মর্জাল-স্টেশনে পৌঁছতে সাত-আটটা গোন লাগে। কেতুচরণের হাজার দিকে সুলুক-সন্ধান। দুকড়ির মতো একেবারে জঙ্গলের কিনার অবধি নয় যদিচ, কিন্তু দুকড়ির পরেই আর কারো যদি নাম করতে হয়—সে তার সুযোগ্য সাকরেদ এই কেতুচরণের। বাদার মধ্যেই মিঠা জল আছে, ক-জনে তা জানে? ভাগ্যিস জানে না! সারা বেলা অপেক্ষা করে সেখান থেকে বিশ-পঁচিশ কলসি জল তুলতে পারা যায় বড় জোর। জানাজানি হয়ে লোকের ভিড় বাড়ালে তখন বাওড়ের কাদা-মাটি দিয়ে কলসি ভরতি করা ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না।

বর্ষার কয়টা মাস ছাড়া অন্য সময়ে কোদালি দিয়ে একটু গর্ত খুঁড়ে দিতে হয় বাওড়ের খোলে। জল চুইয়ে ক্রমে গর্ত ভর্তি হয়ে যায়। সেই জল প্রাণ ভরে খাও—দেহ জুড়িয়ে যাবে। চোখে দেখে বুঝবার জো নেই, এমন অমৃতের সঞ্চয় আছে মাটির তলে।

বনকেওড়া গাছ—প্রায় সমদীর্ঘ—ক্রোশের পর ক্রোশ চলে গেছে। সোজা গুঁড়ি, ঘনপত্র ডালপালা প্রসারিত হয়েছে ঠিক সমান উঁচু থেকে। দেখে মনে হবে, ভেবেচিন্তে মাপ-জোপ করে কবি-প্রকৃতি কেউ গাছগুলো পুঁতেছে। গাছতলায় সযত্নে কাদা-লেপা পরিচ্ছন্ন অঙ্গন। একটি পাতা পড়ে নেই কোনখানে—হরিণের দল খুঁটে খুঁটে খেয়ে যায়। খালের ধারে এখানে-ওখানে গোলঝাড় বাহার জমিয়ে চিক্কন পাতা দোলাচ্ছে। জল বাড়ে জোয়ারবেলা, ছলছল করে জল উচ্ছলে ওঠে। গোলবনের ভিতর চিকচিকে খরশুনো মাছ লাফায়। আবার পাশখালি পার হয়ে গিয়ে ওদিকটায় দেখ, নিষ্পত্র স্বল্পশাখা মহাকালের মতো মহাবৃদ্ধ বনবিটপীরা দূর-দূরান্তর অবধি শিকড় বিস্তৃত করে দাঁড়িয়ে আছে প্রাণপণ প্রয়াসে ব্যাকুল থাবায় ধরণীকে আঁকড়ে ধরে। এ তল্লাটের প্রতিটি চর, প্রতি বাদা, প্রত্যেকটি খাল-দোখালা কেতুর জানা। এই এত রকমারি গাছপালার কোনটি কোনখানে, তা-ও

বোধহয় সে বলে দিতে পারে। বরঞ্চ সে দিশেহারা হয়ে পড়ে বাদার বাইরে মানবেলার মধ্যে গিয়ে পড়লে।

দক্ষিণমুখো তিনপো ভাঁটি বেয়ে গেলে নীলকমল। সোজাসুজি একটা গাঙ ধরে গেলে হবে না কিন্তু—এ-গাঙ থেকে ও-গাঙ, সেখান থেকে আর-এক গাঙ, এমনি অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় জটিল পথ। নতুন লোক কেউ মর্জাল থেকে চিনেই আসতে পারবে না।

নীলকমল সমুদ্র নয়। সমুদ্রের মতো নদী কূলহীন এখানে। প্রসন্ন রৌদ্রোজ্জল দুপুরেই কেবল ওপারের তটরেখার অস্পষ্ট ক্ষীণ চিহ্ন নজরে আসে। জঙ্গল হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়ে নিরবচ্ছিন্ন দূরবিসারী বালুচর। বালুর পাহাড় জমে আছে জায়গায় জায়গায়। রুপোর গুঁড়ো ছড়ানো বুঝি বালুর সঙ্গে—ঝিকমিক করছে, চোখে ধাঁধা লেগে যায়।

ঢোল-কাঁশির বাজনা কানে আসছে অনেক দূর থেকে। সে-সব বন্ধ হল। তারপরে শুধু এক ঢোলক। আরে, আরে—উমেশ তো নয়? তারই হাতের বাজনার মতো, সে যেমনধারা তেহাই মারে। অত্যন্ত কাছে এসে গেছে এখন, কিন্তু বালিয়াড়ির জন্য নজরে আসছে না।

দুটো বড় পানসি বাঁধা আছে। সোয়ারি-মাঝিমাল্লায় জন-ত্রিশেক হবে। বেটাছেলেরা আছে, কিন্তু মেয়েলোকের সংখ্যা অনেক বেশি। নানাবয়সের—বুড়ো থেকে ছা-বাচ্চা অবধি।

তাদের পাশে এসে কেতুচরণ ডিঙি বাঁধল। কী কাণ্ড, সাঁইতলা থেকে এসেছে একদল। উমেশ আছে, টুনিও আছে। টুনি বেশ গিন্নিবান্নি এখন—পায়ে রুপোর জলতরঙ্গ মল, হাতে রুপোর বাঁউটি, এক-কপাল সিঁদুর। মৌভোগ আর সাঁইতলা খুব বেশি দূর নয়। কিন্তু মান্ধর মারা যাবার পর কেতুচরণ আর ওদিকে যায় নি। অনেক দিন পরে দুর্দান্ত নদীর কূলে আচমকা এতগুলো চেনা মুখ দেখে কেতুচরণের ভারি আনন্দ হল। ছোট বাচ্চা যাদের দেখে এসেছিল, তারা দিব্যি জোয়ান হয়ে উঠেছে। যারা সমর্থ যুবা ছিল, গাল তুবড়ে চুলে পাক ধরে কিম্ভুত-কিমাকার হয়ে গেছে তারা। এদের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেতুচরণের নতুন করে মনে হল,

অনেকগুলো বছর কেটে গেছে বটে, চারিদিককার বিস্তর বদল হয়েছে।

পূজো দিতে এসেছে এরা। নীলকমলে পূজো দিলে বাঁজা মেয়ের ছেলেপুলে হয়। বালুচরের প্রান্তে বিশাল এক কেওড়াগাছ। সেই গাছের চতুর্দিকে পাক দিয়ে মানত করে ডালের উপর ন্যাকড়ার ফালি বেঁধে দেয়। তা ছাড়া ফুল কলা চাল ইত্যাদি নিবেদন করে কলার খোলায় ভাসিয়ে দিতে হয় নীলকমলের জলে। বালিয়াড়ি পার হয়ে সর্বপ্রথম ন্যাকড়া-বাঁধা ঐ কেওড়াগাছের দিকে নজর পড়বেই—মনে হবে, গাছের ডালে শাদা শাদা ফুল ফুটে আছে অজস্র।

লোকে দল বেঁধে এই রকম পুজোয় আসে। খরচপত্র ভাগ হয়ে যায়, বিপদের ভয়ও এতে কম। এবার তিনটে মেয়ে এসেছে—টুনির ননদ কিরণা তাদের একজন। পাঁচ-ছ বছর বিয়ে হয়েছে, বয়স পুরোপুরি ষোল চলেছে, এখনো সন্তানসম্ভবা হল না মেয়েটা। কী সর্বনেশে ব্যাপার, বিবেচনা করে দেখ! শ্বশুরবাড়ির লোকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অনেক রকম তুকতাক করা হয়েছে, কিছুতে কিছু হয় না। অবশেষে এই দুর্গম স্থানে এসেছে। এই শেষ চেষ্টা। এতে যদি কিছু না হয়, কিরণার শাশুড়ি আবার ছেলের বিয়ে দেবে—ঠিক করে ফেলেছে।

উমেশ মাথা-পাগলা হোক, যা-ই হোক, তার মতো শিক্ষিত মানুষ সমাজের মধ্যে কে? পৌরোহিত্যে তারই অধিকার। তাকে ধরে নিয়ে এসেছে, নীলকমলে সে-ই কলার ডোঙা ভাসাবে। ঢোলক কেড়ে নিয়ে ছুঁড়িগুলো হাসতে হাসতে উমেশের হাত ধরে বসিয়ে দিল নদীর ধারে। একটু পরে কেতুচরণের ডিঙি এসে লাগল। উমেশ মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখে পাথর হয়ে গেল যেন। হাতের খোলা তেমনি হাতে ধরা আছে।

হল কি মোড়ল?

কোন জবাব দিল না উমেশ। সামলে নিয়ে একমনে আবার নৈবেদ্য সাজাতে লাগল।

কেতুচরণকে দেখে সকলে কলরব করে ওঠে। অনেক দিন পরে অভাবিত ভাবে তাকে পেয়ে সত্যি বড় খুশি হয়েছে। বালি পার হয়ে তারা গাছতলায় এল। পাঁচ-সাতটা মাদুর পড়েছে। রান্নাবান্না হচ্ছে, খাওয়া-দাওয়া হবে। খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের পর নৌকো ভাসাবে আবার ঘর-মুখো। আর কেতুচরণ যখন অনতিদূরে মিঠা জলের বাঁওড়ের সন্ধান দিল, হাঁড়ি-কলসি যা-কিছু সঙ্গে আছে, যথাসম্ভব জল ভরতি করে নিয়ে যাবে।

বোসো কেতুচরণ, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো মাদুরের উপর। জুত করে বোসো, খাওয়া-দাওয়া করে তারপর ছাড় পাবে। কোন কথা শুনছি নে। নয় তো ছোঁড়াগুলোকে বলে দি, চড়চড় করে তোমার ডিঙি বালির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে আসুক। দেখি, চলে যাও তুমি ক্যামনে?

টুনি তো প্রায় মা-ষষ্ঠী হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে—একপাল ছেলেপুলে। পিঠোপিঠি তিনটিকে নিয়ে এসেছে, আর সব বাড়িতে আছে। এই তিনটি সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে একটা পান মুখে দিয়ে ছোট মেয়েটাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মাদুরে কাত হয়ে পড়ে সে কেতুচরণের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিল।

বিয়েথাওয়া করেছ?

যেমনধারা এলোকেশীকে বলেছিল, কেতু ঠিক সেই জবাব দেয়।

তুই ছাড়া আর মেয়ে নেই নাকি?

টুনি অপ্রতিভ ভাবে বলে, না—তাই বলছি। তা ছেলেপিলে হল কিছু?

একটা। না হলেই ভাল ছিল রে! দিনরাত ট্যাঁ-ট্যাঁ করে। বড্ড জ্বালায়। ঠ্যাং ধরে এক আছাড়ে মাথার ঘিলু ছিটকে দিতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ নজর পড়ল, হরিপদ সকলের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে জঙ্গলের দিকে চেয়ে বোধকরি একমনে স্বভাবের শোভাই দেখছে।

তাকে ডাক দেয়ঃ ওখানে কি হচ্ছে হরিপদ? ডাকছে এরা তোমাকে।···ওর সঙ্গে যে কথাবার্তা বলছ না? সরকারি হেডগার্ড বাবু হরিপদ পুঁই, বাদারাজ্যের মুরুব্বি মানুষ—

উমেশ পুজোআচ্চার কাজ শেষ করে চলে এসেছে। চিরদিনের বিনয়ী নির্বিরোধী মানুষ। কী হয়েছে আজকে তার—হি-হি করে হাসতে হাসতে হরিপদর কাছে গেল।

পদা তুমি বাবু হরিপদ হয়ে গেছ? বেশ—তা বেশ—

বাঁ-হাত বাড়িয়ে সে হরিপদর মুখ ঘুরিয়ে আনল নিজের দিকে। কঠিন কণ্ঠে বলে, পদ্ম কোথা?

নেই—

টুনি বলল, সে তো মরে গেছে। সবাই জানে, তুমিই কেবল শোন নি ওমশা?

উমেশ বলে, মরে গিয়ে পেত্নী হয়েছে। নাক কেঁদে কেঁদে বেড়ায়।

তার কথার ভঙ্গিতে সামনের ঘন অরণ্যের দিকে তাকিয়ে লিনছপুরেও সকলে মনে মনে কেঁপে ওঠে। উমেশের তো রাত্রিবেলা চরে বেড়ানো অভ্যাস—কি জানি, সত্যিই কিছু দেখেছে হয়তো!

এবং আশ্চর্য, উমেশ তাদের মনের কথা জেনেই বুঝি বলল, দেখাতে পারি তাকে পদা। যাবে দেখতে?

হরিপদর হাত এঁটে ধরল। পাগলটা হাত ধরে টেনে পেত্নী দেখাতে এখনই জঙ্গলে নিয়ে যাবে নাকি? হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারে না। এত জোর ঐ রোগাপটকা বুড়ো হাড়ে!

খাটাস মরেন তেলে
মানুষ মরেন মেলে—

খাটাস এক বুনো জন্তু—গায়ে চর্বি হলে আপনাআপনি মরে যায়, আর মানুষের সর্বনাশ হয় দলের মধ্যে পড়ে। বচনটা খাঁটি। এই দেখ না, নীলকমলের জমজমাট আড্ডায় যদি বেলা মাটি না

করত, জল নিয়ে—যেমন ঠিক করে গিয়েছিল—পৌঁছে যেত সন্ধ্যার পরেই। এ গল্প তা হলে বোধকরি আর-এক রকম হয়ে দাঁড়াত।

প্লাটফরমের পাশে ডিঙি বাঁধল, তখন চারিদিক রোদে ভরে গেছে। একটা বড় সাঙড় ঘাটে নতুন এসেছে, সুর করে তারা গঙ্গাবন্দনা ধরেছে। জলের ট্যাঙ্ক নামাবার ব্যবস্থায় হরিপদ তাদের কাছে গিয়ে ডাকাডাকি লাগাল। কেতু কাড়ালে বসে। কালুক-ফুলুক করে তাকাচ্ছে যদি চোখাচোখি হয় এলোকেশীর সঙ্গে, ইশারায় যদি সে কিছু বলে দেয়। দুর্লভ বাসায় না থাকে, এবং ইশারায় এলোকেশী যদি তাকে উপরে ডাকে।

হরিপদ চার মরদ যোগাড় করে নিয়ে এল।

তুমিও ধরো কেতুচরণ—ঘটকর্পূর হয়ে বসে থাকলে হবে না। সকলে মিলে ধরে তুলে দিই। কাত কোরো না—আহা, নাড়া না লাগে—জল চলকে পড়বে। বিস্তর লজ্ঝালজ্ঝি করে নিয়ে আসা।

ট্যাঙ্ক উপরে তুলছে—কান্না শোনা গেল জ্যোৎস্নাভূষণের। সে কী কান্না! ঐ তো পুঁটকে ছেলে—কাঁদতে কাঁদতে দম আটকে যায় না গো! তা হলে আপদ চোকে, সর্বরক্ষে হয়। কালীদাসী হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আড়কোলা করে দোলাতে দোলাতে একবার এদিকে এল, কিছুতে থামাতে পারছে না। অসহ্য! কেতুচরণ ভাবছে, আঁচল দলা প্যাকিয়ে মুখে পুরে দিচ্ছে না কেন ওটার?

হাত নেড়ে কালীদাসী হরিপদকে নিভৃতে নিয়ে গেল। কেতুচরণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে—চলে যাবে কি থাকবে, ভেবে পাচ্ছে না।

ফিরে এসে ফিসফিসিয়ে হরিপদ বলল, ফুড়ুত—

সে কি রে?

পাখি পালিয়েছে। বাবুর কোলের মধ্যে থেকে বললেই হয়। ঘুম ভেঙে উঠে দেখতে পেলেন, খোলা দরজা হাঁ-হাঁ করছে। সাঙড়খান কাল সন্ধ্যেয় এসে বেঁধেছে—ওরা বলছে, কোন নৌকো-ডিঙি রাত্তিরে ঘাটে আসে নি।

ভারি তাজ্জব! পালাল কি করে?

এক বিষখালি অবধি হেঁটে গিয়ে সেখান থেকে যদি নৌকোয়

উঠে থাকে। তা-ই হয়েছে—উড়ে যেতে পারে না। আগে থেকে যোগসাজস ছিল।

কেতুচরণ বলে, গেল কোথায়?

খারাপ মেয়েমানুষ—জায়গার অভাব কি ওদের? বাবু, শুনলাম, পাগল হয়ে বেরিয়ে গেছেন। হবে না! ঘর শূন্য, তার উপরে অপমানটা কত বড় ভেবে দেখ।

দিন চারেক পরে দুর্লভ পায়ে হেঁটে মৌভোগে এসে উপস্থিত। অভাবিত ব্যাপার। চেহারা দেখে কেতু স্তম্ভিত—পাগলই ঠিক! চশমা নেই চোখে, রুক্ষ চুল, খোঁচা-খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি, কাদা-মাখা ময়লা জামা-কাপড়। চারটে দিনের ভিতর যেন আলাদা আর এক-মানুষ।

কেতুর দিকে তাকাচ্ছে বারংবার। একটু ইতস্তত করে দুর্লভ তাকে একান্তে ডাকল।

শোন্, তোর কাজকর্ম জানি। ঢাকাঢাকি কিসের রে? উপকার করতে হবে। তুই ছাড়া আর কেউ তা পারবে না। মাংনা বলছি নে—তোকে আর সায়ের চালিয়ে খেতে হবে না, সে ব্যবস্থা আমি করে দেবো।

বলছেন কি দেবতা?

অকারণে এদিক-ওদিক চেয়ে গলা খাটো করে দুর্লভ বলে, সবই তো শুনেছিস। কোনো পাত্তা পাচ্ছি নে—যেন কর্পূর হয়ে বাতাসে উবে গেছে।

কেতু সহানুভূতি দেখিয়ে গালে হাত দিয়ে বলে, তাই তো!

মধু রায়ের কাজ কিনা, সেইটে বল দিকি বাবা—

হাত জড়িয়ে ধরল সে কেতুচরণের। বলে, তুই হয়তো জানতে পারিস। সেই ভরসায় ছুটে এসেছি। যদি কিছু জানা থাকে, বলে দে।

এই দেখেন, এখনো সন্দ গেল না। রায়বাবুর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এইখানেই তো রয়েছেন তিনি—মৌভোগের

কাছারিবাড়িতে। কানে-টানে কিছু আসে নি। ধর্মকথা বলছি হুজুর, মিথ্যে কেন বলব!

চুপ করে মুখের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে দুর্লভ বলল, ঐ রায় ছাড়া কারো কথা ভাবতে পারছি নে। এত তোড়জোড় আর এমন সাফাই-হাত তার কাউকে দিয়ে সম্ভবে না। তিন বছর ওর তাঁবেদারি করেছি, শালাকে হাড়ে-হাড়ে জানি। উঃ—আমারই মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে বেটা ফূর্তি মারছে!

কেতুর ঠাণ্ডা রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। দুর্লভের ঘর ভেঙে গেছে—বেশ হয়েছে, চমৎকার হয়েছে, ধর্ম আছেন। মধুসূদনের কাছারিবাড়িও সে আগুনে পোড়াবে যদি এলোকেশী ঐ চালের নিচে তাঁর সঙ্গে সত্যি সত্যি ঘর করতে উঠে থাকে।

দুর্লভ বলছে, কিনারা একটা করতেই হবে বাবা। কি চাস, খুলে বল। যাক প্রাণ, রোক মান। টাকা খরচে আমি পিছপাও নই। এবারে একবার পেলে মাগীর চুলের মুঠো ধরে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে একেবারে অঞ্চল-ছাড়া করব। চাকরিতে আমার দরকার নেই। এমন জায়গায় নিয়ে তুলব, কোন বেটা ভাগাড়ের-শকুনের নজর যেখানে না পৌঁছয়।

কেতুচরণ রাজি—খুব রাজি। নিশ্চয় সে খোঁজ করবে খুঁজে বের করবে যেখানে আছে এলোকেশী। কিন্তু হয়েছে এখনো কি দুর্লভ হালদারের! এই অর্থদণ্ড ও মনস্তাপ দিয়ে শুরু—আরও অনেক ভোগান্তি আছে তার কপালে। ঐ যে চুলের মুঠি ধরবার কথা বলল—এলোকেশীর চুল ধরে দুটো-পাঁচটা পাক দেবার গরজ তো কেতুরও!

অনেক রকমে আশ্বাস দিয়ে কেতুচরণ বলে, মুখ বেঁধে মাল হুজুরে হাজির করে দেবো—টুঁ শব্দটি হবে না। রায়বাবুর লোকের কাজ দেখলেন—আমাদেরও দেখবেন। খুশি করে দিতে হবে কিন্তু দয়াময়।

দুর্লভ পিঠ ঠুকে দিয়ে বলে, আমি জানি—এ তল্লাটে কেউ যদি পারে, সে তুই। কিন্তু কাজ আরও একটা করতে হবে

বাবা। সকলের আগে সেইটে। ছেলেটা রাখা যাচ্ছে না—কেঁদে অনর্থ করছে। ওটাকে আমার শ্বশুরবাড়ি দিয়ে আসতে হবে। ঝাঁপা চিনিস? ঝাঁপার বৈকুণ্ঠ ধর আমার শ্বশুর। আমি সঙ্গে গিয়ে রেখে আসব। সে বেটা আর-এক খচ্চর—নগদ টাকায় হিসেব মিটিয়ে দিয়ে আসতে হবে, তবে নাতিকে ঠাঁই দেবে। ছেলেটা হয়েছে কাল, নইলে কিসের ঝঞ্ঝাট বল্? ছেলের দেখাশুনো হবে বলেই তো নচ্ছার মাগীটাকে এমন তোয়াজে রেখেছিলাম। ছেলেটার হিল্লে করে এসে তখন দেখা যাবে কার বেশি মুরোদ—দুর্লভ হালদারের না ঐ হাঁড়ি-ঠনঠন ফুটো জমিদারের?

চৌত্রিশ

ঝাঁপায় যাবার পথে বড় বড় গাঙ। বাচ্চা ছেলে নিয়ে যেতে হচ্ছে—তাই ডিঙি-পানসি নয়, একখানা মেদিনীপুরে-নৌকো ভাড়া করে নিয়ে এল। এক বিচিত্র যান—জোয়ার-ভাটার অপেক্ষা রাখে না, বাতাস পেলেই হল। একেবারে উল্টো বাতাস হলে মুশকিল বটে—কিন্তু সামান্য এদিক-ওদিক হলে আর ভাবনা নেই, বাদাম তুলে তরতর বেগে নৌকো ছুটবে। দক্ষিণা বাতাসে ভর করে পুব-পশ্চিম-উত্তর কিম্বা বায়ু-ঈশান-অগ্নি-নৈঋত—কোন দিকে যেতে আটকায় না এ নৌকোর। আর গোন পেলে তো কথাই নেই—স্টিমার বা মোটরলঞ্চের সাধ্য নেই এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে উঠবার। কল হার মেনে যায় মানুষের হাতের কৌশলের কাছে।

ছুটো বড় নদীর মুখ—খোলপেটুয়া আর কদমতলী। নদী-খাল এ-সময়টা ভারি শান্ত, নির্মেঘ আকাশের নিচে রোদ পোহাতে পোহাতে ঘুমোয় যেন পড়ে পড়ে। কিন্তু কদমতলীর মোহানায় এসে কেতুচরণ হেন লোকেরও বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করে। দক্ষিণে অনেক দূরে অস্পষ্ট অতি-ক্ষীণ বনরেখা। আর সব দিকে

কালো জল। জল ছলছল করছে নৌকোর তলায়, ঢেউয়ের দোলায় নৌকো দুলে উঠছে মাঝে মাঝে। কোনদিন যে কূলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, এমনি জায়গায় এলে কেমন ভুলে যেতে হয়। ছল-ছল ছলাৎ-ছলাৎ অবিশ্রান্ত একটানা শব্দ। নৌকো দেখে ঘুমভাঙা ঢেউয়ের দল ছুটে এসেছে কথাবার্তা কইতে—আগে ছিল না বুঝি কোন রকম শব্দ! রুপোর পাতের মতো দিগন্ত-বিস্তার দূরের জলরাশি দেখে ঠিক তাই মনে হয়—ওদিকে ঢেউ নেই, ক্ষীণতম শব্দও নেই। কেতুচরণ অনেকবার এসব জায়গা অতিক্রম করে গিয়েছে, কখনো পথ ভুল হয় না তার, কখনো কিছু মনে আসে না। চুপচাপ হাল ধরে ঝিমোয়—কিছু অসুবিধা দেখলে সঙ্গে সঙ্গে অমনি জাগ্রত হয়ে কঠিন হাতে ঘন ঘন বাইতে থাকে। সঙ্কট কাটিয়ে কলকেয় আগুন তুলে আবার ধোঁয়া ছাড়ে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে। এই তার চিরকালের অভ্যাস। যেমন আমরা সহজভাবে ডাঙায় পথ চলি, কেতুচরণের হাতে নৌকো বাওয়াও অবিকল তাই।

কিন্তু আজকে মন উতলা হচ্ছে ডাঙার স্পর্শ পাওয়ার জন্য। আরও কতক্ষণ বাইতে হবে, আরো কত জল অতিক্রম করতে হবে!

পড়ন্ত রোদ জলে চিক-চিক করছে। তিন-পো ভাটি সরে গেছে, অতএব অত্যন্ত সাবধানে এগুতে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি বাইবার উপায় নেই। হরিপদও যাচ্ছে এই সঙ্গে—গলুয়ে বসে একটি মাত্র হাতে সে জল মাপছে, আর চেঁচিয়ে শোনাচ্ছে কেতুচরণকে। ঋষিবর আর গোল-পাঁচু দু-পাশের দাঁড়ে রয়েছে। বিষম চড়া এদিকটায়। সমস্ত কেতুচরণের নখদর্পণে। তবু বলা যায় না—একটা বিপদ হতে কতক্ষণ!

হল তাই সেদিন। কেতুচরণ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ছেলেটা বিষম কান্না লাগিয়েছে। বোতলে করে দুধ এনেছিল—অনেকক্ষণ তা ফুরিয়ে গেছে। ক্ষিধে পেয়েছে। নেংড়ের হাটখোলায় পৌঁছতে পারলে দুধের চেষ্টা করা যেত—সেখানকার ময়রার দোকানে দুধ থাকে কখনো কখনো। কিন্তু পৌঁছনোর দেরি

অনেক। কেতুচরণ ভাবছিল, এইরকম কাঁদতে কাঁদতে দম আটকে যদি কৌত হয়, অনেক হাঙ্গামা মেটে—অত দূর ঝাঁপা অবধি নৌকো নিয়ে যাবার প্রয়োজন থাকে না। মরা ছেলে জলে ফেলে দিয়ে নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে তাহলে এলোকেশীর তল্লাসে তারা বেরিয়ে পড়ত এখান থেকেই। মধুসূদন রায় খপ্পরে নিয়ে ফেলেছে। গাঙ শুকোলেও সেটা খাল হয়ে থাকে। নেই, নেই—তবু লোকবল অর্থবল যা আছে, দু-দশটা দুর্লভ তার কাছে দাঁড়াতে পারবে না। এ হেন লোকের ব্যাপারে যা করতে হবে, অতি-দ্রুত করে ফেলা উচিত—তিলমাত্র সময়ক্ষেপ বিধেয় নয়। সময় পেলে এলোকেশীকে কোন্ রাজ্যে চালান করে দেবে, ঠিক কি! সমস্ত তখন পণ্ডশ্রম।

কিন্তু সে হবার জো নেই ঐ শুয়োরের বাচ্চার ঠেলায়। হ্যাঁ, শুয়োরের বাচ্চাই বলছে সে ছেলেটাকে মনে মনে। যেমন বাপ, তেমনি ছেলে। রুষ্ট বিরক্ত দৃষ্টিতে কেতুচরণ তাকাচ্ছে একবার জ্যোৎস্নাভূষণ আর একবার দুর্লভের দিকে। দুর্লভ সঙ্গে না থাকলে কোন-একটা অতি-সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা করে ফেলত সে নিশ্চয়ই। ব্যবস্থা সেরে আজকে রাত্রের মধ্যেই গিয়ে পড়ত কাছারিবাড়ি। লোলজিহ্ব প্রলয়াগ্নির আলোয় শেষবারের মতো সে হাত এঁটে ধরত এলোকেশীর—মরি মরি, কত রকম খেলাই খেললি কতজনকে নিয়ে! কত সাধ আমার পায়ে দলেছিস! ভালবাসিস তুই শুধু নিজেকে, নিজের সুখ-সম্পদ রূপের জৌলুষ আর ভোগ-কামনাকে। কেতুর অন্তরে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ঠিক এমনি করেই সে ভাবতে পারে না—কিন্তু মনের কথাগুলো বোধ করি মোটামুটি এই।

কত কি ভাবছে। হরিপদ জল মেপে বলল, দেড় হাত—তবু তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে সে হাল ছুঁয়ে আছে। ঋষিবর মুখ-ঝামটা দিয়ে ওঠে: করছ কি—হয়েছে কি তোমার? বাইরে ঘুরিয়ে দাও নৌকোর মুখ।

ততক্ষণে নৌকো চরের উপর উঠে গেছে। একদিকে কাত

হয়ে পড়েছে—কোনক্রমে সিধা রাখা গেল না। কল-কল করে খোলে জল উঠছে। দুর্লভ লাফিয়ে পড়ল নৌকো থেকে। জল একহাঁটুও নয়। নোনা কাদায় পা এঁটে গেল। তলিয়ে যাচ্ছে নৌকো।

আসন্ন সন্ধ্যায় সেই জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দুর্লভ চিৎকার করছে : খোকা আছে যে ছইয়ের মধ্যে! হায় মা কালী, হায় মা কালী! গাঁজায় দম দিয়ে এসেছিস হারামজাদা—সর্বনাশ করলি—একেবারে শুকনো ডাঙায় বানচাল করলি?

কেতুচরণ নৌকো থেকে গর্জন করে উঠল : গালমন্দ কোরো না বলছি, খবরদার!

দুর্লভ চমকে ওঠে। সীমাহীন জল—কোনদিকে জনমানবের চিহ্ন নেই এদের এই ক'টি প্রাণী ছাড়া। মর্জাল-স্টেশনে যে মেজাজ চলে, এখানে তা চলবে না। এদের হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে—বাঁচবার উপায় যদি কিছু থাকে, এরাই করতে পারবে।

কেতুচরণ পরম শান্ত, নির্বিকার। নৌকো থেকে এইবার চরে নামল। দেখে শুনে আস্তে আস্তে নামছে। যেন নিরাপদ ঘাটে এসে ভিড়েছে, এমনি ভাব। কেতুর কোলে ভিজে কাঁথায় জড়ানো জ্যোৎস্নাভূষণ। কাঁদছে না, শব্দসাড়া নেই।

দুর্লভ হাত বাড়াল ছেলে নেবার জন্য।

বেঁচে আছে তো রে?

কেতু বলে, প্রাণের ভয়ে গাঙে লাফ দিলে, তখন তো এসব কিছু খেয়াল ছিল না।

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-ভরা কণ্ঠ। অনেক জ্বালিয়েছে। অনেক দিনের বিস্তর রাগ পোষা আছে—কায়দায় পেয়ে সেসব বেরিয়ে আসছে এখন। দুর্লভের আগ্রহ সে আমল দিল না, তার দিকে এগোল না। আরও খানিকটা দূরে সরে অপেক্ষাকৃত উঁচু অংশে দাঁড়াল। বারংবার তাকাচ্ছে সে জ্যোৎস্নাভূষণের দিকে।

কেঁদে কেঁদে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে—বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে। দেখতে কালো কদাকার, তবে গা-হাত-পা বেশ নরম। নিষ্ঠুর

হাসি একবার খেলে যায় মুখের উপর দিয়ে। দেবে নাকি গাঙের জলে ছুড়ে শয়তান বাপটার চোখের সামনে? দুর্লভ কৌতুক—দু-চোখ ভরে দেখে কেতুচরণ তৃপ্তি পাবে।

শেষ-ভাঁটা। জায়গায় জায়গায় চরের কাদা জেগেছে। চরে তারা আটকা পড়ে গেছে। কাতরকণ্ঠে দুর্লভ বলে, উপায় কি হবে কেতু?

ঋষিবরের দিকে চেয়ে কেতুচরণ বলে, দেখ দিকি ভাই, জল ছেঁচতে পারা যায় কিনা?

নৌকোর কাছে গিয়ে ভাল করে দেখে, তারপর জলের নিচের কাঠে হাত বুলিয়ে ঋষিবর ঘাড় নাড়ে।

উঁহু, তলি ফেঁসে গেছে একেবারে।

কপালে করাঘাত করল দুর্লভ: আরে সর্বনাশ! উপায়—উপায় কি এখন?

সাঁতার জানো? উই যে, উই—অল্প-অল্প দেখা যাচ্ছে ডাঙার নিশানা।

ডাঙার জন্য দুর্লভ প্রাণপণে দৃষ্টি বিসারিত করে। কিছুই নজরে আসে না।

কই বাবা?

কানা নাকি?

এ অবস্থায়ও কেতু রসিকতা ছাড়ে না: তোমার সেই নীল চশমা চোখে পরো, তা হলে দেখতে পাবে।

ঋষিবর বলে, চোখে দেখেই বা মুনাফা কি হবে বাবু? এই কোণাকুণি পাড়ি ধরো। মাঝে মাঝে মাটি পায়ে ঠেকবে, তখন জিরিয়ে নিও। জোয়ার আসবার আগেই যাতে ডাঙায় উঠে পড়তে পারো, তাই করো।

ডাঙা কদ্দূর?

কেতু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: দড়ি ধরে মাপতে গেছে কে? ক্রোশ দুই-চার হবে আর কি!

ওরে বাবা! দু-ক্রোশ হতে পারে, চার ক্রোশও হতে পারে?

দুর্লভের হাতে পায়ে খিল ধরে আসছে। কেতুচরণ ব্যঙ্গের সুরে বলে, আমরা তাহলে এগুতে লাগি। জোয়ার এলে টান সামলানো যাবে না, কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক ভাসিয়ে নেবে। দোষ নিও না—সবসুদ্ধ মরে মুনাফা কি? নাও, ধরো তবে তোমার জিনিস—

ছেলে এগিয়ে ধরল দুর্লভের দিকে।

দুর্লভ হাহাকার করে ওঠে।

তুই ধর্মবাবা কেতু। আমাদের প্রাণে বাঁচা—যা চাস, তাই দেবো।

গোল-পাঁচু কেতুচরণের হাত ধরে সজোরে টান দেয়। এতক্ষণে সে কথা বলল। বলে, চলো—মরুকগে ওরা। সবসুদ্ধ ডুবে মরুক।

পাঁচুকে সরিয়ে দিয়ে কেতু জবাব দিল: তোমাদের বাপ-বেটা দুটোকে নিয়ে সাঁতরাবো? তবেই হয়েছে! দেড়শ-মনি নৌকো ফেঁসে গেল, এখন আমি যাব ঘাড়ে তুলে নিতে?

জল ছপ-ছপ করে তারা এগিয়ে চলল। হরিপদ পিছন থেকে অনুনয় করে: ছেলেটাকে নিয়ে যা অন্তত। বাবুর নিজের তাল দেওয়াই শক্ত। ছেলে আর কতটুকু ভারি—নিয়ে যা ভাই, তোদের গায়ে লাগবে না।

ফিরে দাঁড়িয়ে কেতুচরণ বলে, এক-শ খানি টাকা লাগবে পুরোপুরি। ছেলে যখন আনতে যাবে, নগদ টাকা গণে দিয়ে আসবে। পাঁচ কুড়ি—একটি আধেলা কম নয় তার থেকে। দরদস্তুর করো তো পথ দেখি—

দুর্লভ বলে, তাই পাবি—বেকায়দায় পড়ে গেছি যখন।

ঋষিবর গা টিপে বলে, হাঙ্গামা জড়াস নে কেতু। দুর্লভ হালদার না-ই যদি উঠতে পারে, তোর টাকা আদায় হবে কোত্থেকে শুনি?

কেতুচরণ তার সদুপদেশে বিশেষ কান দিল না। হেসে উঠে বলে, কি হালদার মশায়, উঠতে পারবে গাঙ পাড়ি দিয়ে? গতিক দেখে তো ভরসা হয় না। মরে যাও তো টাকার উপায় কি হবে,

বলো। খাঁপার বৈকুণ্ঠ ধর নেবে তো এক-শ টাকায় ছেলে ছাড়িয়ে ? না, চালাকি করে আমার ঘাড়ে গছাচ্ছ ?

ছেলেটাকে দুর্লভের হাত থেকে এক রকম ছোঁ মেরে নিয়ে কেতু কাঁধের উপর তুলল। বলে, ইঃ—হালকা যেন শোলা ! খাওয়াও-টাওয়াও না তো ! একজনের জিম্মায় ফেলে রেখে এর কানাচে ওর কানাচে বিড়াল কুকুর ডেকে ডেকে বেড়াও। তারও উড়ু-উড়ু মন—ছেলে খাওয়ানোর ফুরসত কখন ?

ঘোর হয়েছে। কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী কি অষ্টমী তিথি। ক্রমশ অন্ধকার হয়ে এল। নির্ণিরীক্ষ চারিদিক। বিষম নোনা এ সব জায়গায়। জলস্রোতে আগুনের আভা দেখতে পাওয়া যায়—ঢেউয়ের মাথায় মাথায় দীর্ঘব্যাপ্ত আলো ফুটে ওঠে। হাতে জল নাড়লেও আলো ঝিলিক দেয়। ছেলেটাকে পুঁটলির মতো কাঁধের উপর রেখে কেতুচরণ আরও অনেকটা দূর পায়ে হেঁটে গেল—তারপর জল গভীর হলে সাঁতরাতে লাগল। ঋষিবর আর গোল-পাঁচুও কাছাকাছি সাঁতার দিচ্ছে—জল-তাড়নায় টের পাওয়া যায়।

নিঃসীম বিপুল জলরাশির মাঝখানে হাত কয়েক কর্দমাক্ত জায়গায় দুর্লভ আর হরিপদ দাঁড়িয়ে। জোয়ার আসবে ঘণ্টা দুয়েক পরে—তখন আর চিহ্ন থাকবে না এই জায়গাটুকুর। ব্যাকুল দুর্লভ বলছে, হাঁক দে রে হরিপদ—কাছাকাছি যদি কোন নৌকো থাকে।

চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে হরিপদ। জনমানবের সাড়া নেই। নৌকো খুব কমই এ-অঞ্চল দিয়ে গতায়াত করে। দুর্লভ চোখ বুজল। চোখ মেলে থাকা আর চোখ বোজার মধ্যে তফাত নেই এ জায়গায় এমনি অবস্থায়। দেহ পরিশ্রান্ত, অবশ। ভাবনার ক্ষমতাও লোপ পেয়ে গেছে। নিরুদ্যম সে থর-থর করে কাঁপছে। আর পাশে দাঁড়িয়ে হরিপদ অবিশ্রান্ত চিৎকার করছে, হোই গো—কে আছ কোন্ দিকে, আমাদের নিয়ে যাও। মারা পড়ি গাঙের মধ্যে—

পঁয়ত্রিশ

জ্যোৎস্নাভূষণকে বুকের উপর ধরে কেতুচরণ চলেছে। ঋষিবর ও গোল-পাঁচু কোন্ দিকে ভেসে গেছে। এসে পৌঁছবে নিশ্চয়। গাঙে খালে ডুবে মরার মানুষ ওরা নয়। ওদের দেহ জলতলে, শোলার মতোই, ডুবতে পারে না কখনো—সাঁতার না দিলেও ভেসে থাকবে। কিন্তু এখন অবধি কোন পাত্তা নেই। কতদূর ভেসে গেছে, কে জানে!

রাত দুপুর—কিম্বা তারও বেশি হয়তো। কুক্ষণের যাত্রা আজকে। বড় ধকল গিয়েছে নৌকো বানচাল হবার পর থেকে। হাঁটুভর কাদা, নোনা কাদা—যেন মনখানেক ভারী বুটজুতো পায়ে সে চলেছে। এই কাদা ধুয়ে ফেলে পায়ের নিজস্ব মূর্তি বের করতে অন্তত আধঘণ্টা সময় ও ছ-সাত কলসি জলের দরকার হবে। ছেলেটাকে এক হাতে উঁচু করে ধরে তুলে আর এক হাতে জল কাটাতে হল দীর্ঘক্ষণ। হাত দু-খানা অসাড় হয়ে গেছে। বাসায় পৌঁছতে পারলে যে হয়! বোঝা নামিয়ে বিশ্রাম নেবে। আর পারা যায় না—হাত-পা মেলে যেখানে হোক গড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে।

হন-হন করে চলেছে। পদে পদে ঠোক্কর খাচ্ছে উঁচু-নিচু পথে দ্রুত চলতে গিয়ে। বর্ষাকালে মাছ ধরার চারো-দোয়াড়ি পেতে তার উপর কাঁটা বিছিয়ে রাখে। সেই ছড়ানো কাঁটায় পা পড়ছে মাঝে মাঝে। কিন্তু কেতুচরণ গ্রাহ্য করে না এসব। পায়ের তলায় চামড়া তো নয়, লোহা—সেখানে কাঁটা বেঁধে না। ঠোক্কর লাগলে চামড়ার উপরটায় ঝনঝনিয়ে আওয়াজ হয় বোধহয়—ঠোক্কর লাগল এই পর্যন্ত, স্নায়ুতে তার কিছুমাত্র সাড়া জাগে না। আঘাতে কেতুর কোন ক্ষতি নেই—তবে ছেলেটার বেকায়দা না লাগে! এক-শ টাকার ছেলে—যে মূল্যে একদিন টুনিকে নিয়ে সংসার পাততে পারত।

ক্ষিধেয় ও ঘুমে ছেলেটা নেতিয়ে পড়েছে, মাখনের মতো লেপটে আছে গায়ের সঙ্গে। ভারি হাল্কা—একটা কোমল তুলোর বালিস যেন কাঁধের উপর ফেলে নিয়ে চলেছে।

তেমাথার কাছে ছায়ার মতো এক মূর্তি। ফাঁকা মাঠ—হু-হু করে গাঙের বাতাস বইছে। কোন দিকে একটি প্রাণী নেই। গা ছমছম করে ওঠে আচমকা এই জায়গায় মানুষ দাঁড়িয়ে আছে দেখে।

কে?

উমেশ বাঁধের উপর এসে উঠল।

কেতুচরণ বলে, থানে চলেছ—আতরবালার ঘরে? আমরা যে এত ডাকাডাকি করি, খবর পৌঁছয় না।

জড়িত কণ্ঠে উমেশ বলে, হ্যাঁ—ডেকেছিলে বটে সেদিন।

তবে? থানের ঠাকরুনটি ছুটি দেয় না বুঝি! মেলা ভেঙে গেল, পাড়া খা-খা করছে, ও মাগী পড়ে রয়েছে কেন এখনো?

একটুখানি থেমে হাসতে হাসতে কেতু আবার বলে, আষ্টেপিষ্টে পিরীতের বাঁধন পড়ে গেছে—উঁ?

উমেশ হাসি-মস্করার ধার দিয়ে গেল না। সহজভাবে বলল, জমির টাকা পেতে দেরি হচ্ছে—তাই আটকা পড়ে আছে। টাকাটা হাতে পেলেই চলে যাবে।

কানাঘুষো কেতুচরণও কথাটা শুনেছে। কিন্তু অতখানি বিশ্বাস করে নি। আজকের স্পষ্টাস্পষ্টি কথায় সে স্তম্ভিত হল।

ছ-বিঘের ঘেরিটা নাকি বিক্রি করে দিয়েছ?

নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে উমেশ নিজের পায়ে কুড়ুল মারছে, এর জন্য রাগের অন্ত নেই তার উপর। খরকণ্ঠে কেতু বলে, মোড়ল-বাড়ির এত জুতজাত—সমস্ত ঐ ছ-বিঘেয় ঠেকেছিল। বছর-খাওয়ার ধানটা তবু পেতে। তা-ও ঘুচিয়ে দিলে? মেয়েজাতের যা রীত, টাকা হাতে পেলেই লাথি মেরে ছিটকে পড়বে। চিরকাল ধরে তোমায় খাওয়াবে, আদর-যত্ন করবে—স্বপ্নেও তা মনে জায়গা দিও না।

উমেশ বলে, বিস্তর ধার-দেনায় জড়িয়ে পড়েছে। শোধ না হলে এক পা এখান থেকে নড়তে দেবে না। আমি জামিন হয়েছি টিকে সর্দারের কাছে। জমি না বেচে করব কি ?

তার পরে—তোমার উপায় ?

উমেশ নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, সে যা হয় হবে। বুড়ো হয়ে গেলাম—আমি কার ক'দিন !

কেতুচরণ বলে, আমিও তাই জিজ্ঞাসা করি। বুড়োবয়সে এই ব্যারাম কেন ?

কথা বলতে বলতে কেতুচরণ হঠাৎ পা সরে পড়ে গেল। ছেলেটা ছিটকে পড়ছিল ভুঁয়ে—সামলে নিল। খুব সামলেছে। জেগে উঠে তখন কাঁদতে লাগল। সে কী কান্না ! এক গলার ভিতর দিয়ে দু-পাঁচ গণ্ডা হাঁড়িচাচা ডাকছে, এমনি মনে হয়।

উমেশ প্রশ্ন করে : ছেলে না মেয়ে ? পেলে কোথায় ?

বিব্রত কেতু বলে, উড়ো-আপদ কাঁধে চেপেছে। কী করি যে একে নিয়ে !

আহা-হা, ও রকম বলে না। শিশু হলেন দেবতা—অনেক পুণ্যে ওঁরা আসেন।

আ-আ আ-আ—করে কেতুচরণ ছেলেটাকে তুলে ধরে দোলাচ্ছে। লোহার মতো হাতের চাপে কান্না বেড়ে যায় আরও।

উমেশ এগিয়ে এসে সাধুভাষায় কথকতার ভঙ্গিতে সান্ত্বনা দেয়।

বলি, ভীত ত্রস্ত সন্তপ্ত কেন হে রাজকুমার ? কোনো চিন্তা নাই—চিন্তামণির চিন্তা দেখে লাজে মরে যাই।

কথকতা কিছুই কাজে আসে না। তখন উমেশ ঢোলকে ঘা দিল। ভারি মজা তো—শিশু থেমে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

স্ফূর্তি পেয়ে চপাচপ বাজাতে লাগল উমেশ। চাঁদ উঠেছে—ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় দেখতে পাওয়া গেল, জলভরা চোখ মেলে শিশু ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছে।

হেসে উঠে উমেশ বলে, দেখছ কেতু, আমার এই আর-একজন নতুন সমঝদার জুটে গেলেন।

আরও কয়েকবার জোরে জোরে বাজিয়ে উমেশ বাঁয়ে নেমে গেল। আতরবালার বাসা ঐদিকে। এত কথা রটেছে, তবু উমেশ একেবারে নিঃসঙ্কোচ। এতটুকু যে লজ্জার ব্যাপার আছে, চালচলনে তার তিলমাত্র চিহ্ন নেই। বাঁয়ের পথে সে পাড়ার মধ্যে ঢুকছে।

বাজনা বন্ধ হতেই জ্যোৎস্নাভূষণ ডুকরে কেঁদে ওঠে। কী জ্বালা, দুর্লভ হালদারের বেটা এমন বাদ্যরসিক হয়ে উঠল কি করে? কান্নার চোটে দম ফেটে মারা যাবে নাকি! কেতুচরণ ব্যাকুল হয়ে ডাকছে: হল না ওমশা—তুমি এদিকে এসো। সায়ের অবধি পৌঁছে দাও। সেখানে আর সকলে রয়েছে—তারপর যে চুলোয় ইচ্ছে তুমি চলে যেও।

জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে পড়েছে সায়েরের ঘরের ভিতর। চাল তোলা হয়েছে, কিন্তু ছাওয়া পুরোপুরি এখনো হয়ে যায় নি। মেজে কিছু উঁচু করে বসা-ওঠার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। গোল-পাঁচু ও ঋষিবর অনেকক্ষণ এসে গেছে—ছেলে নিয়ে নাস্তানাবুদ হওয়ার দরুন কেতুর পৌঁছুতে এতটা দেরি হল। ঋষিবর এসেই বেরিয়ে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে—সবাই শুকানো মুখে কাঠ হয়ে বসে আছে, তার কোন রকম ব্যবস্থা করা যায় কি না! আর আছে খুশাল ও গুলি-পাঁচু। গুলি-পাঁচু মাছের ব্যাপারি—ভাঁটা শেষ হয়ে জলের টান ফিরছে, মাছ ধরে ফিরবার বড় বেশি দেরি নেই—গাঙ-ভাঙার দিকে তাকিয়ে সে মেছো-নৌকোর অপেক্ষায় আছে। অন্য ব্যাপারি আসবার আগে যদি মাছের ঝুড়ি নামে, সস্তায় কিছু দাঁও মারতে পারবে।

রীতিমতো শব্দসাড়া করে কেতুচরণরা এল। অনেক বাজনা বাজিয়েও উমেশ কান্না থামাতে পারে নি এবার। শিশু কাঁদছে—ব্যাপারটা অভূতপূর্ব এ জায়গায়। সবাই তাদের ঘিরে দাঁড়াল।

গুলি-পাঁচু বলে, আঃ—সরে দাঁড়াও না গো! কেমন ছেলে এনেছে, দেখি—

উমেশ একগাল হেসে বলে, রাজকুমারের মুখ দেখবে—তা নজরানা কই? কত ঢাক-ঢোল বাজিয়ে চতুর্দোলায় চড়িয়ে বলে নিয়ে এলাম—হেঁ-হেঁ—মাংনা হবে না।

ক্লান্ত কেতুচরণ হোগলার চাটাই-এর উপর ধপ করে ছেলে নামিয়ে দিয়েছে। খুশালের দিকে বাঁ-হাত বাড়িয়ে বলে, কই?

জল-ঝাঁপাঝাপি করে বড় কষ্ট হয়েছে, এক কলকে চড়াবে এবার। দেহ-মন চাঙ্গা না করে আর কিছু নয়। কৌটা কয়েক জলে ভিজিয়ে নিয়ে বাঁ-হাতের চেটোয় নিঃশব্দে সে গাঁজা টিপতে লেগেছে।

গুলি-পাঁচু বলে, ক্ষিধে পেয়েছে তাই অত কাঁদছে। খেতে-টেতে দে—

কেতু বলে, দে না। মানা করছে কে? আমি যে মরার দাখিল হয়েছি এদিকে।

নতুন এই হাঙ্গামা জোটানোয় খুশাল একেবারে খুশি নয়। বিরক্ত স্বরে সে বলে, বয়ে গেছে। আমরা আনি নি। আপদ জুটিয়ে আনলি কি জন্য?

টাকা দেবে।

গোল-পাঁচুর দিকে তাকিয়ে বলে, বলিস নি কিছু? একশ-খানি করকরে টাকা। তিন মাস সায়ের চালিয়েও অত হবে না।

ছেলে কাঁদতে লাগল। একটা দম দিয়ে কেতু কলকেটা দিল খুশালের হাতে। ভুল করেছে, মোটা টাকার লোভে পড়ে বিষম অন্যায় করেছে সে। কত বড় দায়িত্বের ব্যাপার, বুঝতে পারছে এখন। দুর্লভের আর ডাঙায় উঠে আসতে হবে না কদমতলীর মুখ থেকে। কোথায় এখন বৈকুণ্ঠ ধরকে খুঁজে খুঁজে বেড়াবে ছেলে গছাবার জন্য! দুর্লভ-শয়তানের কথা—হয়তো বৈকুণ্ঠ বলে মানুষই নেই ঝাঁপায়। আর কোনখানে নিয়ে চলেছিল, অন্য কি মতলব ছিল। ও যা লোক—ভাজবে ঝিঙে তো বলবে পটল। আগাগোড়া না ভেবে ঝোঁকের মাথায় এই

এক কাণ্ড করে বসল—কেতুচরণের এখন অনুতাপ হচ্ছে। একটা হাঁস পোষার ঝঞ্ঝাট পোয়াল না সে জীবনে—জলজ্যান্ত একটা ছেলে! কান্নার চোটে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিয়ে দিচ্ছে—কিন্তু সত্যি সত্যি তো গলা টিপে শেষ করে দেওয়া যায় না! নদীজলের নিশ্চিত সমাধি থেকে এত কষ্ট করে এত দূর নিয়ে এসেছে কেন তবে?

উমেশ বলে, ক্ষিধেয় চোখ উলটে পড়বে এক্ষুনি। টাকা নেওয়া তোমার বেরিয়ে যাবে।

কেতুচরণ অসহায় দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকায়। তাই তো, কী করা যায়! কোন উপায় ভেবে পাচ্ছে না। আর সেইজন্য রাগ বেড়ে যাচ্ছে—নিজে গালে চড় খেতে ইচ্ছে করছে।

গুলি-পাঁচু বলে, ঢোক খানেক জল খাইয়ে দাও গে। গলাটা অন্তত ভিজুক।

কেতুচরণ বলে, দেখ না ভাই চেষ্টা করে—

গুলি-পাঁচু হেসে উঠল।

তুই টাকা মারবি, আর ছেলে খাওয়াতে বসব আমি! বয়ে গেছে।

রেগে উঠে কেতু বলে, যা—যা, বেরো তবে এখান থেকে। ভিড় বাড়াস নে। মাছের নৌকো এলে তখন এসে জুটবি, কাজ মিটলে সঙ্গে সঙ্গে আবার সরে পড়বি। আড্ডা দেওয়া চলবে না। পালা এখন।

গুলি-পাঁচুর কিন্তু চলে যাবার লক্ষণ নেই। হাসিও থামছে না। হাসির রকম দেখে কেতু কেমন অপ্রতিভ হয়ে যাচ্ছে। কী ভেবেছে এরা? ভালবেসে কাঁধে তুলে নাচাতে নাচাতে নিয়ে এসেছে, এই বুঝল নাকি? পোয়া পাঁচেক ওজনের বিকটদর্শন এক বাচ্চা—ভালবাসা কি করে আসে তার উপর? নিছক ব্যবসায়ের ব্যাপার। এই গুলি-পাঁচুই যেমন এখানকার মাছ বাদার বাইরে হাটে নিয়ে গিয়ে তিন-চার টাকা মুনাফা করে আসে। মোটা মুনাফার লোভেই তো সে দায়ে ঠেকেছে। গুলি-পাঁচু পুরানো ব্যাপারি হয়েও ব্যাপার-বাণিজ্যের এই সোজা কথাটা অন্য রকম ভাবছে কেন?

কলসির জল গড়িয়ে ফেরো বাচ্চার মুখের কাছে ধরল। সে এক মুশকিল—জল খেতে পারে কি ফেরো থেকে? যেটুকু মুখের ভিতর যায়, তার দশগুণ গড়িয়ে পড়ে বাইরে। কান্না বন্ধ করে কেমন চুক-চুক করে খাচ্ছে দেখ। ক্ষিধে-তেষ্টায় বড্ড কাবু হয়ে পড়েছে সত্যি। কলকেয় মুড়ি ধরাবার জন্য টেমি জ্বেলেছিল, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে এখন সেই আলো দেখা হচ্ছে। কী দেখছে অমন করে যে নজর ফেরে না?

উমেশ বলল, শুধু জল খেয়ে কতক্ষণ থাকবেন! পেটে ভর হয়, এমনি কিছুর জোগাড় দেখ।

গোল-পাঁচু বলে, ঋষিবর রস আনতে বেরিয়েছে। তাই দু-চার ঢোক খাওয়ানো যাবে। সবুর করো একটু।

রস অর্থাৎ খেজুর-রসের তাড়ি। হি-হি করে হেসে খুশাল তারিফ করে, খাসা বলেছে। সেই বেশ ভাল হবে। মিঠে লাগবে, আর নেশার ঘোরে বুঁদ হয়ে থাকবে।

উমেশ হাঁ-হাঁ করে ওঠে: আহা, শিশু—দেবতা। দুধের জোগাড় দেখ গো তোমরা। মাতার অভাবে সুরভি-মাতার শরণাপন্ন হও।

আবাদের চাষীরা দূরে দূরে এক-একটা ডাঙার উপর পাড়া বসিয়েছে—দুধ সেখানে দুষ্প্রাপ্য নয়। চাষের জন্য লোকে লাঙল-গরু আমদানি করেছে, বুদ্ধি করে গাইগরুও এনেছে কেউ কেউ। চাষ চলে, দুধ খাওয়াও হয়। হিন্দু-চাষার মধ্যে অবশ্য অনেকেরই আপত্তি এই ব্যবস্থায়। মা ভগবতীর কাঁধে জোয়াল চাপানো—পরলোকে যমদূত ডাঙস মারবে যে এই অপরাধে। বুনোরা এসব মানে না। জিতু সর্দার গরু ছাড়া এক-জোড়া মহিষও এনেছে—মহিষ দিয়ে চাষ করায়, দুধ দেয় তার একটা।

উমেশ আজকে যাবে না আতরবালার কাছে—যাবার মন নেই। মাটির উপর জাবড়ে বসে বাঁ-হাতে ঢোলকে মৃদু ঘা দিচ্ছে, আর ডান-হাতে টেমি ঘোরাচ্ছে ছেলের মুখের উপর—ঠাকুর-প্রতিমার সামনে পঞ্চপ্রদীপের আরতি করে যে রকম। ছেলে হাত-পা নাড়ছে—আঁ-আঁ আওয়াজ করছে আলোর দিকে চেয়ে।

উমেশ মাথা নিচু করে ছেলের মুখের কাছে মুখ নিয়ে প্রশ্ন করে : এই ঘরদোর পছন্দ নয় বুঝি রাজকুমারের ? অশন-বসনের অতিরিক্ত অসুবিধা ?

গুলি-পাঁচুও দেখছিল নিষ্পলক চোখে। কেতুচরণের সে হাত ধরে টানে : না খাইয়ে বাঁচাবি কেমন করে ? এখন ঠাণ্ডা আছে, আবার ক্ষেপে যাবে। চল্—

কেতু বলে, তুইও যাবি ? তোর ব্যাপার-বাণিজ্যের কি হবে—মাছ এসে উঠবে তো এইবার !

যাকগে আজ। দায়ে-বেদায়ে যদি কাজ কামাই না করব, স্বাধীন ব্যবসায়ে নেমেছি কেন ? রায়বাবুর জমি বন্দোবস্ত নিয়ে লাঙল ঠেললেই তো হত !

একটা মেটে-হাঁড়ি খুঁজে-পেতে নিয়ে চলল। উমেশকে কেতুচরণ বুঝসমঝ করে দিয়ে যায় : রয়ে গেলে তো ? তাই থাকো—খুশাল ওরা তো এখনি সায়ের নিয়ে মেতে পড়বে। তুমি কাছে বসে থেকো। ভুলিয়ে রাখবে, কাঁদে না যেন। আমরা দুধের চেষ্টায় বেরুচ্ছি।

হা-হা করে উমেশ হেসে উঠল। সবাই হাসে কেন আজ কেতুর কথায়—কী হয়েছে তার ! ফিরে দাঁড়িয়ে কেতু কৈফিয়তের ভাবে বলে, কেঁদে কেঁদে মরে গেলে টাকা দেবে না যে ! এদ্দুর এই বওয়াবয়ি সার হবে। হালদার হারামজাদা উল্টে আবার কোন্ ফ্যাসাদে ফেলে তারই বা ঠিক কি !

॥ ছত্রিশ ॥

বুনোপাড়াটা কাছাকাছিও বটে—ক্রোশ দেড়েকের মধ্যে। বুনো নামে পরিচিত এরা একদা পাহাড়-অঞ্চলের জঙ্গলে থাকত। এমন পরিশ্রমী কষ্টসহিষ্ণু জাত বড় দেখা যায় না। এক পাড়ায় ত্রিশ-চল্লিশ ঘরের বসতি। গাঙের কটু জলে তারা স্নান করে।

আবাদের উত্তর সীমানায় চাষীপাড়ার মধ্যে নতুন পুকুর কাটা হয়েছে—তারও জল নোনা, তবে নদীজলের মতো অত উগ্র নয়। বুনোরা সেই জল খায়, সেই জলে রান্নাবান্না করে। ডাল সিদ্ধ হয় না ঐ পুকুরের জলে—কিন্তু ডাল রান্নার প্রয়োজনও হয় না। ডাল খাবার সঙ্গতি নেই তাদের।

বুনোপাড়ায় গিয়ে গুলি-পাঁচু ডাকাডাকি করেঃ ওরে মিঠু, দুধ আছে তোর ঘরে?

কেতুচরণ তাকে টেনে উঠান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে।

খুব বুদ্ধি! কড়াই-ভরতি দুধ জ্বাল দিয়ে রেখেছে দই-ক্ষীর বানিয়ে খাবে বলে; আর থাকলেও দিচ্ছে ঘুমের মধ্যে উঠে এসে! চলে এসো।

তবে কি হবে?

এসো না—

ঝাঁপ সরিয়ে সন্তর্পণে তারা গোয়ালে ঢুকে পড়ল। মশার কামড়ে পা ছুঁড়ছে গরুগুলো। ঠাহর করে করে দেখে, দুধাল গরু এ গোয়ালে নেই। কী মুশকিল!

এমনি তিন-চার বাড়ির গোয়াল খোঁজ করে দুষ্ট বকনার চাটি খেয়ে হাঁড়ির তলায় অল্প একটু দুধ দুয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ পরে তারা ফিরল।

এখন সায়ের লেগে গেছে। লোক জমেছে, নৌকো থেকে মাছের ঝুড়ি এনে এনে সারি দিচ্ছে, টাকা-পয়সার লেনদেন হচ্ছে। সকলে ব্যস্ত এইদিকে। একবার উঁকি দিয়ে দেখে কেতুচরণ অপর ঘরটায় তাদের বাসাঘরে গেল।

কা কস্য পরিবেদনা!* না উমেশ, না ছেলে—কেউ নেই সেখানে।

গুলি-পাঁচু বলে, গেল কোথায়?

ভরা জোয়ার। জল বাঁধের কিনারা অবধি ছলছল করছে। বিষম অস্বস্তি লাগছে কেতুচরণের। রাগ করে বলে, মরেছে হয়তো ছেলেটা। ওমশা গাঙে ফেলে দিতে গেছে।

জ্যোৎস্নাভূষণ আবার কেঁদে উঠেছিল। খুশাল তখন বিষম ব্যস্ত সায়েরের কাজে। মুখে মুখে অনেক হিসাবপত্রের ব্যাপার—কান্নাকাটিতে মাথা ঠিক রাখা যায় না। সে দাঁত খিঁচিয়ে উঠেছিল ঃ নিয়ে যা এখান থেকে আপদ-বালাইটাকে। সরিয়ে নে বলছি—

শিশু হলেন দেবতার অংশ—ভাগ্যবশে ঘরে আসেন। অমন করে কেউ বলে নাকি তাদের! উমেশেরও রাগ হয়। রাগে গজর-গজর করতে করতে সে ছেলে তুলে নিয়ে বেরুল।

কোলে উঠেই ছেলে চুপ।

যা ভাবো তা নয়—ছোট ছেলের অনেক বুদ্ধি। বুঝতে পারে, কোনটা তার আপন-জায়গা। পায়ে পায়ে উমেশ আতরবালার উঠানে গিয়ে উঠল। আতর ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্য দিন উমেশ থাকে—তখনও আতর দরজায় খিল এঁটে ঘুমায় এমনি। উমেশ উঠানের উপর গাছতলায় চুপচাপ বসে থাকে পাহারাদার হয়ে। পাহারা দেয়—কুসঙ্গী কেউ না জোটে। ঢোলক বাজায় না—ঘুম তাড়াবার জন্য মাঝে মাঝে শুধুমাত্র ত্মটো-একটা ঘা দেয়। আজকে উমেশ আসে নি, তা সত্বেও আতর যথারীতি দরজায় খিল এঁটে দিয়েছে। বদ নেশা কেটেছে বোধহয়। উমেশ বড় খুশি হল। ঘুমোচ্ছে, আহা ঘুমোক! উমেশ শব্দ-সাড়া দিল না—শান্ত হয়ে থাকুক ঘুমিয়ে পরম দুঃখিনী!

ফিরে এল সায়ের-ঘরের দিকে। খুশাল একাই এক-শ। গোল-পাঁচুর কোন কাজ নেই—খুঁটি ঠেশ দিয়ে বসে বসে ঝিমোচ্ছিল একপাশে। উমেশ পিছনে গিয়ে তার গায়ে হাত দিল।

মুখ ফেরাতে চোখের ইঙ্গিতে তাকে বেরিয়ে আসতে বলে। উমেশের সঙ্গে গোল-পাঁচুর মাখামাখি নেই। সেকালের সেই গোলমালের জের আছে মনে মনে। উমেশ ডাকে তাকে কি জন্যে?

বাইরে এসে দেখল, উমেশ গাঙমুখো চলেছে হন-হন করে। ভারি মজা তো! ডেকে আবার ও-রকম ছোটে কেন?

কী বলবে বলো—

উমেশ বলে, ইদিকে এসো। চেঁচিও না। চুপি-চুপি ক'টা কথা বলব। খুব দরকারি কথা।

হাঁটার যেন পাল্লা চলেছে। কত দূরে নিয়ে যেতে চায়? গোল-পাঁচু রাগ করে বলে, আর যাব না—এক পা এগোব না এখান থেকে।

উমেশ দাঁড়িয়ে পড়ে। অকারণে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, বেশ, এখানেই তবে—

কয়েক পা হেঁটে সে-ই পাঁচুর কাছে ফিরে এলো, এসে তার মুখের দিকে চেয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। উমেশ কুঁজো হয়ে বেড়ায়—খাড়া হতেও পারে তবে-তো!

আতরকে দেখেছ?

গোল-পাঁচুর কণ্ঠস্বর রুক্ষ হয়ে ওঠে।

আতর পেশাকার?

উমেশ বলে, দেখ নি তাহলে তুমি। দেখলে অমন কথা বলতে পারতে না।

দেখেই বলছি ওমশা। হঠাৎ একদিন সামনে পড়ে গিয়েছিল। দেখতে ঘেন্না করে—তাই চোখ বুজে চলি ওদিক দিয়ে যাবার সময়। দেখতে হবে না বলেই শান্তিনগরে পালাই-পালাই করি।

উমেশ বলে, চিনতে পারো নি তা হলে—ও হল পদ্ম। তোমার বোন পদ্মমণি।

না—বলে পাঁচু হুঙ্কার দিয়ে উঠল। বলে, পদ্ম মরে গেছে। তার জন্যে কেঁদে কেঁদে মা-ও মরে গেল। তারই শোকে সাজানো দোকান ফেলে দেশে দেশে ঘুরেছি, এখন খুশালের তাঁবেদারি করে বেড়াচ্ছি।

গোল-পাঁচুর স্বর কাঁপতে লাগল। উমেশ বুঝেছে তার ব্যথা। ভাই-বোনে বড় মিল ছিল—মিলেমিশে গৃহস্থালী পেতেছিল। ছবির মতো তকতকে সেই ঘর-উঠান-গোয়াল উমেশের মনে পড়ে যায়।

শোন, ঠাণ্ডা মাথায় বুঝে দেখ কথাটা। সবাই ঝেড়ে ফেলে দিলে মেয়েটা এখন যায় কোথা?

গোল-পাঁচু বলে, তার বলে কত দিকের কত পথ খোলা! তোমার আমার মতন নাকি! তা বেশ, এ-পথে অরুচি এসে থাকে তো আবার গিয়ে উঠুক পদার কাছে। আপন-জনদের সঙ্গে ঝগড়া করে ভালমন্দ কোন-কিছু না ভেবে যার হাত ধরে একদিন সে বেরিয়ে পড়েছিল।

যেতে পারলে তো বর্তে যেতো—কথাবার্তার ভাবে বুঝতে পারি।

ম্লান হাসি হাসল উমেশ। বলে, ভারি পয়মন্ত এখন পদা। পদা নয়, হরিপদ - বাবু হরিপদ পুঁই। পদাকে বলেছিলাম আমি। সে-ও তোমার মতো ঐরকম ভারি ভারি জবাব দিল। হ্যাঁ পাঁচু-দা, দু-জনে তোমরা কি এক-কথা মুখস্থ করে নিয়েছ?

বসে পড়ল সে বাঁধের উপরে। হাত ধরে পাঁচুকে টেনে বসাল পাশে। সমব্যথী দু-জন—মুহূর্তে ভাব জমে গেছে।

বলে, নীলকমলে দেখলাম পদাকে। আজকে যেমন তোমায় ডেকেছি, তাকেও ডেকে এই রকম হাত ধরে সমস্ত বললাম। কত বোঝালাম—

গোল-পাঁচু রাগ করে বলে, তোমার গায়ে হাত তুলেছিল—কত কাণ্ড তাই নিয়ে! সেই মানুষের হাত জড়িয়ে ধরতে অপমান হল না ওমশা? মানুষ, না কি তুমি!

উমেশ বলে, কদ্দিন বা আছি! তারপরেই তো গাঙের জলে যাবে শুকনো হাড় ক-খানা। আমার আবার মান-অপমান!

একটু চুপ করে থেকে নিশ্বাস ফেলে বলল, তবু তো পদ্মর কিছু করা গেল না! মরুক গে। চেষ্টা করলে কি হবে, কপালের লেখা খণ্ডানো যায় না।

কোলের উপর ছেলেটাকে উমেশ মৃদু মৃদু দোলাতে লাগল।

গোল-পাঁচু আপনমনে কি ভাবছে। ক্ষণ পরে বলল, পদা মহাপাষণ্ড, তা মানি। কিন্তু সে যখন তাড়িয়ে দিল, ভাইয়ের বোন হয়ে পদ্ম ফিরে এলো না কেন? এসে যদি কেঁদে পড়ত—কাঁদতেই না হবে কেন—সংসারের সে কি কেউ নয়? যেমন ছিল যেমনি যদি আবার জায়গা করে নিয়ে বসত, আমি কি তাড়িয়ে

দিতাম? সে তো হল না—চলে গেল ভিন্ন পথে, পাপের পথে। আমাদের মুখ তুলে পরিচয় দিবার উপায় রাখল না।

কৈফিয়ত যেন উমেশেরই দেবার কথা। তেমনি ভাবে সে বলে, বয়সটা খারাপ যে! বারো ভূতে জুটে মন্ত্রণা দেয়—ক-জনে সামলাতে পারে ও-বয়সে! কিন্তু এখন শিক্ষা হয়েছে। এখান থেকে চলে গিয়ে ভাল ভাবে থাকবে, আমার কাছে কিরে করেছে।

তারপর যে জন্য পাঁচুকে ডেকে নিয়ে এসেছে—সোজাসুজি সেই প্রস্তাব করল।

শান্তিনগর যাবো-যাবো করো—সেখানে গিয়ে বিয়েথাওয়া করে সংসারী হওগে। বোনকে নিয়ে যাও সঙ্গে করে।

সংসারী তুমিই হও ওমশা, বিয়েথাওয়া করে।

ক্ষেপেছ! জিভ কেটে উমেশ সেই পুরানো রসিকতা পুনরাবৃত্তি করে: বনে আছ কেন ওহে শালবৃক্ষ? শূল হয়ে কলজে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করো।

হাসতে লাগল উমেশ। ঘাড় নেড়ে গোল-পাঁচু বলে, উঁহু, সেটা কোন কাজের কথা নয়। ভেবে দেখছি, এই সবচেয়ে ভাল। তুমি তার জন্য এত করছ—আর তারও টান আছে তোমার উপর—

উমেশ হেসে হেসে বলে, আমার উপর নয় রে দাদা। জমি বিক্রি করে টাকা পাচ্ছি, টানাটানি শুধু সেইগুলো নিয়ে।

তবে যে বললে, ভাল হয়েছে।

উমেশ বলে, অন্যায় দোষ দিলে হবে কেন! যার বোধ-জ্ঞান আছে সে কি পছন্দ করতে পারে আমার মতো মানুষকে? এই যে রাজকুমার—বয়স হলে তখন কি এমনি চুপচাপ নেতিয়ে থাকবেন কোলের উপর? আঁতকে উঠে ভয়ে পালাবেন। ভগবান মেরে দিয়েছেন যে চেহারায়!

আবার মিনতি করে: পদ্মর দেনাপত্তোর শোধ হয়ে গিয়েও অনেক থাকবে। সমস্ত টাকা দিয়ে দিচ্ছি। তুমি আবার দোকান

কোরো নতুন জায়গায় গিয়ে। ভাল দোকান হবে। মায়ের পেটের বোন—গাঙের শেওলার মতো ভাসিয়ে দিও না।

পাঁচু নরম হল, আর বড় প্রতিবাদ করল না। বলে, তোমাকেও যেতে হবে ওমশা। সব খুইয়ে তুমি দুয়োর-দুয়োর ভিক্ষে করে বেড়াবে নাকি? সে হবে না। না যদি রাজি হও, এইখানে ইতি। ভাইয়ের মতো তোমায় দেখব, সেইরকম ভাবে থাকবে। কথা দাও, যাবে তুমি—

কেতুচরণ এই সময় এসে পড়ল। উমেশ কৈফিয়ত দেয়: বাবা রে বাবা! সুতোশঙ্খ সাপ—সুতোর মতো চেহারা হলে কি হয়, শাঁখের আওয়াজ বেরোয়। শেষটা এই গাঙের ধারে ঠাণ্ডা বাতাসে এনে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। তবে শান্ত হলেন। উঃ, মাজা টনটন করছে এতক্ষণ হাঁটাহাটি করে।

কেতু বলে, জলের মধ্যে ফেলে দিলে না কেন? একেবারে আপদ চুকত।

বাসাঘরে নিয়ে এলো ছেলেকে। দুধ-খাওয়ানো হবে। এই আর-এক বিপদ। ঝিনুক নেই, হাঁড়ির কানায় দুধ খাবে কি করে? ক্লান্তিতে কেতুচরণের ঝিমুনি আসছে—হাত-পা ছড়িয়ে গড়াতে চায়। এখন কি ভাল লাগে এত সমস্ত হাঙ্গামা!

গোল-পাঁচু বলে, বেশ তো ঘুমুচ্ছে। থাকুক অমনি। সকাল হোক—তারপর দেখা যাবে।

কেতুচরণ খেঁকিয়ে ওঠে।

তা বই কি! মরে পড়ে থাক, পাঁচ কুড়ি টাকা মাঠে মারা যাক আমার। তোদের কি—তোদের তো বোঝা ঘাড়ে করে কদমতলী পাড়ি দিতে হয় নি!

সমস্যার সমাধান অবশেষে। গুল-তামাক মুখে দেয় গুলি-পাঁচু। বেটাছেলের পক্ষে গুল-তামাক মুখে দেওয়া শোভন নয়, পাঁচুরও আগে এ অভ্যাস ছিল না। কিন্তু মাছের ভরা নিয়ে গাঙের উপর অষ্টপ্রহর ছুটোছুটি করতে হয়—এর মধ্যে মুহুর্মুহু তামাক সাজার সুবিধা হয় না। এই জন্য ভেবেচিন্তে সে এই নেশা ধরেছে।

একবার তামাক-পাতা ছেঁকে শিলে গুঁড়িয়ে ছাই মিশিয়ে নিতে পারলে অনেক দিনের মতো নিশ্চিন্ত। এই গুল-তামাক খায় বলে তার নাম হয়ে গেছে গুলি-পাঁচু। আর পদ্মর ভাই যে পাঁচু—মোটাসোটা বেঁটে মানুষটি—গোল-পাঁচু বলে তাকে সকলে। দুই পাঁচুকে পৃথক করে বোঝাবার জন্য এই রকম নামকরণ।

গুলি-পাঁচু সুরাহা করে দিল। বড় আকারের গুলের কৌটো সঙ্গে নিয়ে সে বেড়ায়। গাঁটে ধরে না, কোমরের গাঁজিয়ায় টাকা পয়সা থাকে, কৌটোও থাকে ঐ সঙ্গে। কৌটোর মুখটা সে দিল দুধ খাওয়াবার জন্য। প্রায় ঝিনুকের মতো হল। অনভ্যস্ত অপটু হাতে কেতুচরণ দুধ খাওয়াচ্ছে। গালের ভিতর দুধ যাচ্ছে সামান্যই—পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

গোল-পাঁচু বলে, যা যা—মুরোদ বোঝা গেছে। পারিস কুস্তি লাগাতে আর নৌকো ঠেলতে। দুধ খাওয়াতে হলে হাত নরম করতে হয়। ও লোহার হাতে হবে না। সর্—

কেতুচরণ বেকুব হয়ে লজ্জিত হাসি হাসে। গোল-পাঁচুর দিকে বাঁকা-চোখে চেয়ে বলে, ওরে আমার মাখনবালা রে!

জুত করে এবার ছেলে কোলে তুলে নিয়ে অতি-যত্নে দুধ খাওয়াতে লাগল। হাসি পাচ্ছে তার নিজেরই—সত্যিকার মা হয়ে যেন দুধ খাওয়াতে বসেছে! হাজার রকম শয়তানি ও দাঙ্গাবাজিতে যার নাম-ডাক—সেই মানুষ ছেলে কোলে এমন শান্তভাবে বসতে পারে, কেউ কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে! লাগছে ভারি চমৎকার—ঝিমুনি আর নেই, দেহ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে ছেলে খাওয়াতে বসে। বেশ জ্যোৎস্না ফুটেছে—ফুটফুটে জ্যোৎস্না পড়ে কালো ছেলের মুখ অপরূপ দেখাচ্ছে। ঘুমের মধ্যে হাঁ করছে, আর কেতুচরণ সন্তর্পণে দুধ দিচ্ছে তার গালে। খুব ছেলেবেলার কথা মনে নেই—তাকে কে এমন দুধ খাওয়াত, কিছু মনে পড়ে না। কিন্তু জ্ঞান হবার পরে এমন কোমল উপলব্ধি হয় নি তার কখনো।

খাওয়ানো মিটল, দুশ্চিন্তার শেষ হল এতক্ষণে। উমেশেরও

মনে বড় শান্তি—দ্রুত লয়ে ঢোলকের উপর একটা বোল তুলতে যাচ্ছে, কেতুচরণ ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

এইও—

উমেশ অবাক হয়ে তাকায়। আর কেউ নয়, কেতুচরণ বাজাতে মানা করছে—বিশ্বাস করতে পারে না ব্যাপারটা।

একটুখানি আসর হলে হত না? অনেকদিন বন্ধ আছে।

কেতু বলে, তোমার গানবাজনা—গজকচ্ছপের যুদ্ধ। ঘুম নষ্ট হয়ে যাবে, এক্ষুনি আবার ক্ষেপে উঠবে।

আজকে উমেশের ভারি ফূর্তি হয়েছিল—আবার সে মুশড়ে পড়ে। দলের মধ্যে একমাত্র সমঝদার কেতুচরণ—সে-ও বিগড়াল বুঝি ছেলে নিয়ে এসে। কী করবে, মনে মনে ভাবছে। গলায় ঢোলক ঝুলিয়ে ফিরে চলে যাবে ফলুইমারি পার হয়ে? আতরবালা ওদিকে বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে—কাজ তো কিছুই নেই এত দীর্ঘ এই রাত্রিবেলাটায়।

কেতুচরণের কী মনে হল—উমেশের মুখের দিকে চেয়ে কোমল কণ্ঠে এবার বলল, আসর কী করে হয়—তুমিই বুঝে দেখ ওমশা। টাকার লোভে ছেলেটা নিয়ে এসে বিষম ঝঞ্চাটে পড়ে গেলাম। সুখ-সোয়াস্তি, আমোদ-ফূর্তি সমস্ত মাটি। আগে বুঝতে পারলে কে যেত এর মধ্যে!

উমেশ সোৎসাহে বলে, দিনমানে আসর হবে তাহলে। কুমার বাহাদুর শুনবেন। তোমরা কাজের মানুষ—বসে থাকতে পারবে না তো! খাইয়ে দাইয়ে রেখে যেও—আমি ওঁকে নিয়ে থাকব। বাজনা ওঁর ভারি পছন্দ। আমাকেও পছন্দ করেন। কেমন এক-নজরে তাকিয়ে থাকেন আমার বাজনার সময়।

ঢোলক নামিয়ে রেখে উমেশ চাটকোল পেতে বসে পড়ল। রাত্রি শেষ হোক, মধুর হাসি হেসে খোকা জেগে উঠুক, তাদের নতুন আসর সেই সময়।

॥ সাইত্রিশ ॥

খুশাল বিষম বিরক্ত। ঋষিবর ছাড়া কাউকে বড়-একটা কাজে পাওয়া যায় না। ওরা যেন আলাদা এক দল করেছে। বাসা-ঘরখানার ভিতরে আড্ডা। এত কষ্টের সায়ের জমে উঠছে, তা সায়ের-ঘরে একবার উঁকি দিয়ে দেখবার কৌতূহলও কারো নেই। ছেলেটা হল যত নষ্টের গোড়া—দুর্লভ হালদারের ছেলে তো! ওদের হাড়ে ভেল্কি খেলে। একরত্তি অবোধ শিশু—দেখ না, এসেই অমনি খুশালকে সকলের থেকে পর করে দিয়েছে।

অসহ্য হয়ে উঠলে শেষকালে খুশাল একদিন দুম-দুম করে মাটি কাঁপিয়ে ওদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। কেতুকে বলে, পরের বাচ্চা কত দিন আর পুষবে শুনি? ঝাঁপায় দিয়ে আসবার কথা—চলে যাও না সেখানে। ছেলে দিয়ে পাওনাগণ্ডা আদায় করে নিয়ে এসো।

গোল-পাঁচু সায় দেয়ঃ ঠিক বলেছ খুশাল। তাই উচিত্ত বটে। টালবাহানা করা অন্যায় হচ্ছে। বলা যায় না—ছেলেটার ভালমন্দ কিছু হলে এককাঁড়ি টাকা লোকসান।

কেতুর কিন্তু উৎসাহ দেখা যায় না। বলে, দুর্লভ হারামজাদার কথা—ফুক্কুড়ি মেরে ছেলে গছিয়েছে কিনা বলা যায় না। কষ্ট করে গিয়ে হয়তো দেখব, বৈকুণ্ঠ ধর বলে লোকই নেই সেখানে।

খুশাল বলে, না মরে ভূত হও কেন? গিয়ে দেখেই এসো। আগে থেকে হাত-পা কোলে করে বসলে হবে কেন!

উমেশ রাগ করে বলে, তোমার কি অসুবিধে হচ্ছে, বলো দিকি খুশাল? তোমার ঘাড়ে কি চেপে বসে আছেন রাজকুমার? অত উতলা কেন? শিশু দেবতা। অমন দূর-দূর করতে নেই, দেবতা রুষ্ট হন।

আর এই এক উপগ্রহ—অকর্মার ধাড়ি উমেশটা এর মধ্যে জুটেছে। খুশাল দু-চক্ষে দেখতে পারে না লোকটাকে। রাগে দাঁত খিঁচিয়ে ওঠেঃ তোকে কে ফোপরদালালি করতে ডেকেছে?

দিন-রাত্তির পড়ে পড়ে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। ঘরবাড়ি নেই ? যা চলে সেখানে।

উমেশের রাগ নেই। হাসতে হাসতে সে বুড়ো-আঙুল নাড়ে। বলে, নেই, নেই—ফক্কা ! ঘরবাড়ি জমিজিরেত সমস্ত বেচে দিয়ে শিব হয়েছি, শোন নি ?

শিব—তবে শ্মশানে-মশানে যা। কষ্টেসৃষ্টে আমরা দেড়খানা কুঁড়ে বেঁধেছি, সে জায়গায় কেন ?

গোল-পাঁচু জ্বলে উঠল।

আসে তা কী হয়েছে ! শ্মশান বলে শাপশাপান্ত করো কেন ? কেতুচরণ বলেছে বলেই আসে। ওমশা না থাকলে কার ক্ষমতায় আছে বাচ্চাছেলের এত ঝক্কি পোহানো ?

উমেশ বলে, আহা, কলহ কোরো না। যাচ্ছিই তো চলে। আর মোটে পাঁচ-সাত-দশ দিনের ব্যাপার।

কথা কেড়ে নিয়ে গোল-পাঁচু বলে, আমিও যাবো। একসঙ্গে চলে যাচ্ছি। যাবো না তো কি হক-নাহক তোমার মুখ-নাড়া খেতে পড়ে থাকব ?

খুশাল ভ্রূকুটি করে। ভাঙন অনেক দূর গিয়েছে—ধ্বস নামছে তবে দু-দশ দিনের মধ্যেই, পুরন্দরে যেমন কূল ভাঙে ? কেতুচরণও আবার গোল-পাঁচুর মতো অমনি একটা-কিছু বলে না বসে ! ভয় পেয়ে সে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল।

আবার, একদিন একটু ঝিরঝিরে বৃষ্টি হল। আধ-ছাওয়া বাসাঘরের ভিতর জ্যোৎস্নাভূষণের গায়ে এক ফোঁটা জল পড়েছে কি না পড়েছে, সেই আক্রোশে উমেশ চালের উপর উঠে ছাউনি টেনে ছিঁড়ে তছনছ করে ফেলল। বিকালবেলা কেতুচরণ এবং আরও কে কে ডিঙি নিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেছে। খুশাল সায়ের-ঘরের মেজেয় পড়ে ঘুমুচ্ছিল গুটিসুটি হয়ে। ঘুম ভেঙে উঠে এসে সে উমেশের কাণ্ড দেখল।

কী হচ্ছে ওমশা ? বলি, বাঁধন কেটে চাল দু-খানাও নামিয়ে আনবি নাকি ?

জল পড়ছিল—তাই দেখছি মেরামত করা যায় কিনা।

কথা শুনে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলে ওঠে। মেরামত একে বলে! চেঁচামেচি করল যতক্ষণ দমে কুলায়। কিন্তু গালিতে গায়ে ফোসকা পড়ে না। উমেশ শোনে, আর হেসে হেসে দেয়ালা করে ছেলের সঙ্গে। ভাল-মন্দ জবাব দেয় না। দম ফুরিয়ে খুশাল তারপর গজর-গজর করে। কেতুচরণের অনুপস্থিতিতে আর অধিক এগোতে ভরসা করে না। আসুক সে ফিরে, তখন দেখা যাবে।

সন্ধ্যার পর কেতুচরণ ফিরল। খুশাল ঘাট অবধি গিয়ে তাকে এগিয়ে আনল। গম্ভীরভাবে কেতু সকল বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে আসছে।

ঘরের সামনে এসে কেতু হাঁক দিল: ওমশা—

কি?

শুনে যাও ইদিকে।

উমেশ বলে, এখন পারব না। মশা ভনভন করছে, সাজাল দিচ্ছি।

ছাউনি কেটে বেছাপ্পর করেছ, সর্বনেশে মানুষ যে তুমি!

উমেশ সমান তেজে জবাব দেয়: বাইরে জল না পড়তে ঘর ভেসে যায়। নিজেরা মরবে মরো, বৃষ্টি খাওয়াতে অবোধ বালক এনে জুটিয়েছে কেন?

আশ্চর্য, কেতুর সুর নরম হয়ে গেল। বলে, কতগুলো টাকার ফেরে ফেললে—হিসেব রাখ?

উমেশ বলে, হাতি এনেছ—তাঁর পিলখানার খরচ তো লাগবেই। সে ভাবনা আগে ভাবলেই হত!

পায়ে পায়ে ইতিমধ্যে কেতু ছেলের পাশে এসে গেছে। ঝুঁকে পড়ে দেখছে। ঘুমিয়ে আছে। তেলচিটে ছেঁড়া একখানা কাপড়ে ঢেকে দিয়ে উমেশ এখন তুষ-ঘুঁটেয় আগুন ধরিয়ে ধোঁয়া করবার চেষ্টায় আছে। ধোঁয়ায় মশা পালাবে। কেতুচরণের বুকের মধ্যে ছাঁত করে ওঠে, বৃষ্টি খেয়ে ছেলের এখন অসুখ-বিসুখ না করলে হয়।

খুশাল তাজ্জব। এত বড় ক্ষতি করেছে, একটা-দুটো কথায় হয়ে গেল তার ফয়শালা! কেতু দাঁড়াল না, হনহন করে বেরিয়ে

পড়ল তখনই। বুনোপাড়ায় গিয়ে দু-কাহন খড়ের দরুন নগদ বায়না দিয়ে এল। সকাল হতে না হতে মাথায় বয়ে আনল সেই খড়। উঠে পড়ে লেগেছে ঘরের কাজে। অমন সায়ের-ঘর কানা করে দিয়ে বাসাঘরের নতুন খড়ের ছাউনি সোনা হেন ঝিকমিক করছে।

ছেলেটা যেখানে শোয়, তার মাথার দিকে একটু বেড়ামতো দেওয়া হয়েছে ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির ঝাপটা ঠেকানোর জন্য। সেই বেড়ায় উমেশ গোবরমাটি লেপেছে, পিটালি-গোলা দিয়ে চালচিত্রের ছবি এঁকেছে তার উপর। দু-বেলা সে মেঝে ঝাঁট দেয়, এক কণিকা ধুলো থাকতে দেয় না। খাট-পালঙ্ক নেই, কাজেই মাটিতে রাখতে হয়। তা বলে তাদের মতো ধুলোয় ভূত হয়ে থাকতে পারেন কি কুমার বাহাদুর?

কেতুচরণ মাঝে মাঝে ভারি প্রসন্ন হয়ে বলে, আমরা বাউণ্ডুলে মানুষ। তুমি আছ ওমশা, বাচ্চাটা তাই বেঁচে রয়েছে। এমন আমরা পারতাম না। আমাদের হাতে থাকলে অক্কা পেয়ে যেতো। তা তুমি থেকে যাও ওমশাভাই, যদ্দিন ছেলের একটা গতি করতে না পারছি।

উমেশের আপত্তি নেই, সে উচ্চবাচ্য করে না। প্রায় সর্বক্ষণই সে এখানে পড়ে থাকে। কালেভদ্রে আতরের কাছে যায়। এখন গোল-পাঁচুর গতায়াত আতরের বাসায়। ভাই-বোনে বোঝাপড়া হয়ে গেছে। উমেশের জমিটা নিয়েছেন ওস্তাদ তারক বাঁড়ুজ্জে। সেই টাকার জন্য গোল-পাঁচু বাঁড়ুজ্জের কাছে দু-বেলা জোর তাগাদা লাগিয়েছে। অতিষ্ঠ করে তুলেছে তাঁকে। উমেশ তাঁর শিষ্য—তাকে ঠেকিয়ে এসেছেন। ভেবেছিলেন, ধীরে সুস্থে দু-পাঁচ টাকা করে দেবেন। কিন্তু গোল-পাঁচুর হাত এড়াবার উপায় নেই।

কেতুকে গোল-পাঁচু জিজ্ঞাসা করে: খবরবাদ পেলে? হালদার মশায় কবে এসে ছেলে নিয়ে যাবে?

কেতু ঘাড় নেড়ে বলে, কিচ্ছু জানি নে।

রসিকতা করে বলে, জোয়ারের জল দুর্লভকে ভাসিয়ে দেশে

ঘরে নিয়ে ফেলেছে ঠিক—আর ফিরবে না। নতুন ঘেরিবাবু এসেছে শুনছি। নিজে গিয়ে খোঁজখবর করব, তা অদ্দুর যাবার ফাঁক পাচ্ছি নে। বুদ্ধির ভুলে কী ল্যাঠায় জড়িয়ে পড়লাম—দুর্লভকে না পেলে তো সর্বনাশ।

গোল-পাঁচু বলে, বাঁড়ুজ্জের টাকাটা হাতে এসে গেলে আমরা কিন্তু একদিনও আর দেরি করব না। তার মধ্যে ব্যবস্থা করে নাও।

অনুনয়ের সুরে কেতুচরণ বলল—কেতুচরণের এমন কণ্ঠ আগে কেউ শোনে নি—দু-চারটে দিন রে ভাই। তার ভিতরে হয়ে যাবে একরকম। ছেলে-পোষার ব্যাপারে আমি তো একেবারে আনাড়ি ছিলাম, আমারও বেশ রপ্ত হয়ে আসছে। কি বলো ওমশা?

এরই মধ্যে ঋষিবর একদিন সুসংবাদ বয়ে আনল: দুর্লভ ফিরেছে মর্জালে, তার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

কেতুচরণ চমকে ওঠে।

বেশ, বেশ! মারা যায় নি তা হলে? ভাল।

খুব অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। হরিপদটার কিন্তু খোঁজ নেই—এক-হাতে কদ্দুর সাঁতরাবে? সেটা, বোধ হচ্ছে, ফৌত।

আবার বলে, বাদাবনের ঘুঘু—অখণ্ড পরমায়ু দুর্লভ বেটার। তোমার পক্ষে জুত হল কেতুচরণ, কিন্তু বাওয়ালিদের আরও বিস্তর জ্বালাবে। ডুবছিল, ভাসছিল, নোনা জল খেয়ে পেট ঢাকের মতো—সেই সময় এক ধানের নৌকো দেখতে পেয়ে তুলে নেয়। এদ্দিন খুলনের হাসপাতালে পড়েছিল। দু-এক দিনের ভিতর এসে বুঝসমঝ করে ছেলে নেবে, আমায় দুর্লভ বলে দিয়েছে।

কেতুচরণ বলে, যাক বাবা, রক্ষে পেলাম। কম ঝঞ্ঝাট একটা ছেলের ঝক্কি নেওয়া!

ঋষিবরের কাছে উল্লাস জানিয়ে কেতুচরণ ঘরে ঢুকল। শিশুকে উদ্দেশ করে বলে, শুনছিস রে শুয়োরের বেটা, বাপ তোর বেঁচে আছে। অমন কদমতলীর টান, তা-ও ভাসিয়ে নিতে পারল না।

আসছে সে তোকে নিয়ে যেতে। খিল-খিল ! খিল-খিল ! হেসে যে গড়িয়ে পড়লি ওরে হাসকুটে ! বড্ড ফুর্তি—উঁ ? তা হাসবি বই কি এখন, কেমন অজাতের ঝাড় !

॥ আটত্রিশ ॥

দুর্লভ এসে হাজির। উঠেছে সায়ের-ঘরে। খুশাল খাতির করে বসিয়েছে। কথাবার্তা হচ্ছে। হি-হি করে হাসতে হাসতে ঋষিবর এসে কেতুচরণকে খবরটা দিল।

টাকাকড়ি নিয়ে এসেছে, বলল। চুকিয়ে দিয়ে ছেলে নিয়ে যাবে। খুশালের কাছে দরবার করছে : এক-শ টাকা বড্ড বেশি—ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছি, কিছু কম-সম হলে উচিত হয়।

এক টুকরা বাঁশ জোগাড় করে কেতু শলা চাঁচছে বাঁধের উপর বসে। কাজ বন্ধ করে চোখ তুলে বলে, কি—কি বলছে ?

ঐ এক পুঁটকে ছেলের পোষানি এক-শ টাকা—তা গায়ে লাগে বই কি !

কেতুচরণ ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, দরাদরি নেই। বলগে যা, ওর সিকি-পয়সা কমে আমি ছাড়ব না।

ঋষিবর রাগ করে বলে, রেখেই বা কোন চতুর্ভুজ হবে—হাঙ্গামা টের পাচ্ছ না ? বিদেয় করতে পারলেই তো বেঁচে যাও।

কেতুচরণ বলে, জল ঠেলে নিয়ে আসতে কী কষ্টটা হয়েছিল—তার হিসেব করছিস ? দু-কথার মানুষ আমি নই। যা বলেছে, তাই দিতে হবে। তুই দালাল হয়ে এসেছিল। ভালর তরে বলছি, সামনে থেকে চলে যা।

বলতে বলতে খুশাল ও দুর্লভ এসে পড়ল। উঁচু গলার বাগ-বিতণ্ডা কানে যাবারই কথা।

দুর্লভ বলে, কী হচ্ছে তোমাদের গো ? অত শলা চেঁচে কাঁড়ি করছ কেন ?

কেতু বলে, দোয়াড়ি বানাবো—

খুশাল বলে, নেই কাজ তো খই ভাজ। জাল ফেললে খাল্‌ুই বোঝাই হয়ে যায়, দোয়াড়ি পেতে কষ্ট করে মাছ ধরার কি গরজ?

ঋষিবর ভালমানুষের ভাবে সুপারিশ করে: পুরো টাকাটাই দিয়ে দেনগে হালদার মশায়। ওতে আর কাটাকাটি করবেন না। অনেক কষ্ট করে সাঁতরে সাঁতরে নিয়ে এসেছে। টাকা তো অঢেল রোজগার করেন, খরচও করে থাকেন। কিন্তু বুঝে দেখেন, ছেলে গেলে আর ছেলে হত না।

দুর্লভ একটু ইতস্তত করে বলল, তা-ই না হয় হল। একশ-ই দিচ্ছি। কেতুচরণকে চটাব না। আরো তো কাজ রইল।

কেতু সবিনয়ে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ—

চলো তা হলে। ছেলে কোথা? ছেলে দাও, পাওনা বুঝে নাও।

কেতু বলে, ছেলে কি বাইরে রাখা যায়? এক্ষুনি সর্দি লাগবে। বলছিলেন, এক-শ টাকা বেশি। কত তোয়াজে রাখতে হয়, কী ঝক্কি পোহাতে হয়, জানেন না তো!

বাসাঘরের দিকে চলেছে সকলে। দেখা গেল—দুর্লভ পিছনে পড়ে গেছে, আতরবালার বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

কেতু বলে, মেলা ভেঙে গেল, আতরটা আজও পড়ে রয়েছে দেবতা।

দুর্লভ বলে, মধু রায় আটকেছে বুঝি? তা ছাড়া আবার কে! হ্যাক-থুঃ—যা বেটার রীত-প্রবৃত্তি!

মুখ টিপে হেসে কেতুচরণ বলল, একা মধু রায় কেন—খদ্দের কি একটা-দুটো? বলেন কেন! অঢেল পশার ও-মাগীর। যাই-যাই করেও যেতে পারছে না।

ঢুকে পড়ল কেতুর সঙ্গে গোবরমাটি-লেপা দেয়ালচিত্র-করা ঘরের ভিতর। উমেশ যথারীতি হাজির আছে। জ্যোৎস্নাভূষণ হাত-পা নেড়ে খেলা করছে উমেশের সঙ্গে, আঁ-আঁ করছে। শিশু ও বুড়োয় আলাপন অবোধ্য ভাষায়। কত ফূর্তি!

দুর্লভ হাত বাড়িয়ে নিতে গেল। আসে না। ড্যাবডেবে চোখ মেলে তাকাচ্ছে শুধু।

হেসে দুর্লভ বলে, হারামজাদার কাণ্ড দেখ! এই ক'দিনে পর হয়ে গেছে। বড্ড গছে গিয়েছে তোমাদের কাছে।

হাততালি দেয় ছেলের সামনে।

এসো লক্ষ্মীধন, সোনামাণিক—

টেনেটুনে নিয়ে নিল কোলে। রকম দেখ ছেলের—ঠোঁট কোলাচ্ছে, কেঁদে পড়ে আর কি!

শুষ্ক মুখে কেতু জিজ্ঞাসা করে: এখনি নিয়ে যাবেন দেবতা?

হ্যাঁ, দেরি আর কেন! ফাঁকা ঘরে তিষ্ঠানো যায় না—কাজকর্ম করতে পারি নে—মন হু-হু করে। চাকরি ছাড়ব বলেছিলাম, তা নিজের আর ছেড়ে দিতে হবে না—ওরাই ছাড়িয়ে দেবে আর কিছুদিন এইরকম অবস্থা চললে।

কেতুর মুখের দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করে: সন্ধান হল কিছু? এই এক-শ টাকা পাচ্ছিস। ওটা হয়ে গেলে আর এক দফায় এক-শ···যাকগে, কাজটা গোলমেলে আছে—ডবল ধরে দেবো ওটার দরুন। তা হলে একুনে তিন-শ টাকা দাঁড়াচ্ছে, বুঝে দেখ।

কেতুচরণ ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। নির্ভাবনায় থাকুনগে—তারও ব্যবস্থা হচ্ছে।

তবে যেন কিছু হদিস পেয়েছিস?

দুর্লভ চোখ পিটপিট করে তাকাল। কেতুচরণ জলজ্যান্ত মিথ্যাকথা বলে, নয় তো এতখানি জোর দিয়ে বলছি কি করে? শিগগিরই পৌঁছে দিয়ে আসব, দেখতে পাবেন। তবে—

সশঙ্কে দুর্লভ বলে, তবে আবার কি রে?

কেতুচরণ কাতর হয়ে বলে, আজকের দিনটে খোকাকে নেবেন না দয়াময়। জলে ভিজে ওর শরীর বেজুত হয়েছে। দু-বার বমি করেছে। তার উপরে নৌকোয় সেই মর্জাল অবধি যাওয়ার ধকল সইতে পারবে না। একটু সামলে উঠলে ক-দিন পরে এসে নিয়ে যাবেন।

কিন্তু ছেলের চেহারা বা ভাবভঙ্গিতে অসুখের কোন লক্ষণ নেই। তবু দুর্লভ রাজি হয়ে যায়।

বেশ, ফিরে যাচ্ছি আজকে। হাসপাতাল থেকে শ্বশুরকে খবর দিয়েছিলাম। জবাব এসেছে, দু-তিন দিনে এসে পড়বে। তার জিম্মায় দিয়ে দেবো। তা থাক—এই ক'টা দিন থাকুক তোর কাছে।

আঙুলের কর গণে বিড়-বিড় করে হিসাব করে। সোমবার অবধি কাজের বড্ড চাপাচাপি। তার মধ্যে সময় হবে না। মঙ্গলবারে আসব—মঙ্গলবারে এমনি সময়। আর এর মধ্যে ওদিককারও পাকা-খবর পেয়ে যাবি, কি বলিস? খেয়াল রাখিস বাবা, তোর ভরসায় আছি।

রাত্রি গভীর হল। কেতুচরণ বাঁধের উপর ফিরে এসে একাকী আবার কাজে লেগেছে। আঁধারেও হাতের আন্দাজে শলার কাজ করতে পারে, কাটারিতে হাত কাটে না।

গোল-পাচু এসে উত্তেজিত ভাবে বলল, দুর্লভ শয়তান আজকে আবার এসেছিল।

এসেছিল ছেলে নিতে—তা দিলাম না। মঙ্গলবারে আসবে বলে গেছে।

মঙ্গলবারের আগেই তবে সরে পড়ব। বাঁড়ুজ্জে টাকা দিক আর না দিক।

খরকণ্ঠে কেতুকে সে বলে, দিলে না কেন ছেলে? ঐ ছুতোয় আবার আসবে। ও আপদ না এলেই ভাল। ওকে দেখলে পিত্তিনাড়ি জ্বলে যায়।

কেতু সায় দেয়: তা ঠিক! দেখ না, কাদমতলীতে পড়েও মরল না। বাদাবনে এত বাঘ-সাপ-কুমির—মা বনবিবি একটা-কোন ব্যবস্থা করে দেন না!

টাকা দিয়েছে?

খেদের সুরে কেতু বলে, দিল আর কই! গাঁটের টাকা গাঁটে নিয়ে সরে পড়ল। বেবাক লোকসান।

গোল-পাঁচু আশ্চর্য হয়ে বলে, হয়েছে কি তোমার, বলো দিকি? কোন বুদ্ধিতে ছেলে দিলে না?

অসুখ করেছে যে। দিই কেমন করে।

তোমার কি তাতে? তোমার হল টাকা নিয়ে কথা। অসুখ করেছে বলেই তো তাড়াতাড়ি লেনদেন চুকিয়ে ফেলা উচিত। এমন-তেমন হয় তো ওর কাছে গিয়েই হোক।

কেতুচরণ রাগ করে বাঁশের খানিক মাটি ছুঁড়ে মারল তার দিকে।

দূর, দূর হয়ে যা। চামারের ঘরে জন্মাস নি কেন তুই?

তাড়া খেয়ে গোল-পাঁচু আরও কাছ ঘেঁসে বসে।

তোমায় বলতে কি, হারামজাদা আজ আবার পদ্মর ওদিকে ঘুরঘুর করছিল। পাড়ার সকলে উঠে গিয়ে একদম ফাঁকা হয়েছে, এদিকে-ওদিকে চেয়ে দেখবারও কেউ নেই—বেটার ভারি জুত। আমি ঘরের ভিতর বসে বসে দেখছিলাম কাণ্ড। যেতে আর চায় না—কেবলই পায়তারা মেরে বেড়ায়। কিছুতে যখন উঠলাম না, শেষটা গোন মারা যায় দেখে নৌকোয় গিয়ে উঠল।

বলতে বলতে পাঁচুর গলা আটকে আসে। কেশে গলা ঝেড়ে বলল, নরকের সাথী—ওরা ডোবাতে আসে। বোনটিকে আর ওদিকে তাকাতে দিচ্ছি নে। তাড়াতাড়ি পালাব।

কেতুচরণ উঠল। কাজ শেষ হয়েছে। দোয়াড়ি নয়, দুর্লভকে মিথ্যে বলেছিল—একটা খাঁচা বুনেছে এতক্ষণ বসে বসে। রঙ-বেরঙের পাখি ধরে খাঁচায় পুরবে। পাখিরা কিচ-মিচ করবে, একটু বা উড়বে। জ্যোৎস্নাভূষণ কত আহ্লাদ করবে পাখি দেখে! হামাগুড়ি দিয়ে চলে যাবে একেবারে খাঁচার কাছে।

ভাঁটা সরে-যাওয়া চরের উপর সকালের রোদ ঝিকমিক করছে। কেতুচরণের শরীরটা বেজুত লাগছে, মনও ভাল নয়। থপথপ করে পা ফেলে অন্যমনস্ক ভাবে সে যাচ্ছে। দূর দিগন্তের হাওয়া এসে গায়ে লাগে। ভাবছে, ভালই তো, নিয়ে যাক এসে মঙ্গলবারে। মঙ্গলের আগে এলে আরও ভাল। এক গাদা টাকা পাওয়া যাবে—উঃ! এর উপরে এলোকেশীর যদি সন্ধান মেলে,

তবে তো টাকার পাহাড় হবে। এক সময় টাকার যখন বড় দরকার ছিল, আনি-দুয়ানি পয়সা গেঁথে গেঁথে একশ-র আধাআধিও পৌঁছতে পারে নি।

বাঁধে নতুন মাটি দিয়েছে। তরঙ্গাকুল নদী আস্ফালন করছে, যেন বাঁধের মাটি হাজার বাহুতে তুলে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে জলে ভাসিয়ে দিতে চায়। পেরে ওঠে না, পারবার কোনই সম্ভাবনা নেই। ভাঁটার টান যত বাড়ছে, জল দূরবর্তী হচ্ছে ততই। মাঝখানের চর ঝিকিমিকি হেসে উপহাস করছে নদীস্রোতকে।

উন্মুক্ত চরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত কে যেন বনপলাশ ছড়িয়ে গেছে। অথবা চরের রূপালি শাড়ির উপর থোপা থোপা গোলাপি বুটি। কাঁকড়া ওগুলো। গর্ত থেকে উঠে এখন সকালবেলার রোদ পোহাচ্ছে। খুব ছোট, একখানা মাত্র দাঁড়া—সর্বাঙ্গের মধ্যে দাঁড়াটাই উল্লেখযোগ্য।

কাঁকড়াই ধরা যাক না! পাখি এখনো একটাও ধরতে পারে নি। খাঁচা খালি। পাখি ধরা বড্ড কঠিন, বিস্তর তোড়জোড় করতে হয়।

কাদায় নেমে পড়ল কেতু। চটচটে কাদা, আঠার মতো লেপটে যায়। সর্বাঙ্গে ছিটকে ওঠে। তারই মধ্যে সে ছুটাছুটি করছে।

আরে আরে কেতুচরণ যে! ওখানে কি করো?

গোল-পাঁচু যাচ্ছিল এই দিক দিয়ে। দেখে সে অবাক হয়ে গেছে।

ক্ষেপে গেলে নাকি কেতু? কি হবে ও-কাঁকড়া? খাওয়া যায় না, কোন কাজে লাগে না।

কেতুচরণ জবাব দিল না। মহা ব্যস্ত, মুখ ফিরিয়ে তাকালই না। এই জাতের কাঁকড়া অতি সতর্ক। কুলো, চিল, মাছাল, ঢালিবক গাছের উপর ওত পেতে থাকে কাঁকড়া ধরে খাবার জন্য। তাই এমন হয়েছে, ক্ষীণতম আওয়াজ হলেই কাঁকড়া গর্তে ঢুকে পড়ে।

এক প্রহর বেলা অবধি অনেক চেষ্টা করে কাদা মেখে ভূত হয়ে কেতুচরণ দুটো কাঁকড়া ধরল। সেই দুটো দু-হাতের মুঠোয় পুরে,

যেন মুঠি ভরে মণিমাণিক্য নিয়ে বাড়ি এসেছে, এমনিভাবে চিৎকার করে :

দেখ খোকা, কী আনলাম তোমার জন্মে—দেখ একবার চেয়ে।

কাঁকড়া দুটো ছেড়ে দেয় ঘরের মেঝেয়। দাঁড়া তুলে তারা ছোটে। কেতুচরণ হাততালি দিয়ে তাড়া করে। জ্যোৎস্নাভূষণ অবাক হয়ে দেখে। তারপর শাদা দুধে-দাঁতগুলো মেলে হাসে। বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে কেতুচরণ। এ জিনিস একেবারে নতুন—এই বন-সীমান্তে এমন হাসি কেউ হাসে নি আজ অবধি। ছোট ছোট হাত দুটি বাড়িয়ে কাঁকড়া ধরতে যাচ্ছে—কী সর্বনেশে ডাকাত ছেলে! হবে না, শুয়োরের বাচ্চা শুয়োরের মতোই গোঁয়ার হবে তো!

হি-হি করে কেতুচরণ একাই হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলে, দেবে আঙুল কামড়ে—কুট করে কেটে নেবে। থাকিস সারাজন্ম আঙুল-কাটা হয়ে।

টিকে এসে উপস্থিত। বাইরে থেকে হাঁক দিচ্ছে : কেতুচরণ আছ নাকি? ওরে কেতু!

ঘরের মধ্যে গলা বাড়িয়ে টিকে বলল, বাবু ডেকেছেন তোমায়।

কেতু অন্যমনস্ক ভাবে বলে, কোন বাবু?

বাবু আবার ক-জন আছে কাছারিবাড়ি? সুকুমার তো ভেগে পড়েছে। অমন বাবু-ভেয়ে মানুষ আবাদে পড়ে থাকতে পারে! বাবুর যেমন কাণ্ড, ছাগল দিয়ে মলন মলাতে গিয়েছিলেন।

কেতুচরণ তাকিয়ে দেখল না একবার তার দিকে। কথা কানে গেল কিনা বোঝা যায় না। গুলি-পাঁচু কিছু জালের সুতো পাকিয়ে রেখেছিল। তারই খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে সে পরম মনোযোগে কাঁকড়া দুটোর দাঁড়া বাঁধছে।

টিকে বলল, যাবে কখন?

কেতু বিরক্তস্বরে জবাব দেয় : যাওয়া যাবে একসময়।

বড্ড জরুরি। আজকেই যেও। সন্ধ্যার সময় যাবে, তাই বলিগে। কেমন?

হুঁ—

কাঁকড়া সুতোয় বেঁধে চালের সঙ্গে টাঙিয়ে দিল। মজা মন্দ নয়। খোকার কান্নাকাটি বন্ধ, হাত-পাও নড়ে না বুঝি! একনজরে ঐ দিকে তাকিয়ে আছে।

॥ উনচল্লিশ ॥

পরের দিন টিকে আবার এসে পড়ল।

কই, যাও নি তো?

পেরে উঠি নি—

টিকে রাগ করে বলে, কাজ তো দেখি নে। কাল দেখে গেলাম, আজও দেখছি। এই দু-পা গিয়ে কথাটা শুনে আসতে পারলে না!

হুঁকো থেকে মুখ তুলে কেতুচরণ চোখ পাকাল তার দিকে। বলে, আমার কাজের নিকেশ তোকে দিতে গেলাম কেন রে! রায়বাবুর কেনা গোলাম আমি? বলে দিস, যেতে পারব না।

নরম হয়ে টিকে বলে, রাগ করো কেন রাগের কথাটা কি হল? রায়বাবু বাদায় যাচ্ছেন—বাদার শেষ অবধি যাবেন এবার। তাই ডাকাডাকি করছেন। দস্তুরমতো পাওনাগণ্ডা আছে, এমনি নয়। বাদাবনে চলাচলের ব্যাপারে, বুঝে দেখ, দুকড়ির পরেই হলে তুমি। দুকড়ি বুড়ো হয়েছে, গায়ে বল-শক্তি কম, নিজের উপর ভরসা রাখতে পারে না। সে-ই বলেছে তোমায় খবর দিতে। সেইজন্যে ছুটোছুটি করছি।

দুকড়ির নামে যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ল।

তিনি পাঠিয়েছেন? সে-কথা বলো নি কেন, আজকেই যাবো। নির্ঘাত যাবো, তাঁকে বোলো। কাছারিবাড়ি থাকবেন তো তিনি?

না থাকে, বাড়ি থেকে খবর দিয়ে আনানো যাবে। আজকে যেন ভুল হয় না কেতুচরণ।

টিকে চলে গেল। কেওড়াফুল ফুটেছে অজস্র। ঘরের পাশেই

গাছ। কেতুচরণ কোনদিন ঘাড় তুলে এসব তাকিয়ে দেখে নি। আজকে কী মনে হল, গাছের মাথায় সে উঠে পড়ল। কোঁচড় ভরে ফুল এনে খোকার গায়ের উপর ঢেলে দেবে, ফুল নিয়ে কী করে সে দেখা যাক। ছিঁড়ে কুচিকুচি করবে, না গন্ধ শুকবে বিলাসিনী এলোকেশীর মতো?

ফুল পাড়তে গিয়ে মনে হল, চাক ভাঙবার মরশুম তো এসে পড়ল। মাছি ওড়া শুরু হয়েছে আকাশে। ঝাঁক বেঁধে ঐ উড়ছে কতকগুলো। গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে কেতুচরণ মাছি লক্ষ্য করে ছুটল। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে না। উড়ন্ত মাছির ঝাঁক থেকে বেশিক্ষণ নজর সরানো চলে না, তা হলে মাছি হারিয়ে যাবে। আকাশে চোখ রেখে অভ্যাসবশে ডিঙি বাইতে লাগল লা-ভাঙার উপর। খাল পার হয়েই আবার ছোটে। গুলোর আঘাতে পা রক্তাক্ত হচ্ছে। জল-কাদা মেখে কাপড় ভিজিয়ে অগভীর নালা দ্রুতবেগে পার হয়ে যাচ্ছে। এমনি বেপরোয়া ভাবে ছুটতে হয় বলে ফি বছর কত মউল যে বাঘের কবলে পড়ে, তার সংখ্যা নেই।

চাকের সন্ধান মিলল অবশেষে। কেতুচরণ দেখে রাখল। দিনমানে চাক ভাঙতে সে সাহস করে না। মন্ত্রতন্ত্র কিম্বা গাছগাছড়ার রস যা হাতে মেখে চাক ভাঙতে হয়, কিছুই তার জানা নেই। রাত্রিবেলা মৌমাছি অন্ধ হয়ে যায়, সেই সময় এসে ভাঙবে। বিচালির বোঁদা বেঁধে নেবে। দুই কাজ হবে এতে— আগুন দেখে বড়-শিয়াল কাছে আসবে না, আর ঐ বোঁদার ধোঁয়ায় মৌমাছি চাক ছেড়ে উড়ে পালাবে।

চাক ভেঙে মধু-ভরা অংশ গামছায় বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছে। খালের ধার দিয়ে ফিরে চলেছে।

রায়বাবুর নীলপানসি যেন চরের উপর। জোৎস্না ফুটফুট করছে। নতুন তক্তার জোড় লাগাচ্ছে—ঠক-ঠক আওয়াজ করে এই রাত্রিবেলাও কাজ করছে ছুতোর-মিস্ত্রি।

কে ওটি? দুকড়ি মাঝি যে! উঁচু জায়গায় বসে দুকড়ি হাত ঘুরিয়ে মিস্ত্রিকে নির্দেশ দিচ্ছে। উঠে কাছে গিয়েও দেখছে এক-একবার—আবার বসে পড়ছে। দুকড়ির বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার বল নেই।

গড় করি ওস্তাদ—

সুখে থাকো।

আশীর্বাদ করল দুকড়ি। বলে, তোমায় ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছি কেতুচরণ। তা এখানে নয়, কাছারিবাড়ি চলো—একেবারে বাবুর মুকাবেলা কথাবার্তা হোক।

মিস্ত্রিকে বলল, এই অবধি থাকুক। এখন রাঁধাবাড়া করে খাওগে। কালকের মধ্যে হয়ে যাবে তো? তারপরে বাকি রইল তলিতে আচ্ছা করে আলকাতরা লাগানো।

ভাগ্যিস কেতুচরণ এই পথে ফিরে যাচ্ছে। নইলে আজকেও আসা হত না। ভুলে গিয়েছিল একেবারে। রাতদিন যা করছে ছেলেটা, তার মধ্যে মাথায় ঠিক থাকে!

দুকড়ি বক-বক করে আপন-কথা বলতে বলতে চলেছে। এত আস্তে যাচ্ছে—হাঁটছে কি দাঁড়িয়ে আছে, বোঝা যায় না। বাদাবনের শেষে—আজ অবধি যেখানে মানুষ যায় নি—সেইখানে এবারে নিয়ে যাবে দুকড়ি, মরবার আগে জীবনের সকল অভিজ্ঞতা কেতুচরণকে দেখিয়ে বুঝিয়ে উজাড় করে দিয়ে যাবে। সে সুযোগ এসে গেছে রায়বাবুর অনুগ্রহে।

জ্যোৎস্নার মধ্যে মধুসূদন কাছারিবাড়ির উঠানে পায়চারি করছিলেন। শান্ত অচঞ্চল চারিদিক। একটু বাতাস নেই, গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না। আকাশ-প্রান্তে ক্ষীণ চাঁদ পৃথিবীর দিকে এবং মধু রায়ের দিকে চেয়ে হাসছে যেন।

এই চাঁদ—কতকালের চাঁদ। কালে কালে জাতি-বংশ-সম্প্রদায়ের পথ ধরে বিচিত্র চেহারা ও চরিত্রের নরনারী জন্ম নিয়েছে। অনন্তযৌবনা ধরিত্রী অকুণ্ঠ রূপ-সম্পদ অবারিত করে দিয়েছে তাদের কাছে। তারাও ভেবেছিল, এ-পৃথিবী আর ঐ

চাঁদ তাদেরই। তাদেরই একান্তভাবে, আর কারো নয়। তারা অতীত হয়ে গেছে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে। এতটুকু পায়ের দাগ পড়ে নেই এত সাধের পৃথিবীর কোনখানে।

ক'দিনেরই বা কথা! মহারাজ প্রতাপাদিত্য নগর গড়লেন এই মৌভোগেরই অনতিদূরে। ধূমঘাট—জাহাজঘাটা—কালজয়ী সুবিপুল দুর্গ। সতর্কতার অন্ত ছিল না। আজকে করাল নদী খল-খল ক্রুর হাসি হেসে ভগ্ন-নগরীর পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। শোভন সুন্দর হর্ম্যগুলার ইটের গাঁথনি কঙ্কালের উলঙ্গ দংষ্ট্রাপংক্তি মাত্র হয়ে মনে আতঙ্ক জাগায়। দুর্গ-প্রাকারের নিবিড় অরণ্যছায়ে রয়্যাল-বেঙ্গল-টাইগার শান্ত আস্তানা পেতে আছে।

মধুসূদনেরও চিরযাত্রার সময় এবার। সকল আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের অবসান। দেনায় চুল বিকিয়েছে। সুকুমারের উপর শেষ ভরসা করেছিলেন, সে পালিয়ে গেল। বিস্তর খাজনা বাকি—খাজনা দেবার সঙ্গতি কোথায়? রায়গ্রাম ও মৌভোগের সমস্ত জমাজমি নিলাম হয়ে যাবে অচিরেই। তারপর পৃথিবীতে শুধু থাকবে অতিরিক্ত এক বোঝা দেনা আর দুর্নাম। পাওনাদার-গুলোর আশ্চর্য অধ্যবসায়—দুর্গম আবাদ জায়গায় এসেও দশ কথা শুনিয়ে যাচ্ছে। অবস্থা এতদিন অনেক কৌশলে ঢেকেঢুকে রেখেছিলেন—এখন সকলে জেনে ফেলেছে। সর্বসাধারণের আলোচনা ও করুণার পাত্র এখন তিনি।

পালাতে হবে। ভেবেছিলেন, পালাবেন জগৎ থেকেই—মৃত্যু ছাড়া এ সঙ্কটের অবসান নেই। কিন্তু, দুকড়িকে মনে পড়ল। আছে বটে আর-এক জায়গা, মৃত্যু ও জীবন যেখানে একাকার। চোখের সামনে ঐ যে অরণ্যের আরম্ভ, তারই নিভৃততম অন্তরালে সান্ত্বনা খুঁজবেন তিনি পালিয়ে গিয়ে।

যাবেন শেষ সীমা অবধি। নীলপানসি, দুকড়ি মাঝি, আর তিনি। আর যদি কৌতূহলী কেউ সঙ্গে যায়—কেতুচরণকে পাওয়া যায় যদি! খানিক পায়ে হাঁটবেন, খানিক বা চলবেন নৌকোয়, নৌকোয়।

অগণ্য নদী-খাল। যত দক্ষিণে যাবে, শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়েছে ততই। গোনা-গুনতি নেই—জরিপ করে হিসাবে আসে না। অবিরল জলধারা—জানা অজানা সহস্র পথ বেয়ে বিশ্রামহীন জল ছুটছে। ভাঁটায় কল-কাকলি তুলে ছুটে যায় সমুদ্রের পানে, জোয়ারের তাড়ায় আবার ঘরমুখো ফেরে। এর মধ্যে দশ-বিশটা মোটা রকমের পথ মাত্র মানুষের জানা। মালবাহী স্টিমার কদাচিৎ সেই সব পথে চলাচল করে, ফরেস্ট-অফিসারের লঞ্চ দ্রুত অতিক্রম করে যায় কালেভদ্রে। জলে আর জঙ্গলে, জঙ্গলে আর পশুপাখী-কীটপতঙ্গে ভারি মিতালি—শত শত বৎসরের দিনরাত্রির প্রতি-মুহূর্তে তাদের উদ্দাম কথাবার্তা ও মেলামেশা চলছে। কোন সতর্কতার প্রয়োজন নেই। দূর-দূরান্তের জলস্রোত হুমড়ি খেয়ে পড়ে স্থলভূমে, গাছের তলায় তলায় ঢুকে পড়ে দূরবর্তী ঘন জঙ্গলের ভিতর। ছলছল হাসি-রহস্য হয় সুগোপন ছায়াচ্ছন্নতায়। সূর্য দেখতে পায় না, চাঁদ-তারা দেখে না। সৃষ্টির পরিপূর্ণ বার্তা আজও পৌঁছয় নি সেখানে। মানুষ এখানে নিতান্ত অবান্তর। মানুষের প্রতিষ্ঠা ও প্রভুত্ব-সীমার বাইরে রহস্যময় বাদাবন—জ্ঞানবুদ্ধি সমস্ত উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে কেউ যদি এখনে এসে পড়ে। আর হরিণ-বানরগুলো বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে প্রথম-দেখা সেই দু-পেয়ে আজব জীবটার দিকে।

সেই অঞ্চলে যাচ্ছেন মধুসূদন। অলক্ষ্য আকর্ষণে অরণ্য টানছে তাকে। পুরানো দিনের চেনা-জানা, প্রাগৈতিহাসিক কালের তাঁর পুরানো আবাস। একশ-দু'শ পুরুষ অতিবাহন করবার পর আবার পুরানো গৃহে ফিরে যাচ্ছেন। সেখানকার নিয়ম-নীতি একেবারে আলাদা। মানুষ ও জীব-জানোয়ারে তফাত নেই—তারা নিতান্ত আপনা-আপনি। মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যার সম্বন্ধে ভেবেছিলে, হঠাৎ হয়তো দেখতে পাবে তাকে। দেশ-দেশান্তরের আর যুগ-যুগান্তরের মানুষ সকল ভিন্নতা ভুলেছে। প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহের লড়াইয়ে মরেছিল যে মহিমান্বিত সেনাপতি, আর নগণ্য যে কাঠুরে কুমিরের কবলে পড়েছিল—হয়তো দেখতে পাবে,

তারা গলাগলি হয়ে বেড়াচ্ছে নিরালা বনভূমিতে। ব্যবধান নেই দেশ ও কালের, জীবন্ত ও বিগতের। দিগন্ত-বিস্তার নদীজলে উদার সূর্যোদয় আর সুপ্রসন্ন সূর্যাস্ত। জ্যোৎস্নায় প্লাবন তুলে হু-হু হু-হু আওয়াজে দুরন্ত বাতাস দাপাদাপি করে, জোয়ার-জলে আকণ্ঠ ডুবিয়ে স্নান করে আরণ্য বৃক্ষেরা। ফুল ফুটছে—ঝরে পড়ছে ফুলদল। আদি-মানুষের শুদ্ধান্তঃপুরের নিকানো আঙিনার মতো ভাঁটা-সরে-যাওয়া চরভূমি। বাঘ ঘুরে বেড়ায় সেখানে, কুমিরে রোদ পোহায়, হরিণ-শিশু খেলা করে।

ভাগ্যে মধুসূদন সমস্ত হারিয়েছেন, বনের ডাক তাই শুনতে পেলেন। মৃত্তিকার আদিতম সন্তান, মানুষের প্রথম আশ্রয়দাতা —বনের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কিসের? ঘরবাড়ি, মাঠ-গ্রাম, নদী-নালার বৈচিত্র্যে বুনন-করা বাংলাভূমি—তারই সবুজ পাড় এই বাদাবন বঙ্গোপসাগরের উপকূল জুড়ে। সমুদ্রের আক্রোশ প্রতিরোধ করছে অগণিত বৃক্ষ-সৈন্যের অতন্দ্র প্রহরায়, আহ্বান করে আনে আকাশের জলদপুঞ্জ, পাতায় পাতায় সঞ্চিত রাখে অফুরন্ত অমৃত-ভাণ্ডার।

এরাই মধুসূদনের সঙ্গী-সাথী। এদেরই কারো স্নেহ-ছায়াতলে তিনি শেষ-ঘুম ঘুমিয়ে পড়বেন একদা।

॥ চল্লিশ ॥

কথাবার্তা ফয়শালা করে কেতুচরণ বেরুল। 'না'—বলা চলে না তুকড়ির কোন কথায়। দুরন্ত লোভও রয়েছে বাদায় বেড়াবার। মঙ্গলবারে খোকাকে যদি নিয়ে যায়, তার পরেই বেরিয়ে পড়বে এদের সঙ্গে।

কাছারিবাড়ির বিস্তীর্ণ আঙিনা, ধান তোলার খোলাট—সমস্ত জনশূন্য এখন, ঘাসবনে ভরতি। রায়-এস্টেটের দুর্দিনে কেউ বড়-একটা আসে না এদিকে। সারি সারি শূন্য গোলা—জ্যোৎস্নায় মনে হচ্ছে খোপ-কাটা চিত্রবিচিত্র গোলকধাঁধার পথ।

তারই মধ্য দিয়ে কেতু ভাবতে ভাবতে চলেছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। এলোকেশী যেন? হ্যাঁ—এলোকেশীই। ঝাসু দুর্লভ ঠিক ধরেছে—কাছারিবাড়ি সত্যিই এনে তুলেছে এলোকেশীকে।

এলোকেশী যেন মায়ারাজ্য থেকে ছুটতে ছুটতে এসে তার পথ আটকাল।

দাঁড়াও ও কেতু, শোন আমার কথা। আমায় উদ্ধার করো।

বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে কেতুচরণ প্রশ্ন করে: তোমায় আটকে রেখেছে?

তা নয় ঠিক—দুর্লভের ভয়ে লুকিয়ে আছি। শুধু দুর্লভ কেন, বাপ-বেটা দুটোরই ভয়ে। একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর। বাপ ঠেঙানি দেয়, আর ছেলেটাও এই দেখ—দুধ খাওয়াতে গিয়াছিলাম, কচ করে আঙুল কামড়ে দিয়েছে। কামটের মতো দাঁতের ধার। রাতে ঘুম নেই, সোয়াস্তি নেই। পঞ্চাশ বার বিছানা বদলাতে হয়। ঐরকম দাসীবৃত্তি পোষাবে না আমার দ্বারা।

কেতু রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকাল এলোকেশীর মুখের দিকে। রাত্রিবেলা ভাল ঠাহর হয় না। এলোকেশী বলতে লাগল, তোমাকে সেই বলেছিলাম তো—তার আগেই সুকুমারের নৌকো গিয়ে পড়ল। তিলার্ধ তিষ্ঠোতে পারছিলাম না ওদের জ্বালায়। যেখানে হোক না পালিয়ে উপায় ছিল না। তাই চলে এসেছি। দুর্লভের চর খুব খবরাখবর নিয়ে বেড়াচ্ছে, শুনতে পাই। খপ্পরে পেলে এবারে জবর আটকান আটকাবে কেতু, তুমি নিয়ে যাও আমায় এখান থেকে।

কেতু উদাস ভাবে বলে, ভালই তো আছ রায়বাবুর কাছে। আবার ছটফটানি কেন?

উনি মানুষ নাকি! গাছপালার শামিল। সুকুমার লোভ দেখিয়েছিল—কলকাতায় যাবার লোভে বেরিয়ে এলাম। তা সে পালিয়ে গেল। শত্তুরে ঠক—যাবার দিন সন্ধ্যেবেলাও পালানোর মতলব বলে নি আমায়। বাঁচাও আমায় কেতু, চিরজন্ম জঙ্গলে পড়ে থাকতে পারব না।

বিরক্ত স্বরে কেতুচরণ বলে, সুকুমার নেই বলেই ঘুরে ফিরে আমার উপর নেক-নজর। কিন্তু আমি তো কলকাতায় নিয়ে রাখতে পারব না।

চাই নে যেতে। যেখানে রাখবে, সেই আমার গয়া-কাশী-বৃন্দাবন। যদি গাছতলায় রাখো, সে-ও স্বীকার।

সুর বদলে আবার বলল, গাছতলায় থাকতে হবে কেন? একেবারে খালি হাতে আসি নি।

কেতু বলে, তা জানি। দুর্লভ আমায় বলেছে।

বলে ফিক-ফিক করে সে হাসে।

এলোকেশী বলে, হাসছ কেন?

এক খেলা আর কতবার আমায় দিয়ে খেলাবে!

আমার হাজার দোষ। ঘাট মানছি। সেসব মনে গেঁথে রেখো না কেতু। রায়বাবুও বিদায় হয়ে যাচ্ছে। পিরথিমে আমার কেউ নেই। তুমি ছাড়া আর কার মুখে তাকাব, বলো।

তার পা জড়িয়ে ধরল।

কেতু নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কি ভাবছে। এলোকেশীর পায়ে ধরাটা বুঝি রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করল খানিকক্ষণ।

ওঠো দেখনহাসি—

একটা কিছু বলো—নয়তো উঠব না, মাথা খুঁড়ে মরব এখানে।

ভাল রে ভাল! এখনই নিয়ে যাই কোথায়? ওঠো, ভেবে-চিন্তে যা-হোক কিছু করা যাবে।

ফাঁকি দিচ্ছ না?

নিজের কথা ভেবে বললে বুঝি এলোকেশী?

এলোকেশী উন্মাদিনীর মতো মাথা ঠোকে মাটির উপর, চুল টানে দু-হাত দিয়ে।

কেতুচরণ বলে, ওঠো—ঠাণ্ডা হও। দু-পাঁচ দিনের মধ্যেই আসব—এসে তোমায় নিয়ে যাবো।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, কবে আসি নি বলো তো? তোমার ব্যাপারে কোনদিন কি ফাঁকি দিয়েছি? বলো।

চোখ মুছে এলোকেশী উঠল। কেতুর প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেছে।

রাত্তিরবেলা এসো। জানাজানির ভয়ে দিনমানে ঘরের বের হই নে। দেখে যাও—এই ঘরে থাকি আমি। পাইক-দরোয়ান কেউ থাকে না আজকাল। কাছারি সোজা এসে দরজায় টোকা দিও।

হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে কেতুচরণকে সে ঘর দেখিয়ে দিল।

জলকাদার ভিতর দিয়ে এতটা পথ চলে এলো, পায়ে তবু কোমল ছোঁয়া লেগে রয়েছে। এলোকেশী কেতুর পা জড়িয়ে ধরেছিল। বনবাসী সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, সংসার যেন পা বেঁধে ফেলল। ফুলের মালা জড়িয়ে দিয়েছে দু-পায়ে—ঝাড়া দিলেও যায় না···

কে?

ছুটছিল লোকটা—পাশ কাটিয়ে সরে পড়বার মতলবে ছিল। সন্দেহবশে কেতু তাকে আটকে ফেলে হাত চেপে ধরল। হাত ছেড়ে দিল তখনই।

দয়াময় ইদিকে কোন কাজে? মঙ্গলবারের এখনো তো চার দিন দেরি।

দুর্লভ বলে, মন আনচান করে উঠল রে! ছেলে হল কিনা অপত্য—অপথ্য-কুপথ্য—বুকের নাড়ি টনটনিয়ে ওঠে। সেই যে অসুখ শুনে গিয়েছিলাম—সেরেছে? কেমন আছে আজকে?

দুর্লভকে বলে দেবে নাকি এলোকেশীর খবর—এলোকেশীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, সেই কথা? না, কেতু তার চিরকালের সাধ মেটাবে ঘর বেঁধে ঘরণী নিয়ে?

সহসা গোল-পাঁচু ও গুলি-পাঁচু এদিকে দৌড়ে এল। হাতে এক-এক লাঠি। গোল-পাঁচু গর্জন করে ওঠে: রাত বিরেতে আর কখনো যদি মৌভোগের পারে দেখতে পাই, মেরে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো—এই তোমায় বলে দিচ্ছি দুর্লভ।

খাল অদূরে, দুর্লভের ডিঙি সেখানে। ডিঙিতে তার লোকজন রয়েছে। সেই সাহসে দুর্লভ দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে।

কেন রে ? মৌভোগ তোদের বাপের তালুক ? হাট বসিয়েছে, রাতে দিনে যখন খুশি এসে হাট-বাজার করব।

গুলি-পাঁচু বলে, বাড়ির উঠোন-হাতনেয় তো আর হাট নয়—

গোলমাল শুনে দুর্লভের ডিঙি থেকে একজন-দু'জন করে নেমে আসছে। সেদিকে এক নজর তাকিয়ে দুর্লভ বলে, সে-ও হাটেরই একটা দোকান। দোকানে চাল-ডাল নুন-তেল বেচে, আতরবালাও বেচে—কি বেচে রে ?

হি-হি করে হাসতে লাগল। এলোকেশী নেই—বাসা শূন্য। দুর্লভ একেবারে বেপরোয়া। বলে, উঠোন-হাতনেয় কি বলিস—মন করলে কড়ি গণে দিয়ে ঘরের মাচায় উঠে বসতে পারি। সেটা অবিশ্যি প্রবৃত্তিতে আসবে না।

গোল-পাঁচুর মুখ চুন হয়ে গেছে। খুশাল তাড়াতাড়ি এসে মধ্যস্থ হয়।

আঃ, কি লাগালে তোমরা ! ডিঙির মাঝির কাঁধে হাত দিয়ে বলে, যাও বাপধনেরা, ঠাণ্ডা হয়ে নৌকোয় ওঠোগে। এখানে হাঙ্গামা হতে দেবো না। আমার সায়েরের নাম খারাপ হয়ে যাবে।

গোল-পাঁচু বলে, ছেলে আজকেই দিয়ে দাও কেতু-ভাই। মঙ্গলবার বলে কী কথা ! দেখি, তারপর কোন্ ছুতোয় মৌভোগে আসে !

তা দিয়ে দে—ভালই তো ! তবে—

কেশে গলা সাফ করে নিয়ে দুর্লভ বলে, টাকাকড়ি নিয়ে আসি নি। এক-শ টাকা কে গাঁটে করে বেড়ায় ! টাকাটা আজ বাকি থাকবে।

কেতু বলল, এক-শ টাকায় কিন্তু হবে না। আগে-ভাগে বলে দিচ্ছি।

সকলে আশ্চর্য হয়ে গেছে। দুই পাঁচু ও খুশাল অবধি।

ছেলে তো এদ্দিন পোষবার কথা নয় হালদার মশায়। তার কোন একটা বিবেচনা হবে না?

দুর্লভ জ্বলে উঠল।

টাকা মাটির চাড়া—উঁ? এক পয়সাও দেবো না—দেখি, কি করিস। ছেলে আটকে রাখবি? রাখ্ না তাই। ঘুঘু দেখেছিস, ফাঁদ দেখিস নি। খুলনে গিয়ে এক নম্বর ফৌজদারি ঠুকে দিয়ে ঘরে শুয়ে থাকব—পুলিশ দলসুদ্ধ পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে ছেলে আমার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

নৌকোর লোকগুলো হাঁকডাক করে: তার কি দরকার! হুকুম দেন হুজুর, ছেলে এক্ষুনি নৌকোয় নিয়ে তুলি। কোন্ শালা কি করতে পারে দেখি। মামলা করতে হয়—ওরাই করুকগে।

কেতুচরণ চারিদিকে তাকায়। মাত্র চারজন তারা। এমন দিনে ঋষিবরটাও কোথায় বেরিয়েছে। উমেশ আছে অবশ্য বাসা-ঘরের মধ্যে—কিন্তু সে মানুষ ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

খুশাল মাঝে পড়ে থামিয়ে দিল। যা গতিক—ছেলে জোর করে যদি নৌকোয় তোলে, ঐ একশ-খানি টাকাও তো মাটি!

আপনি আসবেন বাবু মঙ্গলবারে। যা কথা ছিল—একশ-ই নিয়ে আসবেন। আমি দায়িক থাকলাম। যান, নৌকোয় উঠুন গে। ছুটকো মরদ, জ্ঞান-বোধ নেই—এদের কথায় কান দেবেন না। এরা কি কথা বলতে জানে ভদ্দরলোকের সঙ্গে!

ডিঙি চলে গেল, গোল-পাঁচু তার পরেও গজর-গজর করছে: ভদ্দোরলোক না কচু। কাঁথায় আগুন ভদ্দোরের! ঘুরঘুর করে পাক দিয়ে বেড়ায়। আর একদিন যদি দেখতে পাই—

গোলমাল মিটে গেলে কেতু এসে ঘরে ঢুকল। না ছেলে, না উমেশ—কেউ নেই কোনদিকে। গেল কোথায়? খুশাল, গুলি-পাঁচু, গোল-পাঁচু সকলকে জিজ্ঞাসা করে। কেউ বলতে পারে না। এদিক-ওদিক অনেক দূর ঘুরে এসে দেখল, উমেশ ফিরেছে—ঘরের

মেঝেয় যথারীতি ছেলে নিয়ে বসে আছে। হাত বুলাচ্ছে সে ছেলের গায়ে।

কোথায় গিয়েছিলে?

কেড়ে-কুড়ে নিয়ে যাবে—তাই আমি উই হোদোবনের ভিতরে গুড়ি মেরে বসেছিলাম। মশায় বাছার অর্ধেক রক্ত শুষে খেয়েছে, গায়ে চাকা-চাকা দাগ হয়েছে এই দেখ।

কেতুচরণ তাড়াতাড়ি তেলের ভাঁড় নিয়ে এল। তেল মাখাতে বসবে সে। মশার জ্বলুনি থাকবে না, আর তৈলাক্ত দেহে মশায় কামড়াবেও না। নরম হাতে সে বেশ তেল মাখাতে পারে এখন।

ছেলে আরামে চোখ বুজল।

॥ একচল্লিশ ॥

টিপিটিপি কাছারিবাড়ি ঢুকে কেতুচরণ দরজায় টোকা দিল। এলোকেশী জেগে ছিল, দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে দেখে।

এসে গেছ? দাঁড়াও—

এক লহমার মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল। লম্বা ঘোমটা টানা—তার উপর আলোয়ান জড়িয়েছে সর্বাঙ্গে। ক্যাশবাক্সটা বুকের খাঁজে বাঁ-হাত দিয়ে চেপে নিয়েছে। ক্যাশবাক্সর ভিতর সকল সঞ্চয়। রায়বাবুর দেওয়া গয়নাগুলোও এর মধ্যে।

শুক্লাষ্টমী। চাঁদ ডুবে গেছে—তারার ক্ষীণ আলো। চলেছে দু-জনে—একটি কথা নেই। পাছে লোকের নজরে পড়ে সেজন্য উপর দিয়ে নয়—বাঁধের আড়াল দিয়ে যাচ্ছে। কতক্ষণ ধরে এমনি চলল তারা। চলেছে তো চলেইছে।

গা ছমছম করে ওঠে এলোকেশীর। কেতুর ভাবভঙ্গি ভাল লাগে না। সেদিন থেকেই এই রকম দেখছে। যেন অনেক দূরের মানুষ, অচেনা মানুষ। অনেক কাল আগে যে কেতু একদা তার বাপের বাড়ি গিয়ে উঠেছিল, কিংবা এই সেদিনও যে তাকে নৌকোয় করে মেলা থেকে মর্জাল-স্টেশন পৌছে দিয়েছিল—

এ যেন সে মানুষ নয়। আগাগোড়া বদলে গেছে—কিসে বদলাল এমন ?

একবার থমকে দাঁড়ায়— ইতস্তত করে, আর যাবে কিংবা যাবে না এর সঙ্গে !

ডাকল ঃ কেতুচরণ—

মনে ভাবল, ডাকছে নাম ধরে—কিন্তু অস্পষ্ট একরকম আওয়াজ বেরুল। স্বপ্নের ঘোরে মানুষের যেমন হয়।

কেতু পিছন ফিরে তাকাল। মুহূর্তকাল থামাল গতি। জবাব দিল না। ডাকলেও সাড়া দেয় না—এ কোন রীতি ? একনজর চেয়ে দেখে কেতু আবার চলেছে। অদৃশ্য রজ্জুতে বাঁধা আছে এলোকেশী। সে-ও চলতে লাগল।

বুকের ভিতর এলোকেশীর কী-রকম করছে। এমনও হতে পারে, কেতুচরণ মরে গেছে ইতিমধ্যে। মরে ভূত হয়ে এসেছে। এলোকেশী অন্ধবিশ্বাসে বেরিয়ে পড়েছে—আর সে তাকে নিয়ে চলেছে নিয়তির নিবিড়তম গহ্বরে। কত দূরে পুরন্দর—পুরন্দরের খাঁড়ি ? সদ্য মেরামত-করা নীলপানসি আজ সন্ধ্যার পরে সে নাকি চুপি-চুপি সরিয়ে খাঁড়ির মধ্যে রেখে এসেছে। সেই পানসিতে পালাবে।

পথ মোটে ফুরোয় না—যত চলছে পথ যেন বেশি হয়ে যাচ্ছে মায়ামন্ত্রে। ওদিকটা বিস্তীর্ণ ফাঁকা চর, এখানে গ্রাম-জমি—মাঝখানে বিসর্পিল বাঁধ অন্ধকারের মধ্যে অনন্ত দীর্ঘ অজগরের মতো পড়ে আছে। হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা হয়ে যাচ্ছে এলোকেশীর। অথচ এই সমস্ত পথে কতবার সে চলেছে। হেঁটে নয়—বুঝি নেচে চলত মতিরাম সাধুর মেয়ে সেকালের এলোকেশী দেখনহাসি। বনবিবিতলায় পূজোর দিন কেতুর কাছ থেকে এই সব মাঠ-জঙ্গল ভেঙে সে ছুটেছিল এমনি রাত্তিরবেলা। গাঙে আসতে এত সময় তো লাগবার কথা নয় !

অবশেষে এসে পৌঁছল বাঁকের মুখে। হেঁতাল ও গুড়ার জঙ্গল, তার ওদিকে শ্মশান। ভাঙা কলসি ও আধ-পোড়া কাঠ পড়ে

আছে। কেতুচরণ সেই দিকে চলল। মতলব কি, নিয়ে যাচ্ছে কোথায়?

কাঁদো-কাঁদো হয়ে এলোকেশী বলে, হাঁটতে পারছি নে। কদ্দূর গো?

কেতুচরণ আঙুল তুলে দেখাল। ঝোপের মধ্যে জোয়ারের জল উঠেছে—নীলপানসি সেখানে অল্প অল্প দুলছে ঢেউয়ের তাড়নায়। আঙুল দিয়ে দেখাল—নইলে সহজে কেউ ঠাহর করতে পারবে না, নৌকো রয়েছে ওর মধ্যে।

বাঁচা গেল! এলোকেশীর মনে এতক্ষণে ভরসা এসেছে।

উহুঁ, কামরায় ঢুকছ কেন? খাটতে হবে। হালে গিয়ে বোসো।

অদ্ভুত গম্ভীর কণ্ঠস্বর। আজকে যেন সবই অদ্ভুত কেতুচরণের! এলোকেশী ভাল বুঝতে পারে না। কেতুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

শুনতে পাচ্ছ না? কাড়ালে বসে হাল ধরোগে। জমিদারের ভাত খেয়ে ভুলে মেরেছ নাকি?

সেই ছবি! মোহনার মুখে উলটোপালটা ঢেউ। ডিঙি এপাশ-ওপাশ করছিল। এলোকেশী হালে বসে—তীক্ষ্ণ কুঞ্চিত দৃষ্টি, কিন্তু অচঞ্চল। আঁচল কোমরে ফেরতা দিয়ে বাঁধা। ডিঙি যদি ডুবে যায়, জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সাঁতরে গাঙ-খাল পাড়ি দেওয়া বেশি কথা কি—কাপড় ভিজে যাবে, এই জন্য যা-একটু দ্বিধা।

এলোকেশী হেসে উঠে আবহাওয়া লঘু করতে চায়।

তুমি কি করবে কেতুচরণ? আমি হাল বাইব, আর বাদাম তুলে তুমি বুঝি তামাক টানবে বসে বসে?

বাতাস থাকলে তাই হত। এইটুকু বাতাসে এত উজান কাটানো যাবে না।

এলোকেশীও সঙ্গে সঙ্গে সজোরে ঘাড় নেড়ে বলে, তবে? হাল ঠেলেও যাওয়া যাবে না এই উজানে। আমি পেরে উঠব না। গায়ে কি সে জোর আছে! বয়স হয় নি? বুড়ো হয়ে যাচ্ছি নে?

কেতু গাঙের অবস্থা নজর করে দেখে বলল, বলেছ ঠিক। নৌকো ঠিক রাখা শক্ত—টানের সঙ্গে ছুটে না বেরোয়! আচ্ছা, ধরো তো হাল—আমি গুণ টানব।

অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে এলোকেশী শিউরে উঠল।

বলো কি!

কাদা মেখে আর বেকুবি করছি নে। সেয়ানা হয়ে গেছি। ডাঙায় ডাঙায় চলব। হি-হি-হি—

কেতুচরণ টেনে টেনে হাসতে লাগল।

আবার বলে, উঃ—কতবার তোমায় বওয়াবয়ি করলাম, বলো দিকি দেখনহাসি!

এই শেষ বার—

হ্যাঁ—শেষ এইবার। আর নয়।

গুণের রশি খুলতে খুলতে কেতুচরণ ঝোপের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। এলোকেশী সভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে: তুমি পাগল নাকি? এই রাত্রে বাদায় বাদায় দড়ি টেনে চলবে—সাপখোপের ভয় আছে, বড়-হরিণও সামনে পড়ে যেতে পারে।

বাদাবনের বাঘ হল কেতুচরণ। হরিণ তার সামনে আসবে কোন্ সাহসে?

আদিখ্যেতা রাখো। ঢের হয়েছে।

এলোকেশী তাড়া দিয়ে উঠল। তার বুক কাঁপে। বলে কি! বাদারাজ্যে বাঘের নাম না করে বড়-হরিণ, বড়-শিয়াল, বড়-মিঞা, ভোঁদড়—এই সমস্ত বলে। বহুপ্রচলিত বড়-হরিণ কথা না-বোঝার ভান করে কেতু স্পষ্ট কিনা রাত্রিবেলা জঙ্গলের মধ্যে সেই নিষিদ্ধ নাম উচ্চারণ করে বসল! এটা বাহাদুরি—কেতুর জীবনের অসংখ্য দুঃসাহসিকতার মধ্যে এটি অন্যতম।

হিত-কথা শুনে কৌতুক করে, ভয়-ভাবনা বা জীবনের মমতা নেই—সেই মানুষকে নিয়ে পারবে কে! এলোকেশী হালে বসে আছে, কেতুচরণ গুণ টেনে গাঙের কূলে কূলে যাচ্ছে। চলেছে—

কতক্ষণ চলেছে এমনি ভাবে। জঙ্গল এখানে নদীজলের মধ্যে অনেকদূর অবধি নেমে গেছে। সর-সর আওয়াজে জঙ্গল মাথা নোয়াচ্ছে পানসির সামনে। কোন দিকে একটি প্রাণীর সাড়া নেই, ঝিঁঝিরাও ডাক বন্ধ করেছে বুঝি!

এলোকেশী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল—কি ভাবছিল, কে জানে! ঝুপসি জঙ্গল। হঠাৎ যেন মানুষের গলায় কথা বলে উঠল, মাল তুলে নাও কেতু—

ও কি?

এলোকেশীর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে। স্বর বেরুল কান্নার মতো। কেতুচরণ থেমে দাঁড়িয়েছে। দড়ির টান বন্ধ হয়ে নীল-পানসিও থেমেছে অনতিদূরে।

একখানা ডিঙি—কেতুদেরই সেই ডিঙিখানা জঙ্গল ভেঙে ঠেলতে ঠেলতে ডাঙায় এনে লাগাল। গোল-পাঁচু ও গুলি-পাঁচু ডিঙি থেকে নেমে চলে আসে কেতুর কাছে। ফিস-ফিস কথাবার্তা একটু—তারপর তিন জনের ছ-খানা হাত মিলে গুণের দড়ি টেনে টেনে পানসি অতি-দ্রুত পাড়ে নিয়ে আসছে।

এলোকেশী আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে: ও কি? জঙ্গলের ভিতর নিচ্ছ কেন—কী মতলব তোমাদের?

হাল আড় করে ধরে সর্বশক্তিতে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু পেরে উঠবে কেন তিন মরদের গায়ের জোরে! কেতুচরণ বলে, কী হয়েছে? অমন করো কেন? একটা মাল তুলে নিয়ে এক্ষুনি আবার ছেড়ে দেবো।

কি মাল?

চোখেই দেখো—ফুর্তি পাবে। কত বার তো কত জায়গায় নিয়ে গেলাম—আজকে এমন ভয় পাচ্ছ কেন দেখনহাসি?

কিন্তু এতকাল যাকে দেখে আসছে, আজকের কেতুচরণ সে মানুষ নয়। বাদাবনের কেতু আর এক লোকে চলে গিয়েছে। এই সর্বপ্রথম-দেখা একেবারে অপরিচয়ের কেতুচরণ।

পানসি ডিঙির পাশে চলে এল। দুই পাঁচু মুখ-বাঁধা বস্তার

দু-পাশ ধরে তুলে দিল পানসির গলুয়ের দিকটায়। হাল ঘুরিয়ে এলোকেশী আবার মাঝ-গাঙে গিয়ে পড়ল। এতক্ষণে প্রাণ ফিরে এসেছে দেহে।

আবার চলেছে নীলপানসি। নদীকূল ফাঁকা-ফাঁকা এদিকটায়। ক্ষীণ আলোয় কেতুচরণ তেমনি মন্থর অবিচ্ছিন্ন গতিতে চলেছে। সারি সারি গোলঝাড়—সেই গোলবনের কিনারে এসে পড়ল। কখনো প্রায়ান্ধকারে একেবারে বিলুপ্ত হচ্ছে, কখনো আবার ফাঁকায় আসছে। হঠাৎ এলোকেশী লক্ষ্য করল, দড়ির টান নেই। গুণের দড়ি জলের ভিতর পড়েছে, শুধুমাত্র হালের জোরে অত-বড় পানসি এগুতে পারছে না।

কি হল? টানছ না কেন কেতু?

গোলঝাড়ের আড়াল থেকে জবাব আসে, দড়ি হাত ফসকে পড়ে গেছে।

এলোকেশী বলে, পাড়ে লাগাচ্ছি। ধরে নাও।

আমি পারব না।

না পারো, উঠে এসো। দাঁড় ধরো—যা এক-আধ রশি যাওয়া যায়। একটু ভাল জায়গা পেলে চাপান দেওয়া যাবে।

হঠাৎ ফূর্তির প্রবাহ এসে যায় শুকনো গলায়। বলে, সেই ভাল কেতু। অনেকটা তো আসা গেল! গোন এলে তখন ছাড়া যাবে। ততক্ষণ গল্পগুজবে কাটিয়ে দিই। তুমি নৌকোয় এসো।

ভয়াল উচ্চ কণ্ঠ দূর থেকে আদেশের মতো শোনা যায়: খালে ঢুকে পড়ো—গোন পেয়ে যাবে। বিষখালি ঐ সামনে। বিষখালি থেকে পথ তোমার ভাল চেনা—অসুবিধা হবে না।

এলোকেশী আঁতকে ওঠে।

উঠে এসো কেতুচরণ। নৌকো লাগালাম।

লাগিয়ে কি হবে? দৌড় দেবে। ধরতে পারবে না। আর শোন—নীলপানসি ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো রায়বাবুর কাছে। পরশু ওঁরা বাদায় যাবেন। ওঁদের যাওয়া বরবাদ না হয়।

এলোকেশী ব্যাকুল হয়ে বলে, একা-একা ফেলে পালাচ্ছ? তোমার তুটি পায়ে পড়ি কেতু, এসো—চলে এসো—

একা কেন, হুলো-বেড়াল দিয়ে যাচ্ছি বস্তার মধ্যে। আর কত ধন-সম্পত্তি!

হো-হো প্রবল হাসির আওয়াজ উঠল বনান্তরালে। আওয়াজ দূরবর্তী হচ্ছে। দৌড়চ্ছে কেতুচরণ। খাল-দোখালা জল-কাদা, কাঁটাবন—কিছু মানে না। সাপ-বাঘের ভয় নেই। গুণের দড়ি গুটিয়ে পানসির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে যেন এলোকেশীর ভয়েই তীরবেগে ছুটেছে। কায়ক্লেশে এলোকেশী নৌকো হয়তো পাড়ে নিয়ে আসতে পারে—কিন্তু লাভ কি! পথচিহ্নহীন রাত্রির বাদাবনে কেতুচরণকে দৌড়ে ধরবে, তার কোন সম্ভাবনা নেই। সাপের মতন এরা পিছলে বেড়ায়। বন্দুক ও রকমারি সাজপোশাক নিয়ে জলপুলিশের দল হানা দিয়ে এঁটে উঠতে পারে না—আর সে নিঃসহায় একলা মেয়েমানুষ বই তো নয়!

ভয়ে-ভাবনায় এলোকেশী কুক ছেড়ে কেঁদে উঠল।

কেতু, কেতুচরণ—

জবাব পাওয়া গেল না।

আরও জোরে ডাকে। ঝিম-ঝিম করছে রাত, জোনাকি ঝিকমিক করছে গাছে গাছে। এতটুকু শব্দ নেই, একটা বনচর প্রাণী ডাকছে না আজকে এ সময়। হাল ধরে রাখবে—হাত একেবারে অসাড় হয়ে গেছে। পানসির মুখ ঘুরে গেল। যাক, যেদিকে খুশি চলুক। ডুবে যায় তো আরও ভাল।

বাতাস উঠেছে। জোর টান আর পিঠেন বাতাস পেয়ে ছুটেছে মধু রায়ের শৌখিন নীলপানসি। বিবখালি কোন সময় পার হয়ে এসেছে—অত খেয়াল ছিল না। দূরে সহসা আলো দেখতে পেল। মর্জাল-স্টেশনের আলো। তাই তো, ঘুরে ফিরে সেই পুরোনো জায়গায় এসে পড়ল যে!

মন্দের ভালো যাই হোক। তুর্লভ পিটুনি দেবে—তো হোক, পিটুনির পরে আশ্রয়ও দেবে। এলোকেশীর এ সম্বন্ধে সংশয় নেই।

বাদাবনে থেকে থেকে দুর্লভের রীতি-প্রকৃতি আলাদা হয়ে গেছে। পোষা জীব বেড়া ভেঙে পালালে কি করো? ভালমতো শিক্ষা দিয়ে আরও শক্ত বেড়ায় আটকানো—তা ছাড়া উপায় কি! এবারে অনেক দিন আলাদা হয়ে আছে দুর্লভের কাছ থেকে। মর্জালের বাসার কাছাকাছি এসে দুর্লভের আদর-সোহাগের অনেক পুরানো স্মৃতি এলোকেশীর মনে উঠছে।

কী ধন-সম্পত্তি কেতুচরণ তার জন্য রেখে গেছে, নেড়ে-চেড়ে দেখতে ইচ্ছে হল। পানসি কিনারে লাগায়। বস্তা টিপে টিপে দেখে। মানুষের মতো। মানুষ বস্তায় পুরেছে? কী সর্বনাশ, দুর্লভ হালদার যে!

দুর্লভকে দিয়ে গেল কেতুচরণ। এলোকেশীকে সে ঘৃণা করে, আর দুর্লভকেও অনাবশ্যক আবর্জনার মতো বস্তাবন্দি ফেলে দিয়ে গেল। বস্তার পাশে বাণ্ডিলে আলাদা করে বেঁধে দিয়ে গেছে—দুর্লভের সিল্কের পাঞ্জাবি, ফুলপাড় ধুতি, শিঙের ছাতা, লপেটা জুতো। আর খেরোর থলিতে নোটে ও খুচরায় কতকগুলি। সবই যেন অস্পৃশ্য কেতুচরণদের কাছে। এলোকেশীও।

দুর্লভের মুখে কাপড়-গোঁজা—মরে গেছে? মেরে ফেলেছে তাকে? বুকে হাত দিয়ে দেখল, ধুকধুকানি আছে। বেঁচে যাবে নিশ্চয়—লোকজন ডেকে তাড়াতাড়ি বাসায় তুলে প্রাণপাত সেবায় সে তাউত করে তুলবে। কদমতলীর জলে ডুবতে ডুবতে বেঁচে উঠেছে, বাদায় কতবার হিংস্র জন্তুজানোয়ারের সামনাসামনি পড়ে পালিয়ে এসেছে—এ মানুষ এত সহজে মরবে না। দুর্লভ হালদারকে মরতে দেবে না এলোকেশী।

কেতুও সেই কথা জিজ্ঞাসা করেছিল: মারা যায় নি তো রে?

গোল-পাঁচু রুষ্ট কণ্ঠে বলে, সন্দ আছে। রাক্ষসের প্রাণ একটা-দুটো নয়—সাতশ। তাই তো বস্তায় পুরে গাঙের নিচে দিচ্ছিলাম। কোনো দিন যাতে আর কারও ঘরে উঠে পড়তে না

পারে! একেবারে নিশ্চিন্ত। তা তুমি কেতুচরণ এসে পড়লে এই সময়—তোমার সাড়া পেয়ে দয়ালহরিদের দয়া উথলে উঠল।

গুলি-পাঁচু বলে, দিনক্ষণ দেখে ছেলে আর বোন নিয়ে ভাল জায়গায় আশা-সুখে যাচ্ছি—এর মধ্যে খুনখারাপিটা কি ভাল?

হেসে উঠে বলল, রোগের খুব ভাল রকম চিকিচ্ছে হয়েছে। প্রাণে বাঁচলেও ঠ্যাং নেড়ে আর এ জন্মে ঘোরাঘুরি করতে হবে না।

কেতুচরণ তার দিকে চেয়ে বলে, কিন্তু দলে জুটে তুমি চললে কোন বিবেচনায়? এখনো ভেবে দেখ—এমন জমানো মাছের ব্যবসা তোমার—

গুলি-পাঁচু নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, স্বাধীন ব্যবসার ঐ তো মজা! পাঁচ টাকা সাত আনা গাঁটে। যেখানে পুঁজি ছাড়ব, সেইখানে ব্যবসা জমবে। দেখ না, কী কাণ্ডটা করি শান্তিনগরে গিয়ে। ঘর নয়, দালান-কোঠা বানাব।

গায়ের সমস্ত শক্তিতে টান দিল বোঠেয়। ডিঙিটা শুধু নয়—ইস্পাতের মতো দেহগুলোও যেন কড়-কড় করছে ঐ সঙ্গে। এপাশে-ওপাশে দুই পাঁচু, আর কাড়ালে কেতুচরণ।

কুড়ু-কুড়ু—অতিশয় ক্ষীণ আওয়াজ উঠছে এক-একবার ছইয়ের ওধার থেকে। কিন্তু কারো কানে পৌঁচচ্ছে না, কান দেবার অবস্থা এখন নয়।

তালে তালে ফেল বোঠে। উড়ে যাও। সাবাস!

তিন বোঠের তাড়নায় ডিঙি উড়েই চলেছে একরকম। তবু সোয়াস্তি নেই। আরও—আরও জোরে যেতে পারলে হত! বাদার সীমানা ছেড়ে তবে ঠাণ্ডা হবে।

কুড়তাং-কুড়তাং—ঢোলকের আওয়াজ উঁচু হয়েছে এক পর্দা। কেতু বলে, শুয়োরের বাচ্চা ঘুমোয় নি বুঝি?

উমেশ জবাব দেয়, না—

কান্না শুনছি নে তো?

হাসছেন, আহ্লাদ করছেন। হাসি শুনতে পাচ্ছ না?

গুলি-পাঁচু বলে, পদ্মমণির কাছে বড্ড গছে গেছে।

ওমশার চেয়ে?

তোমার চেয়েও। মেয়েলোক আর বেটাছেলেয় তফাত বোঝ। মন ভোলাবার ওরা গুরুমশায়।

আচ্ছা নিমকহারাম তো। হবে না—কেমন হারামজাদার বংশ! তা তুমি বসে বসে কি করছ ওমশা?

ঢোলকের দল ছিঁড়ে গিয়েছিল। এতক্ষণ ধরে বাঁধলাম। বাজাব?

শুধু বাজনা কেন—গানও ধরো ভাল দেখে। উই যে—দেখতে পাচ্ছ বনবিবিতলা? বাদা ছেড়ে চললাম, মা-জননীকে একখানা গান শুনিয়ে যাও।

চপাচপ—মনের সুখে উমেশ ঢোলে ঘা দিচ্ছে লাগল। গানের গৌরচন্দ্রিকা এই বাজনা। বনবিবির নাম শুনে পদ্ম ছেলে কোলে ছইয়ের নিচে থেকে বেরিয়ে এল। বনবিবিতলা দূর আছে এখান থেকে। এই খাল দিয়েই এরা বেরিয়ে পড়বে, বেশি কাছে যাওয়া হবে না। যেতেও নেই—ফিরে যাওয়ার মুখে দেবীস্থানে গেলে বিপত্তি ঘটে। শুধু মুখে-মুখে বলে যেতে হয়।

কেশে উঠল একবার জ্যোৎস্নাভূষণ। কেতুচরণ চমকে ওঠে।

কি, ও কি? অমন করে কেন?

উমেশ বলে, কিছু না। ডিঙিতে কেওড়া-ফুল পড়েছে। বজ্জাত আছেন তো—ফুল নিয়ে মুখের মধ্যে পুরেছিলেন।

ব্যাকুল কেতু এ-সব শুনছে না। বনবিবির কাছে মনে মনে প্রার্থনা করছে। বিষম পাপী সে। চুরি-ছ্যাঁচড়ামি অনেক করেছে। এই শেষ। কাঠ-চুরি, নৌকো-চুরি—সর্বশেষ এই ছেলে-চুরি। চিরজন্মের মতো এই একবার চুরি করে বাদা থেকে তারা বিদায় নিচ্ছে। দোহাই মা, দোষঘাট নিও না—ছেলের যেন ভালমন্দ কিছু না হয়!

আবার কৈফিয়তও তৈরি করছে মনে মনে।

চুরিই বা হল কি করে! এলোকেশীর অত ঘৃণা ছেলের উপর —মরে যেত ওদের কাছে থাকলে। বৈকুণ্ঠ ঘরের কাছে গছিয়ে দিয়ে আসত, সে জায়গায় কেতুরা নিয়ে বিদায় হচ্ছে। দুর্লভ খুশিই হবে—মাসে মাসে খরচা পাঠাতে হবে না, উলটে মুনাফা হয়ে যাচ্ছে তার। দু-শ টাকার মাল এলোকেশীকে দিয়ে এই এক-শ নিয়ে যাচ্ছে। দু-শর বেশি—শুধু এলোকেশী তো নয়, ক্যাশবাক্স ভরতি গয়না ও টাকাকড়ি। সমস্ত জুড়ে গেঁথে হিসাব দেখ। দু-শর অনেক বেশি।

ছেলে সযত্নে পাটায় নামিয়ে রেখে পদ্ম বনবিবিতলার দিকে উপুড় হয়ে প্রণাম করল। উমেশ ঢোলকের উপর মাথা নোয়াল। দেখাদেখি নৌকোর আর তিনজনও প্রণাম করে। ছেলের কি ফূর্তি হল হঠাৎ—পাটার কাঠে পা ছুঁড়ছে দুম-দুম করে। আর আঁ-আঁ করে অজানা দিব্য ভাষায় কত কি বলছে খালের ঝুঁকে-পড়া কেওড়াগাছগুলোর সঙ্গে। তারার আলো পত্রপুঞ্জের ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে ছেলে ও পার্শ্ববর্তিনী পদ্মকে ঘিরে। বাতাসে ঝুর-ঝুর করে কেওড়াফুল ঝরে পড়ছে…

গগন হাসেন, পবন হাসেন, হাসেন গহীন নদী।
আর হাসেন মায়ের বালক চক্ষে নাহি নিদি॥
বনবিবি বনের মাতা হাসেন রইয়া রইয়া।
গোকুলে যান যশোমতী নীলমণিরে লইয়া॥

রচনাকাল : ১৯৬৫

উৎসর্গ

পরম প্রিয়

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

করকমলেষু

॥ এক ॥

ফিরছে আজ ভাস্কর। দমদম এরোড্রোমে নীরদবরণ প্রতীক্ষা করছেন। সঙ্গে আছে ললিতা—সিতাংশুর স্ত্রী। সিতাংশুও ভাস্করের সঙ্গে এক প্লেনে আসছে।

সিতাংশুর মামাতো বোন শম্পা—নীরদ তাকেও বলেছিলেন, ননদ-ভাজ দুজনে চলো তোমরা।

শম্পা আর ললিতা কাল কেক নিয়ে নীরদের বাড়ি গিয়েছিল। শম্পার নিজ হাতে বানানো কেক, নতুন শিখেছে। বলে, একলা করেছি কাকাবাবু। বলেও দেয়নি কেউ, বউদিকে জিজ্ঞাসা করুন। এক্ষুনি খেতে হবে, খেয়ে বলুন কেমন হয়েছে।

শম্পাকে তখন যাবার কথা বললেন। শম্পা ঘাড় নাড়ে। রাজি নয়, এটা-ওটা অজুহাত দেখিয়ে কাটিয়ে দিল। অভিমান কিম্বা তার চেয়েও বেশি বোধহয়। সন্দেহ—অপমানের শঙ্কা।

লাউডস্পীকারে খবর হল: এসে পড়েছে প্লেন। দিগন্তে ছোট্ট এক পাখির মতো। গর্জন প্রচণ্ডতর—রানওয়ের উপর দিয়ে ধেয়ে আসে প্লেন এদিকে।

এক ছেলে নীরদবরণের, তাকে বিলাতে পাঠালেন। পড়াশুনো নয়, স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডি অঞ্চলটা দেখে আসবে ভাল করে। চটশিল্পের পুরানো ঘাঁটি—জুটমিলের কাজকর্ম দেখবে সেখানে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কাজের ব্যবস্থা ভাল করে জেনে বুঝে আসবে। হাতে-কলমে ট্রেনিং নেবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন কয়েকটা জায়গায়। যাচ্ছে যখন, দেশটাও মোটামুটি দেখে আসুক। বছর খানেক কাটিয়ে ফিরে আসবে। বছরের আগে হলে আরও ভাল, বেশি কোনক্রমেই নয়।

সেই এক বছরের জায়গায় তিন তিনটে বছর কেটে যায়, ফিরে আসার নাম নেই। চিঠির পর চিঠি যায়, জবাবও নিয়মিত আসে। ঘুরছে ভাস্কর চরকির মতো—আজ এখানে, কাল সেখানে। বাইরে এসে বুঝতে পারছে, দেখবার ও জানবার কত কি রয়েছে।

ইয়োরোপ-জোড়া ভারতীয় চটের খদ্দের। কোথায় বা নয়—অস্ট্রেলিয়ায়, আমেরিকায়। দক্ষিণ-আফ্রিকাতেও ছিল এই কিছুকাল আগে পর্যন্ত। এসেছে যখন, খদ্দেরের সঙ্গে খানিকটা মোলাকাত করে যাওয়া উচিত। তাদের পছন্দ-অপছন্দ ও প্রয়োজন জেনে বুঝে যাওয়া, নতুন নতুন খদ্দের পাকড়াও করা। এই সমস্ত করে বেড়াচ্ছে ভাস্কর, এবং টাকাও জলের মতন খরচ হচ্ছে। সেটা হবেই—ভাস্কর হালদারের খরচা একহাতে নয়, দু-হাতে। ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে কড়াকড়ি—কিন্তু ব্যবসাসূত্রে বাইরের সঙ্গেও কোম্পানির লেনদেন রয়েছে, লণ্ডন থেকেই স্টার্লিং-পাউণ্ড সরবরাহের ব্যবস্থা। অসুবিধা কিছু নেই।

হেনকালে এক সাংঘাতিক খবর। স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার। মোটর ছুটিয়ে ভাস্কর কন্টিনেন্টে বেড়াচ্ছিল। তার মধ্যে এক রাজধানী-শহরে (জায়গার নাম বলা ঠিক হবে না) সাংঘাতিক ভাবে একটা মেয়ে জখম হয়েছে—হাসপাতালে আছে। মামলায় ভাস্কর আসামি। প্রাণে বেঁচে গেছে মেয়েটা—আশা করা যায়, ক্ষতিপূরণ পেলে টানাহেঁচড়া বেশি হবে না। কিন্তু পরিমাণটা অত্যধিক হবে নিশ্চিত।

নীরদ ব্যাকুল হলেন। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা—শম্পার বাপ হিমাদ্রিও তার মধ্যে, নীরদকেই দোষ দেন: যেমন প্রশ্রয় দিয়ে আসছেন। আরও কি হয়েছে দেখুন গে। হাটে-মাঠে-ঘাটে কুহকিনীর দল। শ্বেতাঙ্গিনী একটা বউমা-ই হয়তো জুটিয়েছে আপনার জন্যে। চক্ষুলজ্জায় লিখতে পারে না। গিয়ে পড়ে লজ্জা ভাঙিয়ে বউ ছেলে ঘরে নিয়ে আসুন।

লণ্ডনের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ইণ্ডিয়া-হাউসের কেষ্টবিষ্টুদের একজন—

নীরদ তাঁকে লিখলেন অবিলম্বে খোঁজ নেবার জন্য। ঘটনাস্থলে ভারতীয় এমব্যাসি আছে—তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বন্ধু খবর জোগাড় করলেন : গাড়ি চাপা দেয়নি, মেয়েটাকে ধাক্কা মেরে ভাস্কর গাড়ি থেকে ফেলে দিয়েছিল। স্বাভাবিক অবস্থা নয় তখন, কিছু বেএক্তিয়ার ছিল।

নীরদ বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ করলেন। লোকের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা।

সিতাংশু শুনে বলল, অসম্ভব—

তিনটে কারখানা চালান নীরদ। তার একটা সোনার-বাংলা কেমিক্যাল ওয়ার্কস। সিতাংশু ম্যানেজার ঐ কারখানার। সে পরিচয় কিছুই নয়—ভাস্করের বাল্যসখা, সহপাঠী। হালদারদের পৈতৃক বাড়ি হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীট, সিতাংশু সেই পাড়ারই ছেলে। তার উপরেও আছে—মিলের কাজকর্মে নীরদবরণের ডানহাত বলা হয় তাকে।

ডানহাত সিতাংশু এবং বামহাত বলা হত—সে মানুষ পয়লা নম্বরের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে—গৌরদাস। দুয়ের মধ্যে কে ডানহাত কে বামহাত, তাই নিয়ে এমন কি তর্ক উঠতে পারত আগেকার দিনে।

সিতাংশু বলে, আমি ওসব বিশ্বাস করিনে জেঠাবাবু।

নীরদ আশ্বাস পেলেন তার কথায়। মুখ তুলে বলেন, আমিও না। কিন্তু ভাল করে খবর নিয়েই তো লিখেছে।

সিতাংশু জোর দিয়ে বলে, ভাস্কর এমন হতে পারে না। আপনি নিজে গিয়ে দেখে আসুন।

সে কি আর ওঠেনি নীরদের মনে? কতবার ভেবেছেন, গিয়ে পড়ে হিড়হিড় করে টেনে আনবেন : ভেবেছিস কি রে বজ্জাত ছেলে? আমি যেমন চিরজীবন সংসারে শিকড় বসাতে পারলাম না, তোর জীবনও তেমনি ভাবে যাবে নাকি? সেটি হচ্ছে না। তোর স্থিতি করে, সুখশান্তি চোখে দেখে তবে দুনিয়া থেকে নড়ব।

ইচ্ছে হয়েছে এমনি অনেকবার, কিন্তু উপায় নেই। ছেলে দূরে গিয়েছে, ছেলের মতন আর একটি আছেন। দেববিগ্রহ—শ্রীগোপাল। নিত্যপূজা নীরদবরণ নিজের হাতে করেন। ঠাকুরকে সামনে বসিয়ে ধ্যানধারণায় সকাল-সন্ধ্যার অবসরটুকু কী আনন্দে কাটে, সে জিনিষ প্রকাশ করে বলার নয়। শ্রীগোপালের সঙ্গ ছেড়ে স্বর্গধামেও যেতে চান না তিনি।

আর এখন এই নোংরা ব্যাপারের মধ্যে যাওয়ার তো কথাই ওঠে না। সিতাংশুর প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে নীরদ বলেন, আমি নয়, তুমি চলে যাও সিতাংশু। তুমি গেলে বেশি কাজ হবে, তন্নতন্ন করে দেখে বুঝে আসবে। যত টাকা লাগে, উদ্ধার করে আনো আমার ছেলে। ছেড়ে এসো না।

আজকে তারা ফিরে এলো। কেব্‌ল্ করে সিতাংশু সংক্ষেপে জানিয়েছিল: সন্দেহ ও রটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। নীরদবরণের অবস্থা চোখে দেখে গিয়েছে, সেজন্য মিথ্যা প্রবোধও হতে পারে। সত্যমিথ্যা যাচাই হবে এখনই—এই মুহূর্তে।

প্লেনের দরজা খুলে দিল। সিঁড়ির মুখে সিতাংশু বেরিয়ে পড়েছে, পিছনে ভাস্কর।

হে ঠাকুর, হে শ্রীগোপাল, তৃতীয় ব্যক্তি মেমসাহেব-টাহেব খোপ থেকে না বেরিয়ে আসে যেন ওদের পিছনে। নীরদ অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন, অন্তরাত্মা কাঁপছে।

না, তৃতীয় কেউ নেই সঙ্গে। মোটমাট দুজনই।

ঝকঝকে বিশাল গাড়িতে উঠতে গিয়ে ভাস্কর হেসে ওঠে: উঃ বাবা, দু হাতে খরচা করেও তোমায় হারাতে পারলাম না। একলা সাধ্য নয় আমার। ভাই কি বোন থাকত দু চারটে—একসঙ্গে সকলে চেষ্টা করে দেখতাম।

সেই ভাস্করই বটে! প্রসন্ন হাসিতে নীরদবরণের মুখ ভরে গেল।

ভাস্করের বদল হয়নি—মুখে সেই পুরানো রসিকতা। বাপে ছেলের নিরন্তর পাল্লা চলেছে। বাপ রোজগারের দিকে, ছেলে খরচের দিকে—কে কাকে হারাতে পারে সেই চেষ্টা।

গাড়িতে ভাল হয়ে বসে নীরদ ছেলের কথার জবাব দিলেন : খুব তো পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে। সিতাংশুকে পাঠিয়ে ধরে আনতে হল। এবারে উল্টো—তোমার কাঁধে বোঝা চাপিয়ে আমি পালাব। দেশদেশান্তর যাচ্ছিনে, হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীটে পুরানো বাড়িতে আমার শ্রীগোপালের সঙ্গে গঙ্গাবাস করব। তোমার মতন ছটফটে নন গোপাল—ভারি শান্ত।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে ভাস্কর বলে, বেশ তো, বেশ তো!

তিন বছরের বিস্তর জমানো কথা মুখে এসে ভিড় করছে। সিতাংশু গিয়ে বলেছে নিশ্চয়, তবু নীরদ ধৈর্য ধরতে পারেন না। বললেন, মিল নিয়ে নানান ঝামেলা। তুমি কিছু দেখে গিয়েছিল, দিনকে-দিন অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠছে।

হোক না—। অবহেলার ভঙ্গিতে ভাস্কর বলে, এইবারে সব ঠিক হবে, আমি তৈরি।

আবার বলে,দেখে এলাম বাবা, চারটে লুম এক এক জনের হাতে। এখানে তো দুটো লুমেই কান্নাকাটি পড়ে যায়। পুরানো নিয়মে আর চলবে না, ভাঙাগড়া রদবদল হবে। নতুন সব আইডিয়া নিয়ে এসেছি, বিদেশে টাকা তোমার অপচয় করে আসিনি।

নীরদবরণ তৃপ্তি পেলেন। এই তো চাই। প্রথম বয়সে নীরদবরণ কাজে নেমেছিলেন, সব চেয়ে বড় সম্বল তখন আত্মপ্রত্যয়। তারই জোরে শিল্পপতি হিসাবে আজ প্রতিষ্ঠা। পড়তে পড়তে কতবার টাল সামলেছেন প্রত্যয় বস্তুটা আকড়ে ধরে। ছেলের কণ্ঠেও সেই প্রত্যয়ের ধ্বনি।

ললিতা নীরদের পাশটিতে চুপচাপ ছিল। টাকা অপচয়ের কথায় সে বলে ওঠে, মামলা মেটাতে তো অনেক লেগে গেল—অ্যাঁ?

ঘাড় নেড়ে ভাস্কর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়ঃ অনেক। বিদেশি মুদ্রার ব্যাপার নিয়ে এত ঝঞ্ঝাট, বাবার ব্যবস্থার গুণে টাকা যেন জলের ধারে গিয়ে পৌঁছেছে। বাবা তুমি জাদু জানো।

নির্লজ্জের মতো হাসতে হাসতে নিজেই সেই গল্প শুরু করে দেয়ঃ গাড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিলাম একটা মেয়েকে। সারা মুখ তার বিশ্রী রকম কেটেকুটে গেল। হাসপাতালে চিকিচ্ছের পরও গর্ত-গর্ত হয়ে আছে মুখের উপর। সে গর্ত জীবনে ভরাট হবে না। চেহারাই সব চেয়ে বড় সম্পদ ওদের—

মৃদু হেসে ললিতার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে টিপ্পনী কাটেঃ এদেশেও কি নয়? মোটা দাম নিয়ে মেয়েটা তবে রেহাই দিয়েছে।

নীরদ লজ্জা পেয়ে চাপা দেবার চেষ্টা করছেনঃ থাক না, ধীরে-সুস্থে পরে শোনা যাবে। তাড়াতাড়ি কিসের?

সামনের দিকে ড্রাইভারের সিটের পাশে সিতাংশু। সে বলে, দোষী এমব্যাসির লোকেরা। খবরটা আবার তাদেরই মারফতে আনা হল। সাজাবার কায়দায় কথার মানে একেবারে উল্টো হয়ে এসে পৌঁছল।

বলবার জন্য সিতাংশু আকুলিবিকুলি করছে। -কত কী বিশ্রী জিনিষ ভেবে রেখেছেন এঁরা! গাড়ির মধ্যেই শুরু করে দিল। বলছে সিতাংশু, ভাস্কর মাঝে মাঝে কথা জুড়ে দেয়—

সত্যি সত্যি এক মেয়ে আছে কাহিনীর মধ্যে। যুবতী মেয়ে, সুদর্শনাও বটে। মেয়েটা বেএক্তিয়ারে ছিল, তা-ও মিথ্যা নয়। আর ভাস্কর কেমন ছিল—ঘটনাটা শুনে নিন, তারপরে বলবেন।

নিজ হাতে মোটর ছুটিয়ে ভাস্কর কন্টিনেণ্টে বেড়াচ্ছে। মোটর ছোটানোরই রাস্তা ইয়োরোপে, এমন মজা অন্য কিছুতে নেই। দেদার ছোট, তারপর গাড়ি ফেলে কোন এক হোটেলে হাত-পা এলিয়ে দাও। এক রাজধানী-শহরে পৌঁছেছে, সেখানে এমব্যাসি আছে ভারতের। জায়গার নাম ছাপার অক্ষরে না-ই রইল—কারো কারো চাকরি নিয়ে

টান পড়তে পারে (কী জানি, প্রোমোশানও হয়ে যেতে পারে—সেটা বেশি মারাত্মক)। সন্ধ্যার পর গিয়ে পৌঁছেছে ভাস্কর। নিয়ম আছে, নতুন এলে এমব্যাসিতে জানান দিতে হয়—সেই কাজ সেরে তারপর আস্তানায় গিয়ে উঠবে।

ককটেল-পার্টি তখন এমব্যাসিতে। এসব জিনিষ লেগেই আছে। জানেন না আপনারা—ঘরেই মধ্যে অবস্থা যা-ই হোক, বিদেশে কোঁচার পত্তন দেখে মালুম হবে কতবড় খাঞ্জে-খাঁ আমরা! মদ বিনে নাকি বিদেশি বাগানো যায় না, অতএব ঢালাও ব্যবস্থা ওটার।

সেই গুলোড়ের মধ্যে ভাস্কর গিয়ে পড়েছে।

গান্ধিভক্ত কিনা সব—হাতে লাঠি গান্ধিজীর বিরাট ছবি একদিককার দেয়ালে। ছবির নিচেই দেয়াল জুড়ে টানা-সেলফ—সেলফের উপর নানা বিচিত্র লেবেলের বোতল সাজানো। ঢালাঢালি হচ্ছে ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে, এবং পান অন্তে খালি গেলাস সেলফেরই একপাশে এনে রাখছে। গান্ধিজী ছবি থেকে দেখছেন।

ঢুকে পড়ে ভাস্কর চমকে যায়। হাতের এ লাঠি তুলে গান্ধিজী মেরে পড়েন না কেন? অহিংস-নীতি আর যেখানে হোক, এজায়গায় কিছুতে নয়। মূর্খের জন্য শাস্ত্রে ভিন্নপ্রকার ওষুধের ব্যবস্থা। গান্ধিজীর পক্ষে উপায় নেই যেহেতু ছবির ফ্রেমে তিনি আবদ্ধ। এ" ভাস্করও পারে না যেহেতু হাতে ঐ লাঠিগাছিও নেই—গলায় ঝোলানো একটি ক্যামেরা শুধু। ক্লিক ক্লিক করে অতএব ক্যামেরার কয়েকটি ছবি তুলে নিল গান্ধিজী ও তাঁর সম্মুখবর্তী ভক্তবৃন্দের। কন্টিনেন্টে ঘুরে ঘুরে কত ছবি তুলেছে, কিন্তু স্বদেশের মানুষকে দেখাবার এমন মজাদার ছবি একটাও নয়। কাগজে ছেপে দেবে: তোমাদের ট্যাক্সের টাকার সদ্ব্যয়টা দেখ বিদেশে। তা আবার গান্ধিজীর ছবির সামনে—তাঁকেই যেন দেখিয়ে দেখিয়ে।

ছবি তুলে ভাস্কর দ্রুতপায়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। দেখতে পেয়েছে পার্টির অনেকেই, কিন্তু রসভঙ্গে বোধকরি নারাজ। এত

জনের মধ্যে মেয়েটাই কেবল তাড়া করে এলো। পরে জানা গেছে, এমব্যাসিতে চাকরি করে। রিসেপসনিস্ট।

শুনুন, কে আপনি?

বিরক্ত কণ্ঠে ভাস্কর বলে, ইণ্ডিয়ান। আমাদের পতাকা উড়ছে বাড়ির সামনে। আমারই জায়গা এটা।

ডাকছেন ওঁরা, ফিরে আসুন। হুকুম না নিয়ে ছবি তোলা বেআইনি।

ততক্ষণে ভাস্কর গাড়িতে উঠে পড়ে চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দিয়েছে।

মেয়েটা বলছে, ছবি তুললেন কেন?

মুখ বাড়িয়ে ভাস্কর তীব্র কণ্ঠে বলে, হাতে যে পিস্তল ছিল না। থাকলে গুলিই করতাম।

ছবি নিয়ে যাওয়া চলবে না। আপনি স্পাই হতে পারেন। খুব সম্ভব তাই—

আরও গুটিকয়েক ইতিমধ্যে হল থেকে বেরিয়ে এসেছে। মেয়েটা আচমকা দোর খুলে চলতি গাড়ির ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মদ্যগন্ধ মুখে। ভাস্করের ঘাড়ের উপর পড়ে ক্যামেরা ছিনিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে দিল। লহমার মধ্যে এত সমস্ত। ধাক্কা দিয়ে ভাস্করও তাকে বাইরে ফেলেছে।

রক্তে ভাসছে মেয়েটা। হৈ-হৈ কাণ্ড। পুলিশ, ফৌজদারি-কোর্ট—

নিঃশব্দে নীরদবরণ শুনছিলেন। বলে উঠলেন, ঈস, বড্ড ক্ষতি হয়ে গেল!

ললিতাও জুড়ে দেয়: কত টাকা উড়ে গেল ঝোঁকের মাথায় এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসে—

বাধা দিয়ে নীরদ বললেন, না বউমা, টাকার ক্ষতি কে বলছে? ক্যামেরাটা গেল, ছবিগুলো পাওয়ার উপায় রইল না। দেশের ভিতর-অঞ্চলে যা ঘটছে, সে সব দেখিয়ে দিতে হয় না। হাড়ে হাড়ে

লোকে মালুম পাচ্ছে। বাইরের কাজকর্মের নমুনা দেখানো যেত ছবিগুলো হাতে থাকলে।

এই বাপ, এই ছেলে!

॥ দুই ॥

শ্যামবাজারের মোড়ে এসে নীরদবরণই বললেন, ক্লান্ত আছ সিতাংশু, তোমরা আর পার্ক স্ট্রীট অবধি যেতে যাবে কেন? এখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে কোয়ার্টারে চলে যাও। গিয়ে বিশ্রাম করোগে।

ললিতা ও সিতাংশু নেমে পড়ল। পিতা-পুত্র কেবল গাড়িতে।

ভাস্কর বলে, সরকারের উপর বড্ড রেগে আছ বাবা। জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া আর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে যাওয়া এক ব্যাপার। তোমাদের গিলে খেয়ে ফেলবে।

জানি রে জানি। সরকারকে তাই আগেভাগে গিলে রেখেছি। যত উৎপাত, তার পনেরো আনার মূল আমরা। সবকারের নামে গালির পনেরআনাই আমাদের ঘাড়ে পড়ে। অথচ দেশের কাজ বলেই একদিন শিল্প গড়তে নেমেছিলাম—

শুনে নিন সে ইতিহাস। ভাস্কর অনেকবার শুনেছে। নীরদ-বরণের সঙ্গে থাকতে হলে না শুনে অব্যাহতি নেই।

নীরদ প্রথম বয়সে রাধারমণ রায় নামে একজনের পাল্লায় পড়েছিলেন। শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে, গুরুর মতো মানতেন।

চাকরির উপর রাধারমণের বড় ঘৃণা: চাকরি তো চাকরগিরি। চাকরি ছাড়া ভিন্নতর পথ আছে—নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের রোজগার তো বটেই, দেশের মানুষেরও রুজিরোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

ফ্যাক্টরি হবে, ঠিক হল। ইস্পাত-লোহালক্কড়ের কারখানা। নীরদের মূলধন, এবং টাকা বাদে অন্য সমস্ত দায়ঝক্কি রাধারমণের। হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীটে নীরদের পৈতৃক পুরানো বাড়িটা। বাড়ি বন্ধক দাও—ব্যবসা এমনি জিনিষ, বাড়ি তোমার দুটো বছরের মধ্যেই খালাস হয়ে আসবে।

নীরদের স্ত্রী.চিরপঙ্গু। ভাস্করের জন্ম থেকে শাশুড়ি তারামণি সংসারে এসে আছেন। তিনিই গার্জেন, জবরদস্ত স্ত্রীলোক। কেমন করে কথাটা তাঁর কানে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নাকচ : কখনো নয়। বাড়ি যাবে তা হলে। আমার এককোঁটা নাতি আর হাড়মাসের পুঁটলি মেয়েটা ঘাড়ে করে কোথায় যাব আমি? যা করতে চাও করো তোমরা গিয়ে, কোনো কিছু বলতে যাচ্ছিনে। কিন্তু বাড়ির দিকে নজর দেবে না—খবরদার!

মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন নীরদ : উপায়? এক উপায় তো পড়শির টাকাপয়সা ঘটিবাটি কেড়েকুড়ে নেওয়া। নামটা সম্ভ্রান্ত—স্বদেশি ডাকাতি। ধরা পড়লে নিন্দে নেই।

শেষ পর্যন্ত তারামণিই উপায় করলেন। কিছু কোম্পানির কাগজ ছিল, জামাইকে দিয়ে দিলেন। হাজার দশেকের মতো হল।

প্রথম ফ্যাক্টরি শাশুড়ির ঐ মূলধনে। পুরানো এক রোলিং-মিল কেনা হল শহরতলিতে। মালিক চালাতে পারছিল না। ছোটখাট ব্যাপার, কিন্তু নাম দেওয়া হল জব্বর। বৃহৎ নামে যখন অতিরিক্ত ট্যাক্স নেই, সেদিক দিয়ে খাটো হওয়া কেন? গোটা বাংলাদেশ ধরে টান—সোনার-বাংলা স্টীল কোম্পানি।

কাজকর্ম সেই আগেকার—বাতিল লোহালক্কড় সংগ্রহ করে তাই থেকে রড ইত্যাদি বানানো। পুরনো যন্ত্রপাতি। তবে এদিকে যাই হোক, কারখানার জায়গাটা অতি প্রশস্ত। বিঘে কুড়িক জমি টিন দিয়ে ঘিরে রেখেছে ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য। দুই মালিকের মনের আশারই মতো।

উঠে পড়ে লাগলেন তাঁরা—এই ধ্যান এই জ্ঞান, আহারনিদ্রাই বন্ধ হবার জোগাড়। সেটা প্রথম বয়স বলে নয় আজও নীরদের সেই স্বভাব। বুড়ো হয়েও বদলান নি।

তবে বলি। বাইরে বটে ঘরব্যাভারি রঙ বানানো, গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল ভিতরে ভিতরে। গোপন কাজকর্ম। বোমা-রিভলভারের যুগ সেটা। একটা রিভলভার সংগ্রহে কতজনের প্রাণ যাচ্ছে, সারা জীবন জেলবাস হাজার হাজার টাকা খরচ—লাঞ্ছনার অন্ত নেই। রোলিং-মিলের সঙ্গে সঙ্গে আর এক গুপ্ত কারখানা চলে অস্ত্র তৈরির জন্য। পিস্তল রিভলভার বন্দুক—দরকার মতো ছোরা-ছুরিও। ওরা সব জীবনদানে তৈরি—দুষমন দুটো চারটে নিপাত করে যেতে পারে, সেই জিনিষ হাতে তুলে দেবো ওদের। আসল কাজ এইটেই—স্বদেশি অর্ডনান্স-ফ্যাক্টরি। রঙ বানিয়ে যা মুনাফা হয়, বেশির ভাগ যায় এই কাজে।

মাথা বটে রাধারমণের! বিশেষ কোনখানে শিক্ষানবিশি করেছেন, তা নয়। কিন্তু যাবতীয় অস্ত্রের নক্সা সম্পূর্ণ তাঁর নিজের, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিশ্বাসী কয়েকজন কারিগর দিয়ে গড়াচ্ছেন। ছেলেদের কাছে চালান হয়ে যাচ্ছে। বাইরের কেউ ঘুণাক্ষরে জানত না। এখন হাঁকডাক করে নীরদবরণ সেই স্বদেশি অস্ত্রশালার কথা বলেন। যশ নেন।

কাজটা অনেকদিন ধরে চলেছিল। ক্রমশ পটপরিবর্তন। বোমা-রিভলবার গিয়ে সংগ্রাম অহিংস পথে ঝুঁকল। শুধুই রোলিং-মিল এখন, পুরোপুরি ব্যবসা। রাধারমণের কারখানায় আর মন নেই। সঙ্গে আছেন, এই পর্যন্ত। চিরকেলে ছন্নছাড়া মানুষ, আপন বলতে বালবিধবা মেয়েটা আর ছেলে—ঐ যে গৌরদাস। সে দুটিকে নীরদের হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীটের সংসারে গছিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

নীরদকে কিন্তু কাজকারবারে পেয়ে বসেছে। যেটা ছিল গৌণ, এখন তাই প্রধান। ব্যবসা ও অর্থার্জন। স্টীল কোম্পানি আছেই, তা ছাড়া আলাদা এক ফ্যাক্টরি হল সম্পূর্ণ নিজের। সোনার-বাংলা কেমিক্যাল ওয়ার্কস। নানা রকম প্রসাধন দ্রব্য বেরোয় সেখান থেকে।

আর কিছু অষুধ ও অ্যান্টিসেপটিক আরক। এই নিয়েও দেমাক নীরদবরণের: স্বাধীনতা-যুদ্ধের আর এক ধাপ—পুরোপুরি অহিংস পথে। রাজ্যপাটের চেয়ে ব্যাপার-বাণিজ্যে ইংরেজের গরজ বেশি। বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকে গলাধাক্কা দিয়ে দিচ্ছি আমরা। ক-বছর আগে এ সবের একটা জিনিষও এ দেশে তৈরি হত না, জাহাজ বোঝাই হয়ে আসত। আরও ক'টা বছর দেরি করো, আমরাই জাহাজ বোঝাই করে ওদের পাঠাব।

দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধ চলছে। বাইরের আমদানি বন্ধ, কেমিক্যাল ওয়ার্কসের জিনিষ পড়তে পায় না। আহা, চলুক লড়াই—জোর চলুক, থেমে না যায় যেন হঠাৎ। লড়াইয়ে ইস্পাতের টানও বিষম—দরের দিক দিয়ে হীরা-মুক্তা ছাড়িয়ে যাওয়ার গতিক। এমন মওকার মুখে স্টীল কোম্পানি কিন্তু বিগড়ে বসল। সেকেলে লক্কড় যন্ত্রপাতি এলিয়ে পড়ল একেবারে। লোভে পড়ে দিবারাত্রি অবিশ্রাম খাটাতে গিয়েছিলেন, তারই প্রতিক্রিয়ায় হয়তো। বিদেশ থেকে নতুন যন্ত্রপাতি আনা সম্ভব নয় যুদ্ধকালের মধ্যে। এক্সপার্টরা দেখেশুনে রায় দিলেন, যন্ত্রপাতি অন্য কোন রোলিং-মিলকে বেচে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ভেঙেচুরে মেশিনে ফেলে তারাই রড বানাক। সেই অবস্থা হতে দিতে কিছুতে মন সরে না। তালাবন্ধ হয়ে রইল বহুদিন। আরম্ভ তারামণির টাকায়, শেষটা তিনিই নিয়ে নিলেন ঋণের বাবদে। তালিতুলি দিয়ে কাজও মোটামুটি চালু হল। তবে গোলমাল লেগেই আছে। একমাস দু-মাস বেশ চলল, হঠাৎ মেশিন বিগড়ে বসে।

রাধারমণ এই সময়টা একেবারে কলকাতা ছাড়লেন। বসিরহাট থেকে মাইল সাত-আট দূরে কোন এক সিদ্ধিহাট গাঁয়ে গুটি কতক ছেলে নিয়ে আশ্রম গড়েছেন, শুনতে পাওয়া যায়। আবার একদিন শোনা গেল, মারা গেছেন তিনি সেখানে। মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে নীরদ চলে গেলেন রাধারমণের ছেলে গৌরদাসকে নিয়ে। শ্রাদ্ধশান্তি সেখানেই হল।

এটম-বোমার প্রসাদে তাড়াতাড়ি লড়াইয়ের শেষ। স্টীল কোম্পানি জোর চলল আবার। দেশেরও ভোল পালটাল। স্বাধীনতা-লাভ।

নানান দিকে হরেক নেতার উদয়। কি পরিচয়? হপ্তা তিনেক জেলে ছিলেন—সন্দেহ হলে কাগজপত্র খুঁজে গবেষণা করতে পারো। অতীতের যাবতীয় দুষ্কর্ম মাথার গান্ধীটুপিতে চাপা দেওয়া—অমোঘ শক্তি ধরে ঐ টুপি।

নীরদবরণ ইতিমধ্যে এক চটকলের কর্তা হয়েছেন। সোনার-বাংলা জুটমিলের ম্যানেজিং এজেন্ট। ধাপে ধাপে কোন উঁচুতে এখন—বাঙালি শিল্পপতিদের একজন।

তবু কখনোসখনো নীরদ নিশ্বাস ফেলেন পূর্বস্মৃতির তাড়নায়। সে আমলের নভেলে যেমন সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব থাকত। চোখা চোখা বুলি বেরোয় এমনি মানসিক অবস্থায়। রাধারমণের মৃত্যু নিয়ে কথা উঠেছিল—নীরদ বললেন, ভাগ্যিস মরেছিলেন—নয়তো আজকের দিনে আত্মহত্যা করতে হত। তেজস্বী পুরুষ ভণ্ডদের মাঝে টিকতে পারতেন না। অন্যের কথা কি, আমিই তো পয়লা নম্বরের একটি।

তিন বছর পরে ছেলেকে পেয়ে আজ আবার সেই পুরানো প্রসঙ্গ। নীরদ বলছেন, দেশের কাজ নিয়ে কত জনে কত দিকে নেমে পড়েছিল। দরিদ্র জীবন বরণ করে জনসেবার সঙ্কল্প. আজকে ব্রতচ্যুত। এয়ার-কণ্ডিসণ্ড বাড়ি, অগুন্তি আরদালি-বেয়ারা খানসামা-বাবুর্চি, হাজার হাজার টাকার ইলেকট্রিক টেলিফোন আর জলের বিল—এত সমস্ত সত্ত্বেও মিনিস্টারের বাসঘর নাকি ঘোড়ার আস্তাবল। ক্ষমতা আছে বলেই মেম্বাররা টপাটপ মাইনে বাড়িয়ে নিচ্ছে, অথচ সাধারণ মানুষ হাহাকার করে মরে—

টিপি টিপি হাসছিল ভাস্কর, এবারে খিল খিল করে হেসে ওঠে। থতমত খেয়ে নীরদ থেমে যান। ভাস্কর এই বটে! দারিদ্র্য কেমন জিনিষ বুঝতে পারে না, অভাবের কথা মনে তার দাগ কাটে না।

বলছে, শখের হাহাকার বাবা। অন্ত দেশের তুলনায় আমরা তো স্বর্গধামে থাকি। তুমি বলে দিয়েছিলে—বম্বে নেমে তোমাদের চেয়ারম্যান তেজা মল্লিকের বাড়ি গেলাম। সেই সময় দোকানেও ঢুকেছিলাম কয়েকটা। এত সস্তা যে মনে হল দোকান সুদ্ধ কিনে ফেলি।

নীরদ হেসে বললেন, তুমিই পারো সেটা। পুরো দোকান না হোক সিকি আন্দাজ পারো হয়তো কিনতে। জ্ঞান হওয়া ইস্তক বড়লোক, টাকাকড়ি নুড়ি-পাটকেলের মতন তোমার কাছে, যত্রতত্র ছুঁড়ে দিয়ে আনন্দ পাও। কিন্তু আর একটা জগৎ আছে, আমাদের জগতের ঠিক উল্টো। ইয়োরোপ ঘুরে এলে—আছে সেখানেও। কোনো দেশ বাদ নেই। সে জগতের আমরা খবর রাখিনে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা নেই। তোমার কাছে এত সস্তা, তারা হাতে ছুঁতেও ভরসা পায় না ঐ সব জিনিষ। বিপদ হল আমাদের অনেক গুণ বড় সেই জগৎটা। বিশেষ করে আমাদের এই দেশে।

বলেন আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন, হেসে ওঠে কিনা ভাস্কর। বলছেন, আমিও কি জানি তাদের? একেবারেই না—বড্ড বেশি ফারাক আমাদের ভিতর। তবে জন্ম থেকেই আমি বড়লোক ছিলাম না—যত কিছু বলি পূর্বস্মৃতি থেকে। যেন আমার গতজন্মের কথা।

ইতিমধ্যে ফটকের সামনে গাড়ি এসে পড়েছে। পার্ক স্ট্রীটের অট্টালিকা। উর্দি-পরা দারোয়ান সেলাম ঠুকে ফটক খুলে দিল। নুড়ি-বিছানো পথে খড় খড় আওয়াজ তুলে মোটরগাড়ি করিডরের নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। খানিকটা আগে মিনিস্টারের বাড়ি নিয়ে ব্যঙ্গ হচ্ছিল, সোনার-বাংলা জুট-মিলের ম্যানেজিং এজেন্টের বাড়িতেও তাই। এয়ার-কণ্ডিশণ্ড ঘর, বেয়ারা-চাপরাশি বাবুর্চি-খানসামা ইত্যাদি। দূরের রাস্তা থেকে নজরে আসে এ বাড়ি। কত পথিক-জনের নিশ্বাস পড়ে—না জানি কেমন আরাম কত ভোগসুখ বাড়ির কক্ষে কক্ষে!

সিঁড়ি বেয়ে বাপের পিছু পিছু ভাস্কর উপরে উঠছে। তিন বছর পরে। হলঘরে পা দিয়েছে, হঠাৎ নীরদ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, এখনই তোমায় বলা ঠিক হবে কি না, কুণ্ঠা হচ্ছিল। এতদিন একলা নিজের মধ্যে রেখেছি, বলার মানুষ পেয়ে আমার ধৈর্য থাকছে না।

ভূমিকা শুনে ভাস্করের চমক লাগে। সিতাংশু অল্পই জানত, যেটুকু জানে বলেছে ভাস্করকে। কাজ আর কৌতুক ছাড়া বাপকে সে ভাবতে পারে না। বয়স হয়েছে, কিন্তু বার্ধক্য ছুঁতে আসেনি সাহস করে। বাপ-ছেলের সম্পর্ক তাদের মধ্যে খানিকটা বান্ধবের মতো। বিদেশ থেকে ফিরে সেই বাপকে দেখছে যেন আলাদা এক মানুষ। কণ্ঠস্বর ভিন্ন।

ভাস্কর বলে, হাসি ছাড়া তোমায় বিশ্রী দেখায় বাবা। যা বলবার হেসে হেসে বলো, নইলে আমি শুনব না।

হাসতে হয় অতএব নীরদের। বলেন, দু-জনে আমাদের সেই পাল্লাপাল্লি—আমি কত রোজগার করতে পারি, তুমি কত খরচ করতে পার। হারাতে হদ্দমুদ্দ চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু এবারে সত্যিই বুঝি হারলাম। দুটো হাতের একটা হাত আমার একেবারে খসে গেছে।

অর্থাৎ বিগড়েছে গৌরদাস। কথা বাড়তে না দিয়ে ভাস্কর তাড়াতাড়ি বলে, তবে পালটাপালটি এবার। আমি কত রোজগার করতে পারি, তুমি কত খরচ করতে পার। হুঁ, তুমি করবে খরচ! তোমার নিজের মুঠোখানেক আতপ চাল আর তোমার শ্রীগোপালের দু-খানা বাতাসা। পঞ্চাশটি টাকা রোজগার হলেও তো আমি জিতে থাকব।

হালকা সুর ছাড়া কথা চলে না এ ছেলের সঙ্গে। কোনোদিন চলে নি, আজকেও চলল না। অতএব সহাস্যে নীরদ জবাব দেন: তা ভেবো না। আমার ঠাকুরের জন্য মন্দির গড়ব, দান-ধ্যান সদাব্রত কত কি হবে। শুধু শ্রীগোপাল নিয়েই ফতুর করতে পারি তোমায়।

ভাস্কর সগর্বে বলে, কোরো তাই, দেখা যাবে।

জোর দিয়ে আবার বলে, কথা রইল তবে বাবা। কাজকারবার তুমি তাকিয়ে দেখবে না, এক লহমাও ভাববে না ওসব নিয়ে। শুধু খরচ করে যাবে যেমন আমি এতকাল করে এসেছি। এবার থেকে আমি বাবা, তুমি ছেলে—আমারই মতন অবাধ্য অভব্য উড়নচণ্ডী ছেলে একটা। কেমন ?

বাপকে জড়িয়ে ধরল আদর করে। সেই ভাস্করই আছে অবিকল, একটু বদলায় নি। তেমনি পাগল-পাগল ভাব।

॥ তিন ॥

পাগল কেমন শুনুন তবে। সুখময় চাটুজ্জেকে নিয়ে যা করেছিল। ভাস্কর সেইসময়টা মেটালার্জিতে ইস্তফা দিয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ধরেছে। শাশুড়ি তারামণিকে নিয়ে নীরদ প্রয়াগে কুম্ভমেলায় চলে গেলেন, তার পূর্বে কিছু আচার-অনুষ্ঠান ছিল। সেই উপলক্ষে বাড়ি এসেছিল ভাস্কর। ছুটি চলছে তখন, বাড়িতে, রয়ে গেছে।—হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীটের পুরানো বাড়িতে।

ভাস্করের খামখেয়ালি মেজাজ চাউর হয়ে গেছে—টাকার মুঠো ছোকরার কাছে ধূলিমুঠোর সমান। তাক বুঝে ধরতে পারলে হয়। সাহেব ও গিন্নিঠাকরুন বাইরে চলে গেছেন, সুখময় খোঁজখবর নিয়েই এসেছে। এসে বৈঠকখানায় বসল।

ভৃত্য মাধব উপরে খবর দিতে এলো। গল্প-উপন্যাসে হামেশাই এক রকম মার্কা-মারা পুরাতন ভৃত্য পাই, অতি বিশ্বাসী এবং মনিবের অভিভাবকস্বরূপ—পড়ে পড়ে সেই বস্তুর কথাবার্তা চালচলন কণ্ঠস্থ হয়ে আছে। মাধব কিন্তু সত্যি সত্যি তাই।

খবর দিতে এসে মাধব সুখময় লোকটার পরিচয় দেয়ঃ বিষম ঘড়েল দাদাভাই। এ পাড়ার সবাই জানে। আলিপুরে-কোর্টে মিথ্যে

সাক্ষি দিতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। আমাদের সাহেবের কাছে কত বার এসে সাহায্য নিয়ে গেছে। তোমারও আজ কিছু খসাবে।

সিতাংশুর সঙ্গে গুলতানি হচ্ছিল তখন। উৎসাহ ভরে ভাস্কর উঠে দাঁড়াল: এসো সিতাংশু, দান করে কিছু পুণ্যসঞ্চয় করে আসি।

বৈঠকখানায় ঢুকেই প্রথম কথা: কত চাই, বলুন ঠাকুরমশায়।

এমন সরাসরি প্রশ্নে সুখময় হকচকিয়ে যায়। ভূমিকা ছাড়ে না তবু: সাহেব জানেন আমায়। আপনার সম্বন্ধে বিস্তর শুনে আসছি, সোনার টুকরো ছেলে। শুনতে পেলাম, বাড়ি এসেছেন আপনি—

আরও শুনলেন, সাহেব নেই বাড়িতে—

সুখময় বলে, থাকলে তো ভালই হত। মহাশয়-মানুষ তিনি। আপনি জানেন না, ওঁর কাছে আমার যথেষ্ট আসা-যাওয়া আছে।

ভাস্কর বলে, তা-ও জানি। কিন্তু সংক্ষেপে সারুন। তাস খেলতে খেলতে উঠে এসেছি।

সুখময় বলে, মেয়ে সেয়ানা হয়েছে, বিস্তর চেষ্টাচরিত্র করে একটা পাত্তোরও ঠিক করেছি—

বাধা দিয়ে সিতাংশু বিরক্ত স্বরে বলে, ভাস্কর কি রোজগেরে এখন? সাহেব আপনার বাঁধা মক্কেল, যা বলবার তিনি ফিরে এলে বলবেন।

ভাস্কর বলে, ব্রাহ্মণ মানুষ আশা করে এসেছেন, বলেই ফেলুন। সংক্ষেপে সারতে বলছি—কত চাই টাকার অঙ্কে বলে দিন।

একেবারে ন্যাড়া কথায় কাজকর্ম হয় না, একটু তবু ধানাই-পানাই: হাত ঝাড়লে পর্বত আপনাদের হুজুর। টাকা পনেরো যদি দেন, কন্যাদায়ের খানিকটা সুরাহা হবে।

দিচ্ছি। পনেরো নয়, তিরিশ।

কী বলবে, ভাষা হাতড়ে পায় না সুখময়। মনে মনে দেমাক: বলবার বাঁধুনি কী আমার! মানুষ জলে ভেজে, এ আমার হল কথায় ভেজানো।

ভাস্কর তার কথা শেষ করল : তিরিশ টাকা দিচ্ছি, কিন্তু দাড়ি কাটতে হবে চাটুজ্জেমশায়।

মুখ-ভরা দাড়ির জঙ্গল। ত্রস্তভাবে বাঁ-হাতে দাড়ি ঢেকে সুখময় চাটুজ্জে বলে, কেন, দাড়ির কি হল?

ভাস্কর বলে, দাড়ি গালে রাখবেন তো মেয়েও ঘরে রাখুন গে। আমার দ্বারা কিছু হবে না। বাবাকেও মানা করে দেবো।

অবাক হয়ে চেয়ে পড়ে সুখময়। আবোল-তাবোল বলছে—মাথার গোলমাল নাকি ছোঁড়াটার ?

ততক্ষণে ভাস্কর পকেট থেকে তিনটে দশ টাকার নোট বের করে মেলে ধরছে। পকেটের ভিতরটা খসখস করে উঠল—উঃ, কত নোট থাকে ওদের পকেটে!

সুখময় সকাতরে বলে, কন্যাদায় নিয়ে এসেছি, তার মধ্যে দাড়ির কথা ওঠে কিসে? এই দাড়ি—জানেন, আজকের নয়। তিরিশটা বছর পালন করে আসছি। পিতাঠাকুর বরাবর বকাবকি করেছেন : ব্রাহ্মণের মুখে গুচ্ছের দাড়ি কেন? তাঁর অবর্তমানে ব্রাহ্মণীও বলে থাকে। কারো কথা কানে নিইনে।

ফস করে হাত পকেটে ঢুকিয়ে ভাস্কর আরও একটা নোট বের করল : বুঝুন। এর উপরেও 'না' বলেছেন তো উপরে গিয়ে তাসে বসে যাবো।

ইতস্তত ভাব দেখে ভাস্কর সত্যি সত্যি সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায়। সুখময় রোখ করে বলে, যাবেন না। ডাকুন পরামাণিক—

তারপর নিজেকেই বুঝি সান্ত্বনা দিচ্ছে : দাড়ি আবার উঠে যাবে। ভগবান আছেন। দুটো মাসেই যেমন-কে-তেমন।

ভাস্কর বলে, পরামাণিক কোথা? আমরাই সেরে দিচ্ছি।

সিতাংশুকে বলে, শেভিং-সেটটা নিয়ে এসো দিকি। উঁহু, তিরিশ বছর ধরে শাল-সেগুনের জঙ্গল জমানো—পাতলা ব্লেডে কাজ হবে না।

একটা কাঁচি জোগাড় করে আনো মাধব-দা'র কাছ থেকে। কাঁচি না পেলে সুপারি-কাটা জাঁতি আছে, তাতেও চলতে পারে।

মাধবের মুখে সুখময়ের বর্ণনা পেয়ে মানুষটাকে জব্দ করার লোভ দুর্বার। সিতাংশু বুঝেছে সেটা, তারও উৎসাহ। ছুটল মাধবের কাছে। কাঁচিই পাওয়া গেল, জাঁতি অবধি নামতে হল না।

কঁ্যাচ-কঁ্যাচ করে একটা কাগজের উপর ধার পরীক্ষা করে ভাস্কর প্রসন্ন মুখে বলে, ব্রহ্ম-অঙ্গে হাত লাগিয়ে পাপের ভাগী হব না। নিজ হাতেই ছেদন করুন আয়নার সামনে গিয়ে।

কাঁচি চালিয়ে সুখময় মুঠোখানেক দাড়ি কেটে ফেলেছে, আরও কাটছে। ভাস্কর হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আপনার কন্যাদায়ের সাহায্য এক পয়সাও দেবো না কিন্তু।

কাঁচি বন্ধ করে সুখময় আর্তনাদ করে ওঠে : আমার এমনি হাল করে দিয়ে এটা কি রকম বলছেন হুজুর!

কন্যাই নেই, কন্যাদায় কিসের? দাড়ির দাম ধরে দিচ্ছি—এই চল্লিশ। দু-মাসেই আবার তো উঠে যাচ্ছে। ফাঁকতালে ভাল লাভ হয়ে গেল, কি বলেন?

নোট চারটে হাতে এসেছে, কিন্তু কলঙ্কটাও মোচন করে যাবে সুখময়। বলে, কন্যা নেই একথা শত্তুরে লাগিয়ে গেছে। কানে নেবেন না। বলেন তো কন্যাকে সশরীরে হুজুরে এনে হাজির করি।

সে কন্যা চোখে দেখেই ছাড়ব না, জেরা করে পরিচয় বের করব। দাড়ি গেছে, ঝুটো কন্যা হলে মাথা ন্যাড়া হবে কিন্তু।

বলতে বলতে ভাস্করের লঘু কণ্ঠ কিছু গম্ভীর হল : টাকা ছড়াই আমি, কথাটা কানে শুনেছেন। ছড়াই সত্যিই, জেনে শুনে ইচ্ছে করে দিই—বোকা বুঝিয়ে কেউ নিতে পারে না। আপনার কন্যাদায় নয়, অন্নদায়। অভাবের কথা বলতে মানুষের লজ্জা, কিন্তু শঠতায় বাহাদুরি। আমায় নির্বোধ বলে লোকের কাছে বাহাদুরি নিতে

না পারেন, দাড়ি সেইজন্যে কাটা পড়ল। আপনার দাড়ি আপনিই নিয়ে যান, নোটের সঙ্গে ওটাও পকেটে পুরে ফেলুন।

সুখময় চলে গেলে ভাস্কর গর্বদৃষ্টিতে সিতাংশুর দিকে তাকায়। ভাবখানা হল : যা খুশি করা যায় টাকা দিয়ে। দেখলে তো?

হিমাদ্রিশেখর সিতাংশুর মামা। নীরদের বাল্যবন্ধুও বটে। শম্পা তাঁর মেয়ে। অনেক দিন ধরে ভাস্করের সঙ্গে শম্পার বিয়ের সম্বন্ধ চলছে। শম্পার তখন বিয়ের বয়স হয় নি, ভাস্করেরও নয়। শুধুমাত্র প্রস্তাব—তা-ও একবার ওঠে, একবার ভেঙে যায়। নদীর জোয়ার-ভাঁটা যেমন—জল কখনো এদিকে, কখনো উল্টো দিকে। এখন হিমাদ্রি অবসর নিয়ে লক্ষ্ণৌ থাকেন দুই ছেলের কাছে। অবরে-সবরে কলকাতা আসেন, সিতাংশুর কোয়ার্টারে এসে ওঠেন। সে সময়টা কর্মস্থল কলকাতা ছিল। কলকাতায় একটা বাড়িও আছে হিমাদ্রির, সে বাড়ি এখন ভাড়ায়।

সুখময়ের নিগ্রহ বেশ চাউর হয়ে গিয়েছিল। হিমাদ্রিও শুনেছিলেন। নীরদকে তিনি বললেন, অত টাকা কেন দিতে যান ছেলের হাতে?

সংক্ষিপ্ত সরল জবাব নীরদবরণের : খরচ করবে বলে।

হিমাদ্রি বলেন, বয়স যে নিতান্ত কাঁচা। বুদ্ধি পরিপক্ক হয়নি—

খরচ করে তাই আনন্দ পায়। পরিপক্ক হলে জমিয়ে জমিয়ে ব্যাঙ্ক ভরবে। যার কোন মূল্য নেই। বোকারাই টাকা জমায়।

আত্মসমর্থনে কিঞ্চিৎ অর্থনীতির ব্যাপার এসে পড়ে : দিনকে-দিন টাকা সস্তা হয়ে যাচ্ছে—হতে বাধ্য। সায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মণ চাল—পুরো একটা টাকা প্রায় স্বর্গলোকের জিনিষ তখন, দেবতাদের ট্যাঁকে ঘোরে। আপনার আমার মতো সামান্য লোকের তখন কড়ি-কড়ায় বিকিকিনি। প্রথম-লড়াইয়ের আগে এক-শ টাকা যার মাইনে, সে মানুষ ছোটখাটো লাটসাহেব। এক-শ

টাকায় এখন রান্নার ঠাকুর পাবেন না। দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের পর চীনের কি গতিক দাঁড়াল—একটি হিসাবি মানুষ ব্যয়-সংক্ষেপ করে সারা জীবন জমিয়ে গেছেন বুড়োবয়সের সম্বল হিসাবে। ব্যাঙ্কের খাতায় বড় অঙ্কের টাকা (টাকা নয়, ইউআন)। টাকার দাম তখন এত পড়ে গেছে, আধ ডজন মুরগির ডিম কিনতেই সমস্ত সঞ্চয় কাবার।

মা-হারানো ছেলে আদর দিয়ে মাথায় তুলেছেন—ভাস্করের সম্বন্ধে কোন কথা নীরদ গায়ে পড়তে দেবেন না। নাছোড়বান্দা হিমাদ্রি তবু শেষ একবার বললেন, ছেলেমানুষের হাতে এত টাকা পড়া ঠিক নয়, সে আপনি যতই বলুন।

হেসে উঠে নীরদ নিরুপায় ভঙ্গিতে বললেন, টাকার কপাল করে এসেছে, আমি কী করব ? আমার বাবা ছা-পোষা মধ্যবিত্ত ছিলেন, টাকার বড্ড কষ্ট পেয়েছি। ভাস্কর যে বড়লোকের বেটা।

গলা নামিয়ে আবার বলেন, আরও আছে। জানেন না আপনি, বাজি রয়েছে আমাদের মধ্যে। টাকা বন্ধ করলেই হার হয়ে যাবে আমার। বুড়ো বয়সে ছেলের হাতে হেরে মরতে বলেন ?

নাও, হয়ে গেল ! আজব বাপ, আজব ছেলে। আজ দাড়ি কাটছে, কাল এই ছেলে দেখতে পাবেন মানুষের মুণ্ড কেটে বেড়াবে।

সুখময়ের ব্যাপারটা ঐখানে শেষ নয়। বেশ খানিকটা ঘোঁট চলেছিল। পাড়ার অনেকেই তাকে জানে, ঘুঘুলোক বলেই জানে। এতকাল বাদে দাড়িবিহীন হয়ে বেড়াচ্ছে—এই নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ হতে হতে বৃত্তান্ত ছড়িয়ে পড়ল।

সিতাংশুই একদিন কথাটা পাড়ল : তোমার বদনাম রটেছে দাড়ি কাটার ব্যাপার নিয়ে।

কারা রটাচ্ছে, নাম বলে দাও—

মাধব সেখানে। উৎকণ্ঠিত হয়ে সে 'না' 'না' করে উঠল : বোলো না, কক্ষনো না। মিথ্যে তো বলে না কেউ। সুখময় মানুষটা

খারাপ হতে পারে—তবু জাতে বামুন, বয়সও বিস্তর। নাম বলে দিক, আর তুমি কাঁচি নিয়ে দাড়ি কাটতে তেড়ে যাও।

মুখ টিপে হেসে সিতাংশু বলে, একটা নাম বলে দিতে পারি। শম্পা। ছি-ছি করছিল সে তোমার নামে।

মাধব হেসে উঠে বলে, বেশ হয়েছে। যাও তেড়ে এবারে কাঁচি নিয়ে।

ভাস্কর বলে, সব লড়াইয়ে এক অস্তোর খাটে না। যে ক'জন বেশি চেঁচামেচি করছে, নাম বলে দাও সিতাংশু। সত্যি বলছি, কাঁচি নিয়ে পড়ব না।

মাধব বলে, তা হলে বন্দুক নিয়ে পড়বে। তা-ও পারো তুমি। কী যে পারো না, সেটা জানি নে বাপু।

ভাস্কর বলে, বন্দুক নয়, কিছুই নয়—একটা আলপিন অবধি হাতে নিচ্ছি নে। কারো গায়ে আঁচড়টি পড়বে না। অহিংস আমল যে এটা—আমায় যার জন্য মেটালার্জি ছেড়ে কেমিক্যাল-ইঞ্জিনীয়ারিং ধরতে হল।

চাপচাপিতে বলতে হল পাঁচ-সাতটা নাম। বেশির ভাগই ভাস্কর চেনে। কথা রাখল সে সত্যি। কয়েকটা দিন কাটল, গণ্ডগোল কিছুমাত্র নেই।

সিতাংশুকে ভাস্কর জিজ্ঞাসা করে, কি বলছে এখন সেই মানুষগুলো?

চুপচাপ। তাই তো অবাক লাগে—

নিয়মই এই, অবাক হবার কিছু নেই।

রহস্যময় হাসি হাসে ভাস্কর। বলে, ঘাঁটা দিয়ে দেখো তো তাদের—এখন কি বলে আমার সম্বন্ধে।

সিতাংশু বলে, তা-ও হয়েছে। কিছুই বলে না দেখে, আমি দাড়ি-কাটার গল্প জুড়ে দিলাম। দেখি কানেই নেয় না কেউ। স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা করি, কাজটা ঠিক হল কি? হুঁ-হাঁ করে সরে [illegible]না।

ভাস্কর হেসে বলে, কিন্তু উত্তরটা চাই যে আমার। আরো কিছু দিন যাক—জিজ্ঞাসা কোরো, ভাস্কর হালদার লোকটা কেমন ?

ক'দিন পরে সিতাংশু নিজেই এসে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে : কী মন্তোর জানো তুমি বলো।

সহাস্যে ভাস্কর বলে, কি হয়েছে ?

তোমার নিন্দে না করে জলগ্রহণ করত না, তারা এখন শতমুখ তোমার প্রশংসায়।

মন্তোর কিছু নয়, মাংসখণ্ড। কুকুরের মুখে মাংসখণ্ড ফেলে ঘেউ ঘেউ বন্ধ করে, সেই জিনিস। মাংসখণ্ড নয় রে, টাকা। সেই যে বলে, দুনিয়াদারি ফাঁকা সারবস্তু টাকা—তাই। আগে যাচ্ছে-তাই করে বলেছে, সরাসরি উল্টো রকম বলতে লজ্জা-লজ্জা করত। সেজন্য এদিকে নয় ওদিকেও নয় এমনিভাবে ছিল কয়েকটা দিন। আরও কিঞ্চিৎ ছুঁড়ে দিলাম, লজ্জাটজ্জা গিয়ে পুরোপুরি এখন আমার।

এমনি গল্প অনেক আছে। মিথ্যে গল্পও বিস্তর। তবে সুখময়েরটা সত্যি, যেহেতু সিতাংশু নিজে দেখেছে। বাপ নীরদবরণ মানা করবেন কি—হাসেন মৃদু মৃদু, উপভোগ করেন। টাকা চাইলে কোন দিন 'না' বলেন না, না চাইলেও দেন। নীরদের মামার বাড়ি পাড়া-গাঁয়ে—বড়মামি এককাঁড়ি তেঁতুলবীচি দিয়েছিলেন, শিশু নীরদ তাই দিয়ে টাকা-টাকা খেলতেন। নীরদ তেঁতুলবীচি কোথা পাবেন, আসল টাকাই দিয়ে আসছেন ছেলের খেলার জন্য।

ভাস্কর একদিন প্রশ্ন করেছিল : এত টাকা পাও কোথায় বাবা ?

রোজগার করি।

বিশ্বাস হয় না। রোজগারের গোণাগুণতি থাকে, সীমা থাকে একটা। তোমার তা নয়, পকেটে হাত ঢুকিয়েই তো মুঠো করে বের করো। এক মুঠোয় হল না তো দু'মুঠো। তাতেও হল না তো আবার—

প্রচুর টাকা আছে, সম্পদের মধ্যে ডুবে রয়েছেন, এমনি কথা শুনতে নীরদের ভাল লাগে। এই বড় দুর্বলতা—এরই জন্যে জীবনপাত করে এসেছেন। সকৌতুকে তিনি ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। উৎসাহ পেয়ে ভাস্কর বলে, বাক্স খুললে দেখতে পাই গোছা-গোছা পাঁচটাকা দশটাকার নোট, সিন্দুক খুললে দেখি একশ টাকার নোটের তাড়া। এত টাকা রোজগারে হয় না, টাকা বানাও তুমি।

যেন বিষম ভয় পেয়েছেন এমনিভাবে নীরদ বলেন, সর্বনাশ, টাকা জাল করি তাই বুঝি বলতে চাও? তোমার বাবা জালিয়াত? শুনলে যে পুলিশে ধরবে।

জালিয়াত কেন হবে?

ভাস্করের কণ্ঠ গভীর হয়ে ওঠে: আমার বাবা ঋষিতপস্বী, আমার বাবা দেবতা। মন্ত্রোরে তিনি টাকা করেন, যত ইচ্ছে করতে পারেন। দেবতার সঙ্গে লড়ে পারব কেন? এত খরচা করেও শেষ হয় না। হেরে হেরে ভূত হয়ে যাই।

তিনটে বছর অদর্শনের পর সেই বাপ আজ আলাদা এক মানুষ। মুখে বিষাদের মলিন ছায়া—কত হাসছেন, হাসাচ্ছে ভাস্কর অহরহ, কিন্তু মুখের উপরের ছায়া নড়ে না।

বিদেশ থেকে ফিরে ঘরে পা দিয়েই বাপের মুখের কথা শুনল: বুঝি হেরে গেলাম! হারবার কথা নীরদবরণ প্রথম বললেন—যৌবনে নয়, প্রৌঢ়কালে নয়, এই শেষ বয়সে এসে। তারপরে সবিস্তারে কথাবার্তা হয়েছে। নীরদ বললেন, সরকারি নিয়মে পঞ্চান্ন বছরে অবসর নেয়, আমার ষাট হয়ে এলো। আমার জায়গায় নতুন ম্যানেজিং এজেন্ট তুমি। ছুটি আমার—কাজকর্ম যা কিছু শুধু শ্রীগোপালকে নিয়ে।

ভাস্কর বলে, ছুটি মঞ্জুর। কাল থেকেই। বড়লোকের ছেলে

হয়ে আছি—নিজে এবারে বড়লোক হই। সবুর সইছে না আমার।

বলল ঠাট্টার ঢঙে, চিরকাল যেমন বলে আসছে। নীরদবরণের বড় ভাল লাগে। দ্বিধা নেই এক বিন্দু, কাজের জন্য তৈরি। বুদ্ধি আছে, শিক্ষা আছে। আর আছে বিদেশের অভিজ্ঞতা—নীরদের যেটা ছিল না।

স্নেহকণ্ঠে নীরদ বলেন, বাস রে, এতবড় দায়িত্বের কাজ—বলি, জিনিসটা জেনেবুঝে নিতে হবে তো ?

ভাস্কর ফুৎকারে উড়িয়ে দেয় : কাজ তো ভারি! কী কাজ করো তুমি, জানতে বাকি নেই। ডজন দুই-তিন নাম সই করা দিনের মধ্যে—তার আবার জানবার বোঝবার কি আছে ? কাল নয় তো কবে থেকে হবে, অ।.।য় পাকা-কথা বলে দাও।

এগ্রিমেণ্টে অবশ্য আছে, আমার জায়গায় আমারই মনোনীত লোক বসাব ডিরেক্টর-বোর্ড আপত্তি করতে পারবে না। তা হলেও মীটিং চাই—মীটিং-এ রেজল্যুশন পাশ করিয়ে নিতে হবে।

ভাস্কর বলে, করে ফেল মীটিং।

তুমি চেয়ারম্যানের বাড়ি উঠেছিলে। ডিসেম্বরের আগে তাঁর আসা ঘটবে না, তুমিই তো বললে। এ মীটিং মল্লিক সাহেবকে বাদ দিয়ে হতে পারে না।

অধীর কণ্ঠে ভাস্কর বলে, সে আমি জানি নে বাবা। মীটিং যবে হয় হবে, আমি কাল থেকেই বসব। একবার গিয়ে তুমি কেবল সইগুলো সেরে আসবে।

করতে হল তাই। বাপের চোখে-মুখে ক্লান্তি ফুটেছে, বিশ্রাম তাঁকে নেওয়াবেই। পরের হপ্তা থেকে ভাস্কর ম্যানেজিং এজেণ্টের চেয়ারে বসছে। আর একটা চেয়ার পাশে—নীরদবরণের। কোন একসময় তিনি গিয়ে একটু বসেন, পরামর্শ দেন দরকার মতো। কাগজপত্রে সই তাঁকেই করতে হয়, এজেন্সি যখন তাঁর নামে রয়েছে।

॥ চার ॥

হিমাদ্রি এই সময়টা কলকাতায়। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড নিয়ে কী সব গোলমাল, তার ফয়শালা করে যাবেন। এসেছেন তা মাসখানেক হয়ে গেল, ভাগনে সিতাংশুর কোয়ার্টারে আছেন। শম্পাও এখানে থাকে—এম-এ আর আইন পড়ছে। ঐ দুটো শেষ করে তারপর লক্ষ্ণৌয়ে বাবা-দাদাদের কাছে যাবে, কিম্বা প্রজাপতি মুখ তুলে চান তো শ্বশুরবাড়ি।

ভাস্কর ফিরে আসার পর নীরদের কাছে হিমাদ্রি জোর তাগিদ লাগিয়েছেন: হয়ে যাক এইবারে। আর দেরি কেন?

নীরদও বলেন, হোক না—

ঠিক এমনি উত্তর-প্রত্যুত্তর বছর দশেকের মধ্যে অনেকবার হয়ে গেছে। শম্পা মেয়েটিকে নীরদ এতটুকু বয়স থেকে দেখছেন। বড় ভাল লাগে। কোনদিনই ইতস্তত নেই তাঁর। প্রস্তাব তবু ঝুলছে। তা-ই বা কেন—কখনো কখনো কানে এসেছে, শম্পার বিয়ে অন্যত্র পাকাপাকি হয়ে গেছে—দু-এক মাসের মধ্যে হয়ে যাবে। শেষ অবধি ভেস্তে যায়। মেয়ের সম্পর্কে হিমাদ্রি অতিরিক্ত হিসাবি মানুষ বলেই। হিন্দুঘরের মেয়ে বিয়ের সাত-পাক একবার ঘুরে ফেললে উল্টো দিকে চোদ্দ-পাক দিয়েও বাঁধন খসানো যায় না—তখন ছিল এই। মনের নিক্তিতে পাত্রকে তৌল করে তিনি তাই একবার এগোন, একবার পিছিয়ে পড়েন।

হয়ে যেত সেবারেই—ভাস্কর শিবপুর কলেজে মেটালার্জিতে ঢুকেছে তখন। হলে মজার হত বেশ—কচি বর-কনে নিয়ে সেকালের মতন বিয়ে-বিয়ে খেলা। উৎকৃষ্ট চাকরির ব্যবস্থা করেছিলেন হিমাদ্রি, চাকরির প্রস্তাব নিয়ে নীরদের কাছে এলেন—

নাম-করা এক বিলাতি কোম্পানির মস্তবড় অফিসার হিমাদ্রি, কলকাতা শাখার সর্বময় কর্তা। কোম্পানির ইংরেজ ডিরেক্টর পৃথিবী পরিক্রমণে বেরিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। সেই সময় বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো হিমাদ্রির মনে কথাটা উঠল—সুযোগ এসেছে তো গুছিয়ে নিতে হবে।

সাহেবের কাছে গিয়ে বললেন, বিশ বছর বয়সে তোমাদের কাজে ঢুকেছি, কোম্পানির কাজে জীবনপাত করলাম। সম্পর্কটা যেন চিরকাল বজায় থাকে, এই দরবার।

অন্তরঙ্গ ভাবে পারিবারিক পরিচয় দিলেন: দুই ছেলে আর এক মেয়ে আমার। ছেলে দু-জনেরই ভাল ব্যবস্থা হয়ে গেছে, বড় ছেলের শ্বশুর লক্ষ্ণৌয়ে তাঁর অফিসে ঢুকিয়ে নিয়েছেন। দিব্যি উন্নতি করেছে তারা, তাদের জন্য উদ্বেগ নেই। আমি রিটায়ার করলে জামাই আমার চেয়ারে বসবে, এই হুকুম চেয়ে রাখছি।

সাহেব রাজি। বললেন, রিটায়ারের পরে কেন গাঙ্গুলি, তুমি থাকতে থাকতে জামাই এখনই তো ঢুকে পড়তে পারে। শিখিয়ে পড়িয়ে তাকে তৈরি করো। তারপর লণ্ডনের হেড-অফিসে কিছুদিন কাজ করে পাকা হয়ে আসবে, কোম্পানি খরচা দিয়ে নিয়ে যাবে। কলকাতায় হপ্তাখানেক আছি, তার ভিতরে জামাইকে নিয়ে এসো। চোখে দেখি, আলাপ-পরিচয় করি।

হাতে স্বর্গ পেলেন হিমাদ্রি, সাহেবকে শতকণ্ঠে ধন্যবাদ দিলেন। বলেন, জামাই পুরোপুরি হয়নি এখনো—হবু-জামাই, কথাবার্তা পাকা। অকাল চলেছে এখন—সামনের অঘ্রানে অর্থাৎ নভেম্বরে বিয়ে হয়ে যাবে। অত্যন্ত সৎস্বভাব বুদ্ধিমান কর্মঠ ছেলে, দেখে তুমি খুশি হবে সাহেব।

গুণাবলীর ফিরিস্তি দিয়ে এলেন, কিন্তু জামাইয়ের সাব্যস্ত নেই তখন অবধি। তিনটে ছেলে মনে মনে আঁচ করেছেন, তার ভিতর থেকে দেখেশুনে বাছাই করবেন একটি।

কিন্তু সময় এখন তো একটি মাত্র হপ্তায় দাঁড়িয়ে গেল। কাছাকাছি নীরদবরণ আছেন—পুরানো জানাশোনা, ভাগনে সিতাংশু পাত্রের অভিন্নহৃদয় বন্ধু—হিমাদ্রি তাঁর বাড়িতেই সর্বাগ্রে ছুটলেন।

কৃতিত্ব-গৌরবে ফেটে পড়ছেন হিমাদ্রি। গোড়ায় একটু ভূমিকা করেন: সাদা চামড়ার অধীনে কাজ করা কত সুখ বুঝে দেখুন। গুণের কদর বোঝে ওরা, কাজের মানুষের খাতির করে। নিজেদের শালার ছেলে পিসির বেটা নেই তো, সেজন্য ন্যায়বিচার পাওয়া যায়। নইলে ধরুন, এককোঁটা ছেলে ভাস্কর, অভিজ্ঞতা কিছুই নেই—অতবড় চাকরিতে এক কথায় তাকে বসিয়ে দিচ্ছি।

নীরদবরণ কোনরকম মন্তব্য করেন না, নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছেন।

আদ্যোপান্ত শেষ করে হিমাদ্রি বলেন, সাহেব নিয়ে যেতে বলেছে। একটুকু চোখে দেখবে, আলাপসালাপ করবে। পাঁজিতে ভাল যোগ-টোগ দেখে পরশু-তরশুর মধ্যে যেদিন হোক সঙ্গে করে নিয়ে যাই। ওর কলেজে একটা খবর পাঠিয়ে দিন, বাড়ি চলে আসুক।

নীরদ বললেন, ভাস্কর যাবে না।

অবাক হয়ে হিমাদ্রি তাকিয়ে রইলেন। পরক্ষণে মুখে হাসি ফুটল।

ঘাবড়াবার কিছু নেই। যা ছেলে আপনার, এক দেখাতেই মাত করে আসবে। তা ছাড়া আমি তো যাচ্ছি, কথা সঙ্গে সঙ্গে আদায় করে আনব। অতবড় কোম্পানির ডিরেক্টর হয়েও যে কী খাতিরটা করছেন, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

নীরদ হেসে বলেন, চাকরি করবে না আমার ছেলে।

বলেন কি! জগৎজোড়া এদের কাজকারবার—অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট আসবে খাস লণ্ডন থেকে। আই-সি-এস-এর মতন এ চাকরিও স্বর্গে ফলে, বলতে পারেন।

তবু নীরদ হাসিমুখে ঘাড় নাড়ছেন।

হিমাদ্রি বিরক্ত হয়ে বলেন, চাকরি করবে না, মানেটা কি? ধরুন

ডিভিসন্যাল কমিশনার করে দিল। কি হাইকোর্টের চিফ-জাস্টিস। সে-ও তো চাকরি।

নীরদবরণ বলেন, তবু করবে না। চাকরি মানেই চাকরগিরি। আমি নিজে যা কখনো করতে যাইনি, ছেলেকে তার মধ্যে দিতে যাব কেন?

উৎসাহ চুপসে গেল হিমাদ্রির। মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে তিক্ত কণ্ঠে বলেন, ছেলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে যাবে বুঝি? পারবে মাসে-মাসে হাজার টাকা রোজগার করতে?

সেই সময়টা সোনার বাংলা স্টীল কোম্পানিতে তালা পড়েছে। হিমাদ্রি সকল খবর রাখেন, সেই বিপর্যয়ের কথাটা ঠেস দিয়ে বলা আর কি!

তবু নীরদের কুণ্ঠাহীন জবাব: হাজার কি বলেন, হয়তো বা দশ-টাকাও পাবে না। ছেলে আমার শুধুমাত্র রোজগার করবে, আর পরিবার পালন করবে, এমন জিনিষ চাইনে আমি। ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে তুলবে সে—হয়তো সফল হবে, হয়তো হবে না। তবে এটা ঠিক, চাকরি সে কোনদিন করবে না। পারে তো অন্যদের চাকরি দেবে।

হিমাদ্রির দিকে চেয়ে আবার বলেন, আপনি বিরক্ত হচ্ছেন। কিন্তু মেয়ের বিয়ে এখনো তো হয়ে যায়নি। শম্পা-মাকে ভাল লাগে, সেজন্য কোনদিন কিছু বলে থাকতে পারি। সেই কথা ধরে থাকবার কি আছে? এতবড় চাকরির লোভ অনেক বাপই ছাড়তে পারবে না—তাদেরই কারো একটা সৎ ছেলে দেখে নিন। ঝুঁকির মধ্যে কি জন্য যাবেন? আপনার সঙ্গে আমিও গিয়ে সেই পাত্র আশীর্বাদ করে আসব।

এর পর আর একটু বসে একথা সেকথা বলে হিমাদ্রি উঠে পড়লেন। আর যে দুটি পাত্র ভেবে রেখেছেন তাদের খোঁজ নিয়ে দেখলেন, একটি টাইফয়েডে শয্যাশায়ী, অন্যটি বাপের সঙ্গে কলহ করে

বাক্স ভেঙে টাকা নিয়ে পিঠটান দিয়েছে। সপ্তাহ অন্তে ডিরেক্টর সাহেব কলকাতা ছাড়লেন, এতবড় সুযোগ মুঠোর মধ্যে এসে ফসকে গেল।

নীরদের সঙ্গে হিমাদ্রির দেখাসাক্ষাৎ পরেও অনেকবার হয়েছে। কথাবার্তাও না হয়েছে এমন নয়, কিন্তু ভাসা-ভাসা রকমের। শম্পার বিয়ের প্রসঙ্গ আর তুলতেন না। ভাস্করের সম্বন্ধে আগ্রহ একেবারে ঠাণ্ডা। চিরজীবন চাকরি করে আসছেন—ঐ জিনিষটাই বোঝেন ভাল। মাসান্তে নির্ঝঞ্ঝাট বাঁধা-মাইনের মোটা টাকা—এ জিনিষ অবহেলা করে যারা অনিশ্চিত পথে হাতড়ায়, তাদের বুদ্ধির তিনি তারিফ করেন না। নতুন নতুন পাত্রের খবরাখবর নিচ্ছেন। সাহেব বলে গিয়েছেন, সামনের শীতকালে আবার আসবেন ইণ্ডিয়ায়। যদি কিছু হবার হয় সেই সময়। অতএব তাড়াতাড়ি নেই, ধীরে সুস্থে পাত্র খোঁজা চলেছে।

শেষ পর্যন্ত কোন-কিছুই হল না। সাহেব আর ইণ্ডিয়ায় এলেন না, শীতকালের আগেই মারা গেলেন। সেই শোকে কলকাতার অফিস একদিন বন্ধ রইল। আরও কিছুদিন পরে হিমাদ্রি রিটায়ার করলেন—নতুন ডিরেক্টর নিয়মের উপর একটা মাসও এক্সটেনসন মঞ্জুর করল না। রিটায়ার করে কলকাতা ছাড়লেন। তারপর থেকে মন খানিকটা ঘুরেছে—চাকরি ছাড়া অন্য বৃত্তিতেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, সেটা কতক কতক বুঝতে শিখছেন।

স্টীল কোম্পানি তালাবন্ধ, কেমিক্যাল ওয়ার্কস চলছে ভাল—সেই অবস্থায় ভাস্কর বলেছিল, মেটলার্জি ছেড়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ঢুকে পড়ি তবে?

কিছু অপ্রতিভ হয়ে নীরদ বলেন, আমি তাই বলছি নাকি?

তোমার মন বলছে বাবা।

নীরদ হেসে ফেললেন: বিদ্যে তোমার অনেক হয়েছে—বইয়ের কথা শুধু নয়, মনের কথাও টপটপ করে পড়ে ফেল।

ভাস্কর বলেছিল, সকলের কেন হবে, শুধু আমার বাবার মন। তুমি যে ছেলেমানুষ বাবা, মন তোমার গঙ্গাজল। বলছিলে না, ডিগ্রি-ডিপ্লোমা চাকরির জন্য লাগে। যারা চাকরি করবে না, কাজ করবে, তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ হলেই হল, ডিগ্রির জৌলুষের দরকার নেই। হুকুমটা তবে কি এই দাঁড়াল না স্টীল কোম্পানির দায়ে মেটালার্জি পড়লে, কেমিক্যাল ওয়ার্কসের জন্যে কি করবে করো। হুকুমটা বুঝে নিয়ে নতুন সেসনের অ্যাডমিশন-ফরম আমি এনে রেখেছি।

হত তাই সত্যি সত্যি, বাপের ইচ্ছায় মেটলার্জি ছেড়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ভাস্কর ঢুকে পড়ত। কিন্তু লড়াই থেমে গেল আচম্বিতে। এবং সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াময় নানা আজব ব্যাপার ঘটতে লাগল। বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্যে সঙ্কীর্ণ ব্যবধান ঘুচে গিয়ে মানুষ এবারে বিশ্বনাগরিক—এমনি সমস্ত গাল-ভরা বুলি। ওদিকে আস্ত এক একটা দেশ ভেঙে টুকরো-টুকরো করছে—কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, জর্মনি। এবং আমাদের ভারতেও সেই ব্যাপার—এক বাংলা কেটে দুই বাংলা।

কেমিক্যাল ওয়ার্কস এবং স্টীল কোম্পানি দুটোই মোটামুটি ভাল চলছে, তবে উপর নীরদবরণ আর এক কারখানার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লেন। ভারত স্বাধীন হবার পর অনেক সাহেব দেশি মানুষের কাছে কাজকারবার বেচে দিয়ে সরে পড়েছে। তেমনি একটা জুট-মিলের ম্যানেজিং এজেন্সি জুটিয়ে নিলেন তিনি।

চটের বাজারে ভারত প্রায় একেশ্বর। জগৎজোড়া খদ্দের, কোটি কোটি বিদেশি মুদ্রা আসে। এ হেন ইণ্ডাস্ট্রির উপর কতবড় কঠিন আঘাত এসেছে, কারবারের ভিতরে ঢুকে পড়ার আগে নীরদরা পুরোপুরি বোঝেন নি। জলের দরে সাহেবরা ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছে—অকারণে নয়। হুগলী নদীর কিনারা ধরে যাবতীয় জুটমিল, আর উৎকৃষ্ট কাঁচা মাল ঢাকা-ময়মনসিং অঞ্চলে। দুটো আলাদা দেশ হয়ে গেল—গতিক হয়তো এমনি দাঁড়াবে, পাট অভাবে মিল বন্ধ এখানে, আর

খদ্দের অভাবে পাট গাদা হয়ে জমবে পূর্ববাংলায়। মাঝখান থেকে মজা লুটবে ডাণ্ডি, সস্তা দরে কাঁচা মাল কিনে বাজার দখল করে ফেলবে। হতে পারে এমনি অনেক-কিছু যদি না অধ্যবসায়ী মানুষরা এর মধ্যে এসে পড়ে।

জুট-মিলের বন্দোবস্ত নিয়ে নীরদবরণ কিন্তু একবিন্দু অনুতপ্ত নন। বিপদ দেখে রোখ আরও চড়ে উঠল। বিলাতি নাম ফেলে দিয়ে নতুন নামকরণ হল : সোনার বাংলা জুটমিল। হোক না খণ্ডিত বাংলা, সোনা ফলাবেন এখানেই।

হুকুমটা এবারে আর মনে মনে নয়। সোজাসুজি ভাস্করকে বললেন, জুট টেকনোলজি নিয়ে লেগে পড়ো। এমন শিল্প জখম হতে দেবো না। কাঁচা মাল এখানকার মাটিতেই ফলবে। পয়লা-নম্বরি পাট হবে না জানি, কিন্তু খারাপ পাট ভাল হয়ে যাবে মিলের ল্যাবরেটারিতে এসে। সোনার রং ধরবে। আঁশ ছিঁড়বে না। পাটের বিকল্প যে সব তন্তু, তার উপরেও গবেষণা হবে আমাদের মিলে।

বলেন, পাটের জিনিষ নিয়ে ডাণ্ডির আজ এত দেমাক, কিন্তু ইতিহাস জানো না। ভারতীয় পাটে বুনন হবে, সেই জিনিষ খদ্দেরে নেবে একসময় ভাবতেই পারত না ওরা। ডাণ্ডি গ্যারাণ্টি দিত, ভারতীয় পাটের একটি আঁশ পাবেন না আমাদের জিনিষে। পাশা উল্টে গেল আবার একদিন। সেই ডাণ্ডি জাঁক করে বিজ্ঞাপন ছাড়ে : পুরোপুরি ভারতীয় পাটে তৈরি জিনিষ, ভেজাল নেই। পশ্চিমবঙ্গের পাট দিয়েও ঠিক তাই হবে, বাণিজ্যের মোড় ঘুরিয়ে দেবো আমরা।

অতএব ভাস্কর পাটের নাড়িনক্ষত্র নিয়ে পড়ল। বিলাত গেল। বেলফাস্ট থেকে একেবারে হালের যন্ত্রপাতি আনার ব্যবস্থা করল। খদ্দেরের রুচি ও চাহিদা বুঝে এলো দেশে দেশে টহল দিয়ে।

·

দেশে ফেরার পরেই ভাস্কর একদিন সিতাংশুর কোয়ার্টারে

হাজির। নাকি, বড় দরকার সিতাংশুর কাছে। হতে পারে—কিন্তু দরকারের মানুষ শুধুই যে সিতাংশু, কে বিশ্বাস করবে? সিতাংশুরই বরঞ্চ এ সময়টা থাকার কথা নয়—ক্লাবে চলে যায়। আর শম্পা এমনি সন্ধ্যায় সুনিশ্চিত পড়াশুনো নিয়ে থাকে। শম্পা এরোড্রোমে পর্যন্ত গেল না তার সম্বন্ধে বিশ্রী বৃত্তান্ত ভেবে নিয়ে—শোধ নেবে আজ তার, শম্পাকেও কিছু শুনিয়ে যাবে।

ললিতা মামুলি দু-চার কথা বলে কাজের দোহাই পেড়ে উপরে উঠে গেল। ড্রইংরুমে ভাস্কর আর শম্পা।

ভাস্করের সর্বপ্রথম কথা: শম্পা—তারপরে কী এখন তুমি? শম্পা গাঙ্গুলি? কি আশ্চর্য, শুনে গেলাম মজুমদার হয়ে যাচ্ছ। সেই তিন বছর আগে বাইরে যাচ্ছি যখন।

শম্পা হারবার পাত্র নয়। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কৃত্রিম হতাশার ভঙ্গিতে বলে, পাকা-কথা হয়েও ফেঁসে গেল। ছেলেটা ভাল, দেখতে রাজপুত্তুর। বাপ-ছেলে দু'জনাই এডভোকেট। বাপের খুব ভাল প্র্যাকটিশ। ছেলে নিজে এলো একদিন—দেখেশুনে আলাপ করে গেল। আমায় নাকি ভারি পছন্দ তার। শুনে তো আহ্লাদে লাফাচ্ছি আমি।

ভাস্কর বলে, হল না কেন?

আমার অদৃষ্ট! বাবার দোষ ঠিক নয়, দোষ কারে দিতে হয়তো বাবার কোম্পানির সেই ডিরেক্টরের। কোন শীতকালে আর সে ইণ্ডিয়ায় আসবে না বাবার জামাইকে চাকরি দিতে। বাবা হিসাব করতে লাগলেন: বাপের প্র্যাকটিশ ভাল বলে ছেলেরও যে তাই হবে, তার কি মানে আছে? আর একটা নতুন সম্বন্ধও এসে পড়েছে ইতিমধ্যে—

সকৌতুকে ভাস্কর বলে, সে পাত্রটি কেমন?

ভাল। এডভোকেট তো পথে-ঘাটে গড়াগড়ি যায়, এ হল এটর্নি। বাবা বললেন, যখন এটর্নি হয়ে বসেছে, রোজগারের মার

নেই। সম্পত্তিশালী বেওয়া-বিধবা মক্কেল মেরে এটর্নির পয়সা। বেওয়া-বিধবার কোনদিন অভাব হবে না, এইখানে তুই মন ঠিক করে ফেল শম্পা। কি করব—পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ, এডভোকেট ছেড়ে নিজেকে তখন এটর্নির পাশে মনে মনে দাঁড় করাই। এটর্নিও নিজে দেখতে আসছে। আলাপটা কি ভাবে করব, সর্বক্ষণ তাই মনে মনে মক্স করছি—

হাসিমুখে ভাস্কর শুনে যাচ্ছে।

শম্পা বলে, কিন্তু ভালর উপরেও ভাল আছে। বাবার মত ঘুরে যায় আবার। বললেন, মন খুঁত খুঁত করছিল আমার। বেওয়া মেরে পয়সা করবে, কিন্তু নিজেও তো মরে যেতে পারে। তাহলে তোর পথে বসবার গতিক। সাত নয় পাঁচ নয়, একটি মেয়ে তুই আমার—দেখেশুনে এমন ঘরে কী করে দিই? এবারে যা পেয়েছি—দশ দশ খানা বাড়ি তাদের শহরের উপর। মাস অন্তে বাড়িভাড়ার মোটা টাকা আপনাআপনি এসে যায়। নড়ে বসবার গরজ হয় না। নড়েও না সে বাড়ির কেউ। বাড়িসুদ্ধ মরে উজাড় হয়ে গেলেও ভাড়ার টাকার মার নেই। কি করি ভাস্কর-দা, বাবার ইচ্ছা বুঝে মনে মনে নিজেকে তখন বাড়িওয়ালার পাশে দাঁড় করাই।

কথার ধরনে ভাস্কর খিল খিল করে হেসে ওঠে।

শম্পা এইবারে খোঁটা দিয়ে বলে, অন্যে হাসুক, আপনি কি জন্যে হাসবেন শুনি? আপনারই মতন তো। হতে চাইলেন সাহিত্যিক। কোমর বেঁধে কলম নিয়ে বসলেন, লিখলেনও অনেকগুলো। পিতার ইচ্ছায় কলম ছেড়ে একেবারে লোহালক্কড়ের লাইনে। লোহালক্কড় ছেড়ে তারপরে—

কথা শেষ করতে না দিয়ে ভাস্কর বলে, তাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নেই। সাহিত্যের সরল সড়ক পেয়ে গেছি। বোকারাই খাটতে যায়। বেশির ভাগই তো এই—কোন-কিছু না লিখে সাহিত্যস্রষ্টা। তেমনি আবার কোন কিছু না পড়েই সাহিত্যদ্রষ্টা—সব সাহিত্যিকের

মাথার উপর চূড়ামনি হয়ে যাঁদের অধিষ্ঠান। কিন্তু আমার কথা থাক শম্পা। এ সময়টা কার পাশে মনে মনে দাঁড়াচ্ছ, জেঠাবাবুর শেষ হুকুমটা কি—তাই বলো।

শম্পা হেসে বলে, হায় অদৃষ্ট! বেহায়া হয়ে তা-ও আমায় নিজের মুখে বলতে হবে।

চা ঢালছিল ভাস্করের পাশে দাঁড়িয়ে। বলে, হুকুম এবার এইখানে দাঁড়ানোর। ঘুরে ফিরে পুনর্মূষিক—আরম্ভে ঠিক যে জায়গাটায় ছিলাম।

কলকণ্ঠে শম্পা বলতে লাগল, সে-ও ভারি মজা কিন্তু। আপনার ফেরার কয়েকটা দিন আগে কাকাবাবুর সঙ্গে গিয়ে বাবা মিলের ভিতরটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। অত বড় ব্যাপার ধারণা ছিল না। বাসায় এসে আমার উপর ধমকানি: মাঝের যত সম্বন্ধ বাতিল। সকলের গোড়ায় যে কথাবার্তা, সেইখানে হবে। পুরানো বন্ধুর কাছে খেলো হতে পারিনে তোর জন্যে। মন ঠিক করে ফেল, ভাস্কব ফিরে এলে আর দেরি করব না।

চায়ের বাটি হাতে তুলে দিয়ে শম্পা বলে, তা-ও শেষ নাকি? কোথায় কোন গণ্ডগোল পাকিয়ে ফেলেছেন, খবর চলে এলো। বাবার মুখ গম্ভীর— নতুন হুকুম বেরিয়ে পড়ে আর কি! সিতাংশু-দাদা উড়ে গিয়ে আপনাকে টেনে আনল, সাক্ষি দিয়ে ফাঁড়া কাটিয়ে দিল।

ভাস্কর বলে, আবার নতুন বিপদ হতে কতক্ষণ? ধরো, মিলে আমাদের লালবাতি জ্বলল। জেঠাবাবু হুঙ্কার ছাড়বেন, মন সরিয়ে নে শম্পা—

শম্পা বলে, ভয় দেখাবেন না বলছি। খাতির করে চা-টা দিচ্ছি, শোধ বুঝি তার?

এমনি সময় হিমাদ্রি ফিরলেন। বেড়াতে বেরিয়েছিলেন সেই বিকালবেলা। নিজেই বলছেন, বেড়াতে বেড়াতে হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীটে তোমাদের পুরানো বাড়ি গিয়েছিলাম বাবাজি।

ভাস্করে শম্পায় চোখোচোখি, মুখ টিপে হাসে দু-জনাই। এত বড় শহরে হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীটের চেয়ে বেড়ানোর ভাল জায়গা মিলল না। অর্থাৎ জোরদার পয় চলেছে এখন ভাস্করের।

বলছেন, পরশুদিন লক্ষ্ণৌ চলে যাচ্ছি, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে এলাম। তুমি জানো না কতদূর আমরা ঘনিষ্ঠ। এক ইস্কুলে পড়েছি। সেই সব পুরানো গল্প হল। হাঁটতে বেরুলেন আমায় সঙ্গে নিয়ে। সেই লেক অবধি। লেকে গিয়েও চক্কোর দিচ্ছেন। আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট, কিন্তু হাঁটেন ছেলেছোকরার মতো। আমি পিছনে পড়ে যাই। দেহটি খাসা রয়েছে। ধার্মিক মানুষ, নিয়মের মধ্যে থাকেন, কেন থাকবে না ?

জুতো খুলে স্লিপার পায়ে ঢুকিয়ে সামনাসামনি বসে পড়লেন। বলেন, ছাতের উপরের ঠাকুরঘরও দেখালেন আমায়। পাশাপাশি দুটো—জামাইয়ের আর শাশুড়ির। পুণ্যের আবহাওয়া, মন ভরে যায়। কাজকর্মের দায়িত্ব তোমার উপর ছেড়ে পুরোপুরি এবার ভগবানে মতি দিয়েছেন। উচিত তো তাই। আমাদের লক্ষ্ণৌর বাসায় জায়গার টানাটানি, তার উপর বাচ্চাগুলো কুরুক্ষেত্তোর করে বেড়ায়। নিরিবিলি একটু স্থির মনে বসব, উপায় নেই। দেখি, যাবার সময় কালীঘাট থেকে মা-কালীর পট একটা নিয়ে যাব।

শম্পাকে বলেন, তোর বউদি কোথায় রে ? দেখা হয়েছে ভাস্করের সঙ্গে ? খানসামাকে বল এইখানে আমায় চা দিয়ে যেতে। শুধু এক কাপ চা, অন্য কিছু নয়।

শম্পা-ই রান্নাঘর থেকে চায়ের পট এনে বিনি চিনির চা বানিয়ে দিচ্ছে।

হিমাদ্রি বলেন, তোমার কথাও হল বাবাজি। মিলের সর্বেসর্বা তুমিই তো এখন। শুনে বড় আনন্দ হল।

ভাস্কর হেসে বলে, বাবা বলেছেন তো! বাবা তুলে ধরেন অমনি আমায়। আমার কী ক্ষমতা! পরখ করে দেখছেন, আমায় দিয়ে

কতদূর কি হতে পারে। পার্ক স্ট্রীটের কোয়ার্টার ছেড়ে এসেছেন, তা বলে কাজ ওঁকে ছাড়েনি।

তৃপ্ত হলেন হিমাদ্রি। ছেলে বাপকে এত দূর মান্য করে—বাপের উপর এমন নির্ভরশীল। বয়সে বুড়িয়ে এসে এসব শুনতে বেশ ভাল লাগে।

বললেন, তা বললে কি শুনি। কাজের ছেলে তুমি বাবা, মিলের খোল-নলচে বদলে ফেলছ, বাজে লোক কমিয়ে দেবে। শুনলাম, বেশ হৈ-চৈ লেগেছে তাই নিয়ে—

ভাস্করের অবাক লাগে। অতিশয় গুহ্য খবর। গৌরদাস গোল পাকাচ্ছে বটে, কিন্তু বাইরের কেউ কিছু জানে না। সে জিনিষও হিমাদ্রি কেমন করে বের করে ফেলেছেন।

কৈফিয়তের ভাবে ভাস্কর বলে, নতুন নতুন হাই-স্পীড মেশিন এসে পড়ছে, চালু হয়ে গেলে চার-পাঁচটা লুম স্বচ্ছন্দে এক-হাতে চলবে। লোক ফালতু হয়ে যাবে, সেই ওদের ভয়। রাখা যেত লোকগুলোকে না হয় কিছু দিন। কিন্তু ব্যাচিং ডিপার্টমেণ্টের খরচা ওদিকে তিন-চার গুণ বেড়ে যাচ্ছে—রাসায়নিক ক্রিয়ায় নিরেশ মাল মজবুত হবে, সোনালি রং ধরবে। না করে উপায় নেই—প্রতিযোগিতা সাংঘাতিক, পূর্ব-বাংলায় বড় বড় মিল বসে যাচ্ছে। কিন্তু একদল আমাদের উঠে পড়ে লেগেছে—নতুন মেসিন কিছুতে চালু হতে না পারে। তার মানে ইণ্ডাস্ট্রি ধ্বংস হয়ে যাক, সেই ওদের মতলব।

হিমাদ্রি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। আগ্রহ দেখে ভাস্করের হাসি পায়: কন্যাদায় নির্ঘাৎ এবারে মোচন করবেন। ভাস্করকে একদা বাতিলই করে দিয়েছিলেন—বড্ড রোখ পড়েছে এবার। কারণ হল, বিলেত থেকে নতুন চাকচিক্য নিয়ে অত বড় মিলের কর্তা হয়ে বসেছে।

প্রশ্নের আর শেষ নেই, সীমা নেই। ভাস্কর এখন যা মুখে আসে

এলোমেলো ভাবে বলে যায়। রেহাই পেলে বাঁচে। শম্পা উপরে উঠে গেছে, বাণিজ্যের কচকচি কতক্ষণ ভাল লাগে মানুষের!

এরই হপ্তাখানেক পরে রবিবার সকালবেলা শম্পা পার্ক স্ট্রীটের বাড়ি এলো। যুক্তকরে নিবেদন করে: ভয়ে বলি, না নির্ভয়ে বলি?

আসবে শম্পা, ভাস্কর জানে। সিতাংশুর কাছে শুনেছে। সহাস্যে বলে, গো-ব্রাহ্মণ দূত আর স্ত্রীলোক অবধ্য। স্বচ্ছন্দে বলে যাও।

জন্মদিন আজ আমার। সামান্য স্ত্রীলোক, অতিক্ষুদ্র আয়োজন। বৃহৎ বনস্পতির কাছে এসে পড়েছি। পায়ের ধূলো—উঁহু, জুতোর ধূলো—তা-ও তো হয় না, গাড়ির ভিতরে আবার ধূলো কোথায়?

বনস্পতির পা থাকে বুঝি? সে পায়ে আবার জুতো! হল না শম্পা, তোমার উপমার গোড়া থেকেই গোলমাল।

খিল খিল করে শম্পা হেসে ওঠে: বাতলে দিন না আপনি। বিনয় করে যা-সমস্ত বলতে হয়।

ভাস্কর বলে, মানুষটা পাকড়েছ ভাল শম্পা। বিনয়ের অবতার যেন আমি—মুখে সর্বক্ষণ বিনয়ের তুবড়ি ফুটছে। বলাবলির দরকার নেই, ভাবে বুঝে নিয়েছি। বাবার ঐ যে আছেন ভাবগ্রাহী জনার্দন, আমিও তেমনি।

যাবেন কিন্তু। জরুরি কাজকর্ম নেই তো বিকেলবেলা? দেখে নিন, আপনি আবার ব্যস্ত মানুষ—

না গো, কাজ আবার কি!

সকাল সকাল চলে আসুন তবে। ধরুন ছ'টা—কি, সাড়ে-ছ'টা। ছোট্ট ব্যাপার—জন কয়েক আত্মীয়-আত্মীয়া আর কলেজের বান্ধবী ক'জন। জমিয়ে গল্প করা যাবে, কেমন?

ভাস্করের ঘোর আপত্তি: ছ'টা যে বড্ড দেরি। পাঁচটায় গিয়ে আমি হাজির হব।

পরমোৎসাহে আরও জোর দিয়ে বলে, খাসা হবে শম্পা। ভিড়

জমেনি তখন—একলা তুমি। তুমি আর আমি দু-জনে একা-একা থাকা যাবে বেশ খানিকক্ষণ।

আনন্দে বুঝি বাতাসের উপরে ভাসতে ভাসতে শম্পা বাসায় ফিরে গেল।

বিকালে পাঁচটার আগে থেকেই তৈরি। তৈরি যার জন্যে, সে মানুষের কিন্তু দেখা নেই।

ছয় সাত সাড়ে-সাত বেজে গেল। যারা সব এসেছিল একে একে চলে গিয়ে ড্রইংরুম খালি। শম্পার কান্না পাচ্ছে—মানুষটির মুখেই মিষ্টিকথা শুধু। লজ্জা-অপমান গায়ে না মেখে শম্পা টেলিফোনে ধরবার চেষ্টা করে। বেজেই চলে ফোন। তিন-চার বার ফোন করেছে, এক অবস্থা।

টং টং করে আটটা বাজে, সেই সময়টা ভাস্কর নয়—এলো মাধব। উৎসব শেষ হয়ে গেছে, বাড়ির লোক সব উপরে।

খবর পেয়ে শম্পা নেমে এসে বলে, খবর কি মাধব-দা?

ও-বাড়ি যাতায়াতে মাধবও শম্পার মাধব-দা হয়ে গেছে। মাধবের হাতে পরিপাটি প্যাকেট একটা। বলে, নাও গো দিদি, তোমার জন্যে।

শম্পা ছুঁয়েও দেখে না। জিজ্ঞাসা করে, বিলেত-ফেরা সাহেবের খবর কি—তোমার দাদাভাইয়ের?

পাঁচটার সময় কাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। আমি মনে করিয়ে দিলাম, শম্পা-দিদি এত করে বলে গেছে। তা বলল, আমায় দিয়ে কি হবে? জিনিষ পৌঁছে দিস, তাতেই হয়ে যাবে।

অনেক দামের জিনিষ বোধহয়, সেইজন্যে বলেছেন।

বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে সহজ হাসি হেসে শম্পা আবার বলে, বোসো মাধব-দা। আসছি আমি এক্ষুনি।

পাশের ঘরে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে মাধব বলে ওঠে, আরও আছে দিদি। সত্যিকার একটা ভাল জিনিষ।

ফতুয়ার পকেট থেকে সুদৃশ্য কৌটো বের করল। হাসিতে দু-পাটি দাঁত মেলে কৌটো খুলে এগিয়ে ধরে : চেয়ে দেখ—

কানের গয়না, মুক্তা বসানো। যেতে যেতে শম্পা একবার আড়চোখে তাকিয়ে যায়। দামি জিনিষ, সন্দেহ কি!

প্লেট ভরতি খাবার এনে নিচু-টেবিলে পরম যত্নে সে সাজিয়ে দেয় : খাও মাধব-দা।

পরিতুষ্ট মাধব একটু না-না-করে : বুড়ো মানুষের জন্যে এত কেন আনলে?

একটা জিনিষও পড়ে থাকবে না, সবগুলো শেষ করে তবে ছুটি।

খেতে খেতে একবার মাধব মনে করিয়ে দেয় : জিনিষ পড়ে রইল দিদি, সামাল করে রাখ।

হাসিমুখে শম্পা তাড়া দিয়ে ওঠে : চুপ! খাওয়ার মধ্যে বক বক করলে হজম হয় না।

হাত-মুখ ধুয়ে মুখে একটা পান ফেলে জুতো পরতে পরতে মাধব বলে, কিছু বলতে হবে দাদাভাইকে?

ফেরত নিয়ে যাও তোমার দাদাভাইয়ের জিনিষ। বোলো, দোকানের শো-কেসে আরও বেশি দামের জিনিষ থাকে, কেউ ছুঁতে যায় না। না নিয়ে গেলে আমি কিন্তু রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেব মাধব-দা।

বলে মুহূর্তমাত্র দেরি না করে শম্পা ফর ফর করে উপরে উঠে গেল।

রাতটুকু কাটিয়ে সকালবেলা ভাস্কর চলে এসেছে। এসেই প্রশ্ন : রাস্তায় ছুঁড়তে যাচ্ছিলে, গয়নাটা পছন্দ নয় বুঝি!

শম্পা প্রথমটা হকচকিয়ে গেছে। বলে, অমন জিনিস অপছন্দ কেন হতে যবে?

কথাটা লুফে নিয়ে ভাস্কর বলে, ঠিক তাই। কোন গয়নাই কোন মেয়ে অপছন্দ করে না। ব্যাপারটা তাই ধরতে পারছি নে।

আমার জন্মদিনে চেয়েছিলাম আপনাকেই। নিজের বদলে জিনিষ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কী জানি, জিনিষই তো চায় মানুষে।

সকৌতুকে শম্পার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে ভাস্কর বলতে লাগল, বিয়ের নেমন্তন্নে ছেপে দেয়ঃ লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষম। তার মানে লৌকিকতা বলে একটি প্রথা আছে, ভুলবেন না সেটা ভদ্রজনেরা। চাকরির দরখাস্তের ফরমে দেখাদেখি আমরাও ছেপে দিইঃ ক্যানভাসিং নিষিদ্ধ। অর্থাৎ ঐ জিনিষটা বিস্মরণ হলে অদৃষ্টে অশ্বডিম্ব তোমার।

দৃষ্টান্ত আরও দিচ্ছিল, অধীর হয়ে শম্পা ফুঁসে উঠল ঃ যা চিরকেলে নিয়ম আপনার—কুকুরের মুখে মাংসখণ্ড। মাধব-দাকে দিয়ে মাংসখণ্ড পাঠিয়েছিলেন কাল।

ভাস্কর বলে, ছুনিয়ার আধাআধি তো ঘুরলাম। মাংসখণ্ডই ছুঁড়ে এসেছি। ফল অব্যর্থ—সকল ক্ষেত্রে। এদেশে-বিদেশে সব জায়গায় আমার পরখ করা আছে।

দূরদৃষ্ট আপনার, মাংসলোভী কুকুর ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না ছুনিয়া ঘুরে।

উত্তেজনায় কাঁপছে শম্পার কণ্ঠ। সকালবেলার খবরের কাগজটা সামনে। এইমাত্র পড়ছিল, চাঁদের উল্টো পিঠে রাশিয়া রকেট পাঠাচ্ছে। সেই উপমা মুখে এসে পড়েঃ চাঁদের উল্টো পিঠ আছে, মানুষেরও আছে। টাকার বাইরে যে ছুনিয়া, সেদিকে নজর যায় না আপনাদের।

গালি ভাস্কর একেবারে গায়ে মাখে না। হাসিমুখ। বলে, টাকাই শুধু আছে কিনা আমাদের। অন্য কিছু যে নেই।

শম্পা বলে, কেন থাকবে না? আছে টাকার অহঙ্কার।

ভাস্কর সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেয়ঃ ঠিক বলেছ। মোটমাট ঐ ছুটো জিনিষ। কাল রাত্রে মাধব-দা'র মুখে তাজ্জব এক তৃতীয় জিনিষ

শুনলাম। টাকার চেয়ে বড় নাকি একটি মানুষ—মানুষটির বিহনে টাকার জিনিষ রাস্তায় ছুঁড়ে দেওয়া যায়।

কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এলো। বলছে, এ জিনিষ আমার কাছে নতুন। সত্যিই জানা ছিল না। পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না বলে যাচাই করতে বেরিয়েছি।

মন-মেজাজ শম্পার আগুন হয়ে ছিল, সে আগুন মুহূর্তে নিভে যায়। এখন লজ্জা। কথা ফিরিয়ে নেবে কেমন করে?

তাড়াতাড়ি বলে, তাই বুঝি! এই কাগজেই খবর রয়েছে, এখানে না এসে সাহিত্য-পুরস্কারে সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন। বক্তৃতার মধ্যে সেখানে শতমুখে টাকার নিন্দে—

ভাস্কর আশ্চর্য হয়ে বলে, বটে, বটে!

ভাব দেখাচ্ছেন কিছুই যেন জানেন না। অথচ আপনারই মুখের কথা।

কাগজটা তুলে নিয়ে শম্পা দু-তিনটে লাইন গড় গড় করে পড়ে যায়: অর্থ প্রতিপত্তি রাষ্ট্রনেতৃত্ব সমস্ত ক্ষণজীবী—নিতান্তই তুচ্ছাতিতুচ্ছ কোন একটি সার্থক শিল্পসৃষ্টির তুলনায়।

অধিক পড়তে দেয় না ভাস্কর। হো হো করে হেসে ওঠে: রোসো রোসো। বক্তৃতায় আমি এইসব বলেছি—কী সর্বনাশ! এত সব শক্ত শক্ত কথা উচ্চারণ করে দাঁত দু-পাটি অটুট নিয়ে আসতে পেরেছি!

শম্পা বলে, ছাপার অক্ষরে রয়েছে—

সেই তো মজা। ঘটা করে সভার মধ্যে অর্থ জিনিসটাকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলে এলাম, মূলে কিন্তু অর্থেরই খেলা। দেশে কি জ্ঞানী-গুণীর আকাল হয়েছে যে আমায় ডাকে সাহিত্য-সভায় সভাপতি হতে। পুরস্কারের টাকাটা আমি দিয়েছিলাম—সেই মাংস ছোঁড়ারই ব্যাপার। অলিখিত বোঝাপড়া থাকে—সভাপতি আমি, সভাপতি-বরণ উপলক্ষে নানা বিচিত্র বিশেষণে ভূষিত করবে আমায় এবং বক্তৃতা লিখে টাইপ

করে রাখবে আমার জন্য। তা দেখ, বক্তৃতায় অত শক্ত কথা ঢুকিয়ে রেখেছে—খারাপ মতলব নিশ্চয়। পড়তে গিয়ে অপদস্থ হব, সবাই হাসবে। আমিও ঘড়েল তেমনি। এখান থেকে দু-লাইন ওখান থেকে চার লাইন পড়ে কাপি প্রেসকে দিয়ে এলাম। কাগজে বেরুনোই আসল।

কথার ভঙ্গিতে শম্পা হেসে হেসে খুন।

ভাস্কর বলে, বিশ্বাস করো, অনেক ইতস্তত করেছিলাম কাল। তোমার নেমন্তন্নে আসি, না সভায় যাই? সভার দিকেই শেষটা পাল্লা ঝুঁকল। সাঁতারের ক্লাবে সভাপতি হয়ে ওস্তাদ সাঁতারু খ্যাতি পেয়েছিলাম। হরিসভায় গিয়ে ভক্তিবারিধি খেতাব। আর্ট-একজিবিসনে গিয়ে চিত্ররসিক। তা ভাবলাম, সবগুলো গুণই প্রায় গেঁথে ফেলেছি—লিখে লিখে একদিন সাহিত্যিক হবার বড় বাসনা হয়েছিল। বিনা খাটনির সাহিত্যিক নামটা সভায় বসে স্বকর্ণে শুনে আসি। বললও ঠিক তাই সভাপতি-বরণে। হায় রে হায়, আমি হলাম সাহিত্যিক! টাকায় কী না হয়, দেখ শম্পা। টাকা ছুঁড়ব না তো কি!

শম্পার রাগ-অভিমান আর নেই। ঝিলমিল করছে মুখ আনন্দে। চা নিয়ে বসেছে দু-জনে, শুনছে ভাস্করের খাপছাড়া কথাবার্তা। ক্ষণে ক্ষণে খিল খিল করে হেসে ওঠে।

উঠবার মুখে ভাস্কর বলে, কাল আমার জিনিষ ফিরিয়ে দিয়েছ, আজ নিজে নিয়ে এলাম। দোকানের সে জিনিষ নয়। তার বদলে—

পকেট থেকে বের করল আংটি একটা। শৌখিন কেস নেই, কাগজে জড়ানো। বলে, হীরে নয়, মুক্তো নয়, সামান্য একটু সোনা। মীনা করে আমার নাম-লেখা—বাবা দিয়েছিলেন এক জন্মদিনে। পুরানো ক্ষয়া জিনিষ—দামের দিক দিয়ে তুচ্ছ। সে তোমারই দোষ শম্পা। মাধব-দা'র কাছে বলেছ, টাকাকড়ির চেয়ে মানুষটা আমি বড়। এমন কথা প্রথম এই কানে গেল।

আংটি মুঠোয় গুঁজে দিয়ে ভাস্কর গাড়িতে উঠে বসল।

॥ পাঁচ ॥

হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীটের পুরানো বাড়িতে নীরদ আবার গিয়ে উঠেছেন। আদিগঙ্গার একেবারে উপরে, অদূরে কালীঘাট। ছাতের উপর পাশাপাশি দুই ঠাকুরঘর—একটি তাঁর, একটি শাশুড়ি তারামণির। কাজের দায়ে পার্ক স্ট্রীটে মিলের বাড়িতে চলে যেতে হয়েছিল, শ্রীগোপালও গেলেন সঙ্গে। নীরদের ঠাকুরঘর তালাবন্ধ ছিল সেই থেকে। সে বাড়ি বড় শৌখিন, কেতাদুরস্ত চালচলনের মধ্যে তদগত হয়ে ঠাকুরের নাম করা অসাধ্য সে জায়গায়। নিজস্থানে প্রতিষ্ঠিত হলেন আবার, যেন মুক্তি ফিরে পেলেন। তবে পুরোপুরি নয়, নামে এজেণ্ট এখনও, মিলের অফিসে মাঝে মাঝে যেতে হয়।

মিলের গোলমাল দিনকে-দিন জমে আসছে। ভাস্কর উচ্চহাস্যে উড়িয়ে দেয়: কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লে হবেই তো গোলমাল। ঘরে দোর দিয়ে বসে থাক—অখণ্ড পরিপূর্ণ শান্তি।

নীরদকে বলে, বাবা তোমার মায়ার শরীর। কড়া হাতে রাস ধরা তোমায় দিয়ে হত না, কাজকর্ম টিকিয়ে টিকিয়ে চলত। কোম্পানির অনেক সর্বনাশ হয়েছে, বিস্তর লোকসান খেয়েছি। নতুন বন্দোবস্ত যদ্দিন না হচ্ছে, লোকসান ঠেকানোর কোন উপায় নেই।

গোলমালের প্রধান পাণ্ডা গৌরদাস। নীরদবরণ এক সময়ে ছুটো হাতের একখানা বলতেন গৌরকে—শৈশব থেকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন। পুরোপুরি বাড়ির ছেলে হয়েই ছিল সে। প্ল্যান বানচাল করতে সেই গৌরদাস উঠেপড়ে লেগেছে।

প্রথমটা ভাস্কর ভাল কথায় বোঝাবার চেষ্টা করেছে। গৌর-কাকা বলে ডাকে ছেলেবয়স থেকে। বলে, অবুঝ হোয়ো না গৌর-

কাকা। কাজ কলে করবে—মানুষ তো কম লাগবেই। কলের কাজ মানুষের হাতের চেয়ে অনেক নিখুঁত আর পরিপাটি। দেশ ভাগ হয়ে উৎকৃষ্ট কাঁচা-মাল এখন ভিন্ন দেশের সম্পত্তি। পুরানো পথ ধরে থাকলে ধ্বংস অনিবার্য।

গৌরদাস তবু বলে, রাধারমণ রায়ের ছেলে কিনা আমি—আমার ভাবনাটা ভিন্ন পথে। যে দেশে জনসংখ্যা এত বেশি, সেখানে কলকব্জা বাড়িয়ে মানুষ বেকার করবার মানে হয় না। ওটা নৃশংসতা। ছাঁটাই মানুষগুলোর অবস্থায় নিজেকে ফেলে বিচার কর।

রাগ করে ভাস্কর তর্ক বন্ধ করে দেয়ঃ মিল হবার আগে সেকালে পাটের সুতো আর পাটের চট ঘরে ঘরে কুটিরশিল্প হিসাবে বানাত। তোমরা মাতব্বর হয়ে চালাও তাই আবার, পিছন দিকে মুখ ফেরাও। আমার পথ আমি ছাড়ছি নে।

ইউনিয়নের দলাদলি ছিল আগে, এ-দলে ও-দলে মারামারি পর্যন্ত হয়ে গেছে। ইদানীং এক-মন এক-প্রাণ। চেয়ারম্যান-সেক্রেটারি ওরা ভিতরের মানুষ রাখে না—বাইরের তা-বড় তা-বড় মহাশয়েরা। কিন্তু আসল মানুষ একজনই—গৌরদাস। বড় বড় আদর্শ এক ধরনের মানসিক ব্যাধি ছাড়া কিছু নয়—গৌরদাস হল দ্রু-পুরুষে ব্যাধিগ্রস্ত।

বিলেত-ফেরত ভাস্কর কিন্তু বুড়োমানুষ ধার্মিক নীরদবরণের মতো নয়, পুরানো সম্পর্ক সে মনে রাখবে না, তোমারও চাকরি যেতে পারে গৌরদাস—হিতার্থীরা এমনি অনেক বুঝিয়েছে। গৌরদাস গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। লাটসাহেবের মতো চলাফেরা তার, বেপরোয়া কথাবার্তা।

নীরদবরণও ওদিকে ছেলেকে বারম্বার সতর্ক করেনঃ গৌরদাসটা সাংঘাতিক হয়েছে, ওকে ঘাঁটাতে যেও না। আটঘাট সমস্ত জানে। ঘরের ছেলে হয়ে ছিল, আদরযত্ন বিস্তর পেয়েছে—ও মানুষ কিন্তু বশ হবার নয়। উল্টো ফল বরঞ্চ, কোন-কিছুই গৌরের চোখের আড়ালে

থাকত না। তখন বলি, এত বড় দায়িত্বের পদ তোমার, কারখানার উপর না থাকলে কাজের অসুবিধা হচ্ছে। কায়দা করে ওকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিলাম।

নিশ্বাস ফেলে বলেন, তবে কাজের মানুষ বটে। ওরা ছিল আমার ডানহাত-বাঁহাত—সে আমি একটুও বাড়িয়ে বলি নে। বয়স হয়ে নিজে তো ক্ষমতা হারিয়েছি—তার উপরে একটা হাত পঙ্গু। পঙ্গু কেন, বিষাক্ত হয়েছে সে হাত—একেবারে কেটে ফেলে দিতে হবে। কাটবে তো বটেই, কিন্তু সইয়ে সইয়ে। বেশি তাড়াহুড়ো কোরো না. গোলমাল খানিকটা থিতিয়ে যাক।

ভ্রূভঙ্গি করে ভাস্করের সেই উড়িয়ে দেবার ভাব: গোলমালটা তুমি কোনখানে দেখলে বাবা? ঘেউ ঘেউ করে নেড়িকুত্তাগুলো—ডাকেই ওরা, কামড়ায় না।

বাপের উদ্বেগ বাড়বে বলে ভাস্কর অবস্থা গোপন করে আসছে—বাপ দেখি সমস্ত জেনেশুনে বসে আছেন। নীরদবরণ বলে যাচ্ছেন, ভাস্কর অবাক হয়ে গেল। বলছেন, টাকার অসুবিধায় প্ল্যান তোমার বানচাল হতে বসেছে, সে আমি জানি। গৌরদাসেরা বাগড়া দিচ্ছে তার উপর। একদিন ছিল, ম্যাজিকের মতন আমি খালি মুঠো থেকে ভরা মুঠো ঢেলে দিয়েছি। এখন ঠুঁটো-জগন্নাথ। মল্লিক সাহেবকে জানালে টাকার ব্যবস্থা হয়তো হয়ে যায়। কিন্তু ভরসা পাচ্ছি নে। কোম্পানির অনটনের অবস্থা জানাতে চাই নে এ-সময়টা। আমার উপর সমস্ত ফেলে নির্ভাবনায় বম্বে পড়ে থাকেন—কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ না বেরিয়ে পড়ে!

কণ্ঠ বড় মিইয়ে এসেছিল, কি ভেবে হঠাৎ নীরদ চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। উৎসাহ দিয়ে বললেন, ভেবো না। আমি চুপ করে নেই। ডাকছি রাতদিন ঠাকুরকে, তিনি সুরাহা করে দেবেন। কাগজ দেখে থাক? সুয়েজখাল নিয়ে লাগবে-লাগবে ঠেকছে। তোমার কি মনে হয়?

হাসিমুখে ভাস্কর বাপকে ধমক দিয়ে উঠল: অন্যায় হচ্ছে বাবা,

আমার এলাকার মধ্যে তুমি ঢুকছ। বকে দেবো কিন্তু। বন্দোবস্ত পাকাপাকি হয়ে গেছে—টাকার দায় আমার, তুমি শুধু খরচা করে যাবে। টাকা কত দরকার, তাই শুধু তুমি বলবে। তার বাইরে একটি কথাও নয়।

গৌরদাসের সঙ্গে একদিন চরমে উঠল। মুখোমুখি কলহ।

গৌরদাস বলে, সাহেবরা বিদেশি হয়েও প্রতিপালন করে গেছে। দেশি মানুষ এসে অবস্থা ভাল হবে—তা নয়, এত লোকের তুমি অন্ন মারতে লেগেছ।

ভাস্কর বলে, পুরো ছ মাসের মাইনে দিতে রাজি, যদি ওরা আপোষে চলে যায়। কম নয় সেটা।

তার পরে?

ছ-মাস যথেষ্ট সময়। কাজের মানুষ হলে এর মধ্যে কাজকর্ম জুটিয়ে নেবে।

সেটা বিদেশ দেখে এসে বলছ। কাজের মানুষ শুনেছি ওসব জায়গায় পড়তে পায় না। উল্টো রীতি এখানে। তদ্বিরের জোরে আনাড়ি উতরে যায়, গুণী গলায় দড়ি দিয়ে মরে।

ভাস্কর খোঁটা দিয়ে বলে, জুটমিল তোমাদের সিদ্ধিহাট-আশ্রম নয়। অন্নদান আর চরিত্র-গঠনের জন্য নই আমরা। সে আশ্রমই বা রাখতে পারলে কই? উঠিয়ে দিতে হল। সে যা-ই হোক, সকলের আগে আমি মিলের স্বার্থ দেখব। তার চেয়েও বড় কথা, স্বদেশি ইণ্ডাস্ট্রির স্বার্থ।

গৌরদাস ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, লম্বা-চওড়া বুলি বাইরে শুনিও। ঘরের মানুষ আমি, কোন খবরটা না জানি? ধাপ্পায় ভুলব না।

ঘরের মানুষ বুঝি তুমি?

খেলার সাথী ছিল এক বয়সে এরা দুইজন। রাধারমণের ছেলে-মেয়েকে নীরদবরণ নিজের বাড়ি এনে ঠাঁই দিয়েছিলেন। গৌরদাস আর তার দিদি অনুপমা। ভাস্করের চেয়ে বছর আষ্টেকের

বড় গৌরদাস। তবু এক বাড়িতে নিত্যসঙ্গী—কতবার ঝগড়া হত, কতবার ভাব হত। এজেন্টের অফিস-কামরায় গৌরদাসের কণ্ঠে সেই ছেলেবয়সের ঝগড়ার সুর। ভাস্করের মুখ আরক্তিম, তবু সে সংযম না হারিয়ে বলে, সোনার-বাংলা জুটমিলের ব্যাপারে তুমি ঘরের মানুষ নও গৌর-কাকা। পার্ক স্ট্রীটে যেও, তোমার ঘরোয়া কথাবার্তা তখন মজা করে শুনব। আমার সামনে এই অফিসঘরে তুমি কর্মচারী মাত্র।

গৌরদাস উচ্চহাসি হেসে উঠল।

ভাস্কর বলে, উপরওয়ালার মুখের উপর এমনভাবে হেসে ওঠা বেআদবি।

হাসি বেড়ে যায় গৌরদাসের। টেনে টেনে খানিকক্ষণ ধরে হাসে। বলে, হায় আমার উপরওয়ালা! পদ্মপত্রে বারিবৎ আছ উপরে—নাড়া দিলে পলকে গড়িয়ে পড়বে। রসাতলে তলিয়ে যাবে।

বাঁকা হাসি, রহস্যময় কথার ধরন। রাগ হয়েছিল ভাস্করের, এবারে ভয়ও হচ্ছে। বাবা সতর্ক করে দিয়েছেন, সাংঘাতিক ঐ গৌরদাসটা।

ভাস্কর বলে, হেঁয়ালি রাখ। কী চাও তুমি, স্পষ্ট করে বলো।

নতুন মেশিন বসবে না আমাদের মিলে। ভেবো না—খদ্দের আছে, মেশিন লুফে নিয়ে নেবে। খরচা যা পড়েছে, তার উপরেও ধরে দিতে রাজি।

ভাস্কর বলে, টাকার খরচাই সব নয়। কত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে জান? নিজে চলে গিয়েছি বেলফাস্টের ওয়ার্কসপে—

বটেই তো। এ বাজারে ভাল যন্ত্রপাতি আমদানি করা সোজা নয়। কিন্তু ও মেশিন দুশমন আমাদের কাছে। যতক্ষণ আছে, কেউ সোয়াস্তি পাবে না। বিদায় করে দাও। গড়িমসি কোরো না, চালাকি খেলতে যেও না। আমার বাবা আর তোমার বাবা শিল্প-প্রতিষ্ঠায় নেমেছিলেন সেবার আদর্শ নিয়ে। টাকার গাদার উপর বসে টাকা

নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন, সেজন্য নয়। সেই আদর্শ ঠিক রাখতে হবে। একটি লোকও সরানো চলবে না। শেয়ারহোল্ডাররা ডিভিডেণ্ড না-ই পাক, অনেক মানুষ মোটা-ভাত মোটা-কাপড়ে প্রতিপালিত হবে আমাদের মিলে। বড় বড় প্লান ছেড়ে দাও—

একটানা বলে যাচ্ছে। অসহিষ্ণু ভাস্কর বাধা দিয়ে উঠল: তোমার কথায় ছাড়ব নাকি?

কথা একলা আমার হলে কি শুনবে? তোমার সলিসিটারও নিশ্চয় এই কথা বলবেন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হচ্ছিল এতক্ষণ। একটা গদি-আঁটা চেয়ার পেয়ে গৌরদাস ধপ করে বসে পড়ল। বসে আরামে হাঁটু দোলাচ্ছে। বলে, তোমাদের নিজস্ব সলিসিটার বিপিন দত্ত। সলিসিটার মক্কেলকে ফাঁস করে না, উচিত উপদেশ দেয়। তাঁর কাছেই সেজন্য সকলের আগে কাগজ পাঠিয়েছি। পয়লা কিস্তির সামান্য ছু-চারটে কাগজ—আসল জিনিষ নয় অবশ্য, কপি। পাকা লোক দত্ত সাহেব—ছুটো-চারটে ভাত টিপেই গোটা হাঁড়ির খবর বুঝবেন। অন্ন খেয়েছি তোমাদের, হুট করে সাংঘাতিক কিছু করতে চাই নে। কথা যদি শোন, বজ্জাতির ছিটেফোঁটাও বাইরে চাউর হবে না। কিন্তু মতলব খেলাতে গিয়েছ কি, আমরাও দেরি করব না। ধনুকে বাণ জোড়াই আছে, শুধু ছেড়ে দেবার অপেক্ষা।

অবিশ্বাসের হাসি হেসে ভাস্কর বাইরে বেপরোয়া ভাব দেখাচ্ছে, কিন্তু ভিতরের উদ্বেগ কিছুতে আর চেপে রাখতে পারে না যেন। তাকিয়ে দেখে গৌরদাস পরমানন্দে বলে, ভয়-দেখানোর কথা ভাবছ। পাশেই তো ফোন, সলিসিটার দত্তকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। ততক্ষণ বরঞ্চ আমি উঠে দাঁড়িয়ে মুখ গোমড়া করে করজোড়ে থাকি, উপরওয়ালার সামনে আদর্শ ভৃত্যের যেমন থাকা উচিত। ছবিতে যেমন গরুড়পক্ষীকে দেখা যায় প্রভু নারায়ণের সামনে।

একদা বড় ঘনিষ্ঠ ছিল, আলাপে আচরণে সেই সুযোগ গৌরদাস

কিছু কিছু নেয় না যে এমন নয়। কিন্তু আজকে বড় বাড়াবাড়ি। কামরার মধ্যে ভাগ্যিস দু'জন মাত্র, তৃতীয় মানুষ কেউ নেই। নিশ্চয় কোন মোক্ষম অস্ত্র তার হাতে, খরধার ব্যঙ্গের ভাষায় সেই অস্ত্রের আস্ফালন করছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে গৌরদাসই আবার বলে, উপরওয়ালা ফোন করছেন, কর্মচারীর সেখানে থাকা উচিত হবে না। বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। হয়ে গেলে বেল টিপে ডাকবেন।

বশম্বদ ভৃত্যের যেমনটা হওয়া উচিত, জোড়হাত করে গৌরদাস বাইরে চলে গেল। 'আপনি' বলে মজা করল খুব। চরম অপমান। তোয়াজ করে দুধ-কলা খাইয়ে কালসাপের বিষই বেড়েছে শুধু। সকলকে বিষিয়ে দিচ্ছে। সরাতেই হবে ছলে বলে যেমন করে হোক।

দরজার বাইরে অফিস-আরদালির টুল—তারই একটা নিয়ে গৌরদাস বসে পড়ল। কে না জানে গৌরদাসকে—হাসের কাজকর্মে আরও তার পরিচয় খুলেছে। এ হেন ব্যক্তি এজেন্টের দরজার সামনে টুলের উপর বসে—এদিক সেদিক থেকে কৌতূহলীরা এসে জমছে। দরজার অন্তরালে কামরার ভিতর না-জানি কী বিচিত্র ব্যাপার ঘটে চলেছে এখন!

গৌরদাস হাসিমুখে বলে, কি গো মশায়রা, রাগ হল নাকি তোমাদের এখানে বসেছি বলে? টুলটা খালি ছিল, তাই বসে পড়েছি।

একজনে বলে, হবেই তো রাগ। টুলে বসবার মানুষ কি আপনি?

তবে দাঁড়িয়ে পড়ি। সত্যিই তো—সবাই দাঁড়িয়ে, আমি একা কেন বসে থাকব?

এইসব চলছে। বেশ খানিকক্ষণ কেটেছে। ভিতর থেকে বেল

বাজে না, দরজা ঠেলে এক সময়ে ভাস্কর নিজেই এসে হাজির। লোকজন কারো দিকে না তাকিয়ে হাত ধরে গৌরদাসকে নিয়ে গেল।

ভিতরে নিয়ে প্রশ্ন করে : সুপারভাইজার মানুষ বেয়ারার টুলে কেন ? আমাকেই ঐখানে নিয়ে বসাবে, তারই বুঝি ইঙ্গিত দিয়ে রাখছ ?

মিনিট কয়েক আগে যাকে দেখে গেছে, এ ভাস্কর যেন একেবারে আলাদা সেই মানুষ থেকে। মুখ মড়ার মতো ফ্যাকাশে।

হবেই, সমবেদনা হয় না গৌরদাসের। আনন্দ হচ্ছে—প্রতিক্রিয়া যেমনটি আশা করেছিল, ঠিক ঠিক তাই। বেশি বরঞ্চ।

হঠাৎ ভাস্কর পুরানো-ডাক ডেকে বলে ওঠে, একটা জিনিষ চাইছি গৌর-কাকা। সলিসিটারকে বলেছ তুমি, কিন্তু এ নিয়ে বাবাকে কখনও কিছু বলতে যেও না। তাঁকে জড়িয়ে এত কাণ্ড, ঘুণাক্ষরে তিনি জানতে না পারেন।

গৌরদাস নিষ্ঠুর কণ্ঠে বলে, সে কি কথা! কীর্তি তাঁরই—তাঁর অজান্তে একটা কাজও হয়নি। অনেককাল ধরে বিস্তর কৌশলে জাল ছড়িয়েছেন। তাঁর বুদ্ধির উপরেও বুদ্ধি খেলে, সে খবর সকলের আগে তাঁরই তো জানা উচিত।

ভাস্কর বলে, এর মধ্যে কতখানি সত্যি কতটা মিথ্যে, এখনো জানিনে। জানতে হবেই—এত কাণ্ড করে বসে আছ, না জানিয়ে তুমি রেহাই দেবে না।

কাতর হয়ে বলতে লাগল, সবখানি দায় আমিই ঘাড় পেতে নিচ্ছি—যা করবার আমি করব। কিন্তু বুড়োমানুষটির শান্তি ভেঙো না। হাতে ধরে বলছি তোমায়।

হাঁ-না কোন জবাব পাওয়া যায় না। পাষাণ-মূর্তি গৌরদাস—ভাবলেশহীন।

ভাস্কর ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, ভিক্ষে বললে খুশি হও তো তাই। তোমার অজানা কিছু নয়—বিশ্বসংসারে কে আমার আছে বাবা ছাড়া?

একা বাবাই মা-বাবা ভাই-বোন আমার। তোমার বাপকে চিরকাল তিনি গুরুর মতো মান্য করে এসেছেন। অতি দুঃসময়ে ভাই-বোন তোমাদের দু'জনকে বাড়িতে আহ্বান করে এনেছিলেন। অনু-মাকে চলে যেতে হল—কিন্তু তোমায় বাবা যেতে দিলেন না। নয় তো ভেবে দেখ গৌর-কাকা, তুমি যা হয়েছ হতে পারতে এমনি ?

কখনো না, কখনো না—

অকুণ্ঠে গৌরদাস স্বীকার করে নেয় : বাবা কোনদিন তো পাই-পয়সার সঞ্চয় করেন নি ছেলেমেয়ের কথা ভেবে। বড়দা দয়া করে বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে পড়াশুনোর বন্দোবস্ত করেছিলেন, নইলে আজ নিশ্চয় পথে পথে না খেয়ে ঘুরতাম। অথবা সোনার-বাংলা মিলের সামান্য এক মজুর হয়ে নতুন-কর্তার প্লানিং-এর গুঁতোয় সর্ষেফুল দেখতাম চোখে।

ভাস্কর সদুঃখে বলে, নতুন-কর্তার যত খুশি দোষ দাও, আপত্তি করিনে। কিন্তু বাবার দয়ার আশ্রয় নিয়ে তোমরা ছিলে, এর চেয়ে মিথ্যা আর হয় না। সংসারের সর্বময়ী ছিলেন তোমার দিদি। আমার অনু-মা। বাড়ির মধ্যে তাঁর পুরো নাম নয়—আদর করে সবাই ছোট নামে ডাকত—অনু কিম্বা অনু-মা।

ঘাড় নেড়ে গৌরদাস সায় দিল।

ভাস্কর বলে যাচ্ছে, বাবাকে তুমি বড়দা বলতে। আপন ভাইয়েরই খাতির পেয়েছ কিনা, দেখ মনে করে। প্রাণ ঢেলে ভালবাসতেন, বিশ্বাস করতেন।

গৌরদাস হি-হি করে হাসে : তার ফলেই তো অভূতপূর্ব আবিষ্কার। নীরদবরণ ধর্মকর্ম করেন, আবার ঘড়েলও অমন দুটো হয় না—এ হেন মহাসত্য ভুবনে চিরদিন অবিদিত থেকে যেত। বাড়িতে আপন হয়ে থাকতে দিয়েছিলেন বলেই তো চোর-ডাকাতের জেল ধন্য হতে যাচ্ছে এবারে পুণ্যবান মানুষটাকে নিয়ে।

ঠাণ্ডা মাথা এর পরে রাখা চলে না। ভাস্কর গালি দিয়ে উঠল : এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই ? পশুর অধম হয়ে গেছ গৌর-কাকা।

গৌরদাস অবিচল কণ্ঠে বলে যাচ্ছে, না, কৃতজ্ঞতা নয়। মন জুড়ে যদি কিছু থাকে তো প্রতিহিংসা। বাবার জীবনপাত করে-গড়া স্টীল কোম্পানি গেল, আমার দিদিকে রাত্তিরবেলা দূর-দূর করে পথের কুকুরের মতো তাড়াল—

বাক্য নয়, বেরুচ্ছে মুখ থেকে অগ্নিধারা। বলতে বলতে যেন হোঁচট খেয়ে গৌরদাস থামল : দূর! নিজের কথাই একশ-গণ্ডা করে বলছি। আমার কিছু নয়, এতগুলো মানুষের অন্নে টান পড়েছে। বেশ, চুক্তিপত্র হোক, অন্তত তিনটে বছরের মধ্যে নতুন মেসিন চালু হবে না, একটি মানুষ তোমরা সরাতে পারবে না। জোর করে নয়, লোভ দেখিয়ে কায়দা-কৌশল করেও নয়।

ভাস্কর বলে, তারপরে আর দরকার হবে না। মিলে তালা পড়ে যাবে এই তিনটে বছরে—

সোনার-বাংলা স্টীল-কোম্পানির মতো ?

হি-হি করে গৌরদাস পাগলের মতো হাসতে লাগল।

রাধারমণের মেয়ে অনুপমা, বালবিধবা। ছোট ভাই গৌরদাসকে নিয়ে নীরদবরণের বাড়ি থাকত। ছন্নছাড়া রাধারমণের অবস্থা বুঝে নীরদই সমাদরে নিয়ে এসেছিলেন। নীরদের নিজের সংসারও বিশৃঙ্খল। স্ত্রী পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী—বেঁচে থেকেও যেন মরে রয়েছে বারো মাস। সংসারের হাল ধরে আছেন শাশুড়িঠাকরুন—তারামণি। আঁটোসাটো উজ্জ্বল চেহারা, প্রাচীন রাজবংশের মেয়ে। পিতৃবংশের রাজত্ব বহুদিন গেছে, কিন্তু সোনা, নগদ টাকা ও কোম্পানির কাগজ বিস্তর নাকি তারামণির হাতে। সেই জনশ্রুতির কারণে এবং রাশভারি স্বভাবের জন্যেও বটে, সকলে তটস্থ। জামাই নীরদবরণ অবধি। মা-মা-করে জল ঝরে যেন মুখে, সর্বব্যাপারে শাশুড়ীর

উপদেশ নিতে আসেন। তারামণিরও তেমনি ছেলেদের চেয়ে টান বেশি জামাইয়ের সংসারে। বছরের মধ্যে বোধহয় এগারো মাস এইখানে থাকেন। শান্তা একমাত্র মেয়ে—সেই মেয়ের পঙ্গু অবস্থার জন্য জামাইয়ের তিলেক বিরক্তি দেখেন নি, ঐ অবস্থায় যতটুকু আরাম-আনন্দ দেওয়া যায় নীরদবরণের সেদিকে সজাগ দৃষ্টি। এইসব গুণেই জামাইকে তারামণির এত ভাল লাগে। শান্ত সহিষ্ণুতা ও কর্তব্যবুদ্ধির সঙ্গে পঙ্গু স্ত্রী নিয়ে বছরের পর বছর ঘর করে যাচ্ছে—ঘরের শূন্যতা পূরণের জন্য বেশি বেশি যত্ন করেন শাশুড়ী তারামণি।

এরই মধ্যে আছেন অনুপমা। এমন মেয়ে হয় না। উপর-নিচে সর্বক্ষণ চরকির মতো ঘোরেন। শান্তার ওষুধপত্র সেবাযত্ন আর শিশু ভাস্করের দেখাশুনার সকল ভার অনুপমা নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছেন। এর উপরে সংসারের খাটনিও আছে। যত খাটতে পারেন, তত যেন তাঁর আনন্দ। দুটো চারটে হুকুম-হাকাম দিয়েই তারামণি খালাস, তার বেশি তাঁকে কিছু করতে হয় না।

আদিগঙ্গার কিনারে হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীটের বাড়িতে শাশুড়ি-জামাই দু-জনেরই ভগবানে মতি। তেতলার ছাতের উপর সিঁড়ির ঘরের দুপাশে দক্ষিণমুখী ঘর দুটো। ছাতের কার্নিশের উপর দিয়ে সারি সারি ফুলের টব—গন্ধপুষ্প, যে সব ফুল পুজোয় চলে। এবং তুলসীগাছ। ছাতের নাম এজন্য দাঁড়িয়েছিল নৈমিষারণ্য। নৈমিষারণ্যে মোটমাট দুই মুনি—নীরদবরণ ও তারামণি। সিঁড়ির দু-পাশের ঘর দুটোয় দুই মুনির আসন। তারামণির গুরু ছিলেন সিদ্ধপুরুষ- কুসুম-বাবা নামে প্রসিদ্ধ। একটুকরো কাগজ থেকে ফুল করে দিতে পারেন—ফুল হাতে দেবেন না, চোখে দেখিয়ে দেবেন। এবং নাকের কাছে এনে গন্ধ শোঁকাবেন। আর নীরদের গুরু বোধকরি শাশুড়িঠাকরুন নিজেই।

অফিসে কাজের মধ্যে নীরদ ঘোরতর সাহেব। সকালবেলা কাজে বেরুনোর আগে এবং কাজকর্ম অন্তে বাড়ি ফিরে এসে নিখুঁত ব্রাহ্মণ।

হ্যাটের নিচে টিকি, কোটের নিচে উপবীত, টাইয়ের নিচে সোনার চেনে ঝোলানো ইষ্টকবচ। সকালে পূজা-আহ্নিক সেরে ভগবদ্গীতার একটি অধ্যায় সশব্দে পাঠ করে একশ-আট বার ইষ্টনাম লিখে সামান্য জলযোগের পর কাজে বেরোন, তারপরে যত কিছু বলা ও লেখা ইংরেজিতে। দুপুরের লাঞ্চ ষোলআনা বিদেশি। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে কোট-পেন্টলুন ছেড়ে স্নানাদির পর পট্টবস্ত্র পরে ছাতের ঠাকুরঘরে ঢুকে পড়লেন। ভিন্ন মানুষ এখন একেবারে—সাধক-মানুষ। ওদিক থেকে ধূপের গন্ধ আসছে, অতএব শাশুড়িঠাকরুনও নিজস্থানে জপতপ পূজো-অর্চনায় নিমগ্ন।

আজ থেকে বছর কুড়ি আগে, ভাস্কর তখন সাত বছরেরটি। তারামণি উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে জামাইয়ের ঠাকুরঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে উঁকি দিলেন। নীরদবরণ ধ্যানে বসেছেন যথারীতি। তারামণিরও এসবার কথা, কিন্তু মনের এই রকম অবস্থায় সেটা সম্ভব নয়। মগ্ন হয়ে আছেন নীরদ। তারামণি একটু খুটখাট করলেন, সাড়া পাওয়া যায় না। ছোট ঘর ধূপের ধোঁয়ায় ভরে আছে—মিটমিটে প্রদীপ একটা, চেহারাটা তার মধ্যে আবছা দেখায়। নীরদই নয় যেন—পবিত্র ধোঁয়ার খানিকটা জমে গিয়ে নিষ্কম্প এক মূর্তি হয়ে বসেছে।

তাকিয়ে রইলেন মুহূর্তকাল ঐশীমূর্তির দিকে। আগেও দেখেছেন তারামণি। দেখে বড় তৃপ্তি হয়—তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার ভয়। ঈশ্বরে এতদূর উৎসাহ দেওয়া হয়তো বা উচিত হয় নি। স্ত্রী ও শিশুপুত্র ছেড়ে ছাতের নৈমিষারণ্য থেকে পুরোপুরি অরণ্যবাসী হয়ে যাওয়া এ মানুষের পক্ষে বিচিত্র নয়। তারামণি কিছু চিরকাল বেঁচেবর্তে থাকবেন না। পঙ্গু মেয়ে ও অবোধ নাতির কি দশা হবে তখন? অনুর উপর আশা করা গিয়েছিল—সংসার নিয়ে আছেও সে পড়ে। ভাস্করকে যা ভালবাসে, গর্ভের ছেলের জন্য কোন মা বোধকরি এতদূর করে না। সমস্ত ভাল ছিল, কিন্তু সবনাশী কাণ্ড করে বসেছে—

বিষের জলুনির মতো তারামণির সর্বদেহ জ্বলছে। তবু এই দেবস্থানে সংযত কণ্ঠে ডাকলেন : শোন বাবা—

নীরদবরণের নিষ্কম্প দেহ, ধ্যানভঙ্গের এতটুকু লক্ষণ নেই। কিছু জোর গলায় তখন ডাকতে হয় : উঠতে হবে যে বাবা, একটিবার নিচে যেতে হবে। নোংরা ব্যাপার এখানে বলব না।

নীরদ চোখ খুললেন। স্বর্গীয় রাজ্যে বিচরণ করছিলেন, মাটির জগতে অকস্মাৎ নেমে পড়ে যেন ধাঁধা লেগে গেছে।

তারামণি কথার পুনরাবৃত্তি করলেন : কেলেঙ্কারি কাণ্ড। নামতে হবে একটি বার—পাঁক আমি পুণ্যের জায়গায় তুলতে পারব না। বিচলিত হয়ে পড়েছি, ডেকে তুলে তাই তোমার কাজ পণ্ড করলাম। অন্যায় হচ্ছে জেনেও।

খড়ম খটখট করে নীরদ শাশুড়ীর পিছু পিছু নেমে চললেন। দরদালানে এসে দাঁড়ালেন দু'জনে। জামাইয়ের কাছে প্রকাশ করে বলতেও লজ্জা—একবার কেশে জোর করে দ্বিধার ভাব কাটিয়ে তারামণি বললেন, অনুকে লক্ষ্য করেছ ?

নীরদ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, কি হয়েছে অনুর ?

কপাল পুড়েছে। কাউকে বলবার কথা নয়।

কথাটা বুঝি নীরদের উপলব্ধির মধ্যে আসে না। হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

তারামণি বলছেন, সন্দেহ হল আমার। মেয়েমানুষ হয়ে তুই মেয়েমানুষের কাছে লুকোবি! চেপে ধরলাম আজ সন্ধ্যার পর। দুয়োর এঁটে আচ্ছা করে গালমন্দ দিলাম। কাঁদতে কাঁদতে স্বীকার করল। চার মাস পোয়াতি।

নীরদবরণ স্তম্ভিত হয়ে থাকেন মুহূর্তকাল। বললেন, এমন কাণ্ড জেনে এখনো তাকে বাড়ি থাকতে দিয়েছেন ? জানি, দয়ার শরীর আপনার। এ বাড়ি কারো কিছু করবারও নেই, আপনার উপর। তবে মা মিছামিছি কেন আমায় ডাকলেন ?

তারামণি বললেন, দয়াটয়া নয়। অবস্থাবিশেষে খানিকটা মানিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে থাকি বটে—এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার। কিন্তু গোটা সংসার অনুর কাঁধে—তাকে সরাতে হলে তোমার পরামর্শ চাই বই কি বাবা।

কোন দরকার ছিল না—

নীরদ তিক্তকণ্ঠে বলেন, ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের করে সুবিধা মতন কোন এক সময়ে বললেই হত। হাতে ঘাড় ছুঁতে ঘেন্না করে তো ঝাঁটা মারতে পারতেন।

মনে মনে খুশি হয়েও বাইরে তারামণি রাগ দেখান। দেখাতে হয় এমনি। বললেন, কাজটা জঘন্য, তা হলেও বাড়াবাড়ি কিন্তু তোমার। এদ্দিন ধরে আছে, বাড়িসুদ্ধ সবাই অনু অনু করে, ছেলেটা তো অনু-মা বলতে পাগল—

শাশুড়ীকে শেষই করতে দেন না নীরদ। কিছু রূঢ় ভাবে বলে উঠলেন, তা সে যা-ই হোক না, এই কাণ্ডের পর সব সম্বন্ধ চুকে-বুকে গেছে। এক মিনিটও আর এ বাড়ি রাখা চলে না, গা ঘিন-ঘিন করছে আমার।

রাত্রিটা কাটিয়ে ভোরবেলা অনুপমা চলে যাবে, এইরকমটা ভেবে রেখেছিলেন তারামণি। জামাইয়ের ভাবভঙ্গি দেখে সে প্রস্তাব মুখে আনতে ভরসা করেন না। শুধুমাত্র বললেন, যাবে খানিকটা পরে। আরও একটু রাত হোক, ভাস্কর ঘুমিয়ে যাক, নয়তো সে কান্নাকাটি করবে।

নীরদবরণ তার জবাবে বললেন, বলুন তো মা, ঘরে আগুন লাগলে তারপরে কি আর দেরি করা উচিত? সঙ্গে সঙ্গে নেভাতে হয়। তিল পরিমাণ দেরিতেও অনর্থ ঘটে যায়।

বড় হয়ে দিদিমার কাছে ভাস্কর কথাগুলো শুনেছিল। বাবার চোখে যেটা অপরাধ, নির্মম ক্ষমাহীন তিনি তার উপর। এমন যে অনু-মা, তাঁরও রেহাই হল না। যেখানে বাবার পা পড়ে, পুণ্য আর

পবিত্রতার আলোয় ভরে যায়। সেই মানুষটিই আজ, গৌরদাসের মতে, টাকা তছরুপের জন্য দায়ী। জেনেশুনে নাকি করেছেন। অনুপমার কথা এতকাল পরে এই প্রথম শোনা গেল গৌরের মুখে। মনের তলে জ্বালা চেপে রেখেছিল, কোনো একদিন প্রতিহিংসা নেবে সেই সুযোগের অপেক্ষায়।

রাত্রিটা আজও ভাস্করের মনে পড়ে। ছবির বই দেখে একমনে পেন্সিল বুলিয়ে সে তেমনি এক দ্বিতীয় ছবি বানাবার চেষ্টায় ছিল—কী মনে হল, অসমাপ্ত ছবি হাতে ছুটতে ছুটতে চলে আসে অনুপমার ঘরে, অনু-মায়ের কাছে। শান্তভাবে অনুপমা বাক্সপেটরা কাপড়চোপড় গোছাচ্ছেন। সে কিছু বড় ব্যাপার নয়, দশ-পনেরো মিনিটেই সারা হয়ে গেল। ছবি নিয়ে ভাস্কর হাঁ করে দাঁড়িয়ে। চোখ তুলে দেখছেন অনুপমা, তবু আদরের কথা বলেন না। ভালমন্দ কিছুই না বলে নতমুখে নিজের কাজ করতে লাগলেন। ভাস্করও অন্য সময়ের মতন গায়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল না, চোখ দুটো মেলে অবাক হয়ে দেখে।

আর দেখছেন তারামণি। বেশ খানিকটা ব্যবধানে দাঁড়িয়ে একের পর এক বিদায়ের পর্বগুলো চোখ মেলে দেখে নিলেন। জানলায় মুখ বাড়িয়ে দরোয়ানের উদ্দেশে হাঁক দেন: গাড়ি আসে না কেন এখনো? নিজে যাও তুমি, চাকর-বাকর দিয়ে হয় না।

থার্ডক্লাস ঘোড়ার-গাড়ি এসে গেল রাস্তার খোয়ার উপর চাকা বাজিয়ে। অনুপমা এগিয়ে এসে তারামণিকে প্রণাম করেন।

তারামণি বলেন, রাতটুকু কাটিয়ে গেলে পারতে। এদ্দিন রয়েছ, ঘণ্টা কয়েকে কী আর বেশি হত!

আঁচলটা মুখে চাপা দিলেন অনুপমা। ভাস্কর ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাচ্ছে। আদর করতে গেলে কোন উৎপাত না-জানি ঘটে যায়—কাছে যেতে অনুপমার সাহসে কুলায় না। তাকানও না একবার ভাস্করের দিকে।

তারামণি বলেন, কোথায় যাচ্ছ?

চোখ ঠারেন একবার। জানাই তো আছে সত্যিকথা বলবে না, তবু জিজ্ঞাসা করলেন, এই রাত্রে উঠবে গিয়ে কোথা?

সংক্ষেপে অনুপমা বলেন, শিয়ালদা স্টেশন।

যা বলল, যথেষ্ট। জেরা করে লাভ নেই, ভারি শক্ত মেয়ে। কোন পুরুষ দায়ী তার এই বিপাকের জন্য—বিস্তর জেরা করেও জবাব আদায় হয়নি। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে গুম হয়ে থাকে অনু।

বছর কুড়ি আগেকার সেই রাত্রিবেলা অনুপমা চিরদিনের মতো চলে গেলেন। সদর-দরজার সামনে ঘোড়ার-গাড়ি দাঁড়িয়েছে—দু-হাতে দুই বোঁচকা, বোঁচকার ভারে নুয়ে পড়ে অনু-মা বেরুচ্ছেন। শিশু ভাস্কর নিঃশব্দে দেখছিল, ছুটে গিয়ে এবারে পথ আটক করে।

কোথায় যাচ্ছ অনু-মা?

কোথায় আবার! এই তো কালীঘাটে—মায়ের বাড়ি—

দু-হাতে অনুপমাকে জড়িয়ে ধরে শিশু একটা নাচন দিল: আমি যাব, আমি যাব—

না-রে মাণিক। রাত্রে বুঝি ছোট ছেলে বেরোয়! গাছের উপর হনুমান থাকে, টুক করে ঝুঁটি ধরে তুলে নেবে।

অন্য সময়ে হনুমানের নাম শুনলে শিশু মুখে রা কাড়ে না। বিশেষ করে রাতের বেলা। সেই মন্ত্রেও আজ কাজ হল না, কানে নিল না ভাস্কর। রাস্তার গ্যাসের আলো বারাণ্ডায় এসে পড়েছে। অনুপমার চোখের দিকে চেয়ে—যা কারো নজরে আসেনি, অপোগণ্ড শিশু তাই ধরে ফেলল: তুমি কাঁদছ কেন অনু-মা?

কই? আরে পাগল, কোথায় আমার কান্না দেখলি তুই? কত হাসছি—এই দেখ না!

সেই হাসতে গিয়ে বিপত্তি আরও। অশ্রু বাধা মানে না, দরদর ধারে গড়িয়ে পড়ল। অনুপমা কোলে তুলে নেন ভাস্করকে। পাগলের মতন চেপে ধরেছেন।

তারামণি অমনি হুঙ্কার দিয়ে পড়েন : নেমে আয় ভাস্কর, আয় বলছি। শুতে যাবি তুই এখন। শিগগির চলে আয়।

অপরাধী অনুপমা তাড়াতাড়ি কোল থেকে নামিয়ে দেন। নাতির হাত এঁটে ধরে তারামণি হিড়হিড় করে টানছেন। হাত ছাড়াবার জন্য ভাস্কর আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। অনুপমা তাকিয়েও দেখেন না, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে ঘোড়ার-গাড়িতে উঠে বসলেন। বিশ বছর আগেকার কথা। হরিশ চাটুজ্জ্যে স্ট্রীটে খোয়া-ওঠা অসমতল রাস্তা তখন। গাড়ির লোহা-বাঁধানো চাকা তার উপরে আর্তনাদ তুলে ছুটল।

আর ঠিক অমনি ধরনের আওয়াজ ভিতরের দিকে—পাশের ঘরে, পঙ্গু শান্তার বারোমেসে শয্যা যেখানটা। কথাও বন্ধ কিছুকাল থেকে, তবে চোখ-কান আছে, চেতনা আছে। বোবা পশুর গোঙানির মতো একটা-কিছু বলতে চাইছেন শান্তা—অনুপমা চলে যাচ্ছেন, তাঁকে ঠেকাতে বলছেন বোধহয়। ছটফট করছেন প্রকাশ করে না বলতে পেরে। চাকার আওয়াজ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে একেবারে মিলিয়ে গেল। দেখা গেল, আধেক-মরা রোগিণীর দুচোখ-ভরা জল।

গৌরদাস ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে সেই সময়টা সহপাঠীদের সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। দেশ দেখে বেড়াচ্ছে। মাস দেড়েক পরে ফিরল। দিদির ব্যাপার না শোনার কথা নয়, কিন্তু উচ্চবাচ্য করে না। যেন কিছুই হয় নি—অনুপমা বলে একটি নারী এ বাড়ির সর্বত্র জুড়ে থাকতেন, সে যেন একেবারে বিস্মরণ হয়ে গেছে দেশভ্রমণে গিয়ে। রাধারমণের মতো মানুষের মেয়ে হয়ে এত বড় কেলেঙ্কারি—তাঁকে বোধকরি মরার সামিল ধরে নিয়েছে। হয়তো বা সত্যি-সত্যি মরে গেছেন, অসম্ভব নয়। অনুপমা বড্ড ভাল, মোহের বশে ভুল করে বসেছিলেন—দুঃখ সেজন্য সকলেরই মনে মনে। গৌরদাসের কাছে কেউ কখনো তাঁর কথা তোলে নি। আজকে কলহের মধ্যে গৌর-দাসই প্রথম পুরাণো কথা তুলল।

। ছয় ।

আচমকা বজ্র নিক্ষেপ করে গেল গৌরদাস। নীরদবরণকে ঘুণাক্ষরে জানতে দেওয়া হবে না। ভাস্কর ছটফট করছে, সিতাংশুকে খবর দিয়ে পাঠাল। সলিসিটার তো আছেনই, সিতাংশুর পরামর্শও চাই।

সিতাংশুকে বলে, হেন দোষ নেই যা আমার বাবা করেন নি। হিসাবে কারচুপি, ভুয়া কারবারের নামে পাওনা দেখানো, টাকা তছরূপ—ডজনখানেক চার্জ বাবার নামে। হিসাব একাউন্ট্যান্টের হাতের বটে, কিন্তু বাবা যখন সই দিয়েছেন দায়িত্ব ওঁরই। আমি একবর্ণ বিশ্বাস করি নে। গৌরদাসের সাজানো জিনিষ—কিন্তু ভেবে-চিন্তে বড় কায়দা করে সাজিয়েছে।

সিতাংশু সায় দিয়ে বলে, আমারও তাই মনে হয়। এত দূর হতে পারে না—ফাঁপানো আছে বিস্তর। তবে কিছু দিন থেকে বুঝতে পারছি, জেঠাবাবু খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন। পড়তা খারাপ পড়েছে। এককালে ছাই-মুঠো ধরলে জেঠাবাবুর হাতে সোনা-মুঠো হয়েছে, এখন তার উল্টো। দেখ, বড় কাজকারবারে এ সব হামেশাই করতে হয়। শিল্পপতিরা মতলব করেই একগাদা ব্যবসায়ে জড়িয়ে থাকে—যেমন আমাদের চেয়ারম্যান মল্লিক সাহেব। চেইন অব বিজনেস বলে—এতে বড় সুবিধা। এটার না হল তো ওটার—টাকা সব সময়ে হাতে মজুত থাকে, দরকার মতন চালাচালি করে নেয়। জেঠাবাবুর বিপদ হল—তুমি বিদেশে পড়ে রইলে, বয়স হয়ে গিয়ে নিজে আর দেখাশুনো খাটাখাটনি করতে পারেন না তেমন। তার উপর ইদানীং বড্ড বেশি ভগবানে পেয়েছে তাঁকে। সুযোগ বুঝে শত্রু বুকের উপর বসে বসে নির্ভাবনায় দাড়ি উপড়েছে।

ভাস্কর গর্জন করে উঠল: জেলের ভয় দেখাল গৌর আজ মুখের

উপর। বাবার সম্বন্ধে এত বড় কথা বলতে জিভ তার খসে পড়ল না।

ভ্রূভঙ্গি করে সিতাংশু উড়িয়ে দেয়ঃ ওঃ, জেলে দেবে! জেল কিনা ছেলের হাতের মোয়া! কাজকারবার করতে গেলে এদিক-সেদিক হয়েই থাকে—তুমিও যেমন! তা-বড় তা-বড় শিল্পপতি, বলতে গেলে সরকারকে যারা ট্যাঁকে করে বেড়াচ্ছে—কোন্ জন ষোলআনা সাচ্চা, জিজ্ঞাসা করি।

ভাস্কর বলে, কথাগুলো বাইরে না চাউর হয়, আমার সেই ভয়। বাবার নামে দাগ পড়বে, বাবাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া হবে, তার আগে মরে যাই যেন আমি। করবার কিছু থাকলে আমিই তা করব। বাবার কানে কোন রকমে না ওঠে, হাতে ধরে আমি গৌর-কাকাকে বলেছি।

একেবারে সর্বনাশটি করেছ—পাগলকে বলেছ, সাঁকো নাড়াবি নে। তোমার সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটা শত্রুকে দেখিয়ে দিয়েছ। কাগজপত্র এখনই হয়তো তাড়া বাঁধতে লেগেছে, সরাসরি জেঠাবাবুকে পাঠাবে।

দুই বন্ধু তারপর অনেকক্ষণ ধরে শলাপরামর্শ করে। উপায় কি এই অবস্থায়? হাইস্পীডের যন্ত্রপাতি যা আসছে, চালু হতে দেবে না ওরা। রেখে দিলেও শুনবে না—বেচতে হবে এখনই। আপদ বিদায় না হওয়া পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই ওদের। এত কষ্টের সংগ্রহ—হায়রে হায়, এই তার পরিণাম!

ভাস্কর বলে, বুকের উপর যেন পিস্তল ধরে সর্ত দিয়ে দিল। এক চুল এদিক-ওদিক হতে দেবে না।

সিতাংশু বলে, হুমকি মেনে নিলেও তো বিপদ। এত বড় বেইজ্জতির পরে মিলের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক রাখা চলে না। মাথা হেঁট করে অপমান নিয়ে বেরুতে হবে।

জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে ভাস্কর স্বীকার করে নেয়ঃ স্বেচ্ছায় না বেরুলে ঘাড় ধরে বের করে দেবে একদিন। এর পরে তো হাতের পুতুল হয়ে গেলাম। ব্লাকমেল করে যেমন খুশি নাচাবে, যা ইচ্ছে

করাবে আমাদের দিয়ে। প্রতিহিংসার কথা বলছিল গৌর—কায়দায় পেয়েছে তো কোন রকমে আর রেহাই দেবে না।

ভেবেচিন্তে সিতাংশু একটা উপায় বলল—সোজা বম্বে চলে যাওয়া মল্লিকসাহেবের কাছে। চেয়ারম্যানকে বাদ দিয়ে কিছু হবে না—আজ না হোক দুদিন বাদে খবর চলে যাবে। গৌরদাসই পাঠাবে। সকলের আগে তুমি গিয়ে খোলাখুলি সব কথা বলোগে। আজব কিছু নয়—এ জিনিষ ডাল-ভাতের সামিল শিল্পপতিদের কাছে। জেঠাবাবুর উপর মল্লিকের বড় আস্থা। তোমার সুখ্যাতিও মুখে ধরে না। টাকা-কড়ি দিতে হয় তো তিনিই দিয়ে দেবেন। যা করতে হয় করে একাই সামলে দেবেন দেখো। চলে যাও।

বলে, এপ্রিলের জেনারেল-মিটিংয়ে এসেছিলেন। তোমার নামে গদগদ। বলেন, অমন ছেলে হয় না। মিসেস দেখতে চান, বম্বে নেমে তাঁর বাড়ি একটিবার যাবে, বার বার করে নেমন্তন্ন করলেন।

একটু যেন হাসির রেশ ফুটল ভাস্করের মুখে। বলে, নেমন্তন্ন নিষ্কাম নয়। বড় মেয়েটা ঘাড়ে চাপাতে চান—একটা দিন থেকেই বুঝে এসেছি। কোটিপতির মেয়ে, খায়দায় ভাল, ওজনে পাহাড় বিশেষ। পাহাড় ঘাড়ে নিতে বলছ? ঘাড় ভেঙে যাবে যে আমার।

শম্পাকে হঠাৎ দেখা গেল। শম্পা এসে পড়েছে। কথা ছিল বটে দু'জন ব্যালে দেখতে যাবে। ভারী শলাপরামর্শে অতএব ইস্তফা। সিতাংশু উঠে পড়ল।

বলে, টিকিট পেয়ে গেছিস শম্পা? আমায় তো নিয়ে যাবি নে। কি করব, চলি তবে।

শম্পা কলকল করে বলে, সেকথা বলতে হবে না। তোমায় বলেছি, বউদিকে বলেছি। বউদি আরও মুখ বাঁকাল: নাচ তো নয়, সার্কাস। একবার দেখেই শখ মিটেছে, আর নয়।

বিদেশি একটা ব্যালে-পার্টি এসেছে শহরে। মস্কোর বলসই

থিয়েটার সেবারে এসে দেখিয়েছিল—সোয়ানলেক ব্যাল। সেই থেকে শম্পা ব্যালের নামে পাগল। এবারও ভেবেছে তেমনি কোন জিনিষ। টিকিট পাওয়া বিষম দুর্ঘট, অনেক কষ্টে শম্পা সেই অসাধ্যসাধন করেছে।

ভাস্করকে তাড়া দেয় : তৈরি হয়ে নিন, সময় বেশি নেই। একেবারে গোড়া থেকে দেখব। গোড়ার গোড়া থেকে।

শম্পার উল্লাসে ভাস্করের মনের গুমট কাটে। তাড়াতাড়ি একটু চা খেয়ে নিচ্ছে। সেই সোয়ানলেক ঘুরছে শম্পার মাথায় : কী করে হয়, তাই ভাবি। এই দেখছি আলো-ঝলমল লেক, হাঁসের সারি জলের উপর, ডাঙায় উঠে যত হাঁস পরী হয়ে গিয়ে নাচছে। আবার তক্ষুনি সব ঝাপসা হয়ে নীল পোশাকে নীল চেহারার শয়তানেরা। পলক ফেলতে না ফেলতে পালটে যায় কেমন করে ?

ভাস্করকে দার্শনিকতায় পেয়ে বসে : শুধু অপেরায় কেন শম্পা, জীবনেও ঠিক তাই। হাসি-হুল্লোড়ে-আনন্দ—পাতালের শয়তান তার মধ্যে এসে পড়ে সহসায় প্রলয় ঘটিয়ে যায়।

বেখাপ্পা ভাবে হঠাৎ বলে উঠল, খোপে বুঝি এবারও টিকলাম না শম্পা। তোমার আসা-যাওয়া কমিয়ে দেওয়া ভাল।

বিমূঢ় ভাবে শম্পা তাকিয়ে পড়ে। কথা সাংঘাতিক, কিন্তু হাসি-মাখানো আছে কথার গায়ে। ভাস্কর ভয় দেখাচ্ছে।

সামলে নিয়ে দৃঢ় স্বরে শম্পা বলে, এখন হপ্তায় একবার হয়তো আসি। ভাবছি রোজ আসব। মাধবদা বুড়ো হয়ে পড়ছে, আপনার খাওয়ার তদারকি আমাকেই করতে হবে।

মিলের সঙ্গে বুঝি আর সম্পর্ক থাকে না শম্পা। ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে পড়ব।

ভয়ের ভঙ্গি করে শম্পা বলে, খবরদার—খবরদার। অমন কাজটি করবেন না। বাবা আবার পাত্র জোটাতে লেগে যাবেন। চিঠিতে হুকুম আসবে, মন ঘুরিয়ে নে শম্পা।

সকাতরে মুখের দিকে চেয়ে বলে, ছুটো মাস কোন রকমে চুপচাপ থেকে যান। অকাল চলছে যে এখন। অঘ্রান মাস এসে মন্তোর ক'টা পড়া হয়ে যাক। তারপরে যা ইচ্ছে করবেন, কেউ কিছু বলতে যাবে না।

কিন্তু তোমার বাবা যে জামাই করতে চান---

ভাস্কর হালদারকে। লক্ষ্ণৌ চলে যাবার সময় এই মত ছিল, এখন অবধি কোন উল্টো চিঠি আসে নি।

বাধা দিয়ে ভাস্কর বলে, জামাই করতে চান সোনার-বাংলা জুট-মিলের ম্যানেজিং এজেন্ট যে ভাস্কর হালদার—

শম্পা বলে, সেই জন্য হালদার সাহেবের কাছে করজোড়ে নিবেদন, তেশরা অঘ্রান অবধি কায়ক্লেশে ম্যানেজিং এজেন্ট পদটিতে থেকে যান। তারপর জুটমিল লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই।

শোনানোই গেল না কথাটা কোনক্রমে,রসিকতা বলে শম্পা উড়িয়ে দেয়।

হাল ছেড়ে দিয়ে ভাস্কর অন্য প্রসঙ্গে আসে। বলে, শুধু জুটমিল কেন, সারা ছুনিয়া আবার লণ্ডভণ্ড হবার জোগাড়।

সকালের কাগজে মস্তবড় হেড-লাইনের খবর : সুয়েজ খাল নিয়ে লেগে গেল বুঝি ধুন্দুমার। আলেকজান্দ্রিয়ায় বোমা পড়েছে। তৃতীয়-বিশ্বযুদ্ধ না বেধে যায়।

ভাস্কর বলে, এবার যুদ্ধ বাধলে এটম-বোমা ধুলো-ধুলো করে দেবে জগৎ।

নির্ভীক শম্পা ফুৎকারে উড়িয়ে দেয় : আমাদের জগৎ আলাদা। বোমার ভয় করি নে। তবে হাঁ---বাবা। বাবাকে বড্ড ভয় আমার। বাবা হয়তো হুঙ্কার দিয়ে উঠবেন : মন তুলে নে শম্পা। সে জিনিষ বোমার চেয়েও ভয়ঙ্কর।

॥ সাত ॥

কিছুদিন থেকে ভাস্করের লক্ষ্য হচ্ছে, একটা স্কুটার ঘোরে তার সঙ্গে। কখনো আগে আগে, কখনো দূর-পিছনে। সন্দেহটা মনে আসার পর নিরিখ করে দেখল, গাড়িটা একই—নম্বর এক। তবে আরোহী বদলায়। অহঙ্কার আসতে পারে বটে—লাটবেলাটদের একলা ছাড়ার নিয়ম নেই, তার বেলাতেও তাই।

পরখ চলল। অসময়ে বেরিয়ে দেখা যাক। ভোরবেলা বেরুল, ঠিক-দুপুরে বেরুল। কোথাও কিছু নেই—রাত দশটায় আচমকা বেরিয়ে পড়ল একদিন। অনেকটা পথ গিয়েছে—পিছনে, সামনে, ডাইনে. বাঁয়ে কিছু দেখা যায় না। স্ফূর্তিতে যাচ্ছে। হঠাৎ এক সময়ে ঘুরে দেখে পরিচিত স্কুটার। স্কুটার যেন দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা তৈরি হয়ে থাকে ফায়ার-ব্রিগেডের গাড়ির মতন, কোন দুর্জ্ঞেয় উপায়ে খবর পেয়ে দুড়দাড় বেরিয়ে পড়ে।

নিজের ড্রাইভারের দিকে ভ্রূকুটি করে। এরই যোগসাজস নাকি? হর্ন দেয় ঘন ঘন, কারণে অকারণে থেমে দাঁড়ায়, সঙ্কেতে বোধহয় জানান দিয়ে দেয়ঃ সাহেব বেরিয়ে পড়লেন এইবার। অন্তত ভাস্করের তাই সন্দেহ দাঁড়াচ্ছে। পুরানো ড্রাইভার, আছে বিস্তর কাল ধরে। কিন্তু আজকের দুনিয়ায় কারও উপর আস্থা নেই। গৌরদাসও তো বিস্তর কাল ধরে এক বাড়িতে মানুষ, ভাস্করের ছেলেবেলার নিত্যসঙ্গী।

ড্রাইভারকে সরিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে একদিন নিজে গাড়ি নিয়ে বেরুল। বড়রাস্তায় পড়ে হু হু করে ছুটিয়ে দিয়েছে, ইয়োরোপের অটোবানে যেমন গাড়ি ছুটাত। হলে কি হবে—পিছনে তাকিয়ে দেখে সেই স্কুটার। আসছে বেশ খানিকটা দূর বজায় রেখে। ভাস্কর হঠাৎ

জোর কমিয়ে দিল। স্কুটারও গতিবেগ কমিয়েছে। মোটরগাড়িরই ছায়া যেন স্কুটার—ছায়া সঙ্গ ধরে চলেছে।

দিনে দিনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। মনের উপর একটা অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়া। গোপন বলে কিছু আর থাকতে দিল না জীবনে। রাস্তায় এই ব্যাপার—ঘরের মধ্যে যখন থাকে, কে জানে তখনো কেউ হয়তো দৃষ্টি মেলে আছে। কাছে আসে না, কথা বলে না, অমোঘ নিয়তির মতো সঙ্গে সঙ্গে আছে। অহোরাত্রি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দৃষ্টি থেকে পরিত্রাণ নেই।

মিল থেকে একদিন ভাস্কর পায়ে হেঁটে বেরুল। স্কুটারের উপর বিষম এক আক্রোশ—স্কুটার অন্তত আজকে আর পাল্লা দেবে না। হাঁটতে হাঁটতে এলাকা পার হয়ে গিয়ে গাড়ি-টাড়ি নেবে একটা।

স্কুটার নয়, আজকে মানুষ। রাস্তার একটা মানুষকে বড় সন্দেহ। বারবার তাকিয়ে দেখছে। ভাস্কর দ্রুত চলে তো সে মানুষও হাঁটার জোর বাড়িয়ে দেয়। ভাস্কর আস্তে যায় তো সে-ও যেন গণে গণে পা ফেলে।

খুব খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ বাঁয়ের পথে নদীর দিকে ভাস্কর বাঁক নিল। ঘোর হয়ে গেছে। মানুষটা বোঝে নি, একেবারে গায়ের কাছে এসে পড়ল। বেকুব হয়েই বুঝি কথা বলে ওঠে ঃ ফিরে গেলে হত না এইবারে? জায়গাটার বদনাম আছে সাহেব—রাহাজানি কত যে হয়েছে, ঠিকঠিকানা নেই।

ভাস্কর মুখ তুলে কটমট চোখে তাকায়। মানুষটার বাঁ-হাতের কনুই অবধি কাটা। পানের ছোপ-ধরা দু-পাটি দাঁত মেলে নিঃশব্দে সে হাসছে।

ভাস্কর বলে, কে তুমি?

হুজুরের গোলাম।

চিনি নে তোমায়। কোন দিন দেখেছি বলেও মনে করতে পারি নে।

মানুষটা গদগদ হয়ে বলে, হুজুরের হাজার-লক্ষ গোলাম-নফর, তার মধ্যে ক'জনকে আর চিনে রাখা যায়। কিন্তু হুজুর তো একজনই। আমাদের চিনতে ভুল হয় না।

পিঁপড়ে-মাছি দেখে লোকে যেমন করে, ভাস্কর ঘাড় ফিরিয়ে হন হন করে নদীর একেবারে কিনারে এসে দাঁড়াল। জেলেডিঙি যাচ্ছিল একটা, হাত নেড়ে ডাকল। বলে, আরও কাছে—ঘাটে এনে লাগাও মাঝি। ওপারে যাব।

হাত-কাটা মানুষটা পিছন থেকে বলে, পার হতে যাবেন না হুজুর—

ভাস্কর গর্জন করে উঠল : নিজের কাজে যাও বলছি।

মানুষটি বিনয়ে কাচমাচু হয়ে বলে, আমার কাজই তো এই হুজুর। হুজুরের খবরদারি করা। কোন রকম ঝঞ্ঝাটে হুজুর না পড়েন, সেইটে দেখা। রাত্তিরবেলা ওপারে যাওয়া ঠিক হবে না। জোড়-হাতে মানা করছি। কথাটা কানে নিন। পথঘাট মোটেই ভাল নয়।

বলতে বলতে—এমন বেশি কাতরতা, কেঁদেই পড়ে বুঝি বা। রাগ হয়েছিল ভাস্করের—মানুষটার রকম দেখে হাসি পেয়ে যাচ্ছে। বলে, ওপার জানি আমি। পাহাড় নয়, জঙ্গল নয়, পথঘাট এ পারের মতোই। জঙ্গল-পাহাড় হলেই বা কী—দুনিয়া চষে বেড়িয়েছি, পাহাড়-জঙ্গল বিস্তর ঘোরা আছে আমার।

হাত-কাটা তবু ঠাণ্ডা হবার নয়। বলে, পথঘাট যেমনই হোক, মানুষজন ওপারের বড্ড বেয়াড়া।

হঠাৎ দেখা গেল, ডিঙিটা ঘাট থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবিস্ময়ে ভাস্কর বলে, চললে যে মাঝি? আমি তোমায় ঘাটে ডেকে নিয়ে এলাম।

মুখের কথা না হলেও ইশারায় হাত-কাটা নিশ্চয় কিছু বলেছে।

জলের উপর বৈঠের এক প্রচণ্ড টান দিয়ে মাঝি বলে, ভাড়া ধরা আছে আমার—

পার করে দিয়ে যাও। কতই বা সময় লাগবে! পারবে না তো ঘাটে কি জন্মে ভিড়লে?

মনে ছিল না হুজুর।

আগনৌকোয় আরও দুই মাল্লা বৈঠে ধরেছে। তিন বৈঠের টানে লহমার মধ্যে ডিঙি বিস্তর দূরে চলে গেল।

ক্ষেপে গিয়ে ভাস্কর চেঁচিয়ে বলে, দশ টাকা দিচ্ছি, পার করে দাও।

মাঝির বিনীত কণ্ঠ কানে আসে: পারাপারের রেট চার আনা। হবার হলে সিকি নিয়েই পার করে দিতাম। বেকায়দায় ফেলে বেশি আদায় করব, তেমন কাজ আমায় দিয়ে হবে না হুজুর।

বটেই তো! সাচ্চা মানুষ হয়ে হুজুরকে কেমন করে বেকায়দায় ফেলবে?

রাগে গর গর করতে করতে ভাস্কর ঘাট থেকে উঠে এলো। ডিঙিনৌকো প্রায় অদৃশ্য। হাত-কাটা মানুষটা একটা গাছের তলায় ঠায় দাঁড়িয়ে।

ভাস্কর রুক্ষ কণ্ঠে বলে, কই হে, পিছন ধরছ না যে এখনো?

সপ্রতিভ কণ্ঠে হাত-কাটা বলে, আজ্ঞে, এই যাচ্ছি—

এবং দূরে দূরে সেই আগেকার মতো অনুসরণ করে চলল।

নিঃশব্দে কিছু পথ চলে সহসা ভাস্কর বলে উঠল, ওপারের মানুষ বেয়াড়া কি ভাল জানি নে। কিন্তু এ পারে তোমরা এক একটা হাড়বজ্জাত।

লোকটি পরম আপ্যায়িত হয়ে হাসতে হাসতে বলে, হুজুরের গোলাম।

ক'দিন পরে গৌরদাস দেখা করতে এলো। যথারীতি স্লিপ পাঠিয়ে অনুমতি নিয়ে তবে ডিরেক্টরের কামরায় ঢুকেছে।

না জানি কোন মতলব আবার। হাতে কিন্তু নিরীহ দরখাস্ত।

এক মাসের ছুটি চায়, দেশে গিয়ে থাকবে। দেশ মানে সিদ্ধিহাট। সেই যেখানে রাধারমণ আশ্রম বানিয়েছিলেন।

ভাস্কর প্রশ্ন করে : চলছে কেমন আশ্রম ?

কবে উঠে গেছে !

ফোঁস করে গৌরদাস নিশ্বাস ফেলল : বাবার অযোগ্য সন্তান। তাঁর কোন কীর্তিটাই বা রাখতে পেরেছি ! আশ্রমের ক'খানা কুড়েঘর মাত্র আছে, আমাদের বসতবাড়ি এখন।

সেই কুড়েঘরের উপর বিষম টান পড়ে গেছে হঠাৎ—ছুটি তার জন্য এক আধ দিন নয়, পুরো মাস আবশ্যক। ছাঁৎ করে একটা সম্ভাবনার কথা মনে উঠল : ভাস্করকে নজরবন্দি অবস্থায় রেখে গৌর-দাসই বসে চলল নাকি ? নিজে গিয়ে তেজামল্লিকের কাছে কাগজপত্রের কারসাজি বুঝিয়ে দিয়ে আসবে। লম্বা ছুটি নিয়ে গ্রামে যাবার অন্য কোন মানে হতে পারে এ ছাড়া ? নিঃসন্দেহে তাই। ধূর্ত হাসি মাখানো যেন গৌরদাসের মুখে—হাসির মধ্যে পড়া যাচ্ছে : তোমরা বেড়াও ডালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায়।

ভাস্কর বলে, তোমার অবর্তমানে এদিকবার ব্যবস্থা ঠিক ঠিক চলবে তো ?

কোন ব্যবস্থার কথা বলছ ?

ভাস্কর জ্বলে উঠে বলে, এই যে নজরে নজরে রেখেছ আমায়। ভণ্ডামি রাখো। ভাব দেখাচ্ছ, কোন-কিছুই জানো না—নিপাট ভাল মানুষ !

গৌরদাস নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছে। কিন্তু ইউনিয়নে আমি একা নই – খুঁটিনাটি সত্যিই জানি নে। জানা নিশ্চয় উচিত ছিল। কিন্তু কিছুদিন থেকে বড় উদ্বেগের মধ্যে আছি—ওদিকে একেবারে মন দিতে পারি নি।

ভাস্কর বলে যাচ্ছে, দিনে রাত্রে নজর এড়িয়ে কোনখানে এক-পা আমার যাবার উপায় নেই। গাড়ি না নিয়ে একদিন হেঁটে বেরুলাম।

বলিহারি ব্যবস্থা তোমাদের—স্কুটারের বদলে মানুষ অমনি পিছু নিল। ধরে ফেলেছিলাম—হাত-কাটা মানুষ, এক হাতের কনুই অবধি নেই।

আরে সর্বনাশ! মহাদেব তার নাম—নুলো-মহাদেব। হাত-কাটা দেখে হেলা কোরো না—মহাদেব একটা হাতেই রাবণের বিশ হাতের ক্ষমতা ধরে। এক হাতে এমন ছোরা মারবে, একটা অঙ্গ ছিটকে পড়লেও টের পাবে না। আবার শুনতে পাই, ওর হেপাজতে বিনি-লাইসেন্সের বন্দুক-পিস্তলও থাকে।

চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে গৌরদাসের। বলে, নুলো-মহাদেব অবধি নেমে পড়েছে—এতদূর আমি জানতাম না। বড় কাজের মানুষ।

কতখানি সত্যি আর কতটা ভয়-দেখানো কথা, ভাস্কর নির্ণয়ের চেষ্টা করে। গৌরদাস গজর-গজর করছে: গুম-খুন চোরাগোপ্তা মারধোর আমি বিষম ঘেন্না করি। মানুষ হও তো বুক ফুলিয়ে সামনা-সামনি লড়ো গিয়ে। কিন্তু গোঁয়ারগোবিন্দ ছোঁড়ারাই আজকাল দলে ভারী।

ভাস্কর বলে, গুম-খুনের কথাও হচ্ছে নাকি?

আমার সামনে কী হয়! কত ধানে কত চাল, কাণ্ডজ্ঞান নেই ওদের। মজুরের লাস গাছতলায় পড়ে থাকে, ঝিলের জলে ভাসে—পুলিশে আস্কারা করে না। লাস মজুরের না হয়ে উপরওয়ালার হলে পুলিসে তখন কি করবে—এমনি সব বলাবলি হয়েছিল নাকি। বলেছিল গোপনে, আমার কান অবধি তবু গড়িয়ে এলো। কড়কে দিয়েছি খুব।

ভাস্কর উত্তেজিত হয়ে বলে, মগের মুলুক পেয়েছে কিনা! খবরটা বলে দিলে, ভাল হল। এবার থেকে পুলিশ নিয়ে চলাফেরা হবে।

গৌরদাস বলে, কী দরকার! তোমার বদনাম রটে যাবে—নিজে অত্যাচারী বলেই এত সামাল-সামাল। সত্যি সত্যি নও তা তুমি। হাসাহাসি করবে ভিন্ন রাজ্যের লোকে: দেখ, সাহেবরা কত সুন্দর

চালিয়ে গেছে—বাঙালি কর্তা হয়ে এসে যত গণ্ডগোল। সুরাহাও কিছু হবে না, উল্টে বেশি করে মানুষ ক্ষেপানো হবে।

জোর দিয়ে আবার বলে, কোন দরকার নেই। প্রতিকারের ব্যবস্থা হয়েছে। ব্যবস্থা যারা করেছে, নিজেদের লোক বলেই ঘাঁতঘোঁত বেশি জানে তারা—পুলিসের চেয়ে বেশি দক্ষ এই ব্যাপারে। সর্বক্ষণ তোমায় নজরে নজরে রেখেছে, মন্দ লোকে হুট করে কিছু করতে না পারে। রাস্তায় বেরিয়ে ওদের দেখতে পাও, আবার রাত্তিরে যখন ঘুমিয়ে থাক তেখনও কয়েকটা ছোঁড়া পালা করে পার্ক স্ট্রীটে নজর রাখে। সবাই হুটকো নয়, বুদ্ধিবিচার আছে অনেকেরই। কলসির দৈত্য তুমি বের করেছ, নির্গোলে ফের কলসিতে ঢোকানো তোমার পক্ষেই সহজ সকলের চেয়ে। হাই-স্পীড মেশিনারি বাতিল করে দাও—করবেই যখন। বাপকে তুমি কী চোখে দেখ জানি—ন্যায় অন্যায় যা-ই হোক, বাপকে বাঁচানোর জন্য শেষ পর্যন্ত করতেই হবে তোমায়। দেরি করে গোলমাল বাড়িও না। ঐ আপদসরিয়ে দিয়ে তারপর ডঙ্কা মেরে যেখানে খুশি বেড়িও, কেউ আর চোখ তাকিয়ে দেখবে না।

মোটের উপর চক্রান্তটার আন্দাজ পাওয়া গেল। মরীয়া এরা। নতুন মেশিনারির হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত ভাস্করকে নড়ে বসতে দেবে না। গৌরদাস যাই বলুক, খুনখারাবির জন্যেও তৈরি। পুলিশ নিয়ে কিছু করতে গেলে—গৌরদাস মোক্ষম অস্ত্র নিয়ে বসে আছে, তখন আর মুহূর্তের রেহাই করবে না। নীরদকে হাতকড়া পরিয়ে অন্ততপক্ষে একটা রাত হাজত বাস করিয়ে ছাড়বে। লাভ না-ও যদি হয়, প্রতিহিংসা নেবে।

সুখ-দুঃখের সুহৃৎ সিতাংশুকে ডেকে ভাস্কর পরামর্শ করে। গৌরদাসের সঙ্গে যত কিছু কথাবার্তা, সমস্ত বলল। বলে, বম্বে যাবার মতলবটা দিয়েছিলে তুমি। আমায় নজরবন্দি রেখে গৌরদাসই আগেভাগে চলল।

সিতাংশু প্রত্যয় করে না। বলে, বিস্তর ঘাটের জল-খাওয়া ঘুঘু-

ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট হল তেজা মল্লিক। তাকে ভেজানো সহজ নয়। গৌরদাসকে সে আমল দেবে না, দেখাই করবে না মিলের নগণ্য কর্ম-চারীর সঙ্গে।

একটুখানি ভেবে নিয়ে আবার বলে, খেলাচ্ছে এখন তোমায়। তোমার কাছে পুরোপুরি নিরাশ না হওয়া অবধি অস্ত্র ছাড়বে বলে মনে হয় না। তাহলেও খবর নিতে পারি। পূজো দেখার নেমন্তন্ন আছে বসিরহাটে—আমার এক বন্ধু বিশেষ করে লিখেছে। গূঢ় ব্যাপারও কিছু আছে। জমিদার সে—জমিদারি চলে গিয়ে এখন ব্যবসায়ে কিছু টাকা লগ্নি করতে চায়, সেই পরামর্শ। আমাদেরও টাকার দরকার। পূজো দেখতে যাই বসিরহাটে, ড্রাইভারকে ওখান থেকে সিদ্ধিহাট পাঠাব। খুব চালাক সে, আর বিশ্বাসী। চুপিসারে গৌরদাসের খোঁজ নিয়ে আসবে।

তাই হল। নবমীপূজার দিন সিতাংশু বসিরহাট গিয়েছিল। ফিরে এসে ভাস্করকে বলে, বম্বে নয়—সিদ্ধিহাটেই আছে ভাস্কর। পাকা খবর।

ভাস্কর বলে, জমজমাট লড়াইয়ের মধ্যে সেনাপতি ভেগে পড়ল—ব্যাপার কি বল তো?

সিতাংশু হেসে বলে, ঈশ্বর হয়তো সুমতি দিয়েছেন। অযোগ্য সন্তান বাপের ভাঙা আশ্রম গড়েপিটে তুলছে হয়তো।

ভাস্কর বলে, সুমতি এত তাড়াতাড়ি আসতে যাবে কেন? বিপদ কাটিয়ে উঠে ঘাড় ধরে কারখানা থেকে যেদিন বের করে দেব, তখনই তো আশ্রমে যাবার সময়।

সিতাংশু আরও এক বিচিত্র খবর দিল—জলধর নামে একটি মানুষের সে দেখা পেয়েছে।

॥ আট ॥

বসিরহাটে পুজো দেখে এবং বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসায়িক কথাবার্তা সেরে সিতাংশু কলকাতা ফিরছে। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, রাস্তাঘাট ভাল নয়। ড্রাইভারকে তাড়া দিচ্ছে : জোরে চালাও, আরও জোরে—

এক জায়গায় এসে আটকে গেল। বড্ড ভিড়। গাড়ির স্পীড কমিয়ে হর্ন দিতে দিতে ভিড়ের ভিতর পথ করে এগোতে হচ্ছে। বারোয়ারি দুর্গোৎসব, প্রতিমা দেখা যায় পথের উপর থেকেই। যাওয়ার সময়ও এই পথে গেছে, ভিড়-টিড় ছিল না—ওদিকে নজরই পড়ে নি তখন।

জাঁকের পুজো বটে। বিশাল প্রতিমা, দুই মানুষের সমান। মস্তবড় প্যাণ্ডেলে সতরঞ্চির উপর চাদর পেতে আসর সাজানো। আসরের ঠিক মাঝখানে রকমারি বাদ্যযন্ত্র, মানুষও কিছু কিছু বসে গেছে। যাকে বলা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—সেই জিনিষের আরম্ভ বুঝি এইবার। এত ভিড় সেই জন্য।

চমকিত হয়ে সিতাংশু বলে ওঠে, গাড়ি রোখো ড্রাইভার—এই জায়গায়। আমি নামব।

নেমে পড়ে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলাম ভিড় ছাড়িয়ে রাস্তার পাশে বটতলার দিকে গাড়ি রাখতে। দেরি হবে—কতক্ষণ হবে কিছু বলা যাচ্ছে না।

সাহেবি পোশাকের একটা মানুষ হঠাৎ গাড়ি থেকে নেমে পড়ল—তাকাতাকি করছে অনেকে। সিতাংশু ভিড়ের ভিতর ডুবে গেল।

পান-বিড়ি-সিগারেটের অস্থায়ী দোকান সারি সারি—এক দোকানে জন তিনেক বিড়ি কিনছে, বিড়ি ধরিয়ে প্যাণ্ডেলের পাশ দিয়ে তারা ভিতর দিকে চলল। নজর তাদের মধ্যে একটির উপর যার নাম জলধর। পরিচয় হল পরে।

প্যাণ্ডেল ছাড়িয়ে আরও খানিক পিছনে জীর্ণ প্রাচীন অট্টালিকা। বাইরের চাতালটা হোগলায় ঘিরে সাজঘর করেছে—বিড়ি টানতে টানতে জলধর সাজঘরে ঢুকে গেল।

আরতি শেষ। পূজামণ্ডপের ভিড় সরে এবার যাত্রার আসর জমছে। সিতাংশু জুতো খুলে প্যাণ্টলুন সুদ্ধ গড় হয়ে ঠাকুর-প্রণাম করে। পিতলের থালার উপর সিকি-আধুলি-পয়সার প্রণামী ছড়ানো—ব্যাগ খুলে সিতাংশু ধীরে-সুস্থে দুটো দশ টাকার নোট নিয়ে থালার উপর রাখল।

পুরুতঠাকুর চাঙারিতে নৈবেদ্য ঢালছিলেন, কাজ ভুলে অজ্ঞাত-পরিচয় ভক্ত মানুষটির দিকে তাকিয়ে পড়লেন। পূজা-কমিটির সেক্রেটারি হয়েছেন এবারে আশু পাঠক।—হতে পারেন নি নবদ্বীপ ঘোষ। ইতস্তত ঘুরছিলেন তাঁরা, খবর শুনে পরিচয় করতে ছুটলেন।

নিবাস কোথা সাহেবের ?

সিতাংশু বলে, কোথায় আবার—কলকাতা। কলকাতা ভবানীপুরে বাড়ি। কর্মসূত্রে অবশ্য কোয়ার্টারে থাকতে হয়। দেবীপুজার দিনে নতুন একটা কাজের কথাবার্তা হল। তাই ভাবলাম, মাকে প্রণাম করে যাওয়া উচিত।

পুরুতঠাকুর অতএব সংক্ষেপে কিছু দেবীমাহাত্ম্য শুনিয়ে দেন। একশ' বছরের পূজো—বেশি ছাড়া কম নয়। জায়গার নামও সেইজন্য দুর্গাতলা। জমিদার সিংহবাবুরা পুজো করতেন—তাঁদের অট্টালিকার সামান্য অবশেষ ঐ পিছন দিকে। সিংহবাবুরা উৎখাত হয়ে গেলেন, গাঁয়ের অনেকের উপর তখন স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হল : বছরে একবার এসে সকলকে দেখেশুনে যাই, তোরা সব বর্তমান থাকতে সেটা যেন বন্ধ না হয়। সর্বসাধারণ সেই থেকে ভার নিয়েছে, পুজো একটি বছরও বন্ধ থাকে নি। জাঁকজমক বরঞ্চ বেড়েছে।

পুরুত বললেন, প্রসাদ পেয়ে যেতে হবে।

সিতাংশু লুফে নেয় কথাটা : নিশ্চয়, নিশ্চয়। মায়ের প্রসাদে

'না' বলব, এত বড় বুকের পাটা নেই আমার। কোন দিকে যেতে হবে বলুন।

ভাঙা অট্টালিকার অন্দরের দিকে পূজোর ভাঁড়ার। সেখানে এক হাতল-ভাঙা চেয়ারে খাতির করে নিয়ে বসাল। রেকাবি-ভরা প্রসাদ—কয়েক রকমের মিষ্টি ও ফল।

সিতাংশু হেসে বলে, করেছেন কি! প্রসাদ কণিকামাত্র—ভক্তি ভরে মাথায় আর মুখে ঠেকাই। আচ্ছা, শুনবেন না যখন কমলালেবুর কোয়া কয়েকটি তুলে দিন। আর কিছু নয়।

কনসার্ট শুরু ওদিকে, পালার অতএব দেরি নেই। আশু পাঠক প্রস্তাব করেন: আসরে যাই চলুন। একটুখানি শুনে যাবেন। সকলে খুব উৎসাহ পাবে।

যাবই তো—

তড়াক করে সিতাংশু উঠে দাঁড়ায়। যা বলা যায়, তাতেই রাজি। মিশুক ও অমায়িক লোক। অথচ কেমিক্যাল ওয়ার্কসের ম্যানেজারের অফিসে ঢুকে দেখ—সেখানে আলাদা একজন সিতাংশু।

সিতাংশু বলে, যাত্রাগান এক সময়ে কী ভালবাসতাম! কলেজে পড়ি তখন—হস্টেল পালিয়ে কতদিন যাত্রা শুনতে গেছি। মথুর-সা'র দল, ভূষণ-দাসের দল—সে কালের নাম-করা সব যাত্রাপার্টি। এখন আছে কিনা জানি নে।

নবদ্বীপ ঘোষ বলেন, খাঁটি জিনিষ কোথায় পাবেন এখন? যাত্রার মধ্যে এরা এখন ছুনিয়াসুদ্ধ ঢুকিয়ে দিয়েছে—থিয়েটার, সিনেমা সার্কাস যুযুৎসু মায় ম্যাজিক অবধি। যার যেটা। পছন্দ বেছে নিয়ে দেখ।

আশু পাঠকের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলেন, এই জন্যেই মাথা ভাঙাভাঙি করেছিলাম, দরকার নেই মশায় যাত্রাগানের।

আশু পাঠক রাগ করে বলেন, বেশ তো, পরখ হয়ে যাচ্ছে এইবার। আগে থেকে কান-ভাঙানোর কী দরকার! গিয়ে

বসুনগে সবাই—পায়ে পেরেক ঠুকে দেওয়া হচ্ছে না, যার ভাল না লাগবে বেরিয়ে চলে যাবেন।

সিতাংশু আগেই উঠে পড়েছে। হাতল-ভাঙা চেয়ারও চলল তার পিছু পিছু। কুড়ি টাকা দিয়ে ঠাকুর প্রণাম করে, এ হেন ভক্তজনকে সাধারণের সতরঞ্চিতে বসতে দেওয়া যায় না। পরনে ট্রাউসার, জাপটে বসার উপায়ও নেই তার।

নবদ্বীপ ঘোষও একটা মোড়া সংগ্রহ করে সিতাংশুর পাশে বসে পড়লেন। ফিসির-ফিসির করেন কানের কাছে: পার্ট অবধি মুখস্থ করে নি, দেখুন। প্লেয়াররা বরঞ্চ চুপচাপ থাকুক, গলা চড়িয়ে প্রম্পটার একাই সকলের সব-কিছু বলে যাক। হচ্ছেও তো সেই ব্যাপার। ছ্যা-ছ্যা, এদেরই নামে সেক্রেটারি তো মূর্ছা যাবার গতিক। ভিতরে কি আছে, জানি নে বাবা। বায়না একদিন হয়ে শান্তি হল না, কাল আবার আছে এই ভূতের নৃত্য।

যার উদ্দেশে বলা, তার কিছু কানে ঢোকে না। আসরের দিকে এক নজরে তাকিয়ে সিতাংশু মগ্ন হয়ে পালা দেখছে। নবদ্বীপের এদিকে মারাত্মক অবস্থা। নিরপেক্ষ একজনকে দলে পাবেন, এই ভেবে জায়গা নিয়ে বসেছেন। মরি-মরি করে এখন পালা শুনে যেতে হচ্ছে। নয় তো কথা উঠবে, থিয়েটার আনার প্রস্তাবে হেরে গেছেন বলেই যাত্রার উপর এমন খড়্গহস্ত। আশু পাঠক ষড়যন্ত্র বলে বেড়াবেন।

ছুটো অঙ্ক পুরো শেষ করে তবে বুঝি সিতাংশুর চৈতন্য হল। হাতঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়: আরে সর্বনাশ, একটা বাজল যে!

নবদ্বীপ আক্রোশ ভরে বলেন, তিনটে অঙ্ক বাকি এখনো সাহেব। শেষ হতে সকাল। শেষ করে তারপর একটু চা-টা মুখে দিয়ে চলে যাবেন।

কাজ আছে যে, নইলে তাই করতাম। বলতে হত না।

আশু পাঠক খানিকটা পথ এগিয়ে দিচ্ছেন। সিতাংশু বলে, খাসা জমিয়েছে। ছেড়ে উঠতে মন চাইছে না। কিন্তু দিনমানে বিশ্রাম পাই নে, একটুখানি না ঘুমলে বাঁচব না। কালকেও তো আছে শুনলাম। দেখা যাক, যদি আসতে পারি—

ঘুমিয়েছে সিতাংশু এগারোটা অবধি। বিকালবেলা ভাস্করের সঙ্গে দেখা করে সংবাদ বলল: জলধর সেই মানুষটার নাম। রাজা অম্বরীষ সেজেছিল।

॥ নয় ॥

আহা-মরি যাত্রাগান—হিংসায় পড়ে নবদ্বীপ ঘোষ যা-ই বলুন, কেমিক্যাল ওয়ার্কসের ম্যানেজার হেন ব্যস্ত মানুষ পরের দিনও চলে এসেছে। রাস্তার ধারে বটতলায় অন্ধকারে গাড়ি রেখে পায়ে পায়ে দুর্গামণ্ডপে এসে হাজির হল।

মণ্ডপ খালি। প্রতিমা নেই, নিরঞ্জনে বেরিয়ে গেছে। আশু পাঠক দূর থেকে দেখে হন্তদন্ত হয়ে ছুটছেন: আসতে আজ্ঞা হয়। চেয়ারটা গেল কোথা রে? দেখ্ দেখ্, শিগগির এনে পেতে দে।

সিতাংশু বলে, কাল ঐ যে শুনে গেলাম—অনেক দিন পরে শোনা তো, একটা দিনেই দিব্যি নেশা ধরে গেছে। যাত্রা শোনা নিয়ে কত যে বকুনি খেতাম বাবার কাছে!

যাত্রা নাকি জমে নি, কারা বলছিল?

আশু পাঠক চারিদিকে গর্বভরে চোখ ঘুরিয়ে নিলেন: বলি, শুনতে পাচ্ছ সব? ডেকে আনো সেই হেঁড়া মানুষ ক'টাকে যারা নিন্দে রটিয়ে বেড়ায়। বুকের পাটা থাকে তো সমজদার মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে-যাক। কাল ঐ রাত অবধি শুনে গেছেন,

কাজকর্ম ফেলে গাড়ির তেল পুড়িয়ে টানে টানে আজকে আবার আসতে হল।

বলেন কি, এমন জিনিষেরও নিন্দে।

সিতাংশু যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলে, দেশের বাইরেও অনেক জায়গায় গিয়েছি। এই সেদিনও কন্টিনেণ্ট ঘুরে এলাম। নাটক দেখা আমার চিরকালের নেশা। বিদেশের বড় বড় থিয়েটার দেখেছি—কিন্তু যাত্রা হল আলাদা জিনিষ, ভিন্ন রস। কোন দেশের কোন অভিনয়ের সঙ্গে এর তুলনা চলে না।

গাওনা কাল যাচ্ছেতাই হয়েছে, আশু পাঠক নিজেও কি সেটা জানেন না? চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আসরের উপর দমাদম পুরানো বাড়ির ইটপাটকেল পড়তে লাগল, দূরদূরান্ত থেকে লোক এসেছে, বিরক্তি ও রাগে তারাই ইট মারছে। এ নিয়ে রসিকতাও হল: ভাল গেয়ে মেডেল পায়—পিতলের মেডেল কোন্ কাজে লাগে শুনি? ইট বোধহয় তিন-চার গাড়ি জমে গেল। গাড়ি বোঝাই দিয়ে নিয়ে যাও যাত্রার মশাইরা, তোমাদের দালানকোঠা হতে পারবে।

এমনি অবস্থার পরেও সিতাংশু পালা শুনতে এসেছে। আশু পাঠক হাতে স্বর্গ পেলেন। সিতাংশুর এক একটা কথার পরে সকলের উপর একবার করে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেন। সব চেয়ে বেশি শোনা উচিত নবদ্বীপ ঘোষের, সেই মানুষটাই অনুপস্থিত। প্রতিমার সঙ্গে গিয়েছে, শিং ভেঙে বাছুরের দলে মিশে ঘাটে ঘাটে হল্লা করে বেড়াচ্ছে। সেক্রেটারি বলে আশু পাঠক পূজাস্থান ছেড়ে নড়তে পারেন নি।

ভাঙা চেয়ারটা এসে পড়লে কোঁচার কাপড়ে ঝেড়েপুঁছে স্বহস্তে আশু এগিয়ে দিলেন: বসে পড়ুন সার। যাত্রা বসতে আজকে কিন্তু বেশি রাত হবে। আমি বলি, দরদালানে ঘুরে ঘুরে ততক্ষণ ঠাকুর-ঠাকরুনদের দেখে আসুন। সময়টা কাটবে ভাল।

সিতাংশু আঁতকে ওঠে : রাত হবে কেন ? দল বুঝি হাজির নেই ?

হেসে আশু পাঠক নির্ভয় করেন : টাকা দিয়ে বায়না-করা দল—যাবে কোথায় ? হুকুম দিলে দশ মিনিটে নেমে পড়বে। কিন্তু আসল যিনি পালা শুনবেন, তিনিই যে গরহাজির এখন।

ধাঁধার মতো কথাগুলো—আশুই আবার প্রাঞ্জল করে দেন : পুজোআচ্চা বলুন গান-বাজনা বলুন সবই মা-দুর্গার নামে। আমরা বুঝতে পারিনে—কিন্তু এই দুর্গাতলায় জাগ্রত মা-জননী নিজে হাত পেতে পুজো নেন, চোখ মেলে পালা দেখেন। এখন মা জলে জলে ঘুরছেন, ফিরে না এলে যাত্রা বসে কি করে ?

দুর্গাতলার পুজোর এক বিশেষ নিয়ম—প্রতিমা নৌকোয় তুলে নদীর উপর টহল দিয়ে বেড়াবে, কিন্তু বিসর্জন হবে না। ফিরিয়ে এনে রাখবে সিংহবাবুর প্রাচীন দরদালানের ভিতর। অতঃপর নড়া-চড়া নেই আর, পাকা হয়ে রইলেন। আগের আগের মায়েরাও সব আছেন, তাঁদেরই ভিতর ঠাঁই হবে একটা।

আশু পাঠক বলছেন, ফিরে এসে মা দরদালানে ঠাণ্ডা হয়ে বসুন, যাত্রা তারপরে। কাল মা মণ্ডপ থেকে শুনলেন, আজকে সবগুলো মা একসঙ্গে গলাগলি হয়ে দালান থেকে শুনবেন। তাই বলছিলাম, এই ফাঁকে পুরানো-মায়েদের ঘুরেফিরে দর্শন করে নিন। গায়ে কাগজ সাঁটা আছে, কোন্ মা-জননী কোন্ বছরের চিনে নিতে অসুবিধা হবে না।

ভাঙাচোরা দরদালানে আলোর ব্যবস্থা নেই, হ্যারিকেন ধরে একজন আগে আগে চলল। সেই সিংহবাবুদের আমলের প্রতিমা থেকে শুরু—প্রতিমা আর নেই, রং চটে মাটি খসে ভিতরের তাবৎ খড়-দড়ি হাঁ করে রয়েছে। বছরের পর বছর হিসাবে আছেন সব লাইন-বন্দি—দিব্যি একটা প্রগতির ইতিহাস পাওয়া যায় : মা যা ছিলেন, মা যা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

এক পাক ঘুরে দেখে সিতাংশু বলে, মিটমিটে আলোয় দেখে মন ভরে না, দিনমানে এসে ভাল করে দেখব একদিন। চাতালের ঐ

ওঁরাই বুঝি যাত্রার মানুষ? বড্ড মাতিয়েছিলেন কাল। সমস্ত পার্ট ভাল হয়েছে। বিশেষ করে, ঐ যে কী বলে---রাজা অম্বরীষ যিনি সাজলেন।

খাতির করে জন কয়েক সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল, তারা এ ওর মুখে তাকায়। বলেন কী ভদ্রলোক—অম্বরীষ সর্বশ্রেষ্ঠ? চতুর্থ অঙ্কে কাল ঢিল পড়েছিল অম্বরীষের কারণেই। লোকটার গুণের মধ্যে চেহারাখানা, আর আছে গলা। সে গলার কাছে ব্যাঘ্রগর্জন হার মানে। আসরে এসে শুধু সেই গলারই প্রতাপ দেখায়। শোকে হোক, উল্লাসে হোক, রণে হোক, প্রেমালাপে হোক, হুঙ্কারের ইতর বিশেষ নেই। তার জন্য অবশ্য ক্ষতি হয় না। শ্রোতাদের রাজরাজড়া দেখা নেই—তারা ভাবে, রাজকণ্ঠ সর্বক্ষণই বুঝি মারমুখি হয়ে থাকে। কিন্তু কাল বিপর্যয় কাণ্ড। নেশার উপর ছিল নিশ্চয় জলধর—কায়ক্লেশে কোন প্রকারে চতুর্থ অঙ্ক অবধি এসে অবস্থা এমন দাঁড়াল, প্রম্পটারের মুখে কথা বেরুতে দেয় না, একাই সব বলে দেবে। রাজা অম্বরীষ তো আছেই—তার উপর মহারাণী নারদ-ঋষি দূত একনাগাড়ে সব বলে যাচ্ছে। এতদূর আর সইল না লোকের—ছুম করে একটা ঢিল। নানান দিক দিয়ে তখন বৃষ্টিধারার মতো ঢিল পড়তে লাগল।

এই মানুষের কথায় সিতাংশু পঞ্চমুখ। বলে, মানিয়েছিল কী চমৎকার! আসরে এলেন, তারপর আমি আর চোখ ফেরাতে পারি নি। সেকালের নেটিভ-স্টেটে ঘোরা আছে আমার, বিদেশেও দেখে এসেছি। আসল রাজাও এমন সুন্দর হয় না।

যাত্রাদলেরই একটি এদের সঙ্গে ঘুরছে। নিন্দেমন্দ শুনে শুনে কান ঝালাপালা, তার মধ্যে এইসব প্রশংসার কথায় বুক ফুলে দশ হাত হল। জলধরের সঙ্গে একটু বিশেষ মাখামাখি তার, দু'জনে একই দিনে দলে ঢুকেছে। সগর্বে সেই কথা বলে, জলধর-দা হয় সে আমার। চেহারাই কেবল ভাল নয়, ঘরও ভাল। জলধর-দা সব কথা আমায় বলে। ওর ঠাকুরদা ছিলেন বড় দরের পণ্ডিত। বাপও নাকি

কলেজে পড়াতেন, লাখপতি হবার নেশায় পড়ে ব্যাপারবাণিজ্যে সর্বস্ব ফুঁকে দিলেন।

সিতাংশু অন্তরঙ্গ ভাবে মানুষটার কাঁধে হাত দিয়ে উৎসাহ দেখায় : বটে, বটে।

ব্যবসা ফেল হয়ে অকালে মারা গেলেন তিনি। তা লাখ টাকা না-ই পান, ছেলে যা একখানা পেলেন লাখপতির ঘরেই মানায়। বলুন? দলের মধ্যে আলাদা ইজ্জত। আমি এই বঙ্কিনাথ ভদ্দোর —তেমনি সব রয়েছে গোপীকিষ্টো, তিনকড়ি, নারাণ, পেল্লাদ। কিন্তু ওঁর নামের সঙ্গে বাবু জুড়ে বলতে হবে—শুধু জলধর নয়, জলধরবাবু। খানিকটা লেখাপড়া নিজেও না শিখেছেন এমন নয়, কিন্তু হলে হবে কি, খামখেয়ালি ক্ষ্যাপা মানুষ—

সিতাংশু ব্যস্ত হয়ে বলে, আছেন জলধরবাবু? একটু আলাপ-পরিচয় করব।

বঙ্কিনাথ বলে, না থেকে যাবে কোথা? এর নাম যাত্রাদল—আইন জেলখানার চেয়েও কড়া। ঘোরাঘুরি যত কিছু বেলাবেলি সেরে রাখুন—বেলা ডুবেছে কি, এক-পা আর নড়তে দেবে না। আসরের গাওনা থাকুক আর না থাকুক। গাওনা না থাকলে রিহার্শালে নিয়ে বসাবে।

গত রাত্রির মহারাজ অম্বরীষ ও আর কয়েকটি মিলে ফ্লাশ খেলছে। মহা উত্তেজিত।

বঙ্কিনাথ ডাকল, ও জলধর-দা, তাস রেখে তাকাও একটিবার এদিকে।

কেবা শোনে কার কথা!

বঙ্কিনাথ বলে, কানে যাচ্ছে না জলধরবাবু?

জলধর খিঁচিয়ে ওঠে : যা যা, গণ্ডগোল করবি নে এখন। দেখছিস যে কাজে রয়েছি।

বষ্ঠিনাথ কিছু গরম হয়ে বলে, কী আশ্চর্য! সার এসেছেন আলাপ-পরিচয় করতে—

নির্বিকার জলধর বলে, দেরি হবে।

সিতাংশু মোলায়েম হেসে বলে, তাড়া দিও না, ব্যস্ত কিসের? আমিই অপেক্ষা করব।

একজনে ইতিমধ্যে ছুটে গিয়ে হাতল-ভাঙা চেয়ার নিয়ে এল, সিতাংশুর পিছন পিছন কাল থেকে যার টানাটানি চলছে।

বষ্ঠিনাথ বলে, তোমার অ্যাকটিং সারের বড্ড ভাল লেগেছে। মেডেল দেবেন।

বেশ তো, দেবেন।

যেন অতিশয় স্বাভাবিক ব্যাপার, বিস্ময়ের কিছু নেই। বলে, রোজগারে বসছি, কেবলই তুই বাগড়া দিচ্ছিস। এত কথা বলতে বলতে মাথার ঠিক থাকে!

চেয়ারে না বসে সিতাংশু খেলার পাশে দাঁড়িয়ে জলধরের রোজগারের বহর দেখছে। একটানা হেরে যাচ্ছে, তবু উৎসাহের অবধি নেই। ব্যাগ খুলে হারের পয়সা শোধ করে দিয়ে বলে, লোকসান পুষিয়ে পুরো দশখানা টাকা মুনাফা করে ফেলি, কথাবার্তা যত-কিছু তার পরে।

চুপচাপ কিছুক্ষণ। বষ্ঠিনাথ পুনরায় টোপ দিচ্ছে: মেডেল দেবেন বলে সার এসেছেন। পিতল নয় রুপো নয়, খাঁটি সোনার মেডেল।

রীতিমতো চটে গিয়ে জলধর বলে, বললাম তো সবুর করতে হবে। না পোষায় চলে যেতে পারেন।

অদৃষ্ট ভাল, সবুর বেশি করতে হল না। মনিব্যাগ ঝেড়েঝুড়ে উলটেপালটে দেখা গেল সাকুল্যে তিন আনা। নিশ্বাস ফেলে জলধর বলে, ভাত না হলেও বিড়ির খরচা তো চাই। থাক তবে এই পর্যন্ত।

রণে ভঙ্গ দিয়ে লাট্টুর মতন পাক খেয়ে সিতাংশুর দিকে ঘুরল : কি আলাপ-পরিচয় করতে চান, বলুন।

জমাতে হবে মানুষটির সঙ্গে। একগাল হেসে ঘনিষ্ঠ সুরে সিতাংশু প্রশ্ন করে : নাম তো পেয়েছি, দেশ কোথা আপনার ?

সে তো বঙ্কিনাথই বলে দিতে পারত। এর জন্যে কাঠ হয়ে আপনি পাশে দাঁড়ালেন, বঙ্কিনাথটা ভ্যানর-ভ্যানর করতে লাগল। দুয়ে মিলে দফাটি সারলেন, হেরে মরলাম।

প্রতিপক্ষ লোকটা এ-পকেট ও-পকেট থেকে বিজয়ের পয়সা নিয়ে একত্র করছে। সগর্বে বলে, হার তোমার আজ নতুন নাকি জলধরবাবু ?

সুযোগ পেয়ে সিতাংশু একটু খোশামুদি করে নেয় : হারুন আর যা-ই করুন, জলধরবাবু খেলেন কিন্তু বড় ভাল।

জলধর তিক্ত স্বরে বলে, পদাবেন না আমায়। ভাল তো খেলতে চাই নে, জিততে চাই। জিতে দশ-বিশ টাকা পকেটে ফেলব। তা মশায়, খেলা কত রকমই তো খেললাম, আমার বাবাও সারা জন্ম খেলে গেছেন। জিত নেই আমাদের কপালে। হারের পর হার।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল হঠাৎ সিতাংশুর উপর : কী তাজ্জব চিজ আমি মশায়, অমন একনজরে তাকিয়ে রয়েছেন। চোখের টর্চ দুটো সরিয়ে ফেলুন, গা শির শির করে। এত বড় জায়গাটার মধ্যে আর কিছু দেখবার নেই আমি মানুষটা ছাড়া ? কাল আসরেও লক্ষ্য করেছিলাম।

বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ নয় সিতাংশু। বলে, যে সে মানুষ নন আপনি। ললাটে রাজটিকা—

বটে, বটে !

রাগ গিয়ে জলধর হাসিতে ফেটে পড়ছে : পকেটে পুরো সিকিটাও নেই, ললাটে রাজটিকা নিয়ে ঘুরছি। শুনতে খাসা লাগে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আরও একবার তাকিয়ে দেখে সিতাংশু জোর দিয়ে বলে, রাজা হবেন নির্ঘাত। কেউ রোধ করতে পারবে না।

জলধর বলে, হচ্ছিই তো রাত্রে রাত্রে। কোনো আসরে বাদ যায় না।

বদ্যিনাথ জুড়ে দেয়ঃ পাঁচখানা পালা আমাদের। জলধর দা সবগুলোতেই রাজা।

জলধর বলে, চুক্তি আমার সঙ্গে তাই। রাজার পার্ট ছাড়া করব না। স্বপ্নেই যদি খেতে হল, মুড়ি খেতে যাব কেন বলুন। খাব পোলাও, খাবো কোপ্তাকাবাব। অভিনয়ই করব তো রাজা। কাল ছিলাম রাজা অম্বরীষ, আজকে মহারাজ যযাতি।

যাত্রাদলের আর একটি গোপীকিষ্টো—এসে গেল এই সময়। বুড়োআঙুল আন্দোলিত করে হাসতে হাসতে সে বলে, লবডঙ্কা! কালকের অমন আসর মাটি করেছ, যযাতি আজকে আমি করব। মোশানমাস্টার তাই তো রপ্ত করাল এতক্ষণ ধরে। তুমি করবে জনৈক বনবাসী—আমার যেটা ছিল।

জলধর গর্জন করে ওঠেঃ ইয়ার্কি? রাজা ছাড়া অন্য কিছু হব না—কিছুতেই না। চুক্তি যা আছে।

সিতাংশুও লুফে নিয়ে বলে, নিশ্চয়। যাত্রার রাজা কেন, আসল রাজা। এত বড় রাজলক্ষণ বৃথা যাবে বুঝি? কায়দায় লাগছে না তাই।

তাই বুঝি? এত রাগের মধ্যেও ফিক করে হেসে পড়ল জলধর। ক্ষণে শীত, ক্ষণে গ্রীষ্ম—মানুষটার রকম বুঝি এই!

বলে, এতখানি খবর রাখেন তো আপনিই দিন না কায়দা বাতলে। বড় কষ্টে আছি মাইরি। তিনটে অপোগণ্ড শিশু বাড়িতে, ছ-মাসের মধ্যে তাদের কিছু পাঠাতে পারি নি। রাজা হলে কোনো হাঙ্গাম থাকে না। ভাণ্ডারিকে হুকুম করব, মাসে মাসে মোটা মাসোহারা চলে যাবে।

সত্যিই রাজা করব আমি—

চলে যাচ্ছিল জলধর, সিতাংশু হাত চেপে ধরল।

জলধর বলে, হাত ছাড়ুন দিকি, কী মুশকিল! অধিকারীকে দুটো শক্ত কথা শুনিয়ে আসি। দেরি হলে আমার আবার রাগ জুড়িয়ে যায়।

সিতাংশুর মুখের দিকে চেয়ে আবার বলে, ললাটে যাই থাক পকেটে মোটমাট তিন আনা। বিড়ির খরচা রেখে একটি আনা দিতে পারতাম ললাট-গণনার জন্যে। কিন্তু সাহেব মানুষের হাতে আনি দিতে লজ্জা করে।

আনি কি বলেন জলধরবাবু? টাকা নেবো—একটি হাজার অন্তত। লাখ লাখ টাকার মালিক হচ্ছেন, হাজার কি বেশি বলে ঠেকছে?

সে যেদিন হবো—

আমিও বলছি তাই। যেদিন হবেন তখন। আগাম এক আনাও নয়।

হাত ধরে আকর্ষণ করে বলে, আসুন—

কোথায়?

লোকজনের মধ্যে কী আর বলি—

কানের কাছে মুখ এনে সিতাংশু নিম্নস্বরে বলে, রাজাই হয়ে যাচ্ছেন, দেরি নেই তার। জনৈক বনবাসী সাঁজতে যাবেন কোন্ দুঃখে?

দুর্গাতলা ছাড়িয়ে রাস্তায় এসে পড়ল। জলধর বলে, নিয়ে চললেন কোথা বলুন দিকি?

হেসে সিতাংশু বলল, রাজা করতে।

কৌতুক লাগে জলধরের। বলে, রাজা করবার জন্য রাজহস্তী সেকালে পথের মানুষ শুঁড়ে জড়িয়ে পিঠে তুলে নিত। আপনার যে মশায় সেই গতিক।

সিতাংশু বলে, একালের রাজা হাতি চড়ে না, মোটরে চাপে।

ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার বটতলায় মোটরের পাশে এসে পড়েছে। সিতাংশু দরজা খুলে দিয়ে বলে, উঠুন—

সে কি মশায়, আসর যে একটু পরেই।

উঠে বসুন, নিরিবিলি ক'টা গোপন কথা বলি। একেবারে ফুঁ দিয়ে রাজা হওয়া যায় না, ক্রিয়াকর্ম আছে।

মতামতের খুব যে তোয়াক্কা রাখল সিতাংশু, তা নয়। ধাক্কা দিল আচমকা, হুমড়ি খেয়ে জলধর গাড়ির ভিতর পড়ে। সিতাংশু পাশে চেপে বসেছে। ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়ে দিল গাড়ি।

চেঁচায় না জলধর। কৌতূহল মনে মনে। গায়ে একটা শক্ত জিনিষ ফুটছে।

কোমরে কি আপনার মশায়?

সিতাংশু বলে, আপনার জন্যে নয়। দায়িত্বের কাজ করি, কত লোক চটে থাকে। কখন কোন্ বিপদ ঘটে, সেজন্য রাখতে হয়।

জলধরের দৃকপাত নেই। বলে, বুঝলাম। সশস্ত্র এসে রথে তুলে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন। কাপড়চোপড়ের এই তো বাহার, আর ব্যাগেও দেখলেন তিন আনার পয়সা। কোন্ লোভে করছেন বলুন তো, মতলবটা কি?

রাজা করব। এক জিনিষ কতবার বলাবেন আমায় দিয়ে?

গাড়ি তীরের বেগে ছুটেছে।

॥ দশ ॥

ম্যানেজারের কোয়ার্টার ফ্যাক্টরি-কম্পাউণ্ডের বাইরে। নিরিবিলি জায়গা। গাড়ি এসে দাঁড়াল, সিতাংশু নেমে পড়ে। জলধরকে ডাকে: নেমে আসুন জলধরবাবু।

থমকে দাঁড়িয়ে জলধর বলে, রাজবাড়ি নিয়ে এলেন?

রাজবাড়ি বুঝি এত সামান্য? মহামাত্যের বাড়ি। যাত্রার মহামাত্যটি দেখলাম অবিরত দাড়ি পাকান, দাড়ি না পাকিয়ে তাঁর বুদ্ধি খোলে না। একালের মহামাত্যেরা দাড়িগোঁফ-শূন্য।

মেঝেগুলো আয়নার মতন—আলো ঠিকরে পড়ছে। দিনমানে মুখ দেখাও চলে বোধহয়। এ হেন বস্তুর উপর পা ফেলে চলা চাট্টিখানি কথা নয়। বিশেষ করে জুতো পায়ে রয়েছে—যে জুতোর তলার ফুটো দিয়ে মালসা খানেক ধুলো ঢুকে আছে। পা ফেলতে কেয়াফুলের রেণুর মতন ঝুর ঝুর করে ধুলো ছিটকে পড়ে।

তবু যেতে হয়। পাশে ছিল সিতাংশু, সামনে ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে অভ্যর্থনা করে: ইতস্তত কিসের? ঘরে চলে আসুন।

ভক্তিমান শিষ্য গুরুঠাকুরকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে যেন।

যেতে যেতে জলধর বলে, অমাত্য-বাড়িতেই পা ওঠে না, রাজবাড়ি আমায় তো মশায় চ্যাংদোলা করে তুলতে হবে।

খানসামার কাছে জানা গেল, মেমসাহেবরা সিনেমায় গেছেন। গাড়ি সেইখানে পাঠাতে বলেছেন, শো ভাঙলে নিয়ে আসবে।

এমনধারা মেঝে, তারও উপর চিত্রবিচিত্র কার্পেট। কার্পেটের আহা-মরি ছবি নির্মমভাবে জুতোয় মাড়িয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে।

সোফা দেখিয়ে সিতাংশু বলে, বসুন—

একজোড়া সানগ্লাস নিয়ে এলো কোথা থেকে। বলে, পরুন

দিকি। বাইরে বেরুলে পরে থাকবেন। রাস্তায় বেরুনোর সময় তো বটেই।

সানগ্লাস পরে বড়-আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জলধর সকৌতুকে বলে, সিনেমা-আর্টিস্টরা পরে বেড়ায় দেখেছি।

মেকআপ নিয়ে রূপের ফুলঝুরি ছোটায় তারা—হতচ্ছাড়া আসল চেহারা বেরিয়ে পড়লে কেউ আর রূপবান বলে মানবে না, সেই ভয়ে চোখ ঢেকে বেড়ায়। আপনারও ঠিক তাই। রাজা হয়ে যাচ্ছেন, ঘর-ব্যাভারি চেহারা কেন মানুষকে দেখতে দেবেন ?

সিনেমা থেকে গাড়ি ফিরে এল অনতিপরে। তিন তরুণী প্রজাপতির মতো ফুরফুর করে যেন উড়ে এসে ঘরে ঢুকল। নবেলে পড়া যায় এমনি সব মেয়ের কথা। সিনেমা-ছবিতে—এবং ইদানীং পথেঘাটেও দেখা যাচ্ছে। অবোধ্য বস্তু—স্বপ্ন এবং রক্তমাংস চটকে বোধহয় বানানো। অথচ কী আশ্চর্য—নিশাকালে জলধরের সঙ্গে একই ঘরের ভিতর মাত্র আট-দশ হাতের ব্যবধানে, দেখ দেখ, তিন কন্যা কলকণ্ঠে সদ্য-দেখা ছবির আলোচনা করতে করতে হঠাৎ চুপচাপ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

জলধরকে দেখছে। শেষ-আশ্বিনের রাত্রিবেলা রীতিমতো শীত-শীত ভাব—কিন্তু জলধরের মনে হল, জামার নিচে সর্বদেহ ঘামছে। তিনটে পরী-মেয়ের আধ ডজন চক্ষু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তাকে। এবং সেই সঙ্গে দেখে ফেলছে গায়ের এই জামা, পায়ের এই জুতো-জোড়া।

সিতাংশু পরিচয় করিয়ে দেয় : আমার স্ত্রী ললিতা। বোন শম্পা। আর ইনি ললিতার মা—আমারও মা।

হরি, হরি! তিনের মধ্যে একটি হলেন মা, অপর একটি তাঁরই সন্তান। জলধর যে ভেবে নিয়েছিল—

ভাবনা চেপে রাখার বিদ্যা এ জাতীয় লোকের আয়ত্তে থাকে না।

মনের কথাটা জলধর মুখে বলে ওঠে, আমি তো ভেবেছিলাম সমান-বয়সি এঁরা তিনজন। একের গর্ভে আর একজন হয়েছেন, কার বাপের সাধ্যি ধরবে!

শাশুড়ি ঝাঁকি দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। শম্পার মুখে হাসির রেখা। তাড়াতাড়ি সে অন্য কথা আনে: চা হোক একটু?

সিতাংশু আপত্তি করে: এত রাতে চা আবার কেন? ডিনারে বসা যাক। ক্লান্ত আছেন জলধরবাবু, বিশ্রাম করবেন।

শম্পা মৃদুকণ্ঠে বলে, ইনি সেই অম্বরীষ? যা বলেছিলে দাদা, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

জলধরের কানে গেল না। সেই থেকে সে তাজ্জব হয়ে দেখছে তিন তরুণীকে। একবার চোখ নামায়, আবার দেখে। মানুষের কী আশ্চর্য ক্ষমতা—খোদার উপর খোদকারি! সিতাংশু বলে দিল শাশুড়িঠাকরুন—নইলে দলের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে কচি, সকলের বড় রূপসী ও চঞ্চলা। বয়স নির্ঘাত দু-ভাগ কমিয়ে ফেলেছেন। ললিতা ও শম্পা বেশি কমায় নি বোধকরি নিতান্ত খুকি হয়ে যাবার আশঙ্কায়। সব মেয়ে একটা বয়সে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াতে চায়—তার কমে যাবে না, বেশিতেও নয়।

এমনি সব ভাবছে জলধর, ডিনারের বেল বাজল। সিতাংশু উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আসুন—

টেবিলে চার প্রাণী—ললিতা শম্পা সিতাংশু আর জলধর। শাশুড়ি দিল্লি থাকেন—ক'দিন আগে এসে বড় মেয়ের কাছে ছিলেন, আজকেই সেজ মেয়ে এই ললিতার কাছে এসেছেন। শরীরটা ভাল ঠেকছে না, ডিনারে বসবেন না তিনি, শুয়ে পড়েছেন।

মিথ্যে অজুহাত—যে না সে ধরতে পারে। জলধরও। ভবঘুরে যাত্রাওয়ালার সঙ্গে এক টেবিলে বসবেন না, এই আর কি! কিম্বা তা-ও নয়। বেকুবের মতন ঐ যে বয়সের একটা কথা বলে ফেলল—শাশুড়ি-ঠাকরুনের বড্ড লেগেছে। সেই ক্রোধে শরীর খারাপ।

স্ত্রীলোকদের সর্বব্যাপারে বড় বলো, বিষম খুশি—কিন্তু বয়সে বড় বলেছ তো রক্ষে নেই। সেটা এই বড়লোকের বাড়ি বলে নয়, পাড়াগাঁয়ের অতি-দরিদ্র ঘরেও পরখ করা আছে। সে যাক গে—একটি কমেছে, খানিকটা তবু বাঁচোয়া. এ দুটোও গেল না কেন ? কানে কানে ফিসফিস করে, আর চোখ দিয়ে চেখে চেখে খাচ্ছে যেন জলধরকে। নজর ফেরায় না। যেমন করে কাল যাত্রার আসরে সিতাংশু দেখছিল মহারাজ অম্বরীষকে। অত করে কী দেখ ঠাকরুনরা বলো দিকি—তোমাদের মুখে আছে রূপ-বাড়ানো আর বয়স-কমানোর রকমারি চূর্ণ ও অবলেহ, আমার মুখে যদি কিছু লাগানো থাকে তো দারিদ্র্য। আর অতিরিক্ত বিড়ি খাওয়ার দরুন ঠোঁটে কালো রং। সে জিনিষ এতই কি দেখবার ?

তা সে যা-ই হোক, জলধর পরোয়া করে না। নিজ কর্ম করে যাচ্ছে। ওঁচা ছেলে পরীক্ষায় বসে পাশের ছেলের খাতা আড়চোখে দেখে আর টুকে যায়, জলধরের সেই অবস্থা। দেখছে সতর্ক ভাবে সিতাংশুও মেয়েদের কায়দাকানুন—নিজেও ঠিক তেমনি তেমনি করে যাচ্ছে। পারবে কেন, কতকাল ধরে শিক্ষা ওদের ! হাত পিছলে চামচে ঠং করে মেঝেয় পড়ে যায়, বাঁ-হাতের কাঁটা ভুলক্রমে ডান হাতে চলে আসে। খানসামা প্লেট এগিয়ে ধরে—খাবার তুলে নিতে গিয়ে টেবিলের চাদরে মাখামাখি হয়ে যায়। ওরা তিনটি প্রাণী হঠাৎ যেন কানা হয়ে গিয়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এবং কালা হয়ে গিয়ে চামচে পড়ার আওয়াজও কানে পায় না। মৃদু কথাবার্তার তিলেক মাত্র ছেদ নেই—সময় কাটানোর আজেবাজে কথা। এরই মধ্যে খানসামার দিকে চোখ টিপে দিয়েছে হয়তো—দেখা গেল, সে-ই এবার প্লেটে খাবার ঢেলে দিচ্ছে, জলধর নিজে তুলে নেবে সে অপেক্ষায় থাকে না।

আরও হল। ললিতা সহসা বলে ওঠে, হাতেই খান আপনি।

সিতাংশু জোর দিয়ে বলে, বাঙালি-মানুষ আমরা—আলবত হাতে খাব। হাতের পাঁচ আঙুলে মেখে মেখে খাব।

শম্পাও যোগ দেয়: হাতে না খেলে খাওয়ার সুখ হয় নাকি? চচ্চড়ির ডাঁটা কি মাছের মুড়োর ঘিলু—এ সবের মজা কাঁটা-চামচে চালিয়ে মেলে না।

ললিতা বলে, সেই জন্যেই তো ভালবাসি হাতে খেতে।

হাতে খাওয়ার শতেক মহিমা মুখে, আর টুকটুক করে কেমন ওরা ছুরি-কাঁটা চালিয়ে যাচ্ছে। নিজে খাওয়ার চেয়ে খাওয়া দেখে বেশি সুখ। বিশেষ করে স্ত্রীলোক দুটির। যেন কল চালিয়ে খাওয়া—কলই খাদ্য এনে মুখের কাছে হাজির করে দিচ্ছে। এবং গালে ও ঠোঁটে এত রং মেখেছে, মুখদুটোও ঘষামাজা সদ্য রং-করা কল ছাড়া কিছু নয়। স্ত্রীলোক হয়েও কী চমৎকার ছুরি চালায়—ছুরি হাতে পথে বেরিয়ে মানুষের পকেট-কাটাও অসাধ্য নয় এদের পক্ষে। অবাক হয়ে জলধর দেখে। রোসো না সোনামাণিক, ক'টা দিন সবুর করো, রপ্ত করে নিই, পাল্লা হবে তখন—ছুরি-কাঁটা নির্ভুলভাবে চালিয়ে কত দ্রুত কে খেতে পারে। জিনিষ দেখে ঠিক ঠিক যদি নকল করতে না পারব, অভিনেতার গরব নিয়ে কোন্ সাহসে তবে আসরে আসরে ঘুরি?

ডিনার শেষ করে বাটির জলে আঙুল ডুবিয়ে ললিতা ব্যস্তভাবে উঠে পড়ল। সিতাংশুকে বলে, ড্রইংরুমে যাও তোমরা, কফি সেখানে যাবে। মা একলা উপরে আছেন, আমরা চললাম। চলো শম্পা।

বাবুর্চিকে যথোচিত উপদেশ দিয়ে শম্পার সঙ্গে তরতর করে সে উপরে উঠে গেল।

সিতাংশু বলে, কফি চলবে তো জলধরবাবু?

ঘাড় নেড়ে দরাজ গলায় জলধর বলে, যা-কিছু আপনারা চালান, আমারও চলবে। যা আপনাদের চলে না, সে জিনিষও চালাব। এ-রকম শত-তালি জুতো পরে পারেন চলতে কার্পেটের উপর? চলে বেড়িয়েছেন কখনো? মানুষ আমায় মোটেই কম ভাববেন না।

কথার ভঙ্গিতে সিতাংশু হেসে ফেলে : সে কী কথা ! কম যদি ভাবব, এত ছুটোছুটি কেন করলাম আপনার জন্য ?

জলধরকে সিগারেট দিয়ে নিজে একটা ধরিয়ে কৌটোসুদ্ধ তার দিকে এগিয়ে দিল : রেখে দিন—রাতের খরচা। আপনার ঘরেও নিশ্চয় দিয়েছে। চাকরবাকর বাইরে থাকবে—যখন যেটা দরকার পড়ে, হুকুম করবেন। সঙ্কোচ করবেন না, নিজের বাড়ি বলে ভাববেন।

হেসে সঙ্গে সঙ্গে আবার সংশোধন করে নেয় : সেটা অবশ্য ঠিক নয়। একদিন দু-দিনের অতিথি এখানে। রাজা-মানুষ এমন সামান্য জায়গায় থাকবেন কি করে ?

লুফে নিয়ে জলধর বলে, সত্যি কথা। মাঠ-ময়দানে দিন কাটে—উঁচু আকাশের নিচে। সন্ধ্যাবেলা যাত্রার আসরে—সে জায়গাও ছোটখাট নয়। এমন দেয়ালের ঘেরের মধ্যে থাকা বড়-একটা ঘটে ওঠে না।

কৌতুক-দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, ভাঙুন দিকি এবার। কেন আমায় নিয়ে এলেন, এত খাতির কিসের ? এখান থেকে কোথায় চালান করবার মতলব এঁটেছেন ?

সিতাংশু বলে, বলেছি তো—রাজা করব। রাজবাড়ি চাই রাজার জন্য। সে বাড়ির মস্তবড় গেট। গেটে সর্বক্ষণ দরোয়ান হাজির—

রাজবাড়িটা সিতাংশু যেন চোখের উপরে দেখছে, দেখে দেখে তার হুবহু বর্ণনা দিচ্ছে : বন্দুকধারী দরোয়ান গেটে মোতায়েন। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড। লন সামনের দিকটায়—চতুর্দিকে ফুল ফুটে আছে, মাঝখানটা সবুজ নরম ঘাস। মুখে আর কত বলব—যাচ্ছেন সেখানে, গিয়ে সর্বময় হয়ে বসবেন।

একটু দম নিয়ে আবার বলে, রাজা হতে রয়াল-ড্রেস চাই। কাল গিয়ে দু'জনে কেনাকাটা করব। রাজার আদবকায়দা হাবভাব খানিকটা তালিম দিয়ে দেব আমি। আপনাদের যাত্রাদলেও লাগে এসব। একটা দুটো দিন এখানে রেখে তাই কষ্ট দেওয়া।

পাশের শোবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে সিতাংশু উপরে উঠে গেল।

পরিষ্কার হল না ব্যাপারটা। যাকগে, যা করতে চায় করুক। যাত্রাওয়ালার জীবনের দাম কানাকড়ি—এই জীবন নিয়ে বাজি ধরার বড় সুবিধা। যেটুকু জিতলাম পুরোপুরি মুনাফা, হারলে কানাকড়ি লোকসান। খাতির করে আজ রিভলবার গায়ে ঠেকিয়ে নিয়ে এসেছে—মতলব ঘুরে গিয়ে কাল সকালে যদি রিভলভার উঁচিয়ে তাড়া করে, এমনি ঘরে আমার এই রাত্রিবাসের মুনাফাটা তবু থেকে গেল।

সে রাত্রে ঘুম নেই জলধরের চোখে, পাগল হবার জোগাড়। উঃ, এত সুখে থাকে মানুষ—এমন সব বস্তু মানুষের আরামের জন্য! মানুষে বানিয়েছে, মানুষে ভোগ করে। ঘরময় নানান ঢঙের আসবাব—দেয়ালে ছবি, জানলায় দরজায় রকমারি পর্দা। মুখ দিয়ে কথাটি বের করতে হয় না, বোতাম টিপলে বেয়ারা-খানসামা হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়ে। সাজসজ্জায় তারাই তো এক একটা রাজা। যে রয়াল-ড্রেস এঁটে আসরে নামি, এ বাড়ির বেয়ারা খানসামার পোশাকের বাহার অনেক বেশি তার চেয়ে। অনেক দাম। আরও তো সিতাংশু বিনয় করে বলে গেল এই সামান্য জায়গায় দায়ে পড়ে রাখছে কয়েকটা দিন। না জানি সেই আসল জায়গা কেমন—যে রাজবাড়িতে আমার পাকাপাকি আস্তানা—

(তিনটে অপোগণ্ড শিশু ভগবান ভরসা করে ফেলে এসেছি, ছ-মাসের মধ্যে এক আধলাও খরচ পাঠাতে পারি নি।)

সোফায় গিয়ে জলধর ধপ করে বসল। রাক্ষস, রাক্ষস! দেহের আধখানা গিলে ফেলল উদরে। বড়লোকে ঘরময় সারি সারি রাক্ষস বসিয়ে রেখেছে। আরাম কোথা—অস্বস্তি, আতঙ্ক। তারপর খাটের উপর গিয়ে সে গড়িয়ে পড়ে। স্প্রিং-এর গদি—ঠিক যেন জল-ভরা পুকুর। এককালে জলধর খুব সাঁতার কাটত। আজকেও তাই—শয্যার উপর ইচ্ছাসুখে গড়িয়ে সাঁতারের সুখ করে নিচ্ছে। একেবারে সাড় লাগে না—জলে ভাসারই ব্যাপার।

তখন খেলায় পেয়ে যায়। দরজা ভেজানো আছে, জানলাগুলো একটি একটি করে এঁটে দিয়ে এলো। ভাবী রাজার ছেলেমানুষি খেলা চাকরে-বাকরে না দেখে ফেলে—

(বউ বিনা-অষুধে বিনা-পথ্যে মরে গেছে তিনটে ছেলেমেয়ে রেখে। চুলোয় যাকগে, দুনিয়ায় কেবা কার !)

বিছানায় গড়ায় জলধর, সেখান থেকে সোফার উপরে পড়ে, আবার বিছানায়। সব ক'টা আলো জ্বেলে দিয়ে খুশি মতন এটা-ওটা নিভিয়ে দেখে। পাখা খুলে দেয় পুরো জোরে—শীত তা কি হয়েছে, চলুক। আয়নার কাছে গিয়ে ঘুরে ফিরে নানান ঢঙে দাঁড়ায়। দেয়ালের ছবি দেখে একবার দূরে দাঁড়িয়ে, একবার বা অতি-নিকটে এসে—ঝানু ক্রিটিক যেমনটা করে। সুখ যখন হাতের কাছে পাওয়া গেছে, আষ্টেপিষ্টে উপভোগ করে নেওয়া যাক। বলা যায় না কাল দিনমানে কী গতিক দাঁড়াবে।

হাতে তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে কোন্ সব বস্তু রেখে গেছে শোবার ঘরে ও লাগোয়া বাথরুমের ভিতর। গণছে, এক দুই তিন চার—আস্ত একখানা রাত কাটানো বড়লোকের পক্ষে চাট্টিখানি কথা নয়, তার জন্য কত সরঞ্জাম লাগে দেখ। বারোআনা জিনিষ তো চোখেই দেখেনি জলধর—ব্যবহার কেমন করে করবে, সেই এক সমস্যা। এসে কেউ ব্যাখ্যা করে দিয়ে যেত !

বোতাম টিপে দিয়ে জলধর পা ছড়িয়ে সোফায় বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দরজায় টোকা। বড়লোকের চাকরবাকর কর্তব্যপরায়ণ বটে—নিশিরাত্রি অবধি ঘুমোয় নি, আড্ডা দিতে বেরোয় নি।

টোকা পড়ল আবার।

ভিতরে এসো, জল দাও—

জল অদূরে কাচের সোরাইতে, পাশে গেলাস। উঠতে হবে না, হাত বাড়ালেই বোধহয় পাওয়া যাবে। কিন্তু যে মানুষ রাজা হতে

যাচ্ছে, হাত বাড়ানোর কষ্ট করা কি করে সম্ভব তার পক্ষে ? সিতাংশুও বলে গেছে, যা-কিছু দরকার হুকুম করে নিতে।

বোতাম টিপে গম্ভীর গলায় তাই হুকুম করছে : জল—

পরক্ষণে হি-হি করে হেসে ওঠে : কিছু চাই নে ভাই। পরখ করে দেখলাম, কলকব্জা ঠিক ঠিক চলে কিনা। বসে পড়ো ওখানটা, কথাবার্তা বলি। যতক্ষণ না ঘুমোই দলবল নিয়ে আড্ডা জমাই, তাস-দাবা খেলি। আমার চিরকেলে নিয়ম। এমন নির্জন কারাবাসে—বাপরে বাপ, মানুষ থাকে কি করে ?

তবু বেয়ারাটা জল গড়িয়ে দেয়। দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

বসতে হুকুম করলাম, হুকুম মানলে না যে বড় ? এ ঘরে বোসো নি কোনদিন ? সত্যিকথা বলো। মানুষজনের সামনে অবশ্য বসা যায় না—কিন্তু আমি আবার মানুষ নাকি ?

ছেঁড়া জুতো তুলে ধরে দেখায় জলধর, গায়ের জামা দেখায়।

বলে, কত মানুষই তো এসে থাকে, এমন জিনিষ কাউকে পরতে দেখেছ ? পরে এইখানে বসেছে ? শখ করে কুকুর-বিড়াল এনে পোষে, মনে করো তাই একটি আমি। আসনাই পেয়ে বিড়াল সোফায় বসেছে, তাকে কেন গ্রাহ্য করতে যাবে ?

উঠে গিয়ে খপ করে তার হাত এঁটে ধরে : ঢং ছাড়ো দিকি। জমিয়ে না বসলে কথাবার্তায় জুত হয় না। সমীহ করতে হয়, দিনমানে সকলের সামনে কোরো। জামা-জুতোয় আমিও তার মধ্যে বেশ খানিকটা ভব্য হয়ে যাব।

বসানো গেল না, কিন্তু পাগড়ি-চাপা পাথুরে মুখের উপর ক্ষীণ একটু হাসি দেখা দিয়েছে।

বলে, বেড-টি চাই তো ?

সেটা আবার কেমন বস্তু ?

বুঝে নিয়ে জলধর বলে, না রে ভাই, মুখ না ধুয়ে খেতে ঘেন্না করে। অত ভোরবেলা কে দেখছে—ওটা ফাঁকি দেওয়া যাক। তারপর থেকে

সবগুলো পর্ব নিয়মমাফিক চালিয়ে যাবে। কেউ না বলতে পারে, বড়লোকি চালচলনে খুঁত আছে আমার।

আচমকা বলে উঠল, তোমার সাহেবের সঙ্গে আলাপ খুবই হয়েছে ভাই। কিন্তু পরিচয়টা একেবারে জানি নে। বলি মাথা-টাথা খারাপ নয় তো?

কী বলছেন হুজুর! অত বড় একটা মিল বলতে গেলে উনি একাই চালিয়ে যাচ্ছেন।

কী জানি, আমার যেন কেমন-কেমন ঠেকছে। এক পাগলা জমিদারের গল্প আছে—পথের মানুষ তোয়াজ করে বাড়ি আনতেন, পর পর দাঁড় করিয়ে কতজনকে এক সঙ্গে বর্শায় গাঁথা যায় অতিথিদের উপর তার পরখ হত। তেমনি কোন মতলব নেই তো তোমার সাহেবের?

বেয়ারা লোকটা এবারে শব্দ করে হেসে উঠল।

কী সর্বনাশ করলে তুমি, কত বড় অন্যায় অরাজক কাণ্ড!

লোকটা হকচকিয়ে গেছে।

জলধর বলে, দেয়াল দেয়ালের ছবি ছাত-মেঝে সব ভয় পেয়ে গেছে। আমাদের চাষাড়ে হাসি এ ঘরে আজ এই প্রথম।

বেয়ারা সামলে নিয়েছে ততক্ষণে। বলে, যাই হুজুর। গুড নাইট!

॥ এগারো ॥

বড়লোকে সূর্য ওঠা দেখেন কালেভদ্রে—ঘুম-পাহাড়ের চূড়ায় অথবা পুরীর সমুদ্রে। সে নাকি আজব দর্শনীয় বস্তু। ঘরব্যাভারি যে সূর্য প্রতিদিন ভোরে উঠে ডিউটি মাফিক রোদ ছড়াতে লেগে যায়, তাকে দেখবার জন্য চোখ মেলতে যাবে কে? যাত্রাদলের মধ্যেও বড়লোকের এই রেওয়াজটা চালু। ভোররাত্রি অবধি পালা গেয়ে বেলা দুপুর পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমানো।

কাল রাত্রে জলধরের পালা গাইতে হয় নি, কিন্তু ঘুমও হয় নি। ঘুমোয় কেমন করে, কে জানে, এত নরম বিছানায়! শুয়ে পড়ে আছে—তবু শব্দসাড়া নিচ্ছে, বাড়ির মানুষদের কি গতিক। কান পেতে আছে। অনেকক্ষণ পরে বাইরে এক সময় মোটরের শব্দ পাওয়া গেল, মোটর এসে দাঁড়িয়েছে। নিঃশব্দতার মধ্যে সিঁড়ি ধরে জুতোর আওয়াজ নেমে এলো। মোটর তার পরে বেরিয়ে চলে যায়।

অতএব এবারে উঠে পড়লে নিন্দে হবে না। ঘড়িতে আটটা। হাত-মুখ ধুয়ে জলধর ড্রইংরুমে বসে খবরের কাগজ ওলটাচ্ছে। কালকের সেই খাতিরের বেয়ারার কাছে জানা গেল, সিতাংশু বেরিয়ে গেছে। রোজই প্রায় যায়—জুটমিলের এজেণ্ট হালদার সাহেবের বাড়ি। ব্রেকফাস্ট সেখানে। আর বড় মেমসাহেব – মানে, সাহেবের শাশুড়ির তবিয়ৎ ঠিক নেই, সেজন্য ওঁরাও কেউ নামছেন না।

আহা রে, কী আনন্দের খবর! শাশুড়িঠাকরুনই নিশ্চয় ধমক দিয়ে ওঁদের আটকেছেন। ঈশ্বর, তুমি পরম দয়াময়।

বেয়ারা বলে, ওঁদের ব্রেকফাস্ট উপরে চলে গেল। আপনাকেও ঘরে পাঠাতে বলি?

না, টেবিলে—

ঘরের মধ্যে সর্বচক্ষুর আড়ালে ইচ্ছাসুখে খাওয়া যেত—মুখে লেপটে, যথেচ্ছ ছড়িয়ে। টেবিলের খাওয়ার ভুলভ্রান্তিতে চাকর-বাকরগুলো মুখ টিপে হয়তো হাসবে। হাসে তো বয়ে গেল। বাড়িতে নতুন পা দিয়ে রাত্রিবেলা কাল যা করবার করেছে—দিনমানে কাউকে এখন মানুষের মর্যাদা দেওয়া হবে না। বড়লোকে যেমনটা করে থাকে।

টেবিল লাগাও। একলাই খাব আমি।

খাওয়া প্রায় শেষ—আচমকা শম্পা নেমে এলো। এসে কথাবার্তা কিছু নয়—কাপে চা ঢালছে। সহজভাবে প্রশ্ন করে: চিনি ক'টা দেবো?

দিন না যতগুলো দিয়ে পারেন।

চা দিল শম্পা, নিজেও এক কাপ নিয়ে পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। চা খাওয়া ঠিক নয়, ছল করে এসেছে। এক চুমুক খায়, আর দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে।

জলধর বিব্রত হয়ে বলে, জামাটা বড্ড ছেঁড়া। নিখুঁত জামাও আছে আমার। কিন্তু আপনার দাদা যে ফুরসত দিলেন না। গাড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে ফেললেন।

হেসে শম্পা বলে, জামা দেখছি নে আমি।

জলধর বলে, পান খেলে ঠোঁটের কালো দেখা যেত না। আপনাদের বাড়িতে সব আছে, খিলি-পান কিন্তু পাওয়া যায় না। একটা পান চিবোতে পারলে ঠোঁট আপনার মতোই হত।

ঠোঁট দেখছে কে?

এবারে রীতিমত চটে গিয়ে জলধর বলে, তবে কি দেখছেন? কাল দেখেছেন, আবার এখন এসে দেখতে বসলেন। আপনার দাদাও সেই দুর্গাতলার আসর থেকে আজ তিন দিন একনাগাড়ে দেখে যাচ্ছেন। সত্যি কথা বলুন তো—ভূত দেখেন না কন্দর্প দেখেন?

কলহের সুরে শম্পা বলে, আমাদের দিকেও তো আপনি দেখছেন কাল থেকে। কী এত দেখেন, আমি যদি জিজ্ঞাসা করি?

একটু চুপ থেকে জলধর বলে, বলব?

বলুন না। আপনি তো রেখেঢেকে বলেন না। এসেই তো কাল বোমা ছুঁড়লেন বউদির মায়ের উপর।

কৌতূহলী শম্পা আবার বলে, বলে ফেলুন।

বড় সুন্দর দেখায় আপনাদের। আমি বলে কেন—যে না সে-ই চোখ ফেরাতে পারবে না।

ফেরাতে বলছে কে? ক্ষয়ে তো যাচ্ছি নে—আপনার মতন রাগারাগি করতেও যাব না।

গা কুটকুট করে না?

শম্পা অবাক হয়ে বলে, দেখছেন চোখ দিয়ে, গা কেন কুটকুট করতে যাবে?

আমাদের করে কিন্তু। ছটফট করি কতক্ষণে সাজপত্তোর নামিয়ে বাঁচব। সাজঘরে ঢুকেই গোঁফ-চুল ফেলে নারকেলতেল-সাবান নিয়ে রং তুলতে বসে যাই। আপনাদের অভ্যেস হয়ে গেছে দিনরাত চৌপহর সাজ করে থাকা।

অভিমান ভরে শম্পা বলে, কী এমন সাজ করেছি যে অত করে বলছেন।

জলধর একসুরে বলে যাচ্ছে, গায়ের রংয়ে পদ্মফুলের আমেজ এনেছেন। আমরা এমনধারা পারি নে। এমনটা কিসে ওতরায়, দিন না শিখিয়ে। ভবিষ্যতে কাজে লাগাব।

দেখুন না—

শম্পা একটা হাত বাড়িয়ে দিল: চোখে ধরে নিরিখ করে দেখুন।

জলধর প্রণিধান করে বলে, রং পাকাই বটে। কিন্তু হয় কেমন করে? বড়লোকের ঘরে ছাড়া তো দেখি নে। ঘষতে ঘষতে হয়

আর কি! পিতলের ঘটিও ঘষেমেজে সোনার মতন চকচক করে।

শম্পা উচ্ছ্বসিত হাস্যে বলে, চোখ আছে, ঠিক ধরেছেন। পিতলই আমি বটে। কিন্তু দাদা আপনাকে যার কাছে নিয়ে যাবেন, সেখানে খবরদার আমাকে পিতল বলবেন না। বিয়ে ভেঙে যাবে আমার।

মজার কথাবার্তা—শম্পার বড় কৌতুক লাগে। এমন স্পষ্টবাদী অদ্ভুত মানুষের কাছাকাছি আসে নি কখনো। ঘাঁটিয়ে অনেক শুনতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু প্রয়োজন হল না—জলধর আপাতত মেজাজে আছে। নিজেই আবার বলে, দেখুন, বয়-বেয়ারা আয়া-আরদালি খানসামা-বাবুর্চিতে কতজনা খাটছে, গণবার ইচ্ছে হল। কাল রাত্তির থেকে লেগেছি। পেরে উঠলাম না—এখন একে দেখছি, তখন তাকে দেখছি। এত চাকরবাকর কেন আছে, মানুষ তো এই ক'জন আপনারা।

কমিয়ে দেখা হয়েছে, চলে না। কষ্ট হয়।

কিন্তু ঐ যারা চাকরবাকর, তাদের তো একটা চাকরও নেই। তবু দিব্যি চলে।

তারা নিজেরা খাটে। আমরা কেন খাটতে যাব, টাকা আছে যখন? টাকা দিয়ে খাটনির লোক রেখেছি।

আচ্ছা, আরো যদি টাকা হয়?

সকৌতুকে শম্পা বলে, কি বলতে চাচ্ছেন আপনি?

আপনারা তবু এঘর-ওঘর করেন, নিজ হাতে তুলে তুলে খান—এখন এই চা ঢেলে দিলেন। আপনাদের দশগুণ বিশগুণ যাদের টাকাকড়ি, তাদের বোধহয় চ্যাংদোলা করে তোলে, অন্য কেউ খাইয়ে দেয় বাচ্চা ছেলেপুলের মতো। কিম্বা একেবারেই হয়তো খায় না, চাকরবাকর খেয়ে নেয় তাদের হয়ে—

এগারোটার কাছাকাছি সিতাংশু ফিরল।

বলে, চানটান হয়ে গেছে দেখছি। চমৎকার। ফিরতে দেরি হয়ে গেল, এখুনি বেরুব। ঘরে গিয়ে চট করে তৈরি হয়ে আসুন তো—

হাতে করে একটা প্যাকেট নিয়ে এসেছে। জলধর বলে, কি ওটা ?

রয়্যাল ড্রেস। যে ড্রেস পরে আপনি যাত্রার আসরে নামেন, সে হল পৌরাণিক আমলের। হাল আমলের রাজরাজড়া যত, তারা পরে কোট-প্যান্ট। রাজমুকুটও অচল। সে জায়গায় টুপি চলছিল, তারও দিন শেষ হয়ে গেছে।

প্যাকেট হাতে দিয়ে সিতাংশু বলে, পরে আসুন।

জলধর একনজরে তাকিয়ে থাকে সিতাংশুর দিকে।

সবিস্ময়ে সিতাংশু বলে, কি হল ?

উঠতে হবে আপনাকে একটু। কোট-পাণ্টলুন কোন পুরুষে পরেছি নাকি ? আপনারা পরে বেড়ান, কায়দা-কানুনগুলো মুখস্থ করে নিচ্ছি।

হাসতে হাসতে সিতাংশু উঠে দাঁড়াল। জলধর সামনে পিছনে ঘুরে ঘুরে দেখে। একটুআধটু টেনেটুনেও দেখল।

বলে, বসুন এবারে, হয়ে গেছে। মেকআপটা মনে গেঁথে নিলাম। দলের মধ্যে আমার আলাদা নিয়ম—মেকআপ-ম্যানের হাতে সমস্ত ছেড়ে দিই নে। তাদের হল ছক-বাঁধা কাজ—যযাতি আর জাহাঙ্গীরে তফাৎ করে না। আমার অম্বরীষ দেখে এসেছেন, অন্য দলেও দেখুন গিয়ে—ভূভারতের কোন অম্বরীষ আমার সঙ্গে মিলবে না। মহাভারতের ছবি কেটে নিজে টেরেটিবাজার গিয়ে ছবির সঙ্গে মিল করে কার্লিং-এর অর্ডার দিয়েছি। পোশাকেও সেই ব্যাপার—ভেলভেটের উপর শলমা-চুমকি কোন্ কায়দায় বসাবে, খড়ি এঁকে দরজিকে বোঝাই। তারপরেও যা বাকি থাকে, আয়নার সামনে নিজ হাতে ঠিক করে নিই।

সিতাংশু বলে, এখানেও ঠিক ঠিক সেই জিনিষ। সকলের আগে পোশাকআশাক, তার পরে অভিনয়।

সাজসজ্জা করে জলধর বেরিয়ে এলো। নিখুঁত পরিপাটি। যেমন যেমন দেখে গেছে—অবিকল তাই।

শতকণ্ঠে সিতাংশু তারিফ করে: সুন্দর! বললেন যে এই পোশাক আপনি কখনো পরেন নি?

সত্যিই তাই।

তাহলে যা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও ঢের ঢের গুণী আপনি। আপনার ট্রেনিং-এ একদিন ছ'দিনের বেশি লাগবে না। চটপট ধরে নেবেন।

গাড়ি ছুটল সোজা চৌরঙ্গিপাড়ায়। সকলের আগে জুতো। নিউ-মার্কেটের পাশের এক নাম-করা দোকানে একজোড়া কেনা হল, অর্ডার দিল আর একজোড়ার। নতুন জুতো পায়ে পরে সেই বাক্সে জলধর ছেঁড়া-জুতো ভরছে।

সিতাংশু বলে, কি হবে? ফেলে দিন।

জলধর বলে, রাজা করতে এসেছেন—বিশ্বাস নেই মশায়দের, খেয়াল মিটে গেলে হয়তো ফকির করে ছেড়ে দেবেন। রাজার সাজ দোকানে মেলে, ফকিরের সাজ কোথায় পাব? থাকুক, যদি আবার দরকার পড়ে।

জুতো হল তো স্যুট। সব চেয়ে বনেদি পোশাকের দোকানে গিয়ে উঠল:

অর্ডার নিন—জরুরি অর্ডার, কাল ট্রায়াল হবে, পরশু ডেলিভারি। যা ইনি পরে আছেন—এই কাপড়, এই কাটছাঁট, অবিকল এই জিনিষ। এমন ঢিলেঢালা নয় অবিশ্যি। অন্যের জিনিষ পরে এসেছেন, নমুনা দেখানোর জন্য।

বলা আছে, পরের দিন আটটার ভিতর জলধর তৈরি হয়ে থাকবে,

তার নিজস্থানটা সিতাংশু ঘুরিয়ে আনবে একবার। যেখানে যথাসময়ে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করতে হবে।

এর বেশি একটা কথাও পাওয়া গেল না সিতাংশুর মুখে। রহস্যময় হাসি হাসে। বলে, চোখেই তো দেখবেন। সেই জন্যে নিয়ে যাওয়া। ভয় করছে নাকি জলধরবাবু?

ভয়—আমাদের মতন লোকের? এই সুখেই তো বেঁচে রয়েছি মশায়। রাজবেশ অঙ্গে নিয়েছি, ফকিরের আদি-বেশও ফেলি নি, ব্যাগে ভরে রেখে দিয়েছি। সিংহাসনে না পোষালে নেমে এসে তক্ষুনি আবার ফকির। পকেটে তিন-আনার উপর একটা পয়সাও যদি থাকে, বুঝব মুনাফা নিয়ে বেরুলাম। আর লোকসানে সর্বস্বান্ত হলাম তো সে-ও তিন-আনার বেশি নয়।

গেট খুলে মোটর প্রবেশের পথ করে দিয়ে দরোয়ান তটস্থ হয়ে একপাশে দাঁড়াল।

সিতাংশু বলে, আপনার রাজবাড়ি—

জলধর বলে, বলে দিতে হবে কেন! গেট দরোয়ান লন নুড়ি-ঢালা পথ—আপনার সেদিনের বর্ণনায় ছিল, বর্ণনা মনে গেঁথে নিয়েছি।

গেটের উপরে উঁচু হরফে ভাস্করের নাম দেখিয়ে প্রশ্ন করে: উনি হলেন—

বর্তমান রাজা। আপনার অনুকূলে রাজতক্ত ছেড়ে বানপ্রস্থে যাবেন, আপনি রাজা হবেন। যদি অবশ্য মনে ধরে আপনাকে।

কম্পাউণ্ডের ভিতর গাড়ি ঢুকে গেছে। সবুজ ঘাসের লন, এক কণিকা ধুলো নেই একটি ঘাসের গায়ে। ঝলমল করছে। ফুল ফুটে আছে লনের চারিপাশে—গোলাপ আর ডালিয়া। চৌকো ত্রিকোণ ও গোলাকার ছোট ছোট বেডের উপর রংবেরঙের মৌসুমি ফুল।

খড় খড় আওয়াজ তুলে রাস্তার নুড়ি ছিটকে মোটর ব্যালকনির নিচে দাঁড়াল।

সিঁড়ি বেয়ে দু-জনে সোজা উপরে। কয়েকটা ঘর-বারাণ্ডা পার হয়ে এক দরজায় সিতাংশু মৃদু আঘাত করল। অতোধিক মৃদুস্বরে বলে, এসেছি আমরা।

জলধরকে বলে, সানগ্লাস খুলে ফেলুন এবারে। এখন আর দরকার নেই।

কপাট খুলে গেল ভিতর থেকে। পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে পড়ে—অবাক কাণ্ড! জলধরের চোখে পলক পড়ে না—ভিতরে আর এক জলধর। দুই জলধর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। একই নাক-মুখ, গায়ের রং ও উচ্চতা প্রায় এক, অবিকল এক পোশাক। ভাস্কর ও জলধর নিঃশব্দে এ-ওর আপাদমস্তক দেখছে।

অবশেষে সিতাংশু কথা বলে ওঠে, কি বলো?

দেখে দেখে ভাস্করের মুখে হাসি ফুটেছে। বলে, বুদ্ধিটা মন্দ করো নি। লেগে যেতে পারে।

আরও বুঝি ভাল করে মেলাবে। ভাস্কর জলধরের কাঁধে হাত রাখল। কাঁধে হাত দিয়ে আয়নার কাছে এসে পাশাপাশি দাঁড়ায়।

সিতাংশুও দেখে পিছন থেকে। পুলকিত কণ্ঠে বলে, মিথ্যে বলি নি, দেখতে পাচ্ছ। বিধাতার খেয়াল—একই ছাঁচে দু'বার ছাপ তুলেছেন।

ভাস্কর ঘাড় নেড়ে বলে, আলগা চেহারা এক বটে, কিন্তু তফাতও আছে। আমার ভ্রূ আর ওঁর ভ্রূ লক্ষ্য করে দেখ—আমার ঠোঁট সোজা, ওঁর ঠোঁটের শেষ দিকটা একটু বেঁকে গিয়েছে যেন।

নিজের কপালের উপরে একটা কাটা দাগ দেখিয়ে ভাস্কর বলে, এ জিনিষও নেই ওই কপালে।

সিতাংশু বলে, নেই এখন—কিন্তু হতে কতক্ষণ!

জলধরকে উদ্দেশ্য করে বলে, হবে না জলধরবাবু?

স্ফূর্তি লেগে গেছে জলধরের। অবহেলার ভঙ্গিতে বলে, হয় না কোন্‌টা আমাদের? অষ্টাবক্র-মুনি, জরাগ্রস্ত যযাতি, চতুর্মুখ ব্রহ্মা

অবধি হতে পারে, এ তো ছিটেফোঁটা মেরামতি ব্যাপার। টেরেটি-বাজারে গনি মিঞার দোকান থেকে কয়েকটা জিনিষ কেবল আনিয়ে দেবেন, ব্যস!

সিতাংশু বলে, মেকআপের ব্যাপারে ঐশী শক্তি ধরেন জলধরবাবু। তোমার এক পুরানো ফোটো আছে আমার ওখানে। তাই দেখে দেখে এতদূর হয়েছে। এর পর আমার কোয়ার্টারে যাবে তুমি। ছবির মডেল সিটিং দেয়, তোমাকেও তেমনি কয়েকটা সিটিং দিতে হবে। পোশাক পরাটা আমায় দেখে এক বারে শিখে নিয়েছেন। তোমায় দেখে ক'টা দিনে পুরোপুরি তোমাকেই শিখে নেবেন। পরীক্ষায় খুঁত পাবে না তখন।

ভাস্কর হাসিমুখে বলে, পরীক্ষক আমি নই—তুমিও নও। এখনই তো ওঁর দিকে ঢলে পড়ছি। পরীক্ষক হবে মাধব-দা। তার সার্টিফিকেট পেলেই নির্ভয়ে তবে কাজে নামা যায়।

কয়েকটা দিন যাতায়াত করছে সিতাংশুর বাড়ি। ভাল লাগে জল-ধরকে। আলাদা ধরনের মানুষ—এরা এক অজ্ঞাত জগতের বাসিন্দা আলাপ-পরিচয়টা নিঃসন্দেহ কাজের দায়ে, তবু কিন্তু সে নতুন আবিষ্কারের আনন্দ পাচ্ছে। স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারত না, এই শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে গলাগলি হওয়া সম্ভব ভাস্কর হালদারের পক্ষে। সেই অঘটন ঘটেছে। এমন কি যেন ভালবেসে ফেলছে জলধরকে।

ভাস্কর বলে, ক্ষমতা বটে তোমার জলধর-ভাই। ভাস্কর হালদারের বেশ নিয়ে দাঁড়ালে—আয়নার পাশাপাশি আমার নিজেরই ধাঁধা লেগে যায়: খাঁটি ভাস্করটা কে—আমি না তুমি? মনে মনে জীবনবৃত্তান্ত আওড়াই, মা-বাবা-দিদিমার কথা মনে করি। তুমি চলে যাওয়ার পরে ফোটোগ্রাফের এলবাম বের করলাম—পিকনিকের ছবি, ইস্কুলে প্রাইজ-পাওয়ার ছবি, প্লেনের ভিতরের ছবি, ডাণ্ডির মিল-এরিয়ার ছবি। এমনি নানান পরীক্ষা করে তবে নিঃসন্দেহ হলাম, আমিই বটে ভাস্কর হালদার— তুমি নও।

বাঘ কুমির আর বড়লোক সম্পর্কে জলধরের নিদারুণ অসোয়াস্তি —এখন দেখছে, তিনটে ঠিক এক জিনিষ নয়। খাসা লাগে ভাস্করের মুখে এই সব মজার মজার কথা শুনতে। হো-হো করে হাসিতে সে ফেটে পড়ল।

চমকে উঠে ভাস্কর বলে, ভুল হয়ে গেল কিন্তু এবার—মারাত্মক রকমের ভুল। এই হাসি জলধরের। সাজের দিক দিয়ে তুমি এখন পুরোপুরি ভাস্কর, এইখানটা কিন্তু জলধরকে ছাড়তে পারো নি। ভাস্কর হালদার বড়লোক, বিপুল শিক্ষাদীক্ষা, এমন শব্দ করে হাসা অসম্ভব তার মতো মানুষের পক্ষে। সূক্ষ্ম হাসি তার—মেয়েদের ঠোঁটে-মাখানো লিপস্টিকের মতো।

জলধর দেমাক করে বলে, পারি নে বুঝি? দেখুন।

মুখভাব মুহূর্তে বদলাল। ক্ষমতা রাখে বটে মানুষটা! যা কিছু দেখবে, হুবহু তার নকল করতে পারে। এবার সেই হাসি হাসছে রুচিবান সমাজে যে জিনিষ সচরাচর দেখা যায়।

জলধর বলে, হয় নি আপনাদের মতন? বিচার করে বলুন।

ভাস্কর রায় দিল: নির্ভুল হয়েছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে জলধর অভিনয়ের হাসি মুখোসের মতন ছুঁড়ে ফেলে হুল্লোড় করে হেসে ওঠে।

দূর, গোমড়া হাসিতে প্রাণ ভরে কখনো! কষ্ট করে না হয় দরবারে চালালাম, ঘরের মধ্যেও ঐ হাসি হাসব তো বেঁচে থেকে সুখটা কি! আপনাদের বড়লোকের বাঁধাবাঁধি বড় বেশি।

ভাস্কর গম্ভীর স্বরে বলে, বড়লোকের বড্ড কষ্ট জলধর-ভাই। তবু দেখ, লোকে দরদ করে না—উল্টে হিংসা করে।

সঙ্গদোষে বড়লোক ভাস্করের মন ঘুরে গেল নাকি সত্যি সত্যি? বলে, তোমার মোটা হাসিটা শিখিয়ে দাও তো আমায়। হেসে বাঁচি। আর সেই হাসির মাপসই কথাবার্তাগুলোও। তুমি পুরোপুরি আমার মতন হয়েছে, আমিই বা কেন তোমার রূপ ধরতে পারব না?

হেঁ-হেঁ, শক্ত জিনিষ। সগর্বে জলধর ঘাড় নাড়ে: ইচ্ছামূর্তি ধারণ করতেন সেকালের দেব-দেবীরা। আর একালে আমরা করে থাকি —যাত্রা-থিয়েটারের প্লেয়ার যারা আছি।

ভাস্কর বলে, প্লেয়ার আকাশ থেকে পড়ে না—শিক্ষায় তৈরি হয়। ছেলেবয়স থেকে কত কি শিখলাম, ওটাই বা পারব না কেন? তুমি পাঠ দাও জলধর-ভাই। পারি কিনা পরখ তো হওয়ার দরকার।

জলধর রাজি হয়ে বলে, আচ্ছা, ছোট্ট ওই ব্যাপার—হাসিটাই আগে চেষ্টা করুন। এক বারে যে হবে, তার মানে নেই—

লেগে গেল ভাস্কর। তখনই। মুক্তির বিশাল সাগর একেবারে আমাদের হাতের নাগালে—হঠাৎ সেই আশ্চর্য আবিষ্কার হয়ে গেছে।

ভাস্কর হাসে, আর যাত্রাওয়ালা জলধর সেই হাসির কায়দা বাতলে দেয়—এ হেন কাণ্ড চোখে দেখেও কেউ প্রত্যয় পাবে না। আসে না ঠিক জিনিষটা—আনাড়ি ছাত্রকে উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে জলধর বলে, ঘাবড়াবার কি আছে! আবার হাসুন দিকি—এই তো, বেশ খানিকটা হয়েছে। আবার, আবার—

এরই মাঝে দু-লাইন কবিতা আবৃত্তি করে উঠল: একবার না পারিলে দেখ শতবার, পারিব না ওকথাটি বলিও না আর।

হাসছে ভাস্কর—এমন উদ্দাম হাসি হাসে নি সে কোনদিন। যাদের সঙ্গে মেলামেশা, এ হাসি শুনলে তারা কানে আঙুল দেবে। যে ঘরে হাসছে, সেখানে প্রাণহীন দেয়ালগুলোও বোধকরি চকিত হয়ে উঠেছে। পাঠ বুঝি পুরোদস্তুর আরম্ভ হয়ে গেল—সামান্য সাধারণ হয়ে যাবার পাঠ। খোলামেলা জীবনের প্রথম অভিযাত্রী ভাস্কর—প্রবেশলাভ ঘটে নি এখনো, যাত্রামুখে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। হাসতে কি পারছে ছাই ভাল করে? ভাবনাচিন্তার পাষাণভার বুকের উপর চেপে ছিল, তবু ঐ হাসির তোড়ে পাহাড় ধ্বসে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফুরফুরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

জলধর মন্তব্য করে—যেন কোন বহুদর্শী আচার্যের কণ্ঠ।

বলছে, বাইরের সাজসজ্জা নিয়ে হাঙ্গামা হয় না। আমাদের মেকআপ-ম্যান আধঘণ্টার মধ্যে অমনধারা এক ডজন সাজিয়ে দিতে পারে। রাজা করছে দৌবারিক করছে রাজকন্যা করছে নফর করছে—টুক টুক করে সেরে দিচ্ছে এক-একজনকে ধরে। আর মোশানমাস্টারের হল ভিতরের কাজ—চলন-বলন হাবভাব তৈরি করে দেওয়া। সে কাজে একজনকে নিয়েই লেগে গেল হয়তো তিন-চার মাস। তা-ও সব ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে না। অ্যাক্টরের নিজের ভিতরে এলেম চাই। চেহারায় পুরোপুরি জলধর আপনাকে এক্ষুনি সাজিয়ে দিচ্ছি, সে কিছু কঠিন নয়। কিন্তু ভিতরের জলধর বানানো আমার হাতে নেই—ওটা আপনার নিজের।

দরজা বন্ধ করে হচ্ছিল। শিক্ষা অন্তে দরজা খুলে দেখা গেল, শম্পা দাঁড়িয়ে আছে। চোখ ছল-ছল করছে তার। উদ্দাম হাসির কিছু নিশ্চয় বাইরে থেকে শুনেছে—ভয় পেলো নাকি বেচারি? ভাবল, মাথা খারাপ হয়ে গেছে ভাস্করের?

তা নয়। শম্পা টেলিগ্রাম মেলে ধরল, লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছে। হিমাদ্রির বড় অসুখ, শম্পা যেন অবিলম্বে চলে আসে।

কথা বলতে গিয়ে শম্পা আকুল হয়ে কেঁদে পড়ল। বলে, সন্ধ্যের গাড়িতে চলে যাচ্ছি।

আরও ক'দিন কেটেছে। এক সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির নুড়ি-ফেলা রাস্তায় যথানিয়ম ভাস্করের অফিস-ফেরত গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। চেনা হর্ন পেয়ে মাধব রান্নাঘরে গিয়ে বাবুর্চিকে তাড়া দিচ্ছে। এর পরেই চুপচাপ কিছুক্ষণ। ভাস্করের নিয়ম এই। নিচের ড্রয়িংরুমে কেউ কেউ অপেক্ষা করে, ছ-পাঁচটা কথাবার্তা হয় তাদের সঙ্গে। অফিসের পোশাক ছাড়ে, পাজামা পরে, স্লিপার পায়ে ঢোকায়। স্নান করে তারপর উপরে চলে আসে। বিছানায় গড়াল হয়তো একটুখানি, পিয়ানোয় টুংটাং করল।

কিম্বা হয়তো সাপ্তাহিক-মাসিকের পাতা উল্টায়। ইতিমধ্যে চায়ের টেবিল সাজিয়ে মাধব ডাকতে আসে। ঘণ্টা বাজায় কোন কোন দিন।

ভাস্করের বদলে জলধর এসে আজ উপরের শয্যায় গড়িয়ে পড়ল। সেদিন দেখে গেছে সমস্ত, ভাস্কর দেখিয়েশুনিয়ে তালিম দিয়ে দিয়েছে। উপুড় হয়ে আছে একটা বিলাতি ম্যাগাজিন মুখের সামনে ধরে।

মাধব এসে ডাকল : খাবে এসো দাদাভাই।

নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে টেবিলে বাইরের লোক থাকলে খানসামার ডাক পড়ে। নয় তো মাধব নিজের হাতে চা দেয়। দাদাভাইকে খাইয়ে তার আনন্দ—এতটুকু বয়স থেকে খাইয়ে আসছে।

দিয়েছে খাবার, জলধর পরমানন্দে খাচ্ছে। তা সত্ত্বেও মাধবের বকাবকি প্রতিদিনের মতো : যত বয়স বাড়ছে, খাওয়া তত কমছে দাদাভাইয়ের। কোন্ হতচ্ছাড়া নিখাউন্তির দেশে গেলে —সেখান থেকে বেশি করে উপোসের অভ্যাস নিয়ে ফিরেছ।

চলেছে এমনি, হঠাৎ প্রচণ্ড হাসি। ভাস্করের আবির্ভাব—একা নয়, সিতাংশুও আছে।

ভাস্কর বলে, কাকে বসালি মাধব-দা আমার জায়গায়? কার এমন খাতির!

মাধব অবাক হয়ে তাকায়—একবার ভাস্করের দিকে, একবার জলধরের দিকে।

সিতাংশু আরও হকচকিয়ে দেয় : ঘাবড়ে যেও না মাধব-দা, ঠিক মানুষকে খাওয়াচ্ছ তুমি। উনিই আসল, এটি জাল। পথে পেয়ে মানুষটাকে ধরে নিয়ে এলাম তোমাদের দেখাব বলে।

জলধরের দিকে চেয়ে বলে, চেহারার কী রকম মিল দেখ ভাস্কর। আয়নার ধারে গিয়ে বরঞ্চ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখ। অবিকল তুমি! দু'জন মানুষ হয় এমনধারা—আশ্চর্য!

ভাস্কর বলে, ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দিবি নে মাধব-দা ? আমার খাবার সমস্ত বুঝি জাল-মানুষটাকে দিয়ে দিয়েছিস ?

খাবার থাকবে না কেন, খাবারের অভাব কি ! ইতস্তত করে মাধব দু'জনের জন্য প্লেট এনে দাঁড়ায়।

ভাস্করকে দেখিয়ে সিতাংশু হাঁ-হাঁ করে ওঠে : একে টেবিলে দিও না মাধব-দা। রাস্তার মানুষ খাওয়াবে তো ওদিকে কোনখানে নিয়ে বসাও।

হতভম্ব হয়ে মাধব দাঁড়িয়ে থাকে। ভাস্কর হেসে উঠল আবার— সেই হাসি যার খানিকটা রপ্ত করে নিয়েছে জলধরের কাছ থেকে। বলে, নাঃ, একেবারে বুড়ো হয়েছিস মাধব-দা। চশমা ধর্। এইটুকু বয়স থেকে হাতে ধরে মানুষ করলি—আমায় চিনতে পারিস নে ?

সিতাংশুর প্লেট মাধব আগেই টেবিলে দিয়েছে, অন্যটা হাতে ধরে ছিল। আরও একবার দু'বার জলধর ও ভাস্করের দিকে তাকিয়ে দেখে সেটিও টেবিলে দিয়ে দেয়।

সিতাংশু বলে, একি মাধব-দা, আমার পাশে রাস্তার লোক ?

মাধব বলে, বুড়োমানুষকে খেলাচ্ছ তোমরা। বসে পড় দাদাভাই। রাত্তিরে চোখে কম দেখি, তাই ধাঁধাঁ লেগেছিল। দিনমানে এসো দিকি চালাকি করতে—তখন বোঝা যাবে।

জলধর সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে দিল : সাধ মিটল অনেক দিনের। আসরের রাজা হতে হতে আসল রাজা হওয়া। কপালে একটা আঁচড় ছিল, খণ্ডে গেল। নইলে আমি হেন লোকটা এমনি ঘরে এমনধারা চেয়ার-টেবিলে খাচ্ছি— ঘরময় আলো, ফুলদানিতে ফুল—ওরে বাবা, ওরে বাবা ! এয়ারবন্ধুরা দেখতে পেলে চোখ কচলাবে—সত্যি, না স্বপ্ন ?

লজ্জিত মাধব আর দাঁড়ায় না, সরে পড়ে। বাবুর্চি এসে চায়ের সরঞ্জাম রেখে গেল।

ভাস্কর বলে, সব চেয়ে কড়া যে পরীক্ষা, তাতে পাশ হয়ে গেছ জলধর-ভাই। মাধব-দাও ধরতে পারে নি। শুধু পাশ হওয়া নয়, ফুল-নম্বর পেয়েছ।

নিভৃতে গভীর পরামর্শ তিনজনে। বুদ্ধিটা সিতাংশুর—দৈবক্রমে জলধরকে পাওয়া গেল, তখন থেকে মাথায় এসেছে। পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে ভাস্কর হয়ে থাকুক জলধর। রাজা হওয়ার বড্ড শখ, থাকুক সেই রাজা হয়ে। তবে আবুহোসেনের খলিফা হওয়া—পাঁচটা সাতটা দিনের রাজত্ব। আর সেই ক'টা দিন ভাস্কর হালদারের শরীরটা যেন খারাপ হয়ে পড়ল—অফিসে যাচ্ছে না। বাড়িতেই আছে সে। নজর হানতে একেবারে কাছাকাছি কেউ আসবে না—দূর থেকে ভাস্করকে হামেশাই দেখা যাবে। দোতলার খোলা বারাণ্ডায় সকাল-সন্ধ্যা সে ঘুরে বেড়ায়। বই পড়ে সেখানে বেতের চেয়ারে বসে। লনে আসে কখনো-সখনো, গাড়ি নিয়ে বেড়াতেও যায়—

শোনে জলধর, আর ফিকফিক করে হাসে। বলে, বাঁধা আসরে যাত্রা-গাওয়া নয়—সিনেমার হিরো হয়ে গেলাম এঁবারে। ভাস্কর সেজে বারাণ্ডায় মাঠে রাস্তায় একটো করে করে বেড়ানো।

সিতাংশু বলে যাচ্ছেঃ যারা চর হয়ে ঘুরছে, উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখুক চতুর্দিকে থেকে। ন্যুলো-মহাদেব আশেপাশে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াক। গাড়ি নিয়ে বেড়াতে গেলেন তো স্কুটারও চলুক আপনার দেহরক্ষী হয়ে। ইউনিয়ন-ওয়ালারা নিঃসংশয় হয়ে থাকুক, বাড়িতে নজরবন্দি ভাস্কর হালদার। আসল ভাস্কর কিন্তু উড়েছে—পাখি হয়ে উড়ে পালিয়েছে।

কথার মাঝখানে জলধরকে হঠাৎ বলে, ভাস্কর হয়ে বই হাতে বসুন দিকি বারাণ্ডার ওই চেয়ারে। রিহার্শাল একটু হয়ে যাক—

জলধরকে সরিয়ে দিয়ে সিতাংশু গলা নামিয়ে বলল, বুঝেছ

মতলবটা ? আসল ভাস্কর প্লেনে উড়ে ইতিমধ্যে বম্বে চলে গেছে। তেজা মল্লিকের কাছে।

বাকিটুকু ভাস্কর বলে দেয়। ধর্না দিয়ে পড়েছে মল্লিকের কাছে : বাঁচান, এই তো অবস্থা! আমার বাবার গায়ে আঁচড়টি না লাগে। যেমন বলবেন, তাতেই রাজি। কায়দায় পেয়ে মল্লিকই বা ছাড়বে কেন! পাহাড়খানা ঘাড়ে চাপিয়ে জামাই করতে চাইবে। তাই সই। বিক্রি হয়ে যাবো ভাল দামে। বিরাট অঙ্কের বরপণ, ঐশ্বর্য-প্রতিপত্তি, বাবার চিরজীবন ধরে গড়ে-তোলা মান-ইজ্জত। সমস্ত বজায় রইল—গেল শুধু শম্পা—

নিশ্বাস ফেলে ভাস্কর হঠাৎ চুপ হয়ে গেল।

পরমুহূর্তে প্রশ্ন করে : লক্ষ্ণৌর চিঠি পেয়েছ ? আছেন কেমন তোমার মামা ?

সিতাংশু বলে, ভাল। মামা নিজেই চিঠি লিখেছেন। স্ট্রোক বলে সন্দেহ হয়েছিল—এখন ডাক্তারে বলছে, সে জিনিষ নয়। শম্পা তো সেই পাগল হয়ে ছুটে বেরুল। ছুটি চলছে বলে ফিরবার তেমন তাড়া নেই।

এলে বুঝিয়ে বোলো সিতাংশু, ভাস্কর বৃত্তান্তটাকে যেন সে ঝেড়ে ফেলে দেয় মন থেকে। একেবারে ভুলে যায়। বড়লোকের মেয়ে শম্পা, আমিও বড়লোক। এমন খেলার চল আছেই তো আমাদের মধ্যে। কত নাচাই, কত কাঁদাই। লোকে ধরে নেবে তারই একটা। আমাদের সমাজে এ জিনিষ নিয়ে কেউ আশ্চর্য হয় না।

কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে উঠল : তুমি জানো সিতাংশু, খেলা আমি করতে চাই নি। কিন্তু বাবার চেয়ে বড় কেউ নয়। বাবার লাঞ্ছনা না হয়! বাবার ইজ্জতে ঘা না পড়ে! বাবাকে ছুঁয়ে একটি কথা কেউ না বলতে পারে! মেয়ে বিয়ে করা তো সামান্য কথা, তেজা মল্লিক যদি বলে, তার তেরোতলা বাড়ির ছাত থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে এক মিনিটও আমি দ্বিধা করব না।

॥ বারো ॥

ভাস্করকে কিছু করতে হল না। নীরদবরণ নিজে থেকেই ব্যবস্থা করে অপমান-লাঞ্ছনার বাইয়ে চলে গেলেন। ঘটনাটা সেই সময় আপনারা কাগজে পড়েছিলেন। বলে দিলে আবার মনে পড়বে।

কালীপূজোর কাছাকাছি সময়। সুয়েজ খাল নিয়ে ধুন্দুমার বেধে গেল। বৃটিশ আর ফ্রান্স নেমে পড়েছে, ইসরায়েলও আছে।

হায় রে হায়, কী সর্বনাশ!

ব্যাপার নিয়ে নীরদবরণ রীতিমত বিচলিত। শুধু কাগজ পড়ে হয় না, খবরের কাগজের অফিস পর্যন্ত গিয়ে হানা দেন। পৃথিবীর নানা দেশের কাগজে কি লিখছে, খবরাখবর নেন সেখানে; সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। রাজনীতিতে ঝানু বলে যাঁরা খ্যাত, ব্যাকুল হয়ে ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা করেন তাঁদের কাছে। তৃতীয়-বিশ্বযুদ্ধ সত্যি সত্যি বেধে যায় নাকি? এ্যাটম-অস্ত্রের যুগ—এবারে তো তামাম জগৎ পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে।

যতক্ষণ ঠাকুরঘরে থাকেন মাথা কোটেন শ্রীগোপালের সামনে, বিড় বিড় করে কী-সমস্ত কামনা করেন বিগ্রহ-সেবায় হেলা হচ্ছে। তারামণিকে বলেন, আপনি মা কয়েকটা দিন আমার পূজোরও ভার নিন। মন বড্ড বিচলিত, ঠাকুরের কাছে অপরাধ ঘটছে।

না, সামলে গেল। মানুষের শুভবুদ্ধি? কিম্বা আসল কারণ বোধহয় দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের মার খেয়ে উঠে এখন অবধি যথোচিত সমৃদ্ধি গড়ে তুলতে পারে নি মানুষ। সামান্য ভেঙেচুরে সুখ হয় না—আরও কিছুকালের তাই অপেক্ষা। লড়াই মোটের উপর জমল

না। আলোকজাস্ত্রিয়া এবং এখানে ওখানে কয়েক পশলা বোমা-বর্ষণ করেই ক্ষান্তি দিল।

শুনে নীরদ বুক চাপড়ান : হায় রে হায়, কী সর্বনাশ!

সর্বনাশটা কতদূর, কালীপুজোর পরের দিন প্রকাশ পেল। হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীট থেকে ফোন এলো : সকাল থেকে নীরদবরণের উদ্দেশ নেই।

কোনদিন কখনো এমন হয় না। ছুটল ভাস্কর। সিতাংশু এবং আরও অনেকে এসেছে। পুলিশে খবর চলে গেল। শহরের যাবতীয় হাসপাতাল এবং নীরদের পক্ষে যেখানে যেখানে যাওয়া সম্ভব সর্বত্র খোঁজাখুঁজি হচ্ছে।

সন্ধ্যাবেলা ডাকের চিঠি এলো ভাস্করের নামে, তখন পরিষ্কার হল সমস্ত। এই চিঠি নীরদবরণ নিজ হাতে লিখে ভোরবেলা কোন এক ডাকবাক্সে ফেলেছেন : চলে গেলাম আমি ইহলোক ছেড়ে। আত্মহত্যা মহাপাপ জেনেও সেই পথ নিতে হল। নিরুপায়। টাকার দায়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম—হিসাবে কারচুপি করে এ-ব্যবসার টাকা ও-ব্যবসায়ে সরিয়েছি। নিজেও খরচ করেছি। ইজ্জতের দায়ে—এবং ভাস্কর আমার টাকার অভাবে পড়বে, সেই আতঙ্কে। নতুন কিছু নয়, আগেও হয়েছে—সুদিনে সামলে নিয়েছি, টের পায় নি কেউ। এবারে গ্রহবৈগুণ্য—যত উঠতে গেছি, চোরাবালির মধ্যে আটকে পড়েছি ততই। গৌরদাস সমস্ত ধরে ফেলেছে, দীর্ঘকাল ধরে প্রমাণপ্রয়োগ জোগাড় করেছে। শাসাচ্ছে আমায়। মুখের শাসানি, আবার চিঠিতেও শাসিয়েছে। আর দেরি করবে না তারা—মিলের নতুন প্লান এক্ষুনি যদি বাতিল না করে দিই। আমাদের তাসের ঘর উড়িয়ে দেবে।

ঠাকুরের আশীর্বাদের মতন এমনি সময় সুয়েজখালের হাঙ্গামা এসে পড়ল। চড়বড় করে শেয়ারের দর উঠছে দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের মুখটায় যেমন হয়েছিল। সেই মওকায় নীরদ ফাটকাবাজারে বিস্তর

পয়সা পিটেছিলেন—তখন থেকেই বড়লোক। পরে অবশ্য আর ওদিকে যান নি—ফাটকাবাজার লোকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে না। এতকাল পরে সর্বস্ব পণ করে আবার বিস্তর শেয়ার ধরলেন। কিন্তু সুয়েজখালের লড়াই জমল না, সর্বনাশ হল। শেয়ারের দর পড়ে গিয়ে এই দুরবস্থার উপর নতুন করে লাখ কয়েক টাকার দায়। সেটা দিতে হলে পথের ভিখারি হয়েও ভাস্করের অব্যাহতি হবে না—হন্যে-কুকুরের মতো পাওনাদার পিছনে থাকবে। ফাটকাবাজারের লেনদেন লেখা-জোখায় থাকে না, শুধুমাত্র মুখের কথা। বেঁচে থাকলে দিতেই হবে টাকা, একমাত্র উপায় মরে যাওয়া ; মরে গিয়ে পাওনাদারদের কলা দেখানো যায়। বড় লোভ ছিল, বেঁচে থেকে ভাস্করের বিয়ে-থাওয়া দেবেন ; অন্তিম দিনগুলো ঠাকুরসেবায় শান্তিতে কাটবে। তবু মৃত্যুর পথ নিতে হল।

নীরদ নেই—দেহ তাঁর কোনখানে ? সারারাত সকলে উৎকর্ণ হয়ে আছে। শেষরাত্রে খবর এলো, লেকের জলে ভেসে উঠেছেন—প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় যে লেক তিনি পরিক্রমা করতেন। বাড়ি নিয়ে আসা হল। ফুলে ঢোল—বীভৎস বিকৃত মূর্তি। ভেবেচিন্তে প্রস্তুত হয়েই জলে পড়েছেন—মরণ কোনক্রমে ফসকে না যায়। পায়ে ডবল মোজা, গায়ে একগাদা জামা। দুটো তিনটে কাপড় জড়িয়ে জড়িয়ে পরা। মোটা শরীর, তায় সাঁতার জানেন না মোটেই। প্রাণের দায়ে আঁকুপাকু করে তবু যদি দৈবাৎ ডাঙা পেয়ে যান, কাপড়চোপড়ে দেহ-ভার তাই যতদূর পারেন বাড়িয়ে নিয়েছেন।

ঘটনা চাউর না হয়, সেই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অসম্ভব। এমন এক শিল্পপতি আত্মঘাতী হলেন, খবর বাতাসের আগে ছোটে।

শোক প্রকাশের জন্য তিন কারখানাই বন্ধ হয়ে গেল। মীটিং হল তক্ষুনি, বক্তৃতা ও শোকপ্রস্তাব পাশ হল। তারপর কাতারে কাতারে মানুষ চলল হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীটের বাড়ি। তিন-তিনটে

কারখানার মানুষ। তাছাড়া অতবড় এক শিল্পপতির এই পরিণাম —বাইরের মানুষই বা কত! বাড়ি এবং ছোট রাস্তা ভরে গিয়ে ভিড়ের শেষ ট্রামরাস্তা অবধি চলে গেছে। মৃত্যুর কারণ ফাটকা-বাজার, তা-ও জানতে লোকের বাকি নেই।

ভিড় ঠেলে মড়ার কাছাকাছি যাওয়া সকলে পেরে ওঠে না। কৌতূহলের অবধি নেই। ভাগ্যবান যারা কাছে গিয়ে দেখে এলো তাদের শুধাচ্ছে: দেহ তো ফুলে গেছে—দেখে চেনা যাচ্ছে এখন? পচা গন্ধ নাকে আসে?

নিশ্বাস ফেলছে এরই মধ্যে আবার: বড়লোক হয়ে এই পরিণাম! সমস্ত পড়ে রইল—একটা পয়সাও কি সঙ্গে নিয়ে গেলেন? বাইরে থেকে দেখতাম, ভাগ্যবান মানুষ, ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি—মানুষের ভিতর অবধি কারো যে চোখ চলে না!

এত লোকের মধ্যে গৌরদাস নেই, অনেকের সেটা দৃষ্টিকটু লাগে। —মানুষটা চলে গেলেন, এখনো শত্রুতা পুষে রেখেছে! নীরদবরণ বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন—একেবারে বাড়ির মানুষ হয়ে ছিল, নীরদবরণের সে ছিল বড় বেশি আপন।

এই নিয়ে কানাঘুষো করছিল কেউ কেউ। মূর্খ মানুষ মাধব ঢাকাঢাকি বোঝে না—ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, সাক্ষাৎ কলিঠাকুর। কায়দায় পেলে মুখের ছাঁচ তুলে রাখবেন মশায়রা। কত নিয়েছে কত খেয়েছে আমার সাহেবের, শেষ-দেখাটা দেখতেও মন চাইল না!

শোকস্তব্ধ ভাস্কর। কানে শুনে সে মাধবকে থামিয়ে দেয়: ছুটি নিয়ে গাঁয়ের বাড়িতে আছে সে। থাকলে কি আসত না একবার! এত যত্নে জাল খাটিয়েছে, নিজের কীর্তিটা চোখে দেখবার জন্য অন্তত আসত।

কয়েকটা দিন কেটেছে। আত্মঘাতী হলে উত্তরপুরুষের বড়

সুবিধা। অশৌচ নেই, প্রায়শ্চিত্ত এক বছর পরে। শ্মশানবন্ধু হয়ে শ্মশানে যারা শব বয়ে নিয়েছে, তাদেরও। একটা বছর দিব্যি চুপচাপ থাকো সকলে ঘুমিয়ে। যদি কিছু করণীয় থাকে, পুরো বছর কেটে যাবার পর।

ভাস্কর সজল চোখে সিতাংশুকে বলছে, বাবা ভালবাসতেন কিনা বড়—এই পথ নিয়ে তিনি আমায় সকল দায় থেকে বাঁচিয়ে গেলেন। ঋণের দায় থেকে মুক্তি, পিতৃদায় থেকেও। তাঁর নামে অঞ্জলি ভরে অন্নপিণ্ড দেবো, সে কষ্টটুকুও হতে দিলেন না। কিন্তু আমি শুনব না—

সজোরে ঘাড় নেড়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, শ্রাদ্ধ আমি করবই তারিখ ধরে। পিতৃদায় শোধ করব। পরিমাণটা এমনি ভাবে না হলে কোন তারিখে আমি পিণ্ডদানে বসতাম, দেখ দিকি হিসাব করে। মঙ্গলবার—আসছে হপ্তায়? বেশ। পুরুতে মন্তর না-ই পড়লেন—বাবার আত্মার যাতে তৃপ্তি হয়, আমায় তা করতেই হবে। ঠিক ঐ মঙ্গলবারের দিন।

কী যেন ভাবছে বড় নিবিষ্ট হয়ে। তারই মধ্যে আচমকা প্রশ্ন : শম্পা আসে নি ফিরে?

সিতাংশু ঘাড় নেড়ে দেয়।

কেন, কলেজ তো খুলে গেছে। ভেবেছিলাম, একটিবার দেখা হবে যাবার আগে।

কিছু ইতস্তত করে সিতাংশু বলে, তেসরা অঘ্রান তার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্ণৌয়ের এক ব্যারিস্টার ছেলের সঙ্গে। মামা আমাদের যেতে লিখেছেন।

ভাস্কর কেমন এক ভাবে তাকিয়ে পড়ল।

সিতাংশু বলে, দেখ, অসুখের নাম করে জরুরি টেলিগ্রাম—পরে জানা গেল, অসুখ এমন-কিছু নয়। আমার তখন থেকেই সন্দেহ, তলে তলে কোন একটা ষড়যন্ত্র চলেছে।

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল : মামা হোন যা-ই হোন— মেয়েটাকে নিয়ে তাঁতের মাকুর মতো একবার এদিক একবার সেদিক, এ জিনিষ আমি একেবারে পছন্দ করি নে।

ভাস্কর বলে, রাগ করছ কেন? তাঁর দিকটাও ভাববে তো! মিলের অবস্থা কিছু কিছু নিশ্চয় তাঁর কানে গিয়েছিল। এখন তো বাবার আত্মহত্যার খবর ফলাও হয়ে কাগজে বেরিয়েছে। কোন আশায় এর পরে আর দেরি করবেন? তবু তো অনেক দয়া—কলকাতার বাইরে অনেক দূরে চোখের আড়ালে নিয়ে করছেন।

একটু থেমে আবার বলে, দিব্যি হল। আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম আমি, আপনাআপনি কেমন সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

মতলব ছিল, ভাস্কর অসুখের ভান করবে। আর তার প্রয়োজন কি? এমন পিতৃশোকের মধ্যে কাজের কামাই করতেই হয়। শাস্ত্রে অশৌচের বিধান না-ই থাকুক, ভাস্কর কিছুদিন এখন অফিসে যাবে না।

তা হলেও জুটমিলের কিছু মাতব্বর লোক সে ডেকেছে। সাধারণ হিসাবে মঙ্গলবারের দিন নীরদবিহারীর শ্রাদ্ধশান্তি হবার কথা—সেই-দিন সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রীটের বাড়ি তাঁরা সব আসবেন। তাঁদের কথা এত কাল ধরে যথেষ্ট শুনে আসছে, ভাস্করের জবাব সেই দিন—বাপের সম্পর্কিত বিশেষ ঐ দিনটায়। নিজ-মুখে সামনাসামনি বলবে—মারফতি কথায় অনেক সময় মানে ঘুরে যায়।

সিতাংশুকে চুপি চুপি বলে, সেই যে ব্যবস্থা আমাদের ঠিকঠাক হয়ে আছে। আগেভাগে আমি বেরিয়ে পড়ব, জলধর ভাস্কর হালদার হয়ে থাকবে।· কোয়ার্টার ছেড়ে তুমিও পার্ক স্ট্রীটে এসে থেকো এই কয়েকটা দিন। জলধরকে সামলাবে। বক্তৃতার সময়টা পাশে থেকে ব্যবস্থা করবে।

প্ল্যানটা আদ্যোপান্ত আবার দু'জনে আলোচনা করল। মাতব্বরেরা বাড়িতে এসে বক্তৃতা শুনে যাচ্ছেন—এজেণ্ট কলকাতায় আছে,

একেবারে চাক্ষুষ প্রমাণ তার। শত্রুপক্ষ নিশ্চিন্ত রইল। ভাস্কর তখন তেজা মল্লিকের কাছে তদ্বির করে ঘুরছে।

সিতাংশু বলে, তাই যাও তুমি। কাজ না হয়ে পারে না। এমনি যদিই বা মল্লিক দ্বিধা করত, এই অবস্থায় গিয়ে পড়লে 'না' বলতে পারবে না। আরও সুবিধে, গৌরদাসটা নেই—গোলমালের মধ্যে নজরবন্দির ব্যবস্থা নিশ্চয় কিছু ঢিলে হয়ে আছে।

ভাস্কর বলে, সকলের বড় সুবিধেটা বলছ না যে! শম্পার দায়ও নেমে গেছে। আর কিছু পরোয়া করি নে, একেবারে মুক্তপুরুষ। মন খুলে কাজ করতে পারব। মল্লিক যা বলে শুনতে আর কোন রকম বাধা রইল না।

হাসে ভাস্কর কেমন করে। সিতাংশু উঠেপড়ল। এ হাসি চোখ মেলে দেখা যায় না।

জলধরকে সিতাংশু বলে, মীটিং হচ্ছে মিলের লোক নিয়ে। আপনি বক্তৃতা করবেন।

আঁতকে ওঠে জলধর: কী সর্বনাশ! দিনকে-দিন কী আরম্ভ করলেন বলুন তো! পেটে কত বিদ্যে আছে যে বক্তৃতা করব? জানি তো শুধু অভিনয়—

সিতাংশু বলে, বক্তৃতা বুঝি অভিনয়ের বাইরে? যাত্রার আসরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন না?

সে তো মুখস্থ করা থাকে। ভাবভঙ্গি করে নোশানের উপর বলে যাই।

সিতাংশু বলে, মীটিংয়ের বক্তৃতাও ঠিক তাই। অন্যে তৈরি করে দেবে, সেই জিনিস আউড়ে যাবেন। একবর্ণ ভাবতে হবে না আপনাকে, একটি লাইন নিজে লিখতে হবে না।

জলধর কৌতুক পেয়ে যায়: বটে, বটে! তবে তো যাত্রার পালারই মতো।

সিতাংশু বলে, মীটিঙের ঠিক আগে বক্তার বাড়ি গিয়ে দেখবেন, ঢক ঢক করে জল গিলছে আর বক্তৃতা মুখস্থ করছে। বড় হওয়ার অনেক জ্বালা।

জলধর প্রবল সায় দিয়ে ইংরেজি বলে ফেলে, তা সত্যি, আনইজি লাইজ দি হেড দ্যাট উইয়ার্স দি ক্রাউন।

কিন্তু আমি বলি কি—মুখস্থর ঝামেলায় গিয়ে আপনার কাজ নেই। গড়বড় হয়ে যেতে পারে। দেখে দেখে পড়বেন। লিখিত বক্তৃতা যাত্রার আসরে চলে না, মীটিংয়ে চলে। তবে বাহাদুরিটা কম। গোড়ার দিকে ভূমিকা স্বরূপ পাঁচ-দশটা কথা—সেটুকু মুখস্থ থাকলেই হবে।

খুব রাজি এখন জলধর। শুধু সামাল করে দেয়: বক্তৃতার মধ্যে ইংরাজি কথা-টতা থাকবে না তো মশায়? একটা ঐ এখন বলে বসলাম—বিস্তর কাল ধরে ওটা রপ্ত ছিল। ইংরাজিটা কিছু কম আসে আমার।

আহা, বলছে ভাস্কর হালদার যে! বিলেত-ঘোরা মানুষের মুখে দুটো-চারটে ইংরেজি না থেকে পারে না। ঘাবড়ান কেন? আসরে দাঁড়িয়ে সেদিন তো পুরো এক সংস্কৃত শ্লোক কপচালেন—সংস্কৃতেই বুঝি মহামহোপাধ্যায় আপনি। কিছু না—বলেন তো আপনি নন, মোশানমাস্টার বলিয়ে নেয়। বক্তৃতার মধ্যেও তেমনি ইংরেজি-ফ্রেঞ্চ-জর্মান, আরবিফারসি যাচ্ছেতাই থাকুক না—বলিয়ে নেবার দায় আমার। নাকে সর্ষের তেল দিয়ে আপনি ঘুমোনগে যান।

॥ তেরো ॥

পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির লনের উপর জমায়েত। ইতিমধ্যে আবার এক বিপদ—পা হড়কে ভাস্কর নাকি জখম হয়েছে। ভূয়োদর্শীরা বলে, হবেই। মহাগুরু-নিপাত—তার উপরে অপঘাতে গেলেন। বড্ড সামাল-সামাল এই গুরুদশার বছরটা।

অতএব সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে আসা হালদার সাহেবের পক্ষে সম্ভব নয়। যা বলবার দোতলার বারাণ্ডা থেকে বলবে। অভ্যাগতেরা কিছু যেন মনে না করেন।

লনের মধ্যে বসে দাঁড়িয়ে সকলে প্রতীক্ষা করছে। সিতাংশুর কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে রেলিং ঝুঁকে দাঁড়াল ভাস্কর—অর্থাৎ জলধর। ধরার উপায় নেই যে নকল-ভাস্কর। পাশে দাঁড়িয়ে, এমন কি, সিতাংশুরও যেন ধাঁধা লেগে যাচ্ছে।

কী বলে যাচ্ছে ঈশ্বর জানেন—বক্তা জলধর কোন-কিছু জানে না। তবে বলাটা হচ্ছে ভালই, ঘন ঘন হাততালি পড়ছে। বিকৃত মুখে মাঝে মাঝে বক্তৃতা বন্ধ করে—অভিনয়ের প্যাঁচ—যন্ত্রণা হচ্ছে যেন আহত পা-খানা নিয়ে। কথা বন্ধ করে বাঁ দিকে একটু কাত হয়ে পায়ের উপর হাত বুলিয়ে নেয়।

শ্রোতা কেউ কেউ নিচে থেকে বলছে, বসে বসে বলুন সার। দাঁড়ানোর কী দরকার।

বিনম্র হাসি হাসে ভাস্কর হালদার, অর্থাৎ জলধর। বলে : সে কী কথা! আপনাদের মধ্যে যেতে পারলাম না, আপনারাও কতজনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, বসি আমি কোন লজ্জায়?

অফিসের রুক্ষবচন সাহেব-মানুষটির মুখে এমন হাসি দেখে তাজ্জব লাগে। নানা টিপ্পনী শ্রোতাদের মাঝে। কেউ বলে, বাপের শেষ

পরিণাম দেখে ঘাবড়ে গেছে। কেউ বলে, মানুষটা আসলে ভালই—নারকেলের মতন, উপরে শক্ত খোলা, ভিতরে দুধালো শাঁস। কেউ বা বলে, গুঁতোর চোটে। আঙুল না বাঁকালে ঘি ওঠে না।

কিন্তু ঘি সত্যি সত্যি এবারে উঠবে, বক্তৃতার মানে কি তাই দাঁড়ায়? ঘোরতর মতভেদ। কেউ বলে, হাঁ, সুনিশ্চিত। কেউ বলে, না, উল্টো। মনোযোগ দিয়ে শুনেছে সকলে, হাততালি দিয়ে সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু আসলে গোলমাল—কী বলে গেল, তার মানে ঠিক পাওয়া যাচ্ছে না।

অর্থাৎ বক্তৃতা খুব ভাল হয়েছে। ভাল জিনিষের মজাই হল, মানে করতে গিয়ে দু'জনে একমত হয় না।

মানে যা-ই হোক—মোটের উপর এটা দাঁড়াল, আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা ভাস্কর পার্ক স্ট্রীটের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছে। ঠিক এই সময়টা কলকাতা থেকে অনেকটা দূরে সিদ্ধিহাট গ্রামে পিস্তলের গুলিতে গৌরদাস যদি খুন হয়ে থাকে, আততায়ী আর যে-ই হোক, ভাস্কর হালদার কখনো নয়।

স্বপ্নে নয়, ভাস্কর গেছে সিদ্ধিহাটে। বসিরহাটে নেমে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পৌঁছেছে।

প্রহরখানেক রাত্রি। ঘন অন্ধকার, ঝিঁঝি ডাকছে: জোনাকি উড়ছে এদিক সেদিক। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভাস্কর পিস্তল মুঠোয় চেপে নিল। টিপি টিপি এসে জানলার কাছে দাঁড়ায়।

লাইসেন্স-করা নিজের রিভলভার আছে, সে জিনিষের ব্যবহার চলবে না। তদন্তে বের করে ফেলতে পারে পুলিশ। সামান্য চেষ্টাতেই পিস্তল জোগাড় হয়ে গেল। স্বদেশি আমলে একটি পিস্তল-রিভলভারের সংগ্রহে কত ছেলের মোটা মেয়াদে জেল হয়েছে, প্রাণও গেছে কত জনার। যার জন্য রাধারমণ আর নীরদে মিলে স্টীল-কোম্পানির পত্তন করে ফেললেন। এখন সে জিনিষ কত সহজে জোটানো যায়—সামান্য

তিন-চার শ টাকার মধ্যে। গোপন কারখানা চলে—বেশি করে মুঙ্গের অঞ্চলে। পুরুষানুক্রমে কাজ করে ঐ অঞ্চলের কারিগরের সুদক্ষ হাত। ঘুঘুলোকে সুলুকসন্ধান রাখে, চোরা-কারবার চালায়। গোড়ায় ভাস্কর মুঙ্গেরি পিস্তল একটা জুটিয়েছিল, তারপর ভাল বিলাতি জিনিষ পেয়ে গেল। বত্রিশ পয়েন্টের অটোমেটিক পিস্তল—আয়তনে ছোট, ইঞ্চি ছয়েকের মতো। ধরাশায়ী হবার মুহূর্ত আগেও গৌরদাস বুঝবে না, অব্যর্থ মারণাস্ত্র ভাস্করের মুঠোর ভিতরে।

বম্বে যাচ্ছি—সিতাংশুকে পর্যন্ত ভাঁওতা দিয়েছে। বাবা নেই, কার জন্যে আর তেজা মল্লিকের কাছে ধর্না দিতে যাওয়া, তাঁকে আমড়াগাছি করা? আত্মঘাতী মানুষটা কোন অলক্ষ্যে ছটফট করছেন—প্রতিহিংসা নিয়ে তাঁর আত্মার যদি কিছু শান্তি দেওয়া যায়। সেই কর্তব্যে এসেছে ভাস্কর। সন্ধ্যারাত্রেও একবার এসে গেছে এখানে—এই জানলার ধারে। কেরোসিন-কাঠের টেবিল, সামনের দেয়ালে দেয়ালগিরি। গৌরদাস ছিল তখন—ঘাড় নিচু করে কিছু লিখছিল এই দিকটা পিছন করে, কোন হিসাবপত্র মনে হয়। কোনখানে দাঁড়িয়ে তাক করবে, জায়গাও ভাস্কর নিরিখ করে দেখল। চারিদিকে লোকজন দেখতে পেয়ে তখন ফিরে গেল। রাত করে এই দ্বিতীয় বার এসেছে।

ভিতরে উঁকিঝুঁকি দেয়। গৌরদাস নেই। দেয়ালগিরিটা জ্বলছে—চিমনিতে কালি পড়ে আলো বড় বেরুচ্ছে না। আলো রয়েছে, এবং ঘরের দরজা খোলা—কাছেপিঠে আছে গৌর কোথাও। এক্ষুনি এসে পড়বে।

মানুষের গলা: কে ওখানে?

ভাস্কর হকচকিয়ে গেছে। আচমকা টর্চের আলো মুখে পড়ল। ছুটে এসে ধরে ফেলল তাকে। জন চারেক তারা।

ধরেছে অন্য কেউ নয়—গৌরদাস নিজে। চেপে ধরেছে ডান-হাতখানা—আর ভাস্করের ডান-পকেটে পিস্তল।

হাতে হাত ধরে আলিঙ্গনে জড়িয়েছে, জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে চলল।

মেটে-ঘরের দাওয়ার কাছে গিয়ে ভিতরে তাকিয়ে নিচু গলায় গৌরদাস বলে, ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এলাম মীরা। শব্দসাড়া পাচ্ছি নে, দিদি কি ঘুমিয়ে গেলেন? আর এই ইনি ভাস্কর হালদার—রাজা-মানুষ এসে পড়েছেন। আমার মনিব। বড় ঘরটায় আলো জ্বেলে তক্তাপোষে চাদর-টাদর পেতে দে শিগগির।

গৌরদাসের দিদি—অর্থাৎ অনুপমা। ভাস্করের ছোট বয়সের অনু-মা। সেই এক রাত্রে কত বছর আগে কোল থেকে অনু-মা নামিয়ে দিয়ে এসেছিলেন, আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছিল শিশু-ভাস্কর—হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীটের খোয়া-ওঠা রাস্তায় আর্তনাদ তুলে ঘোড়ার-গাড়ি চলে গেল।

শোনা গেল সমস্ত। অনুপমার বাড়াবাড়ি অসুখের জন্য গৌরদাস ব্যাকুল হয়ে চলে এসেছে। ছুটি নেবার দিনে এসব কিছু বলে নি—ভাস্করদের কাছে অনুপমার কথা তুলতে বোধহয় ঘৃণা বোধ করে। দোষ দেওয়া যায় না—রাত্রিবেলা বাড়ি থেকে সেই একদিন শিয়াল-কুকুরের মতো দূর-দূর করে তাঁকে পথে তুলে দিয়েছিল।

তা বলে অনু-মাকে কাছে পেয়ে ভাস্করই বা সবিস্তারে না শুনে কেমন করে পারে? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করছে। অসুখটা ঠিক সাব্যস্ত হয় নি, নানারকম সন্দেহ। পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় সময় সময় কাটা-কবুতরের মতো অনুপমা ছটফট করেন। এই একটু আগে তেমনি হয়েছিল। অজঙ্গি পাড়াগাঁয়ে ডাক্তার সহজলভ্য নয়—ছুটোছুটি করে ক্রোশখানেক দূরের গঞ্জ থেকে ভূতপূর্ব-কম্পাউণ্ডার ডাক্তারবাবুটিকে ধরে এনেছে। ডাক্তার নিয়ে গৌরদাস বাড়ি ঢুকছে, তখনই ভাস্করকে দেখল।

কষ্টে ও ক্লান্তিতে অনুপমা ঝিমিয়ে পড়েছেন। গৌর মীরাকে ডেকে বলে, ঘুমোচ্ছেন দিদি? আহা, ঘুমোন। ডেকে তুলে তবে

আর কাজ নেই। তুই আগে এঁর হাত-পা ধোওয়ার ব্যবস্থা কর। সেই কলকাতা থেকে আসছেন, কষ্ট হয়েছে।

নিচু গলায় ফিসফিস করে বলছিল—কী আশ্চর্য, অনুপমার কানে চলে গেছে। সজাগ হয়ে বলে ওঠেন, কে এলো রে গৌর? কলকাতা থেকে কে আমায় দেখতে এসেছে?

কত বছরের ব্যবধান—ভাস্কর তখন একফোঁটা শিশু। তবু কঠিন রোগশয্যার মধ্যে ক্ষীণ কেরোসিনের আলোয় জীর্ণশীর্ণ অনুপমার চিনে ফেলতে মুহূর্তমাত্র দেরি হল না। বলেন, দোদো? দোদো তুই ভুলিস নি আমায়? তোর সর্বনাশের খবর কাগজে বেরিয়েছে বাবা, ওরা সব পড়ছিল। আমার তো তক্ষুনি তোর কাছে ছুটে যাবার কথা। কারো কথা শুনতাম না, গিয়ে তোর এই অবস্থায় চোখের দেখাটা দেখে আসতাম। কিন্তু পোড়া রোগে শুইয়ে রেখেছে—শুয়ে শুয়ে ছটফট করি, আর ভাবি। দেখবার বড্ড ইচ্ছে হচ্ছিল, ভগবান তাই এনে হাজির করে দিলেন। নইলে তুই এই পাপধাড়া গাঁয়ে এসে আমার শিয়রে বসবি, কেউ কখনো ভাবতে পারে?

প্রসন্ন মুখ—উজ্জ্বল হাসি ফুটেছে মুখে। হাসি তবু নিভে যায় এক একবার, মুখের উপর বিকৃতি আসে। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অনুপমা সামলে নেন, পরক্ষণে আবার কথা বলেন।

ডাক্তারের চোখ এড়ায় না। বলেন, কি রকম হচ্ছে বলুন দিকি? যন্ত্রণা কোনখানে?

অনুপমা হেসে উড়িয়ে দেন: কতকাল পরে ছেলে পাশে বসেছে, এখন কি আর যন্ত্রণা থাকে ডাক্তারবাবু? যন্ত্রণা-টন্ত্রণা নেই—আমি সেরে গেছি। কোন অষুধ লাগবে না—কাল-পরশুর মধ্যে উঠে বেড়াব, দেখতে পাবেন।

মরফিয়া ইনজেকসনের জন্য ডাক্তার সূঁচ নিয়ে এসেছেন, সে আর লাগল না। অষুধও এনেছেন। যন্ত্রণা বাড়লে সেই অষুধ খাবার নির্দেশ দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন।

॥ চোদ্দ ॥

কোথায় যন্ত্রণা ? না, নেই।

অনুপমা হেসে হেসে গল্প করছেন। রাত্রি অনেক, অনেক। রোগীর মলিন শয্যার উপর ভাস্কর সেই থেকে বসে। মীরা কত বার এসে এসে পড়ছে, নড়াতে পারল না। বাপের শোচনীয় মৃত্যু—হেন অবস্থায় মা থাকলে, সেই মা বোধকরি শৈশবের 'দোদো' নামে ডেকে গল্পগাছায় এমনি করে ভোলান ছেলেকে।

অনুপমা বলে, মনে পড়ে দোদো, সেই যখন ছোট্টটি ছিলে সন্ধ্যার পরে আমার কিছু করবার জো ছিল না—ভ্যানর-ভ্যানর করতে হত তোমার সঙ্গে।

ভ্যানর-ভ্যানর কী বলো অনু-মা। সে তো রূপকথা—

পকেটের পিস্তলের উপর হাত চাপা দিয়ে ভাস্কর বলে যায়, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি পাতালবাসিনী-রাজকন্যা রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র কোটাল-পুত্র সদাগরপুত্রের গল্প—

সমস্ত মনে আছে দেখি তোমার—

ছিল না মনে—আশ্চর্য স্বপ্নের মতন এখনই সব ভেসে আসছে। কিছুই বুঝি নিঃশেষ হয়ে যাবার নয়—লুকিয়ে থাকে কোনখানে, সুবিধা মতন বেরিয়ে পড়ে।

ভাস্কর আবার বলে, অনু-মা, আমার মনে আছে, তুমিই কিন্তু সব ভুলে গিয়েছ।

আমি ?

হ্যাঁ। কবে আমায় 'তুমি' বলতে, বলো তো অনু-মা ?

এখন যে বড় হয়ে গেছ বাবা। তার উপর বড়মানুষ—

ভাস্কর আর বলতে দেয় না। অভিমানের সুরে বলে, দেখছি

তাই অনু-মা। বড়মানুষ হবার মতন অভিশাপ নেই। দুনিয়ার কেউ দু'চক্ষে দেখতে পারে না—বড়মানুষও যে মানুষ, সে কথা ভুলে যায়।

একটু থেমে মৃদু কণ্ঠে আবার বলে, বড়মানুষ আর নই আমি অনু-মা। কত দিন পরে তোমায় পেলাম—বড়মানুষ-বড়মানুষ করে গালমন্দ কোরো না।

আরও রাত হয়েছে। মীরা এবারে মারমুখী হয়ে এসে পড়ে: রাত যে পুইয়ে গেল। আর নয়, খেতে আসুন এবারে। মামাকে বসিয়ে দিয়েছি, হাত গুটিয়ে বসে আছেন তিনি।

রান্নাঘরের দাওয়ায় দুটো পিঁড়ি পাশাপাশি। কী দুর্দৈব, গৌরদাসকে খুন করতে এসে তারই পাশাপাশি খেতে বসতে হচ্ছে। পরনের স্যুট খুলে হোল্ড-অলে পুরে বসিরহাট স্টেশনে স্টেশন-মাস্টারের জিম্মায় রেখে এসেছে। সাদামাটা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে গাঁয়ে ঢুকেছে—লোকের বিশেষ নজর তার উপর না পড়ে। পাঞ্জাবির ডান-পকেটে পিস্তল—সেদিকটা ঝুলে পড়েছে নাকি? বিষম মুশকিল জিনিষটা নিয়ে। কী করে সামলানো যায়।

মীরা ভাত বেড়ে আনল। ভাস্করের পিঁড়ির সামনে একটা জলচৌকি—থালা এনে তার উপর রাখে। গৌরদাসের থালা মাটিতে।

ভাস্কর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তার জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলে, গৌর-কাকা বেশ তো নিচু হয়ে খাবে, আমার এই উঁচু হয়ে খাওয়া কেন?

বিলেত-ঘোরা সাহেব-মানুষ—অভ্যাস যে টেবিলে খাওয়া।

বিলেতের ঐ রেওয়াজ—আমি কি করতে পারি? সেখানে যদি মাটিতে খেতে যাই, সবাই হাঁ করে চেয়ে থাকবে। খাওয়া যায় তার মধ্যে—বলুন। কাপুরুষ আমি—সাহসও ছিল না সকলের মধ্যে একটা উল্টো কিছু করবার।

মুখ তুলে কৈফিয়তের ভাবে বলতে লাগল, প্রবাসে নিয়ম নাস্তি— অভ্যাস যদি করেই থাকি, সেটা প্রবাসে গিয়ে। ধুতি-পাঞ্জাবিতে এখন তো পুরো বাঙালি হয়ে আছি। সাহেব নাম কিসে ঘুচবে, প্রায়শ্চিত্ত কিসে হবে, বলুন। গোবর খেয়ে? নিয়ে আসুন তবে একতাল।

গৌরদাস বলে উঠল, খেতে তোমার অসুবিধা হবে ভেবেছিল। জলচৌকি সরিয়ে নে মীরা, ভাস্কর রাগ করছে।

ইতিমধ্যে আরও কিছু নজরে পড়ল। পাশে আলাদা একটা রেকাবিতে ছুরি ও ছোট্ট হাতা। স্থান-কাল ভুলে ভাস্কর বিষম ক্ষেপে যায়: বাঃ বাঃ, সাহেবি ব্যবস্থা আরও তো রয়েছে। কিন্তু চাকুছুরি পেন্সিল কাটতে লাগে, হাতায় ডাল ঘোঁটে—ও-সবে খাবার তুলে কেউ খায় না।

সলজ্জে মীরা বলে, পাড়াগাঁয়ে হুট করে এখন মেলে কোথায়? কষ্টেসৃষ্টে চালিয়ে নিন, দিনমানে কাল বসিরহাট থেকে এনে দেবে। কাঁটা-ছুরি না হোক, চামচেটা মিলবে ওখানে।

মীরার কথার আগেই ভাস্কর হাতা-ছুরি দূর করে ছুঁড়ে দিয়েছে।

উঠান থেকে টুক করে বাঁশের চেলা কুড়িয়ে নিয়ে মীরা তলোয়ারের মতন ধরল।

ওকি, ওকি—

পিটুনি দেবো বুঝতে পারছেন।

ভয়ের ভঙ্গি করে ভাস্কর বলে, কী সর্বনাশ!

মীরা হেসে বলে, গেঁয়ো মেয়ে আমাদের মুখ-হাত দুই-ই চলে। মুখের ঝগড়া, হাতের পিটুনি।

মিথ্যা বলে নি। খেতে বসতে না বসতে দু'জনের দুই থালা ঘিরে একপাল বিড়াল।

মারে মীরা চেলাকাঠের ঘা-ঘা খেয়ে বিড়াল পালিয়ে যায়। তবু সদাসতর্ক থাকতে হবে। দুধ গরম করতে রান্নাঘরে গিয়েছে,

সেই সময় বিড়াল আবার এসে পড়ল। থাবা বাড়িয়ে থালা থেকে মাছ তুলে নিতে যায়—এতদূর সাহস। দূর থেকে দেখে মীরা তেড়ে আসে চেলাকাঠ নিয়ে।

ভাস্কর বলে, লাঠি হাতে কি জন্যে এসে দাঁড়ালেন ভেবে পাচ্ছিলাম না। উদ্দেশ্য এখন বুঝেছি।

হাসিমুখে মীরা বলে, কি বুঝলেন বলুন।

বিড়ালে খেতে এলে লাঠিপেটা করে তাড়াবেন।

উদ্দেশ্য আরও আছে—

বলতে বলতে মীরা প্রকাণ্ড বাটি-ভরতি দুধ এনে থালার পাশে রাখল।

ভাস্কর সকাতরে বলে, দুধ খাই নে আমি। বিশ্রী লাগে।

এই তো সামান্য একটু। আমসত্ত দেওয়া আছে, নতুন-পাটালি এনে দিচ্ছি। এক চুমুকে শেষ হয়ে যাবে।

গৌরদাসের খাওয়া শেষ। ভাস্করও তার সঙ্গে উঠে পড়তে যায়।

মীরা বলে, লাঠি হাতে কেন দাঁড়িয়েছি পুরোপুরি জানেন না। খেতে এলে বিড়াল মারি, আর না খেলে মারি—

বাক্যটা ভাস্কর পূর্ণ হতে দেয় না। পিঁড়িতে আবার বসে পড়ে ঢকঢক করে বাটির দুধ শেষ করে ফেলল।

মীরা উল্লাস ভরে বলে, এই তো দিব্যি খেয়ে ফেললেন।

ভাস্কর গোমড়া মুখে বলে, কি করি বলুন। দুধ বিশ্রী, পিটুনি যে আরও বিশ্রী।

কিন্তু এখনো শেষ নয়।

চক্ষের পলকে মীরা রান্নাঘরে ঢুকে গাড়ুতে গরম জল পুরে আনল। বলে, আঁচাবেন আসুন।

ভাস্করের হাতে গরম জল ঢেলে দিচ্ছে গাড়ুর নলের মুখে। ভাস্কর বলে, আপনি সরে যান তো। আমি ঢেলে নেবো। খেতে বসুন গিয়ে আপনি।

আপনি পারবেন কেন?

ভাস্কর চটে গিয়ে বলে, না, আমি মানুষ নই। আপনারাই কেবল মানুষ। আপনারা সমস্ত পারেন—গাড়ুটা কাত করে জল ঢালবার ক্ষমতাটুকুও নেই আমার।

করলেন কবে যে শিখবেন। বেসিনের কল খুলে দেন, কলের মুখে জল পড়ে। এ-ও তাই। গাড়ুর নলের মুখে কলের মতন জল পড়ছে।

শুতে যাবার আগে ভাস্কর আবার একটু অনুপমার ঘরে গেছে।

অনুপমা বলেন, খাওয়ার কষ্ট হল, বুঝতে পারছি। অভ্যাস নেই তো এমন।

ঠিক বলেছ অনুপমা। ঝগড়া করে লাঠি ধরে সামনে বসে একজনে খাওয়াচ্ছে, এ অভ্যাস কোনদিন নেই আমার। এত সুখে কি খাওয়া যায়? না অনু-মা, ভুল বললাম। খেয়েছি একদিন তোমার কাছে ছোট্টবেলা তুমি এমনি:করে খাওয়াতে, স্বপ্নের মত মনে পড়ে। আজকে মীরা খাওয়াল।

কে জানত, কলহ ও সংঘর্ষের পৃথিবীতে এমন সব জায়গাও আছে যেখানে সামান্য কথা, ছোটখাটো খুনসুটি আর নির্ভেজাল আনন্দ। শত্রুর বাড়ি আততায়ী হয়ে এসে একঘুমে রাত কাবার—কতকাল ভাস্কর এমন গভীর ঘুম ঘুমায় নি।

জলধরের বক্তৃতা দস্তুরমতো জমেছিল সেদিন। মীটিং শেষ, হাততালিতে কানে তালা ধরিয়ে দিয়ে মানুষজন বেরিয়ে যাচ্ছে। সিতাংশুর কাঁধে ভর দিয়ে জলধর উঠে পড়ল, খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভিতরে চলেছে।

ব্যালকনি পার হয়ে দৃষ্টির আড়ালে গিয়েই চকিতে তালগাছের মতন সে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। হলের ভিতর এদিক সেদিক বার কয়েক ছুটোছুটি করে নেয়।

সিতাংশু ধমক দিয়ে ওঠে: আঃ, পাগলামি রাখুন। দুমদুম আওয়াজ হচ্ছে—নিচে চাকরবাকর, তারা সব কি ভাবছে বলুন তো?

সঙ্গে সঙ্গে জলধর নিশ্চল। বেকুব হয়ে বলে, বসে বসে পা লেগে গেছে। ছাড়িয়ে নিচ্ছিলাম। খঞ্জ কুব্জ অন্ধের অভিনয় আসরেও করেছি. কিন্তু এতক্ষণ ধরে নয়। উঃ মশায়, এত ভিরকুটিও জানে বড়লোকে। টাকাকড়ি এলাকপোশাক দেখে হিংসেয় জ্বলি, কিন্তু বড় কষ্ট আপনাদের। জৌলুষ আছে, কিন্তু আসল যে জিনিস—সুখ নেই।

অন্তরঙ্গ কণ্ঠে আবার বলে, মানে কিছুই বুঝি নি—তা হলেও আন্দাজ হল, বক্তৃতার মধ্যে বিস্তর ভাল ভাল কথা ছিল। মানুষগুলো এবার থেকে সোনা-দানা পরবে, হীরে-মাণিক কামড়ে কামড়ে খাবে। তাই না?

সিতাংশু বলে, শুনতে তাই বটে। কিন্তু সব কথারই দু-রকম মানে। ভিতরের মানেটা হল: ওরে হতভাগারা, পরবি গাছের বাকল, খাবি ঘোড়ার ডিম।

উঃ মশায়, এত মিথ্যেও বলিয়ে নিলেন?

জলধর ফিক ফিক করে হাসে: আসরে পাঠ বলতে গিয়ে এই জিনিষ—ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা। আবার মশায়দের স্বর্গধামে এসেও তাই—ঠিক সেই ধান ভেনে যাচ্ছি। অভিনয়টা উতরেছে ভাল—কি বলেন? কী হাততালিটা দিল!

অভিনয় ভালই, হাততালি তা বলে এমনি এমনি পড়ে নি।

জলধর অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়ে। সিতাংশু বলে যাচ্ছে, তদ্বির ছিল আমাদের তরফ থেকে—ধরতা দেবার লোক ওদের ভিতর ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। গোড়ার হাততালি তারাই দেয়। মানুষ একসঙ্গে বসলে তখন আর মানুষ থাকে না, মিলেমিশে জনতা। যেদিকে চালাবে, সেইদিকে চলবে। হাততালি না দিয়ে আমাদের লোকগুলো যদি 'শেম' 'শেম' করত, সবসুদ্ধ তখন সেই 'শেম' 'শেম' করে উঠত।

আছে জলধর দস্তুরমতো ভাল। ভাবনাচিন্তা অভাব-অভিযোগ কিছু নেই। যা-কিছু প্রয়োজন, মুখে বলতেই এসে যাচ্ছে। বলার

আগেও আসে। মন তবু ছটফট করে। ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, জলের মাছ ডাঙায় এসে পড়েছে। মনের উপর জলধর চোখ রাঙায় : কুত্তার পেটে ঘি অসহ্য বুঝি? ঝেড়ে ফেলে দেয় মন থেকে পুরাণো চেনা-জানা লোকজন—বাইরের জগৎসংসার।

সিতাংশু মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে : রাজা হয়ে লাগছে কেমন জলধরবাবু?

জীবনভোর এই তো চেয়েছি। খারাপ কেন লাগবে বলুন। ভাল—

জোর দিয়ে আবার বলে, খুব ভাল। দামি দামি জিনিষ খাচ্ছি পরছি (বিনা অষুধে বিনা পথ্যে স্ত্রী মারা গেল তিনটে ছেলেমেয়ে ফেলে), ছেলেমেয়ের কাছে রমারম টাকা যাচ্ছে। আর মানুষে কি চায়? তবে—

বলতে গিয়ে থেমে যায়। সিতাংশু উৎসাহ দিয়ে বলে, বলুন না —বলে ফেলুন। অসুবিধা হলে নিঃসঙ্কোচে বলবেন। সেই তো পয়লা দিনেই কথা হয়ে আছে।

একলা লাগে বড্ড। আসরে আসরে পালা-গাওয়া আড্ডাধারী মানুষ কিনা আমরা।

রাজাদের এই মুশকিল। সমান দরের মানুষ নইলে মেশা যায় না —বাছগোছ করে মিশতে হয়। কথাবার্তাও বলতে হয় হিসেব করে, নিখুঁত নিক্তির ওজনে।

প্রণিধান করে জলধর : তা বটে, রাজারা গুণতিতেকিনা বড্ড কম! দুনিয়ার সবসুদ্ধ রাজা হয়ে গেলে দিব্যি হত। অভাব-অনটন নেই, আর তখন বাছাবাছিও নেই। দল বেঁধে দেদার আড্ডা জমাও। এখনকার বাজারে রাজা হওয়া মানে বন্দী হয়ে থাকা।

সিতাংশু বলে, রাজার খাতির-সম্মান টাকাকড়ি ভোগ করবেন, সেই সঙ্গে মন্দটুকুও নিতে হবে বইকি। নীর বাদ দিয়ে শুধু ক্ষীর খাবেন, সংসারে সেটা হয় না।

কী জানি, কোনটা নীর আর কাকে বলছেন ক্ষীর!

একটুখানি চুপ করে থেকে জলধর অধীর কণ্ঠে বলে ওঠে, আসল রাজা হালদার সাহেব চার-পাঁচ দিনের কথা বলে বেরুলেন—তার ছুনো হয়ে গেছে, এখনো পাত্তা নেই—

ভালই তো, চুটিয়ে আপনি রাজত্ব করে যান। ফিরে এলেই কি আর ছাড় পাচ্ছেন?

চমক খেয়ে জলধর বলে, সে কি মশায়, তখন আমায় কোন কাজে লাগবে?

ডুপ্লিকেট রাজা। আপনাদের যাত্রাদলে ডুপ্লিকেট থাকে—ধরুন আপনার একদিন অসুখ করল, ডুপ্লিকেট সেদিন অম্বরীশ সাজবে। এ-ও তাই, ভাস্কর হালদারের ডুপ্লিকেট হলেন আপনি।

উঃ মশায়, মতলব ভাল নয় আপনাদের। এই আঁটো-মাপের কুর্তা পরে হাসি বন্ধ করে মাপজোপের কথাবার্তা বলে বলে গায়ের বাতাস পেটের বাতাস একদম বেরুতে পারছে না। ফুলে গোল হয়ে যাব যে ফুটবলের মতন—আপনারা বড়লোকেরা যেমন হয়ে যান। আর কাজ নেই বাবা—ফকিরের পোশাক বুক-বুক করে রেখে দিয়েছি, হালদার সাহেব ফেরা মাত্তোর গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ব। আপোষে না যেতে দেন, পালাব।

সিতাংশু ভয় দেখিয়ে দেয়: পালালেই হল! নুলো-মহাদেব পিছন ধরে আছে—ঘ্যাচ করে ছোরা বসিয়ে দেবে।

বলেন কি মশায়! অতি যাচ্ছেতাই ব্যাপার দেখছি রাজা হওয়া। কান মলছি নাক মলছি—রেহাই পেলে কক্ষনো আর এ পথে নয়।

সিদ্ধিহাট গাঁয়ে ভাস্করের দশ-বারো দিন হয়ে গেছে। আরও কত বারো দিন লাগে ঠিক কি! গ্রাম আটক করে ফেলেছে, সাধ্য কি বেরিয়ে পড়বে। কলকাতায় নজরবন্দি ছিল, এখানে তার ঢের ঢের বেশি। অত্যাচার রীতিমত। মীরা জুতো-জামা সেরে ফেলে: যান না চলে

খালি-পায়ে। বাসে ট্রেনে কিন্তু এই অবস্থায় যেতে হবে। মা একটু ভাল হয়ে উঠুন, তখন কেউ আর থাকার কথা বলতে যাবে না। সত্যিই তো, কষ্ট হচ্ছে বড়মানুষের।

গৌরদাসেরও ঐ ধরনের কথাঃ আমরা কিছু জানি নে। যাবে তো তোমার অনু-মার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে যাও। আমিও তো সর্বকর্ম ফেলে দিদির জন্যে আটক হয়ে আছি।

অনু-মার সামনে গিয়ে রোগিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে যাওয়ার কথা বলা যায় না। অসহ্য যন্ত্রণা, কাটা-কবুতরের মতো ছটফট করছেন, কোন অষুধে যন্ত্রণার উপশম হয় না। ভাস্কর হয়তো তখন বাড়ি নেই, ছোলা-মটরের ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরে কড়াইশুঁটি খাচ্ছে। খোঁজে খোঁজে মীরা গিয়ে পড়েঃ শিগগির আসুন, মা কেমন করছে।

হন্তদন্ত হয়ে ছোটে ভাস্কর। বাইরে থেকেই কাতরানি শুনছে—আহত বোবা জন্তুর মর্মান্তিক আওয়াজের মতন। ঘরে ঢুকে ডাক দেয়ঃ অনু-মা—

কোথায় যন্ত্রণা, কোথায় কি! চোখ তাকিয়ে অনুপমা হেসে পড়েন। অষুধে ডাক্তারে পারে না, ভাস্করের আসার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র-বলে যেন যন্ত্রণা সেরে যায়।

দিনের পর দিন ভাস্কর কিন্তু বিষম বাড়িয়ে তুলেছে জুতো-জামা সেরে মীরা ভয় দেখিয়েছিল—একদিন লক্ষ্য হল, জুতো সত্যি সত্যি পরিত্যক্ত—সর্বক্ষণের জন্য। খালি-পায়ে এবং গেঞ্জি মাত্র গায়ে পথে-ঘাটে সর্বত্র তার চলাচল।

মীরার চক্ষু কপালে উঠে যায়ঃ সর্বনাশ, একটা কিছু না ঘটিয়ে ছাড়বেন না? শু পরতে ভাল না লাগে, মামার চটি পরে তো বেড়াতে পারেন।

গাঁয়ের মধ্যে কেউ চটি পরে না, খালি-পায়ে বেড়াচ্ছে সব।

তাদের সঙ্গে আপনার তুলনা? কত বড়মানুষ হলেন আপনি!

হঠাৎ ভাস্কর আগুন হয়ে ওঠে : দেখ, বড্ড লেগেছ তুমি আমার সঙ্গে। (আপনি গিয়ে 'তুমি' হয়ে গেছে কবে। যা গতিক 'তুই'তে না দাঁড়ায়!) যখন তখন যার তার কাছে বড়মানুষ বলে বেড়াও। সামনে শুধু নয়, আমার আড়ালেও। ভাবো, আমি টের পাই নে। মানা করে দিচ্ছি, কক্ষনো কোনদিন আর বলবে না।

মীরা সমান তেজে উত্তর দেয় : এক-শ বার বলব। হাতিকে হাতি বলব না, বড়মানুষকে বড়মানুষ বলব না—এত ভয় কিসের শুনি? বড়মানুষ খালি-পায়ে হাঁটে না, আপনিও হাঁটবেন না—ব্যস, চুকেবুকে গেল।

রাগ দেখে ভাস্কর ঘাবড়ে গেছে। মিন মিন করে বলে, হুঁ খালি-পায়ে হাঁটব না! আচ্ছা, হলাম বড়মানুষ। বড়মানুষের পা বুঝি পা নয়?

সে পা হাঁটবার জন্য নয়।

কি করব তবে পা নিয়ে? রূপোয় মুড়ে রেখে দেব?

রূপোয় না হোক, মোজায় জুতোয় মুড়ে। বলুন দিকি আপনি—সত্যি কথা বলবেন, গাড়ি ছাড়া গিয়েছেন কখনো কোথাও? কোন্ বড়মানুষটা পায়ে হেঁটে বেড়ায়?

ভাস্কর বিরক্ত কণ্ঠে বলে, অজঙ্গি পাড়াগাঁয়ে আমার অন্ন-মা'র কাছে এসেছি—সেখানেও শান্তি নেই। রাজা-মানুষ সাহেব-মানুষ বড়মানুষ বলে বলে মাথা খারাপ করে দিল। বিশেষণগুলো বাতিল করে শুধু-মানুষ বলে কেউ মানবে না?

ভাস্করের মেজাজ হারানোর কারণ আছে। সত্যিই সাড়া পড়ে গেছে তাকে নিয়ে। মীরা এর মূলে, সন্দেহমাত্র নেই। আজকেই, এই খানিকক্ষণ আগে হাতে হাতে তার একটা প্রমাণ—

মাহিন্দার বলরাম কার কাছে যেন পরিচয় দিচ্ছে : রাজামানুষ খোড়োঘরের মধ্যে পড়ে আছেন। দ্বাপরে সেই যে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস হয়েছিল—কলিতেও তাই।

নিচু গলায় বলছিল, তবু ভাস্করের কানে গেল। রাগে গর গর করতে করতে তখনকার মতো সরে গেল। মাহিন্দারটার অবধি কান ভাঙিয়েছে। কোন কাজে বলরামকে ডাকলে কাজটুকু সমাধা করেই সুড়ুত করে সরে পড়ে। কথার মধ্যে 'আজ্ঞে' 'হুজুর' ঢোকায়, তা-ও লক্ষ্য হয়েছে। কারণটা এবারে বোঝা গেল।

নিরিবিলি পেয়ে এক সময় ভাস্কর বলরামের হাত চেপে ধরল : কার কাছে শুনেছ আমি রাজামানুষ? ছি-ছি!

বলরাম মুখ তুলে তাকায় ভাস্করের দিকে। জবাব দেয় না।

ভাস্কর বলে, না বললে কি হবে, আমি জানি। মীরা রটিয়ে বেড়াচ্ছে—পয়লা নম্বরের শত্রু সে আমার। তার কথা একবর্ণ বিশ্বাস কোরো না।

হাত চেপে ধরে ছিল বলরামের। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলরাম ভাস্করের আঙুলগুলো টিপে টিপে দেখে : বড়মানুষ নইলে এমন নধর হাত হল কেমন করে? একরত্তি হাড়-মাংস নেই—শুধুই তুলো।

একটা রোগ ভাই। রোগ নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করতে নেই। কানাকে কানা বলে না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলে না। কার কখন কি ঘটে, কেউ জানে না। মাংস কিছু নরম বলে আমায় খুঁড়ছ, তোমারও এ জিনিব হতে পারে।

বলরাম ঘাবড়ে যায়। তবু অবিশ্বাসের সুরে বলে, শুধু খাওয়া ছাড়া তো বড়মানুষের হাতের কাজকর্ম নেই। হাত সেই জন্যে এত নরম—

তা সত্যি। আবার রোগের কারণেও ঠিক তেমনি হতে পারে। আমার এ অবস্থা রোগে হয়েছে। সাহেবদের রং সাদা—ধবল রোগ যার হয়েছে, সে-ও অমনি ধবধবে হয়ে যায়। ধবল রুগিকে তাই বলে কি সাহেব বলবে?

কতটা বিশ্বাস করল বলরাম, কে জানে। ভাস্কর তখনই ঠিক করে রেখেছে, ধমক দেবে মীরাকে আজ আচ্ছা-রকম।

৷ পনেরো ৷

হপ্তা তিনেক কাটল। কী আশ্চর্য, ভাস্করের চেহারাতেও যেন গেঁয়ো মানুষের ছোপ ধরে যাচ্ছে। ভাস্কর হালদার হবার আগে জলধর যেমনটা ছিল, প্রায় তাই। এক-হাঁটু ধুলো মেখে গাঁয়ের এখানে সেখানে সে চক্কোর দিয়ে বেড়ায়। কতটুকু সাধ্য মীরার, কী করে সে ঠেকাবে! বকাবকি করে, ভাস্কর কানেও নেয় না। হাসে হি-হি করে—গাঁয়ের মানুষদের মতন।

মীরা রাগ করে বলে, চলে যান আপনি গাঁ ছেড়ে। একদিনও আর থাকতে পাবেন না।

ভাস্কর ভ্রূভঙ্গি করে বলে, যাব তোমার কথায়? আমার অনু-মার কাছে এসেছি, তুমি তাড়াবার কে? বাড়িটা গৌর-কাকার—তিনি বলে দিন, তক্ষুনি চলে যাব।

গৌরদাস বলবে চলে যেতে! উল্টো সে আরও তটস্থ হয়ে আছে। যখন তখন বলে, তোমার কষ্ট হচ্ছে জানি। দিদির কথা ভেবেই স্বার্থপর হয়ে আটকাচ্ছি। কনফারেন্স শেষ করে ডাক্তার পাল এ বাড়ি আসবেন, দেখেশুনে নিজে ব্যবস্থা দেবেন—তখন কি করতে হয় না হয়, সেই ক'টা দিন অন্তত থাকতেই হবে তোমায়।

ছন্নছাড়া মানুষ গৌরদাস—বাপ রাধারমণেরই মতো। সংসারের বন্ধন শুধুমাত্র দিদি, আর দিদির মেয়ে মীরা। দিদি নয়, দেবী। অনুপমার বাড়াবাড়ি অসুখের জন্য সকল কাজকর্ম ফেলে বাড়ি এসে রয়েছে। ভাল রকম চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে তবে নড়বে। একটা বড় সুযোগ এসেছে। কলকাতায় মেডিক্যাল কনফারেন্স হচ্ছে বৃহৎ আয়োজনে। ডাক্তার পাল সভাপতি হয়ে আসছেন। এইসব রোগের বিশেষজ্ঞ তিনি। নয়াদিল্লীতে রিসার্চ ল্যাবরেটারি,

দেশবিদেশের মেডিক্যাল-জর্নালে তাঁর গবেষণা বেরোয়। সম্প্রতি একটা অষুধ বের করেছেন, যা নিয়ে খুব হৈ-হৈ চলেছে। কিশোর বয়সে এই ডাক্তার পাল রাধারমণের সাগরেদি করতেন—বোমা-রিভলভারও অস্ত্রসন্ত্র নাড়াচাড়া করেছেন। রোগের যাবতীয় লক্ষণ গৌরদাস তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল। যথোচিত ব্যবস্থা দিয়ে গৌরদাসকে লিখলেন : আপাতত টানাহেঁচড়া করতে যেও না এই অবস্থায়। যাচ্ছিই তো কলকাতায়—তোমাদের বাড়ি যাব। যা করতে হয়, দেখেশুনে আমি বলে দেব।

ডাক্তার পাল না আসা অবধি এই কয়েকটা দিন গৌরদাস ভাস্করকে আটকে রাখতে চায়। বলে, কী ছটফট করতেন দিদি—অবস্থা দেখে পাষাণেরও চোখ ফেটে জল বেরুত। তুমি এসে সব আরোগ্য হয়ে গেল। যন্ত্রণা যে নেই, সেকথা মানি নে। তোমার মুখ শুকোবে বলে দিদি প্রকাশ হতে দেন না।

গৌরদাসের জোর পাচ্ছে, তবে আর ভাস্কর মীরাকে গ্রাহ্য করতে যাবে কেন? আরও জোর অনুপমার কাছে। গিয়ে ভাস্কর সোজাসুজি নালিশ করে : দেখ অনু-মা, মীরা আমায় দূর-দূর করে তাড়াচ্ছে।

অনুপমার বিশীর্ণ মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সস্নেহে মেয়ের দিকে চেয়ে বলেন, জানি, বিষম হিংসুটে ওটা। এদ্দিন এক-সন্তান হয়ে ছিল—ভাগিদার এসেছে কিনা, হিংসায় জ্বলছে।

মীরাকে বলেন, তুই পেটের সন্তান, দোদো আমার বুকের সন্তান। তোর আগে ওকে পেয়েছিলাম, দোদোর দাবি ঢের ঢের বেশি। তুই কে রে ওকে যাবার কথা বলবার?

ভাস্কর বিজয়ীর আনন্দে মীরার দিকে চেয়ে টিপ্পনী কাটে : আস্পর্ধা বোঝ অনু-মা। যাবে তো ঐ যাক না চলে—

অনুপমার চোখে সহসা জল এসে যায়। বলেন, যতই ওরা ভরসা দিক, আমি নিজে সব টের পাচ্ছি। এত দুর্বল—হাতখানা উঁচু করতে

কষ্ট হয়। পেট টিপলে বলের মতন কী একটা ঠেকে—দিনকে-দিন পেট যেন ভরাট হয়ে আসছে। মনে মনে তোকে আমি বড্ড চেয়েছিলাম, আমার দোদোকে একটিবার দেখব। টানে টানে তুই চলে এলি। এসেছিস যখন, থেকে যা দুটো-পাঁচটা দিন। দেরি বেশি হবে না। মরার সময়টা আমার মুখে এক ঢোক জল তুই হাতে করে দিস। এর চেয়ে বড় কামনা আমার জীবনে নেই।

ভাস্কর বলে, হুঁ, মরবেন—আবদার! দিলাম আর কি মরতে! আমার মত অনাথ নিঃসহায় দুনিয়ার উপর কে আছে বল তো অনু-মা? কত কাল পরে মা পেয়েছি. তুমিও এমন ভয় দেখাতে লেগেছ। ডাক্তার পাল দেখে যান, তারপরে তোমায় কলকাতায় নিয়ে তুলব। দরকার পড়লে লণ্ডনে কি ভিয়েনায় নিয়ে যাব। ছোটবেলায় আমার এক মা ভুগে ভুগে গেছেন, অনু-মাকে আমি কিছুতে যেতে দেব না।

মীরা ইতিমধ্যে সরে গেছে সেখান থেকে। হার হয়ে গেল সেই লজ্জায়? নাকি তারও চোখে জল এসে গিয়েছিল?

অবস্থা এর পরে ভাস্কর একেবারে অসহ করে তুলল। এক দঙ্গল ছোঁড়া জুটিয়ে নিয়েছে—কাঁধের উপর গামছা ফেলে তাদের সঙ্গে দীঘির ঘাটে স্নান করতে যায়। জল দাপাদাপি করে। প্রবীণেরা স্নান করতে এসে ঘাটে নামতে পারেন না, ওরাই সদলবলে পুরো ঘাট দখল করে আছে।

আর বাড়িতে মীরা ভাত বেড়ে হা-পিত্যেশ বসে। উদ্বেগ হচ্ছে, শহুরে মানুষ সাঁতার জানে না—অঘটন ঘটিয়ে না বসে। সে উদ্বেগ কারো কাছে খুলে বলার নয়। বেলা গড়িয়ে যায় দেখে নিজেই সে ঘাটে চলল।

ঘাটে এসে মীরা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল—হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পায় না। সাঁতার জানে না বলেই ভাস্করের যত বিক্রম ঘাটের উপরে। জল ঘোলা-ঘোলা হয়ে গেছে, স্নানার্থীরা রাগ করছে।

মীরা ডাক দেয়ঃ উঠে আসুন। ভাত ঠাণ্ডা-কড়কড়ে হয়ে গেল। বসে আছি তো বসেই আছি। আসুন শিগগির।

ভাস্কর চোখ তুলে দেখল একবার। কে যেন কাকে বলছে। ভুস করে দিল ডুব জলতলে। ডুব দিয়ে দম ধরে কে কতক্ষণ থাকতে পারে, সেই পাল্লা। আর সুবিধা, জলের নিচে মীরার তাড়না কানে ঢোকে না।

যেই না আবার উঠেছে, মীরা গর্জন করে ওঠেঃ না যাবেন তো ভাতব্যঞ্জন আমি গরুর জাবনায় ঢেলে দিইগে।

বলেই ফরফর করে ফিরে চলল। ভয় পেয়ে এবারে ভাস্কর উঠে পড়েছে। মীরা ফিরে তাকায় না—চষা-ক্ষেত, বড় বড় মাটির ঢেলা—তার মধ্য দিয়ে পথ সংক্ষেপ করে চলেছে। ভাস্কর ডাকছে পিছন থেকেঃ উঠে পড়েছি মীরা। দাঁড়াও একটু, চেয়ে দেখ—

বাইরে দেমাক করলে কি হবে, পায়ের তলায় ঢেলা পড়ে প্রাণ যাই-যাই করে। আর মীরা ছুটে চলেছে কেমন দেখ। মাটিতে পা ছোঁয় না বুঝি তার, পরীর মতন বাতাসে আঁচল ভাসিয়ে যাচ্ছে। মাটি ছুঁলে এমন আলগোছে যেতে পারত না।

আ'লে ঠোক্কর লেগে ভাস্কর আচমকা আছাড় খেয়ে পড়ল।

মুখ ফিরিয়ে মীরা হায়-হায় করে ওঠেঃ এত করে বলি, জুতোটুতো পরে ভাল পথ দিয়ে চলাচল করুন। আমরা পারি বলে আপনি পারবেন? হল তো এবার?

ভাস্কর ততক্ষণে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে-ও ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেঃ হবে আবার কি। পড়েছি নাকি? ঢেলা সরে গেল পায়ের নিচে থেকে—তোমাদের যায় না?

না, পড়বেন কেন। আমাদের ঘরে বিস্তর ভালমন্দ খেয়ে রক্ত বেশি হয়েছে কিনা, কবজি ফেটে এমনি এমনি রক্ত বেরুচ্ছে। দেখতে পাবেন হাতের কী দশা হয়!

রক্ত বন্ধ করার অন্য কিছু না পেয়ে কবজির উপর হাত চেপে ধরে

মীরা তাকে একরকম টেনেই নিয়ে চলল। কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, কী যে করি আপনাকে নিয়ে! গলবস্ত্র হয়ে বলছি, চলে যান আপনি। কোন দিন আরো কি সর্বনাশ ঘটাবেন—ভয়ে আমার বুক কাঁপে।

যাবো তাই মীরা, কিন্তু একা-একা নয়।

দুপুরের নির্জন মাঠ, হাতে-হাত-ধরা দু'জনের, গাছপালায় ঢাকা ঘরবাড়ি দেখা যায় অদূরে। কী চোখে তাকায় ভাস্কর, মীরার সর্বদেহ থর থর করে কাঁপে।

বলে, পঙ্গু শয্যাশায়ী মা আমার বেঁচে থেকেও ছিলেন না, কর্মবীর বাবা কাজকর্ম নিয়ে সর্বক্ষণ বাইরে বাইরে, অনু-মা ছিলেন তিনিও চলে এলেন—একলাই চিরকাল আমি থেকে এসেছি। কিন্তু যে লোভ ধরিয়ে দিলে, এখন আর সে সাধ্য নেই। একটি মানুষ চাই আমার দুঃখ-কষ্টের দিনে হাতে হাত রেখে আমার সঙ্গে যে এগিয়ে চলবে। অনু-মা ভাল হয়ে গেলে তাঁর কাছে আমি ভিক্ষা চাইব।

মীরা হাত ছেড়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে, একটি কথাও না বলে দ্রুত-পায়ে অদৃশ্য হল। হতভম্ব হয়ে যায় ভাস্কর, খানিক দাঁড়িয়ে থাকে। কী পাগলামিতে যে পেয়ে বসল—মীরা বিষম রেগে গেছে। এর পরে মুখ দেখাব কেমন করে তার কাছে?

বাড়ি গিয়ে দেখে, না, রাগ করে বসে নেই—কাজেই ছিল মীরা। ইতিমধ্যে গাঁদাফুলের পাতা তুলে শিলে বেটে রেখেছে। খাওয়ার পিঁড়িতে বসতে না বসতে কবজির ক্ষতের উপর খানিকটা প্রলেপ দিয়ে ন্যাকড়ায় কষে ব্যাণ্ডেজ করে দিল।

কোথায় রাগ! খিল খিল সে হেসে ওঠে: দুষ্টু মানুষটার হাত বেঁধে ফেললাম। কেমন জব্দ! হাত তুলে কেমন করে খান এবারে দেখি।

ভাস্করও সেই সুরে বলে, কুছ পরোয়া নেই। কারো গরজ থাকে তো ভাত মেখে মুখে তুলে দিক। নইলে আমার কি—রইলাম পড়ে উপোস করে।

পুরানো স্মৃতিতে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বলে, অনু-মাকে কম জ্বালিয়াছি! এটা দাও, ওটা দাও—নয় তো খাবো না, জেদ ধরে বসে রইলাম। কোথা থেকে সেই সব আবদারের জিনিষ জুটিয়ে এনে কত রকম খোশামোদ করে কোলে বসিয়ে অনু-মা ভাত খাওয়াতেন। ছেলেবয়সে কত কি করা গেছে, ভাবলে এখন হাসি পায়।

মীরা বলে, বয়স হোক যা-ই হোক, সেই ছেলেমানুষ আপনি এখনো।

সে যদি হয়ে থাকি, এই ক'দিনে তোমাদের কাছে এসে। অর্ধেক ইয়োরোপ চষে বেড়িয়েছি জানো—একলা একটি প্রাণী। সে দেশের সেরা সেরা ইনডাস্ট্রিয়ালিস্টদের সঙ্গে ব্যাপার-বাণিজ্যের কথাবার্তা চালিয়েছি।

একটি ভ্রূভঙ্গিতে মীরা ভাস্করের সকল কৃতিত্ব উড়িয়ে দেয়।

বিরক্ত হয়ে ভাস্কর বলে, মিথ্যা বলছি নাকি?

তা ছাড়া কি!

পাশপোর্টে অ্যারাইভ্যাল-ডিপারচারের নোট—তা-ও বুঝি ভুয়ো?

মীরা বলে, নিয়ে আসুন পাশপোর্ট। দেখব।

গাঁয়ের মধ্যে এখানে পাশপোর্ট কি জন্যে আনতে যাব? কলকাতায় চলো—

উঁচু দরের হাসি হেসে মীরা বলে, সে আমি জানতাম।

ভাস্কর ক্ষেপে যায়। বিদেশের যত বাহাদুরি এই দরিদ্র গ্রাম্যকন্যার কাছে প্রমাণ না করলে মানইজ্জত বুঝি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। বলে, খবরের কাগজ তো পড়ো—বিলেত থেকে ফিরলে ছবি বেরিয়েছিল আমার।

আকাশ থেকে পড়ে মীরা: তা হলে বুঝি নজরে পড়ত না?

কী আশ্চর্য! তুমি যদি কানা হও, দুনিয়াটা তার জন্য মিথ্যে হয়ে যাবে? তোমার মামার কাছে বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করে নিও, সত্যি না মিথ্যে—

কী জানি কোন্‌টা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে। তবে এটা মিথ্যে নয় যে—

কপট গাম্ভীর্য ছেড়ে মীরা অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে উঠল। মুখে আঁচল চেপেও হাসি রোধ করতে পারে না। বলে, এটা মিথ্যে নয় যে আপনি একেবারে ছেলেমানুষ। ঝগড়ায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে ভাত-ব্যঞ্জন মেখেছি, হাঁ করেছেন—গালেও পড়েছে দু-এক বার। কিচ্ছুটি টের পান নি। কিন্তু আর নয়, লোকে দেখলে কি বলবে? চামচে এনে রেখেছি—মাখা-ভাত চামচেয় তুলে তুলে খান। সন্ধ্যেবেলা কি কাল সকালে ব্যাণ্ডেজ খুলে দেবো।

এর পরে চরম হল সেই হাটবারের দিনটা। ডাক্তার পাল কনফারেন্স শেষ করে পরের দিন আসছেন। গৌরদাস কলকাতার চলে গেছে তাঁকে সঙ্গে করে আনবার জন্য। এদিককার সমস্ত দায় মীরার উপর। এত বড় মানুষটা আসছেন, খাবেন এখানে কাল দুপুরে। ভাল মাছ-তরকারির জন্য হাটে যাওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু বিকালবেলা বলরামের জ্বর এসেছে, কাঁথা মুড়ি দিয়ে কাঁপছে।

বেলা ডুবু-ডুবু। লোকজন হাটে চলেছে বাড়ির সামনের রাস্তা ধরে। উচ্চকণ্ঠে নিজেদের কথাবার্তা বলতে বলতে যাচ্ছে। কোনদিকে ছিল ভাস্কর, রান্নাঘরের দাওয়ার নিচে এসে দাঁড়ায়। চেঁচাচ্ছে: কোথায় গেলে মীরা? হাটের সময় হয়ে গেল, হুঁশ নেই তোমার। ধামা-ঝুড়ি সব কোথা?

মীরা বেরিয়ে এসে বলে, ও-বাড়ির গণেশকে বলে এসেছি, সে আমাদের হাট করে দেবে। ক্ষেতে নিড়ান দিচ্ছিল, এইবারে এসে পড়বে।

ভাস্কর বলে, বাড়ির মানুষ থাকতে পরের খোশামুদি করতে যাওয়া কেন? আমি পারি নে? নাকি আমায় সন্দেহ করো, পয়সা চুরি করব হাট করতে গিয়ে?

কারো পরোয়া করে নাকি ভাস্কর! ঝুড়ি-খালুই কেরোসিনের-বোতল নিজেই খুঁজেপেতে নিয়ে এলো। গামছা পাট করে কাঁধে

ফেলে তার উপর ঝুড়ি বসিয়েছে। ডান-হাতে মাছের খালুই ও হ্যারিকেন-লণ্ঠন, বাঁ-হাতে কেরোসিনের বোতল।

কি কি আনতে হবে বলে দাও—

বলবে কি মীরা, হেসেই খুন। একটানে কাঁধের ঝুড়ি কেড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলঃ ইস রে—অবিকল বলরাম আমাদের! যে পত্তোরটা যেমন ভাবে নিয়ে সে হাটে বেরোয়। একটা জিনিষ হয় নি কেবল, ঐখানে হেরে রয়েছেন।

সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে ভাস্কর তাকাল।

কথার শেষে দিদিঠাকরুন ডাকলেন কই? কি কি আনতে হবে দিদিঠাকরুন—হুবহু এই বলবেন। হিসেব করে পয়সাকড়ি গণে নিয়ে গাঁটে গুঁজবেন।

ভাস্কর বলে, মতলব বুঝেছি তোমার। আজেবাজে কথায় সময় কাটানো—এর মধ্যে গণেশটা এসে পড়লে তাকেই সব বুঝিয়ে দেবে। কাজ নেই আমার শুনে নিয়ে। যেটা চোখে ধরবে, কিনে নিয়ে আসব।

ঝুড়ি কুড়িয়ে কাঁধের উপর নিয়ে দ্রুতপায়ে ভাস্কর বেরিয়ে পড়ে।

একটু পরে গণেশ এসে গেল, সে-ও পিঠ পিঠ ছুটেছে।

প্রহরখানেক রাত হয়েছে। আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না। কাঁধের ঝুড়িতে আনাজপত্র ডান-হাতের খালুইতে মাছ বাঁ-হাতে ঝুলানো কেরোসিন-ভরতি বোতল, গেঞ্জি গায়ে খালি-পায়ে ভাস্কর হাট থেকে ফিরে ছাঁচতলায় এসে দাঁড়াল। হাটুরে মানুষের ঠিক যেমনটি হতে হয়।

পিছনে শূন্যহাতে গণেশ। তারস্বরে গণেশ নালিশ জানাচ্ছেঃ একটি জিনিষ আমায় হাতে ধরতে দিলেন না। কী করব, হাটের মধ্যে তো লাঠালাঠি করতে পারি নে।

মীরা দাওয়ায় বেরিয়ে হ্যারিকেন তুলে ধরে দেখছে। অবাক হয়ে দেখে।

ষোল

ক্ষীণস্বর কান পেতে শুনতে হয়।

অনুপমা বলছেন, বমি করে ফেললাম রে। আঙুলে তুলে রক্ত বলে ঠেকে। গলা খস খস করছে, এই যে, আবার—আবার—

ভাস্কর বলে, রক্ত না আরো-কিছু! আমরা তো কিছু দেখছি নে। ছটফট কোরো না অনু-মা, ঠাণ্ডা হয়ে চোখ বুঁজে থাক। ঘুম এসে যাবে।

আলোর একেবারে জোর কমিয়ে দেয় ভাস্কর। মীরা ওদিকে ভিজে গামছায় মায়ের মুখ মুছিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি রক্ত পরিষ্কার করছে।

অনুপমা ঝিমিয়ে পড়েছেন। রাতের মধ্যে আর সাড়া মিলল না।

পরের দিনও অবস্থার ইতরবিশেষ নেই। ডাক্তার পাল এলেন। সেই আমলে অনুপমা তাঁকে দাদা বলে ডাকত।

শয্যার পাশটিতে বসে ডাক্তার ডাকলেন: আমায় চিনতে পারো অনুপমা? তাকিয়ে দেখ একবার।

অনুপমা ফ্যালফ্যাল করে দেখেন। ঘাড়ও একটু নাড়েন যেন। কথা নেই।

পরম যত্নে দেখলেন ডাক্তার পাল। রাধারমণ রায়ের মেয়ে—দেখবেনই তো! সে বয়সে রাধারমণের কথায় প্রাণ দিতে পারতেন।

বাইরে এসে মীরা আর গৌরদাসের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাবতীয় লক্ষণ শুনছেন। নিজেই সব জিজ্ঞাসা করছেন: এই রকমটা হয় বুঝি? —এই রকম, এই রকম? এরা 'হাঁ' দিয়ে যাচ্ছে।

নিশ্বাস ফেলে বললেন: একটা পরীক্ষা আছে আমাদের—বেরিয়াম মিল এক্সরে। কিন্তু কি হবে, সন্দেহ থাকলে তবেই তো পরীক্ষা।

ভাস্কর ভেঙে পড়ল : কোন যদি উপায় থাকে, কলকাতায় নিয়ে কিংবা যে-কোনখানে—আমায় বলুন ডক্টর পাল। প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখব।

ডাক্তার গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়েন : এ রোগের কাছে এখন অবধি পরাজিত আমরা। লড়াইয়ে লেগে আছি, আমার জীবন-সাধনা তাই। ইদানীং যা চিকিৎসা চলে, অনেকখানি মনের তুষ্টির জন্য—রোগীর দেহ-যন্ত্রণা কমে, জীবনের মেয়াদ হয়তো কিছু বাড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু সেদিক দিয়েও খুব দেরি হয়ে গেছে। বিছানা থেকে নড়ানো-সরানোর অবস্থা নেই। মাসও আর নয়—দিনের গণতিতে এসে ঠেকেছে।

রান্নাবান্না হয়ে আছে, দুপুরবেলাটা এখানে খেয়ে যাবেন সেই আয়োজন ' কিন্তু ডাক্তার দেরি না করে জীপে উঠে পড়লেন।

অনুপমা অর্ধ-অচেতন। ডাকাডাকিতে চোখ মেলেন, কিন্তু কথাবার্তা মুখে ফোটে না। দু-এক দিন পরে নতুন এক উপসর্গ—বিড় বিড় করে কী সব বলছেন। অর্থহীন অসংলগ্ন বকুনি—তিনটে করে কথা একসঙ্গে। যেমন : দুই-নয়-সাত, ক-খ-দ, কলা-আখ-গুড়, ছেলে-মেয়ে-বউ। এমনি ধরনের কথা। সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে আবার সকাল। তিলার্ধ কালের বিরাম নেই মুখে, ঘুমও একেবারে গেছে।

দিন তিনেক এমনি অবস্থায় থেকে নিস্তব্ধ হলেন অনুপমা।

বাইরের দিককার মেটে-দেয়ালের ঘরখানায় ভাস্করের ওঠ-বসা গৌরদাস কোন দিকে যাচ্ছিল, ভাস্কর ডাকে : শোন গৌর-কাকা।

নিশ্বাস ফেলে বলে, এদিকেও চুকেবুকে গেল। আমার অদৃষ্ট! চলে যাই এবারে।

গৌরদাস বলে, কার জন্যে আর আটকাতে যাব? দিদি বড় কষ্ট পেয়ে গেলেন। কষ্টযন্ত্রণার শেষ এত দিনে।

একটা টুল টেনে নিয়ে গৌরদাস বসে পড়ল। বলে, ছোটবেলা দিদির কোলে-পিঠে মানুষ হয়েছিলে—সেটা যদি ঋণ বলে ধরো, সে ঋণের অনেকখানি শোধ হয়ে গেল। আমিও চলে যাব—গিয়ে আবার কাজকর্মে লেগে পড়ি।

চুপ করে একটুখানি ভেবে বলে, সমস্যা মীরাকে নিয়ে। মেয়েটার বড় মন্দ কপাল। ছুনিয়ার উপর আপন বলতে কেউ নেই। বয়স্থা মেয়ের যত্রতত্র থাকা চলে না। ওর কথাই ভাবছি আমি—

অপ্রত্যাশিত ভাবে সুযোগটা গৌরদাসের কাছ থেকে এসে পড়ল, ভাস্করকে ভূমিকা করতে হল না। তাড়াতাড়ি সে বলে, মীরার জন্য ভেবো না গৌর-কাকা। তার সকল ভাবনা আমার। তুমি আশীর্বাদ করো আমাদের!

স্তম্ভিত হয়ে গৌরদাস তাকিয়ে পড়ে।

ভাস্কর বলছে, মীরাকে চাই আমি। ভেবেছিলাম, সুস্থ হয়ে গেলে অনু-মা'র কাছে কথাটা তুলব। ঘটে উঠল না আমাদের অদৃষ্টে।

গৌরদাস ঘাড় নেড়ে বলে, হবে না ভাস্কর—এ-জিনিষ হতে পারে না।

হবে না কেন?

যেন কোন যন্ত্র থেকে শব্দ নির্গত হচ্ছে, মানুষের কণ্ঠ নয়—গৌরদাস তেমনি ভাবে বলে, একদিন রাত্রিবেলা তোমাদের বাড়ি থেকে দিদিকে কুকুর-বিড়ালের মতন দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ছেলেমানুষ তুমি তখন, কিন্তু একেবারে ভুলে যাবার কথা নয়। মীরা গর্ভে এসেছিল, অপরাধটা সেই—

ভাস্কর বলে, ধরে নাও তারই প্রায়শ্চিত্ত। মীরাকে প্রতিষ্ঠিত করব সেই বাড়িতে, মীরা সর্বময়ী। কাব্যের মতন শোনাবে—কিন্তু মীরা সত্যি সত্যি শতদল-পদ্ম, কোন্ পাঁকে জন্ম সে খোঁজে আমার গরজ নেই।

চুপ করে আছে গৌরদাস।

ভাস্কর অধীর হয়ে বলে, শত্রুতা অনেক করেছ গৌর-কাকা। বাবার আত্মহত্যার মূলে তুমিই। সম্পদের পিছনে আমি পাগল হয়ে দৌড়ব না—বাবাকে দেখে শিক্ষা হয়েছে। মীরাকে নিয়ে সুখী হব, নিরালা শান্তির ঘর বাঁধব। হাতজোড় করছি তোমার কাছে, বাবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুতার শেষ হোক। খুশি হয়ে তুমি অনুমতি দিয়ে দাও।

পাষাণ গৌরদাস। এমন করে বলছে, কণ্ঠস্বর তবু এক বিন্দু কাঁপে না। বলে, অসম্ভব—

ভাস্কর ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, কিছু যায় আসে না তোমার অমতে। মীরা সাবালিকা। স্বেচ্ছায় আমরা বিয়ে করব। কেউ রোধ করতে পারবে না।

গৌরদাস বলে, হবে না, হতে পারে না। মীরা বোন হয় তোমার। একই পিতার রক্ত দু'জনের দেহে।

বোমা পড়ল বুঝি ঘরের মধ্যে, তারপর নিদারুণ স্তব্ধতা—জগৎ-সংসার পুড়ে জ্বলে ছারখার হয়ে গেছে যেন।

ক্ষণপরে গৌরদাস কথা বলে: সেই রাত্রে একবাড়ি লোকের চোখের উপরে দিদিকে স্বৈরিণী নাম নিয়ে চলে যেতে হল। আর পরম ধার্মিক তোমার পিতৃদেব ছাতের উপরের ঠাকুরঘরে ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন। ধ্যান তাঁর এতটুকু বিচলিত হল না।

মিথ্যে কথা—তোমার নতুন বানানো। বাবা অনু-মা দু'জনেই গেছেন, প্রতিবাদের কেউ নেই। গল্প ইচ্ছামতো বানিয়ে দিলেই হল।

প্রতিবাদ কানে না নিয়ে একই সুরে গৌরদাস বলে যাচ্ছে, সকল কলঙ্ক-লাঞ্ছনা একলা মাথায় নিয়ে নিঃশব্দে দিদি বেরিয়ে গেলেন, বিশ্বাস করে যাকে সর্বসমর্পণ করেছিলেন তার গায়ে আঁচড়টি পড়তে দিলেন না। কারো কোনদিন জানবার কথা নয়, কিন্তু আমার চোখ বড় ধারালো। মহাত্মা নীরদবরণের চিঠি আবিষ্কার করে দিদিকে চেপে ধরলাম। তখন 'না' বলতে পারেন না। কথা আদায় করে নিলেন,

ব্যাপারটা আমি প্রকাশ করব না। দেখতে পারো সে চিঠি—প্রেম আছে, তার সঙ্গে বিবেচনাও আছে। বাচ্চার বাবদে কিছু থোক টাকা দেওয়ার প্রস্তাব। দেখবে? যে চিঠি এখানেই আছে। দিদি নেই, এখন দেখানোর বাধা হবে না।

একটু থেমে তিক্ত হাসি হেসে গৌরদাস আবার বলে, দিদি ছিল—যেন মানুষ নয়, অভিমান আর আত্মসম্মানের পাহাড়। সকলের চোখের আড়ালে এই তেপান্তরে এসে পড়ে রইল—কারও এককোঁটা দরদ কি করুণার প্রত্যাশী হল না। আমার বাবাও ঠিক এমনি। মেশিন বিকল হয়ে সোনার-বাংলা স্টীল কোম্পানির দরজায় তালা পড়ল, দেশসুদ্ধ সকলে এই জানে। তোমার পুণ্যশ্লোক পিতৃদেবের আরও এক কীর্তি। কেমন করে মেশিন ভাঙে, হাতবদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেশিন আবার চালু হয়ে যায়—এ রহস্য নিয়েও গবেষণা আমার আছে। ঐশ্বর্য মানুষকে কত নিচুতে নামায়—যাঁকে গুরুর মতন মান্য করতেন, তাঁকে পথে বসাতে বাধল না। সমস্ত জেনে বুঝেও বাবা একটি কথা বলেন নি, নিঃসম্বল পথে নেমে গেলেন—নিরিবিলি এই সিদ্ধিহাটে এসে উঠলেন। জানেন, নতুন করে কিছুই হবে না, বয়স আর দারিদ্র্য বিপক্ষে—তবু কতকগুলো ছেলে জুটিয়ে আশ্রম বানিয়ে তাদের চরিত্র-গঠনে লেগে গেলেন। যেমন বাবা তেমনি আমার দিদি—একজুটি ওঁরা দু'জনে—নিজেরাই কেবল জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হলেন। কিন্তু আমি কেমন উল্টো স্বভাব পেয়েছি। শুনেছি, মা এই রকম ছিলেন—অন্যায় এক তিল সয়ে যেতে পারতেন না।

কিন্তু এত সমস্ত কথা শুনছে না বোধহয় ভাস্কর। আবিষ্ট হয়ে আছে। হাসছে ফিক ফিক করে, পাগলে যেমনধারা হাসে।

বলে, পলকে কেমন ভোজবাজি হয়ে গেল গৌর-কাকা। ধন-ঐশ্বর্য নেই, কাজকারবার নেই, বাবা নেই, অনু-মা নেই, মীরাকে পেলাম না, শম্পা তো আগেই গেছে—মুক্তপুরুষ আমি। না, লেংটি পরে জঙ্গলে ঢুকছি নে, আছে আমার একটা জিনিষ—

মাথার উপরে তালকাঠের আড়া। তক্তাপোষে উঠে হাত বাড়িয়ে ভাস্কর আড়ার উপর থেকে পিস্তল নামিয়ে আনল। বলে, একলা আসি নি গৌর-কাকা, বন্ধুকে সঙ্গে এনেছি। কেউ না থাক, পিস্তল আছে আমার।

পিস্তল তাক করল—গৌরদাসের দিকে নয়, নিজের দিকে। আর কিছু জানে না ভাস্কর।

* * *

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বারো দিনের পর চেতনা ফিরল। অপারেশন হয়েছে, মাথায় গুরুতর আঘাত। চেতনা কোনদিনই ফেরবার কথা নয়—কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ধাক্কা দিয়েছিল গৌরদাস, পিস্তলের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল।

সিতাংশু সেই সময়টা রোগির কাছে এসেছে। সঙ্গে শম্পা। কী চেহারা শম্পার—বিবর্ণ মুখ, সে-ও যেন রোগে ভুগে আধখানা হয়ে গেছে। শয্যার উপারে শিয়রের দিকে শান্তমূর্তি মীরা।

চেতনা পেয়ে ভাস্কর সকলের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে অবস্থাটা বোধকরি মনে মনে ভেবে নেয়। প্রথম কথা বলল: শম্পা এসেছ?

ডাক্তারদের আশঙ্কা, দেখা গেল, অমূলক। মস্তিষ্ক বেসামাল হয় নি, চিনতে পেরেছে ভাস্কর। এমন কি পিছনের কথাও মনে পড়ে গেছে। মুখে একটুকু হাসির রেখা ফুটল। অনেক দিন আগেকার সেই পুরানো প্রশ্ন: শম্পা, কী এখন তুমি?

শম্পার ম্লান মুখেও সেই পুরানো হাসি। এবং সেই পুরানো দিনের উত্তর: শম্পা গাঙ্গুলি—এখনো। পাকা কথা এবারও ফেঁসে গেছে—আমার চিরকেলে অদৃষ্ট!

সিতাংশু তাড়াতাড়ি বলে দেয়, তুমি চলে গেলে ভাস্কর, সেই রাত্রেই শম্পা এসে হাজির। বিয়ের চক্রান্ত ওর কাছে গোপন রাখা হয়েছিল—জানতে পেরে তুমুল ঝগড়াঝাটি করে স্টেশনে গিয়ে

গাড়ি চাপল। লক্ষ্ণৌ থেকে এত পথ এসেও রাগে তখন অবধি গরগর করছে। আমায় বলল, বাবাকে না চটাতে চাও তো স্পষ্টাস্পষ্টি বলো—বাসায় উঠব না, হোটেলে গিয়ে উঠি। কিন্তু এখন থাক এ সমস্ত—সেরে ওঠো, তারপর সমস্ত শুনবে।

নিঃশব্দ মীরা ছবির মতো বসে। শম্পা চোখ তুলে বারম্বার তাকে দেখছে। মীরার একখানা হাত ভাস্কর মুঠি করে ধরল। বলে, শম্পা, আমার ছোট বোন। ভাইবোন আমরা বড় দুঃখী।

এতগুলো কথার পর ক্লান্ত হয়ে ভাস্কর আবার চোখ বুঁজল।

শেষ